চিঠিপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চিঠিপত্র

চিঠিপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

প্রকাশক—শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ ... অগ্রহায়ণ, ১৩৪৯

মূল্য একটাকা

মুদ্রাকর—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
শান্তিনিকেতন প্রেস, শান্তিনিকেতন

শ্রীপ্রতিমা ঠাকুরকে লিখিত

(১) ওঁ শিলাইদা

নদিয়া

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, আমরা ত কাল অনেক স্রোত ঠেলে সমস্ত দিন নদীর ধারার সঙ্গে লড়াই করে রাত্রে শিলাইদহে এসে পৌঁচেচি।

এখানে কাজকর্ম্মের ভিড় যথেষ্ট। কতদিন থাক্‌তে হবে এখনো ঠিক বলতে পারিনে।

কিন্তু তোমার পড়ার পাছে ব্যাঘাত হয় এই উদ্বেগ আমার মনে আছে। তোমাকে পড়াবার জন্যে অজিতকে বলে এসেছিলুন সেইমত তোমার পড়া চল্‌চে ত? ইংরাজি পাঠ প্রথম ভাগ ত হয়ে গেছে—আর একটা বই তোমার জন্যে ঠিক করে দিয়েছিলুম সেটা বেশ বুঝতে পারচ ত? সে বইটা ইংরাজিপাঠের চেয়ে ভারী নয় বরঞ্চ হালকা।

হেমলতার কাছ থেকে বাংলা গদ্য ও পদ্য কিছু কিছু পড়ে যেয়ো। বানানটা যাতে ক্রমে বিশুদ্ধ হয় সেই চেষ্টা কোরো।

আর তোমাকে আমার একটি উপদেশ আছে প্রতিদিন ভক্তির সঙ্গে ঈশ্বরের কাছে নিজেকে নিবেদন করে দিয়ো।

অনেকদিন পরে আমি পদ্মায় এসেছি। আজ সকালে সুন্দর রৌদ্র উঠেছিল। নদী একেবারে কূলে কূলে পরিপূর্ণ। আজ সকালবেলা যখন বোটের ছাদের উপর বসে উপাসনা করছিলুম আমার মনের ভিতরটি আলোকে ও সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। এই জল স্থল আকাশের মাঝখানে বসে তাঁকে চিত্তের মধ্যে অনুভব করতে আমার খুব ভাল লাগ্‌চে। ইচ্ছা করে অনেকদিন ধরে এই রকম এখানে শান্তি ও নির্ম্মলতার মধ্যে নিবিষ্ট হয়ে কাটিয়ে দিয়ে যাই। কিন্তু যিনি প্রভু তিনি ছুটি না দিলে কিছুই হবে না—তিনি এখনো আমার হাতে কাজ রেখে দিয়েছেন। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। ইতি ২৩শে আষাঢ় ১৩১৭

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পতিসর

আত্রাই

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, আমরা কাল রাত্রে পতিসর পৌঁচেছি। এখানে এসেই তোমার চিঠিখানি পেয়ে খুসি হলুম।

আমি যে ঠিক কাজের তাগিদে এসেছি সে কথা সম্পূর্ণ সত্য নয়। লোকজনের মধ্যে যখন জড়িয়ে থাকি তখন ছোটো বড় নানা বন্ধন চারদিকে ফাঁস লাগায়—নানা আবর্জ্জনা জমে ওঠে—দৃষ্টি আবৃত এবং বোধশক্তি অসাড় হয়ে পড়ে—তখন কোথাও পালিয়ে যাবার জন্যে মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। যিনি অপাপবিদ্ধ নির্ম্মল পুরুষ, যিনি চির জীবনের প্রিয়তম, তাঁর মধ্যে সম্পূর্ণ আপনাকে সমর্পণ করে দেবার জন্যে মনের মধ্যে এমন কান্না ওঠে যে ইচ্ছা করে বহু দূরে বহু দীর্ঘকালের জন্যে কোথাও চলে যাই। যতই নানাদিকে নানা কথায় নানা কাজে মন বিক্ষিপ্ত হয় ততই গভীর বেদনার সঙ্গে সুস্পষ্ট বুঝতে পারি তিনি ছাড়া আর কিছুতেই আমার স্থিতি নেই তৃপ্তি নেই—তাঁকে ছাড়া আমার একেবারেই চল্‌বে না।

কবে তিনি আমার বাসনা পূর্ণ করবেন জানিনে—কিন্তু জোড় হাত করে কোনো প্রশান্ত পবিত্র নির্জ্জন স্থানে তাঁর দিকে তাকিয়ে পড়ে থাক্‌তে ইচ্ছা করে—কেবল বলি—মা মা হিংসীঃ—আমাকে আর আঘাত কোরো না—আর মেরো না, আর মেরো না—ভাল মন্দর দ্বন্দ্বের মাঝখানে রেখে আমাকে কেবলি চারদিক থেকে এমন ধাক্কা খেতে দিয়ো না। জীবন যখন দ্বিধাবর্জ্জিত বাসনা-মুক্ত পবিত্র হয়ে উঠ্‌বে—তখন লোকালয়েই থাকি আর নির্জ্জনেই থাকি সর্ব্বত্রই সেই পবিত্রতার সাগরের মধ্যে সেই প্রেমের অতলস্পর্শ সমুদ্রের মধ্যেই নিমগ্ন হয়ে থাক্‌তে পারব। দুঃস্বপ্নজালজড়িত এই অন্ধকার রাত্রির অবসানে সেই জ্যোতির্ম্ময় প্রভাতের জন্যে মন অহরহ অপেক্ষা করচে—সকল সুখদুঃখ, সকল গোলমাল, সকল আত্মবিস্মৃতির মধ্যেও তার সেই একটি মাত্র সত্য আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু চিরদিনই জীবনকে এত মায়ায় এত মিথ্যায় জড়াতে দিয়েছি যে, তার জাল কাটাতে আজ প্রাণ বেরিয়ে যাচ্চে। তা হোক্, তবু কাটাতেই হবে—সংসারের, বিষয়ের, বাসনার সমস্ত গ্রন্থি একটি একটি করে খুলে তবে যেন আমার এই জীবনের ব্রত সাঙ্গ হয়—স্নান করে ধৌত হয়ে নির্ম্মল বসন পরে শুচি ও সুন্দর হয়ে

যেন এখান থেকে বিদায় গ্রহণ করে তাঁর কাছে যেতে পারি—ঈশ্বর সেই দয়া করুন—আর সমস্ত চাওয়া যেন একেবারে নিঃশেষে ফুরিয়ে যায়। তোমাদের মধ্যেও আমার সংসারের মধ্যেও সেই পবিত্র পরম পুরুষের আবির্ভাব বাধামুক্ত হয়ে প্রকাশ পাক্ এই আমার অন্তরের একান্ত কামনা। তোমার মনের মধ্যে সেই অমল সৌন্দর্য্যটি আছে—যখন তাঁর জ্যোতি সেখানে জ্বলে উঠ্‌বে—তখন তোমার প্রকৃতির স্বচ্ছতা ও সৌন্দর্য্যের মধ্যে থেকে সেই আলো খুব উজ্জ্বল ও মধুর হয়ে প্রকাশ পাবে আমার তাতে সন্দেহ নেই—তুমিই আমার ঘরে তোমার নির্ম্মল হস্তে পুণ্যপ্রদীপটি জ্বালাবার জন্যে এসেছ—আমার সংসারকে তুমি তোমার পবিত্র জীবনের দ্বারা দেবমন্দির করে তুল্‌বে এই আশা প্রতিদিনই আমার মনে প্রবল হয়ে উঠ্‌চে। ঈশ্বর তোমার ঘরকে তাঁরই ঘর করুন এই আশীর্ব্বাদ করি। ইতি ৭ই ভাদ্র ১৩১৭

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৩) ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, তোমার চিঠিখানি পেয়ে খুব খুসি হলুম।

আমাদের অভিনয়ের দিন কাছে আস্‌চে অথচ আজ পর্য্যন্ত আমার ভাল মুখস্থ হয় নি বলে ভাবনা ধরিয়ে দিয়েছে। মুখস্থ হবে কি করে? দিন রাত নানা লোকের সঙ্গে আলাপ করতে করতেই দিন কেটে যায়। কলকাতা থেকে লোক এখান পর্য্যন্ত এসে আমাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুল্‌চে।

তোমার ইংরিজি বই নিয়ে অভিধান দেখে বাংলা করবার চেষ্টা করতে থেকো—যেখানে বুঝতে বিশেষ বাধবে তোমার বাবার কাছে বুঝিয়ে নিয়ো।

রথীর চিঠি পেয়েছি। সে বেশ মজা করে ষ্টীমলাঞ্চে চড়ে চলে গেল—আমার ভারি লোভ হচ্চে। যদি এই অভিনয়ের উৎপাত না থাক্‌তো তাহলে দিব্যি মনের আনন্দে চলে যেতুম। দেখি, শিলাইদহে গিয়ে তার পরে ষ্টীমারে করে যদি কোথাও বেরিয়ে পড়ার সুবিধা হয়।

এখানে খুব ঘনঘটা করে এসেছে। এক একবার এলোমেলো বাতাস দিচ্চে, বৃষ্টি হচ্ছে—থেকে থেকে ভীষণ রবে বজ্র ধ্বনিও শোনা যাচ্চে। ভাবছিলুম নদীতে যদি রথী এই দুর্য্যোগ পেয়ে থাকে তাহলে মুস্কিলে পড়বে—কিন্তু তা হয় নি—সে ত লিখ্‌চে বৃষ্টি পথে পায় নি।

প্রভাতের মার শরীর বড়ই খারাপ। তিনি শান্তিনিকেতনেই আছেন। তাঁকে নিয়ে দু তিন রাত জাগ্‌তে হয়েছে।

মেয়েদের অভিনয়ের উৎসাহ খুব বেড়ে গেছে। তারা 'সতী' অভিনয় করবে বলে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল কিন্তু এই গোলমালের মধ্যে তাদের দেখিয়ে দেওয়া ঘটে উঠ্‌চে না।

তোমাদের বাড়ির নম্বরটা দিলে না কেন? আমার ত মনে নেই।

ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। ইতি রবিবার

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অক্টোবর, ১৯১০]

(৪)　　　　ওঁ　　　　বোলপুর

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, তোমার চিঠি পেয়ে খুসি হলুম। মিস্ বুর্ডেট্‌কে ত শুধু ভাল লাগ্‌লে হবে না, তাঁকে কাজে লাগাতে হবে। তিনি যদি শেলাই জানেন হয় তাহলে তাঁর কাছ থেকে ভাল করে শেলাই শিখে নিয়ো—কেবল সৌখীন শেলাই নয়—জামা কাপড় প্রভৃতি কাট্‌তে শেখা চাই। সেলাই শেখা উপলক্ষ্যে খানিকটা ইংরাজি কথা কওয়ার অভ্যাস সুরু হবে। তুমি যতটুকু পার ওঁর সঙ্গে কইতে বল্‌তে চেষ্টা কোরো, লজ্জা কোরো না। ওঁর খাওয়া দাওয়ার কি রকম ব্যবস্থা করে দিয়েছ? দুপুর বেলায় কি খেতে দাও? দেখো ঠিক সময়মত খাওয়ার যেন ব্যাঘাত না হয়—ওরা সকল কাজেই সময় রক্ষা করে চলে আর আমরা ঠিক তার উল্টো। রথীকে বোলো ওঁকে অল্প অল্প করে বাংলা শেখানো যেন ধরিয়ে দেয়—আপাতত বাংলা অক্ষর ও তার উচ্চারণ শিখ্‌তে ওঁর প্রাণ বেরিয়ে যাবে। মীরা ওঁকে বাংলা শেখাবার ভার নিতে

পারে। সন্ধ্যাবেলায় তোমাদের কি রকম কাটে? ওঁর সঙ্গে তোমাদের খেলা চলে কি? আমি যখন যাব তখন দেখব তোমাদের খুব ইংরিজি কথা হুহুঃ শব্দে চলচে। Christmas এর দিনে আগে থাকতে মনে করে ওঁর জন্যে কিছু card আনিয়ে দিয়ো এবং সেদিন একটু বিশেষ করে খাওয়া দাওয়া আমোদ প্রমোদ কোরো—বোটে করে নদীর চরে গিয়ে যা হয় একটা কিছু হুটোপাটি কোরো—রথীকে বোলো থ্যাকারের ওখান থেকে দুই একটা Christmas নম্বর ছবির কাগজটাগজ আনিয়ে দিতে এবং কলকাতা থেকে একটা সময়মত ক্রিষ্টমাস্ কেক্ আনাতে। উনি ভাল বাজাতে পারেন এবং বাজাতে ভাল বাসেন—রথীর কর্ত্তব্য হবে একটা পিয়ানো আনিয়ে নিতে—এই সময়টায় কলকাতায় Season, সুতরাং সুবিধা দামে পিয়ানো এখন পাওয়া শক্ত—আর তিনচার মাস পরে তবে দাম কমে যাবে। যা হোক্ উনি যখন ওখানে অমন একলা পড়েছেন তখন ওঁর চিত্তবিনোদনের একটা বিশেষ উপায় করে না দিলে কষ্ট দেওয়া হবে।

দ্বিপুকে পাটালি পাঠাতে রথীকে বলেছিলুম কই এ পর্য্যন্ত তার ত কোনো লক্ষণ দেখ্‌চিনে—দ্বিপু ঐ পাটালির পথ চেয়ে আছে।

রথীর বাগান চাষবাস কি রকম চল্‌চে? মীরার মামাশ্বশুরের বাগানের কি খবর? সেখান থেকে শালগম গাঁজরের আমদানি হচ্চে বোধ হয়।

নগেনের আসবার কোনো খবর পেয়েছ কি?

রথীকে বোলো পিসিমাকে আমি অন্যত্র যেতে চিঠি লিখে দিয়েছি কিন্তু কোনো উত্তর পাইনি। তোমাদের শরীর ত ভাল আছে?

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১৯১০]

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, তুমি আমার নববর্ষের অন্তরের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কোরো। যিনি সকলের বড় তাঁকে তুমি সর্ব্বত্র দেখ্‌তে পাও, এই আমার একান্ত মনের কামনা। মানব জীবনকে খুব মহৎ করে জান—নিজের সুখস্বার্থ সাধন কখনই তার লক্ষ্য নয় এ কথা সমস্ত ভোগসুখের মধ্যে মনে রেখো—সংসারকেই বড় আশ্রয় বলে জেনো না এবং কঠিন দুঃখ বিপদেও ভক্তির সঙ্গে তাঁকে প্রণাম করে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করতে শেখ—প্রতিদিনের সুখ দুঃখে তাঁকে প্রণাম করার অভ্যাস রেখো—প্রত্যহই যদি তাঁর কাছে যাবার পথ সহজ করে না রাখ তাহলে প্রয়োজনের সময়ে সেখানে যেতে পারবে না। প্রভাতে ঘুম থেকে উঠেই যেন তোমার মনে পড়ে যে তিনিই আছেন তোমার চিরজীবনের সহায় সুহৃদ্ পিতামাতা—তাঁরি কর্ম্ম বলে সংসারের কর্ম্ম করবে—এবং এ জীবনে যাদের সঙ্গে তোমার স্নেহ প্রেমের সম্বন্ধ হয়েছে তাদের সেই সম্বন্ধ তাঁরই প্রেম উৎসের সুধারসে মধুর ও সুন্দর হয়ে রয়েছে এই কথাটি খুব গভীর করে মনের মধ্যে স্মরণ

করবে। তাঁর নাম স্মরণের মধ্যে তোমার মন প্রতিদিন স্নান করুক—সেই সত্যময় জ্ঞানময় আনন্দময় সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মের চিন্তার মধ্যে কিছুক্ষণের জন্যে মনকে ডুবিয়ে প্রতিদিনের সমস্ত ধূলা ও দাহ থেকে আপনাকে নির্ম্মল ও স্নিগ্ধ করে তোলো। তিনি তোমার মনে আছেন, বাইরে আছেন, দিনরাত্রি তিনি তোমাকে স্পর্শ করে আছেন—তিনি যেমন নিবিড়ভাবে অহরহ তোমার কাছে আছেন এমন আর কেউ না—খুব করে সেই কথাটি মনে জেনে তাঁকে প্রণাম করে সকলের এবং নিজের মঙ্গল তাঁর কাছে প্রার্থনা কোরো।

আমাদের এখানে কাল পূর্ণিমা রাত্রে মাঠের মধ্যে বর্ষশেষের এবং আজ খুব ভোর রাত্রে মন্দিরে নববর্ষের উপাসনা শেষ হয়ে গেল—সকলেই আমরা গভীর আনন্দ পেয়েছি।

তোমরা আবার শিলাইদহে কবে ফিরে যাবে? বড়দাদাকে নিয়ে হেমলতা বৌমা 'বোধ হয় পশু' কলকাতা হয়ে পুরীতে চলে যাবেন। ইতি ১লা বৈশাখ ১৩১৮

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৬) ওঁ

কল্যাণীয়াসু

মা, জীবনের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুকে মিলিয়ে না দেখ্‌লে সত্যকে দেখা হয় না। আমরা প্রতিদিন জীবনকে যখন উপলব্ধি করি তখন মৃত্যুকে তার অঙ্গ বলে উপলব্ধি করিনে বলে আমাদের প্রবৃত্তি দিয়ে সংসারটাকে আঁক্‌ড়ে থাকি। আমাদের বাসনা আমাদের ভয়ানক বন্ধন হয়ে ওঠে। মৃত্যুর সঙ্গে তাকে মিলিয়ে দেখলে তবেই সংসারের ভার হাল্কা হয়ে যায়। আবার আমরা মৃত্যুকে যখন দেখি তখন জীবনকে তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখিনে বলেই শোকের জ্বালা এত প্রচণ্ড হয়ে ওঠে। মৃত্যু জীবনকেই বহন করে, জীবন মৃত্যুর প্রবাহেই এগিয়ে চলচে এই কথাটিকে ভাল করে বুঝে দেখলে সত্যের মধ্যে আমাদের মন মুক্ত হয়। পূর্ণ সত্যের মধ্যে বিরোধ নেই। জীবন ও মৃত্যুকে একান্ত বিরুদ্ধ বলে জানলেই আমাদের মোহ জন্মায়। সেই মোহ আমাদের বাঁধে,

সেই মোহ আমাদের কাঁদায়। যত পাপ যত ভয় যত শোক ঐখানেই।

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১৯১১]

কল্যাণীয়াসু

আচ্ছা বেশ—তোমরাও যদি ছুটিতে সিঙ্গাপুরে যাও তাহলে আমিও তোমাদের সঙ্গে ঘুরে আসব। দিনুও যাবার জন্যে ক্ষেপেছে— তাকেও সঙ্গে নিতে হবে। ...

এখন cycloneএর সময় কি নয়? যদি সমুদ্রের মাঝখানে ঝড়ের দর্শন পাওয়া যায় তাহলে সমুদ্রটাকে খুব মনোরম বলে মনে হবে না।

যদি East Coast Railway দিয়ে কলম্বো যাতায়াত করতে ইচ্ছা কর সে একটা মন্দ trip হয় না। পূজোর সময় concession পাওয়া যায়। সেখানে Candy শুনেছি চমৎকার জায়গা।

যাই হোক্ সিঙাপুরই যদি তোমাদের পছন্দ হয় আমার তাতে আপত্তি নেই। পাছে জলপথে সেই একই রাস্তা দিয়ে ফেরবার সময় তোমাদের বিরক্ত ধরে এই একটা আশঙ্কা আছে।

যেখানেই যাও রথীকে বোলো Cookদের সঙ্গে

সমস্ত হোটেল খরচপত্র ইত্যাদি সম্বন্ধে যেন পরামর্শ করে রাখে।

মীরা ভাল আছে তাই আর কলকাতায় গেলুম না। যেতে হলে আমার কষ্ট হত। শরীর ত তেমন ভাল নেই ---এখানকার রেলে যাত্রার সময়টাও বড় বিশ্রী।

বড়দিদির বেশ ভাল লাগ্‌চে শুনে খুসি হলুম। তোমার পড়া শুনো এখন কি রকম চলচে? নগেন অনেকদিন অনুপস্থিত বলে বোধ হয় তোমার ক্লাস বন্ধ। সেই Astronomyর বই কি এখন রথী তোমাকে পড়ে শোনায়? জাহাজে যাবার সময় তোমাকে অনেক বই পড়ে শোনানো যাবে। ইতি

[১৯১১] শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, তোমরা ভয় করচ আমার বুঝি ভ্রমণে যাওয়ার মত উল্টে গেছে—একেবারেই না—ভ্রমণে বেরিয়ে পড়বার আবেগ আমার আরো বেড়ে যাচ্ছে—আমি দুই এক মাসের জন্যে কোথাও খুচরো রকমের বেড়াতে যেতে ইচ্ছে করিনে—পৃথিবীর কাছে বেশ ভাল রকমে বিদায় নেবার জন্যে মনটা উতলা হয়ে উঠেছে। কলকাতায় গিয়ে দেখব যদি বাধা কাটাতে পারি তাহলে আমি দূরেই বেরিয়ে পড়ব।

এখানে শারদোৎসব অভিনয়ের আয়োজন চলচে। আমাকে সবাই মিলে সন্ন্যাসী সাজাচ্চে। কলকাতা থেকে এবারেও মেয়েদের দল সব আসচেন।

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১৯১১]

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা—তোমরা ত বেশ নদীতে বেড়িয়ে এলে—আমরা এখানে মাঠের মধ্যে স্থির হয়ে বসে আছি। আগে যখন কুঠি বাড়ি তৈরি হয় নি তখন আমি বৎসরের অধিকাংশ সময়ই বোটে কাটিয়ে দিতুম ভারি ভাল লাগত। এখনো এক একবার সেই রকম করে নদীর চরে দিন কাটাতে ইচ্ছা করে কিন্তু সে আর হয়ে উঠ্‌বে না।

আজকাল খুব করে Science পড়চ বুঝি। Story of the Heavens বইখানা প্রথম যখন পড়েছিলুম তখন মুগ্ধ হয়েছিলুম—ওটা খুব চমৎকার। এবার যখন তোমরা কোনো সময়ে বোলপুরে আস্‌বে তখন এখানকার বড় দূরবীন দিয়ে তোমাদের চন্দ্র ও গ্রহদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া যাবে। রথীকে বলে এই রকম একটা দূরবীন কিনিয়ে নেও না কেন? আমাদের এখানে যেটা আছে তার দাম ২৫০ টাকা—কিন্তু পঞ্চাশ

ষাট টাকায় ওদের ওখানেই ছোট সাইজের দূরবীন পাওয়া যায় তাতেও বেশ কাজ চলে।

সন্তোষ আজকাল একলা। ওর মা এবং স্ত্রী কেউ এখানে নেই। ও গোরু মহিষ নিয়ে দিনযাপন করচে।

আমি নগেন্দ্র শ্যালকের দেশ থেকে একজন নাপিত চাকর আনিয়ে তাকে তৈরি করে নিচ্চি। তার বুদ্ধি বেশ আছে—হাঁতের কাজও বোধ হয় ভাল পারে, কামাতে জানে, শুনেছি ঘড়ি মেরামৎ করতে পারে। তোমাদের চাকরের অভাব আছে বলেই আমি একে আনিয়েছি। আমি যখন তোমাদের কাছে যাব একে নিয়ে গিয়ে রেখে আসব।

নগেনের সেই প্রিয়পাত্র পাড়ার ছেলেরা এক একদিন সন্ধ্যাবেলা এসে কি গান শুনিয়ে যায়? আমার এখানেও সে রকম গাইয়ে খুঁজলে পাওয়া যায়—তারা গলা ছেড়ে গান গাইতেও ছাড়ে না।

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১৯১১]

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, রথীকে এই চিঠি দিয়ো। কিছু দিন থেকে মনে মনে ভাবছিলুম বুধগয়ায় যাব এমন সময় হঠাৎ দেখি নগেন মীরারাও সেখানে যাবার আয়োজন করচে তাই এক সঙ্গে যাওয়াই ঠিক করেছি। ওরা হয় ত দুচার দিনেই ফিরে আসবে। আমি কত দিন কোথায় থাকব এখনো ঠিক করিনি। হয় ত বা হরিদ্বারেও যেতে পারি। আপাতত ভগবান বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করতে চলেছি।

ও জায়গাটি তোমাদের ভাল লেগেছে এবং তোমরা সকলে মিলে আনন্দে আছ এই শুনে আমি খুব খুসি হলুম। নগেন বলছিল তোমরা দুই চার দিনের মধ্যেই পুরীতে যাবে। যতদিন তোমরা যেখানে থাকতে ইচ্ছা কর বেশ ভাল করে দেখে শুনে বেড়িয়ে চেড়িয়ে আনন্দ করে শরীর মনকে প্রফুল্ল করে তবে ফিরে এসো—কোনো কারণেই তাড়াতাড়ি কোরো না—ইস্কুলের ছুটি

ফুরিয়ে গেলেও ভাবনা নেই। চাই কি তোমরা East Coast Railway দিয়ে দক্ষিণে যতদূর পর্য্যন্ত যেতে ইচ্ছা কর যেতে পার। শুনেছি ত্রাবাঙ্কুর ভারতবর্ষের মধ্যে খুব একটি রমণীয় জায়গা। তোমরা সেই পর্য্যন্তই যাও না। সেতুবন্ধ পার হয়ে লঙ্কাতেও যেতে পার।

চিরশুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[সেপ্টেম্বর, ১৯১৪]

(১১)　　　　　ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, আমি তোমাদের সকলকে অনেক দুঃখ দিয়েছি এবং দুঃখ পেয়েছি। আমার মনের মধ্যে কোথা থেকে একটা ঘন অন্ধকার নেমে এসেছে। কিন্তু সেটা থাক্‌বে না। তোমরা যখন ফিরে আস্‌বে তখন দেখ্‌তে পাবে আমি নিজের স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বসেছি। আমার সেই স্থানটি হচ্চে বিশ্বের বাতায়নে, সংসারের গুহার মধ্যে নয়। তোমাদের সংসারকে তোমরা নিজের জীবন দিয়ে এবং পূজা দিয়ে গড়ে তুল্‌বে—আমি সন্ধ্যার আলোকে নিজের নির্জ্জন বাতায়নে বসে তোমাদের আশীর্ব্বাদ করব।

আমাকে তোমাদের কিছুমাত্র প্রয়োজন থাকবে না—ঈশ্বর তার থেকে আমাকে মুক্তি দেবেন। সংসার যাত্রার যা কিছু উপকরণ সে আমি সমস্ত তোমাদের হাতেই ছেড়ে দিয়েছি। এখন আমার সঙ্গে তোমাদের বিনা প্রয়োজনের সম্বন্ধ—সেই সম্বন্ধের টানে

তোমরা আমার কাছে যখন আসবে তখন হয় ত আমি তোমাদের কাজে লাগ্‌ব।

তোমাদের পরস্পরের জীবন যাতে সম্পূর্ণ এক হয়ে ওঠে সেদিকে বিশেষ চেষ্টা রেখো। মানুষের হৃদয়ের যথার্থ পবিত্র মিলন, সে কোনোদিন শেষ হয় না— প্রতিদিন তার নিত্য নূতন সাধনা। ঈশ্বর তোমাদের চিত্তে সেই পবিত্র সাধনাকে সজীব করে জাগ্রত করে রেখে দিন এই আমি কামনা করি।

তোমাদের সংসারটিকে সুধাপাত্রের মত করে মৃত্যুর পূর্ব্বে আমি একবার গৃহস্থধর্ম্মের অমৃতরস পান করে যাই এই আমার মনের লোভ এক একবার মনকে চেপে ধরে। কিন্তু লোভকে যেমন করে হোক্ ত্যাগ করতেই হবে। এখন আর ফল আকাঙ্ক্ষা করবার দিন নেই—সম্পূর্ণ নিরাসক্ত হয়ে তোমাদের কল্যাণ কামনা করব—সেই কল্যাণে আমার কোনো অংশ থাকবে একথা মনেও করতে নেই; এবং আমার রাস্তা দিয়ে যে তোমাদের জীবনের পথে তোমরা চলবে একথা মনে করা অন্যায় এবং এ সম্বন্ধে জোর করা দৌরাত্ম্য। তোমাদের সমস্যা তোমাদের, তোমাদের প্রকৃতি তোমাদের, তোমাদের পথ তোমাদের—তোমাদের সম্বন্ধে আমার স্নেহ এবং

আমার শুভ আশীর্ব্বাদ ছাড়া আর কিছু আমার নয়। সেই স্নেহকেও নির্লিপ্ত হতে হবে—সে যাতে তোমাদের প্রতি লেশমাত্র ভার স্বরূপ না হয় আমাকে সে দিকে লক্ষ্য রাখতেই হবে—তোমাদের ঈশ্বরকে তোমাদের আপনার জীবনের আলোকে তোমাদের আপনাদের সুখদুঃখ ও ভালমন্দের সংঘাতের ভিতর দিয়ে একদিন পাবে আমাকে সে জন্য উদ্বিগ্ন হতে হবে না—সে জন্যে আমি তাকিয়ে থাকব না। তোমাদের কল্যাণ হোক।

চিরশুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১৯১৫-১৯১৮]

তোমাকে বেলার খবর দিতে বলেছিলুম। কিন্তু দরকার নেই। আমি দুর্ব্বলভাবে এ রকম করে চারদিকে আশ্রয় হাৎড়ে বেড়াব না—বেলা নিশ্চয় ভালই আছে ভালই থাকবে—আমার উদ্বেগের উপর তার ভালমন্দ কিছুই নির্ভর করচে না।

বৌমা

তোমার চিঠিতে মীরার খুকী হওয়ার খবর পেয়ে খুসি হলুম। খুকীর ছবিও বেশ লাগল। ওর জন্যে এখান থেকে কাপড় পাঠাচ্চি—আশা করি তার গায়ে হবে। খোকার জন্যেও একটা জাপানী কাপড় পাঠালুম। আজ বিকেলে আমাদের জাহাজ ছাড়বে তাই সকাল থেকে গোছাবার হাঙ্গাম পড়ে গেচে। মুকুলটা কোনো-মতেই আমার সঙ্গ ছাড়ল না। সেও চলেচে। এখান থেকে যে কতকগুলো কাপড় চোপড় এবং জিনিষপত্র পাঠাচ্চি সে হয়ত বা এই চিঠির আগেই পৌঁছবে। রথীকে বোলো আমার জাপানী কিমোনোগুলো দেশে ফিরে গিয়ে পরতে চাই—ওগুলো ভারতবর্ষের পক্ষে খুব আরামের হবে। টুকিটাকি অনেক রকম জিনিষ জমেছিল সমস্তই রওনা করে দিলুম—তোমাদের কাজে লাগবে। এণ্ড্রুজের হাতে তোমার জন্যে একটা জাপানী তুলির বাক্স পাঠিয়েছি—গগন অবনের জন্যেও পাঠালুম।

আমি যে সব জিনিষপত্র পাঠিয়েচি তার মধ্যে থেকে বেছে সমরকে একটা কিছু দিয়ে দিয়ো।

বিচিত্রার কাজ বন্ধ হয়ে গেছে শুনে দুঃখিত হলুম। এ সমস্ত কাজ ত কেবল সখের কাজ নয়; দেশের কাজ—সমস্ত প্রাণমন দিয়ে না করলে কোনোমতেই হবার নয়। এ সব দেশে এরকম ধরণের কত কাজই হচ্চে কিন্তু সে ত দিব্যি আরাম করে হচ্চে না। কত লোকের সত্যিকার শক্তি এবং প্রেম এদের দেশকে উপরে তুলে রেখেচে। আমাদের শক্তিহীন ভক্তিহীন দুর্ব্বল সৌখীনতার কথা স্মরণ করলে কোনো আশা থাকে না।

এণ্ড্রুজের কাছে খবর পেয়েচ ডিসেম্বর মাসে এখানকার একজন আর্টিষ্ট তোমাদের ওখানে যাবে—তাকে বিচিত্রার একটি ঘরে বেশ যত্ন করে রেখো। তার কাছ থেকে তোমরা অনেক শিখ্‌তে পারবে। আমার সব চেয়ে ইচ্ছা করে এখান থেকে তোমাদের জন্যে একজন দাসী পাঠাই—কি সুন্দর করে এরা কাজ করতে জানে! তোমরা সকলে আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদ জেনো। ইতি ১৭ ভাদ্র ১৩২৩

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১৩)　　　　　ওঁ

কল্যাণীয়াসু

মা, ঈশ্বর তোমার শোককে সফল করুন—মৃত্যুর বাণী তোমার জীবনের মধ্যে সুগভীর শান্তি ও কল্যাণ বহন করে আনুক এই আমি অন্তরের সহিত কামনা করি। ইতি ৫ বৈশাখ ১৩২৫

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১৪)　　　　　ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমার চিঠিতে লিখেছিলে তোমরা কলকাতায় আসচ কিন্তু পশু পর্য্যন্ত খবর পেয়েচি তোমাদের কলকাতায় ফেরবার কোনো সংবাদ নেই।

আমি বহুকাল পরে শান্তিনিকেতনে ফিরে এখানকার নির্ম্মল শরতের আলোকে যেন স্নান করে বেঁচেচি। আমার পক্ষে শেষ পর্য্যন্ত এইই ভাল এখানকার খোলা মাঠ এবং গভীর শান্তি। কাজ কর্ম্ম করবার দিন আমার ফুরিয়েচে। ভিড়ের মধ্যে আমার আর চল্‌বে না। এখানকার সংসারটাও চিরদিনের নয়—এবার তার ধূলোমাটি ধুয়ে ফেলে বড় জীবনের জন্যে প্রস্তুত হওয়া চাই।

রথীর শরীর কেমন আছে আমাকে লিখো। উপ্‌রি-উপরি যখন জ্বর এল তখন সম্ভবত ম্যালেরিয়া। ওটাকে সম্পূর্ণ না ঝেড়ে ফেললে বারবার কষ্ট দেবে। ওখান থেকে ফিরে এসে বরঞ্চ কোথাও সমুদ্রের ধারে

গেলে ভাল হয়। বেলার শরীরও, বোধ হয় কয়দিনের বাদলায়, খারাপ হয়ে উঠেছিল। তার জন্যে মন উদ্বিগ্ন আছে।

কলকাতার ঠিকানাতেই চিঠি লিখে দিলুম—না থাকে শিলাইদহে পাঠিয়ে দেবে। ইতি ১৮ কার্ত্তিক ১৩২৪

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বৌমা

তোমার মায়ের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে মনে আঘাত পেয়েচি। সেদিন তোমার মা যখন শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন তখন তাঁর মধ্যে এমন একটি গভীরতা দেখেছিলুম, সাধনার এমন একটি সহজ সুন্দর রূপ তাঁর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছিল যে আমি আশ্চর্য্য হয়েছিলুম। মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁর এই যে ভাবটি দেখতে পেয়েছিলুম এই কথাটি মনে করে আমার ভারি ভাল লাগ্‌চে। এইবার এই দিক থেকে বিনয়িনী আমার হৃদয়ের খুব কাছে এসেছিলেন। এক একদিন আমার কাছে এসে তিনি যখন তাঁর প্রাণের গভীর কথাগুলি বল্‌তেন আমার ভারি তৃপ্তি হত। অন্তরে তিনি এমন একটি মুক্তি পেয়েছিলেন যে, মৃত্যু তাঁর কাছে কিছুই নয়। ভিতরে ভিতরে তিনি সংসার পার হয়ে গিয়েছিলেন। একদিন তিনি বলছিলেন, এবার শান্তিনিকেতনে আসবার সময় রেল-গাড়িতে ভেদিয়ার কাছে যখন মাঠের উপর অপরাহ্ণের

সূর্য্যালোক দেখ্‌লেন তখন তিনি এক মুহূর্ত্তে তাঁর ঠাকুরকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করতে পেলেন। বল্লেন, এর আগে একদিনের জন্যেও পূজানুষ্ঠানে ব্যাঘাত হলে তিনি দুঃখ পেতেন, কিন্তু এবার শান্তিনিকেতনে এসে তাঁর কাছে বাহ্য অনুষ্ঠান সব মিথ্যে হয়ে গেছে—আর দরকার নেই। তিনি যে একান্ত উপলব্ধির মধ্যে নিয়ত নিমগ্ন হয়ে ছিলেন তাই দেখে আমার নিজের মনের মধ্যে ভারি শান্তি বোধ হত। আমার কেমন মনে হয় যে, জীবন বন্ধনের শেষ সূত্রগুলি ছিন্ন করবার জন্যেই এবার তিনি শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন—সংসারের দায়িত্ব থেকে নিজেকে কিছুকালের জন্যেও বিচ্ছিন্ন করে যেন তিনি শেষ বিচ্ছেদের ভূমিকা রচনা করেছিলেন। অন্তরের মধ্যে গভীর শান্তি লাভ করে তবে তিনি যে সুখ দুঃখের পারে চলে গেলেন এ কম সৌভাগ্যের কথা নয়।

পূপের কথা লিখে আমাকে লোভ দেখাও কেন বৌমা? তুমি মনে মনে জান ঐ কন্যাটি আমাকে মোহপাশে বেঁধেচে। ঐ মায়াবিনী মরীচিকার মত আমাকে ভোলায় কিন্তু আমাকে ধরা দেয় না। এম্‌নি করে' ফাঁকি দিয়ে ও আমার কাছ থেকে কেবল গান

আদায় করে। এত অল্প বয়সে ওর এমন সর্ব্বনেশে বুদ্ধি হ'ল কি করে'? ও কেমন করে জান্‌লে কবির কাছ থেকে গান আদায় করবার এই একমাত্র উপায়—দুঃখ না দিলে ফাঁকি না দিলে বাঁশি ডাক দিতে চায় না। তুমি লিখেচ, দাদার গান ছাড়া আর কারো গান ওর পছন্দ হয় না, ও আমি কিচ্ছু বিশ্বাস করিনে। ও যদি স্বয়ম্বরা হয়, ওর দাদার গলায় মালা দেবে না সে আমি নিশ্চয় জানি। তা হোক্ না, মনে কোরো না তাই নিয়ে আমি হৃদয় বিদীর্ণ করব। আমার জন্যে মালা গাঁথাকে ভাগ্য মনে করে দেশে বিদেশে এমন সুন্দরী ঢের আছে।

আজ রাত্রে পিকিন ছেড়ে আর এক জায়গায় যাচ্চি। ৩১শে মে তারিখে সাঙহাই থেকে জাপানে যাত্রা করব। সেখানে ৪ঠা তারিখে পৌঁছব। জাপানে খুব আগ্রহ করে আমাকে ডাক্‌চে। হয় ত জুনের শেষের দিকে সেখান থেকে ছুটি পাব। তার পরে ঘুরতে ঘুরতে একদিন সেই শান্তিনিকেতনের মাঠের ধারে গিয়ে সেই বারান্দায় আরাম কেদারায় গিয়ে বসব। কিন্তু আমার বাসাটি তৈরি শেষ হয়েচে ত? এবার গিয়ে যেন আমার ঘরের মধ্যে গুছিয়ে বসতে পারি। আর বোলো ছাদে ওঠবার একটা সিঁড়ি যেন তৈরি হয়। আর উত্তর দিকে

জিনিষপত্র রাখবার যে ঘরটা তৈরি হয়েচে সেটাতে এমন করে জানলা দরজা বসাতে বোলো যাতে আমার চীন দেশী চাকর সে ঘরে বাস করতে গিয়ে হাঁপিয়ে মারা না যায়। ইতি ২০ মে ১৯২৪

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১৬)　　　　　ওঁ

বৌমা,

তোমরা ত আমাকে আটলান্টিকে ভাসিয়ে দিয়ে লণ্ডনে চলে গেলে। আমি এবার খুব ভুগেচি। সমুদ্র আশ্চর্য্য শান্ত ছিল। কিন্তু এখানে পৌঁছবার দিন সাতেক আগে বোধ হয় আমাকে ইনফ্লুয়েঞ্জায় ধরেছিল। বুকে এমন ব্যথা আর দুর্ব্বলতায় চেপে ধরেছিল যে, প্রায় মনে হত যে, এ যাত্রায় আর দেশে ফিরে যেতে পারব না। এখানে পৌঁছলে পর এরা আমাকে খুব যত্ন করেচে। এখানকার খুব নামজাদা ডাক্তার আমার চিকিৎসা করেচেন। বুকের দুর্ব্বলতার জন্যে আমাকে ডিজিটালিন্ খেতে হয়েছিল। পেরু যাওয়া ত বন্ধ হবার জো হয়েছিল। কিন্তু পেরুর লোকেরা ছাড়তে চাচ্চে না, তাই রেলপথ বাদ দিয়ে সমুদ্রপথে যাওয়া ঠিক করেচি। এখানকার একজন মহিলা আমাকে ঘরের লোকের মত যত্ন করচেন—তিনি আমার সঙ্গে যেতে রাজি হয়েচেন। তিনি তাঁর একটা বাগানবাড়ি' আমাদের ছেড়ে

দিয়েচেন। তিনি এখানকার খুব একজন বিখ্যাত লেখিকা—অনেকদিন থেকে আমার লেখা পড়ে আমাকে বিশেষ ভক্তি করেন। মোটের উপর এখানকার সবাই আমার ভক্ত। এরা যে আমাকে কতখানি জানে আর কত চায় তা আগে কল্পনা করতেও পারতুম না। আমাদের সেই নাটকের দল এখানে আন্‌লে খুবই আদর পেত। তাদের আনবার প্রস্তাব যখন তুলেছিলুম এরা লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত দিতে রাজি হয়েছিল। ছবির এক্জিবিশনের জন্যে এরা খুবই উৎসুক। বেশ দেখতে পাচ্চি দক্ষিণ আমেরিকায় আমাদের মস্ত একটা জায়গা আছে। যাতায়াতের পথ যদি দূর না হত তাহলে ভারি সুবিধা হত। তুমি ওখানে Pottery শিখচ শুনে খুব খুসি হলুম। রোটেন্‌স্টাইনের ইস্কুলে Wood Engraving শিখ্‌তে পার। কিন্তু পুপেকে নাচ শেখাবার বন্দোবস্ত কোরো। ওকে ভুলে যাবার জন্যে খুবই চেষ্টা করচি—আশা করি আরো মাস দুয়েক যদি উঠে পড়ে লাগি তাহলে কিছু পরিমাণে কৃতকার্য্য হতে পারব। ওর মায়াজাল ছিন্ন করতে সাধনার জোর চাই, আর সময়ও লাগ্‌বে। ভয় হয় যখন দেখা হবে আবার পাছে মোহপাশে পড়ি—আমার মন যে বড় দুর্ব্বল।

নীতুকে আনিয়ে নিয়ে দেখ্‌তে ভুলো না—যদি নিতান্ত সে ছুটি না পায়, তোমরা গিয়ে দেখে এসো, আর ওকে যা হয় কিছু দিয়ো।··· ডিসেম্বর ২৯শে তারিখে পেরুতে রওনা হব। পেরু রিপাব্লিকের প্রেসিডেন্টের কেয়ারে আমাকে চিঠি দিয়ো।

১৯১৪]

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১৭)

৩ ইউনিয়ন ষ্ট্রীট
পেনাং

বৌমা,

ভেসে ভেসে চলেচি। জলে ঢেউ নেই, জাহাজে যাত্রী কম, গরম যথেষ্ট আছে। আজ পেনাঙে পৌঁচেছি। একজন মাদ্রাজীর বাড়িতে আতিথ্য নিয়েচি। আমার দলের লোকেরা সবাই সহর দেখতে গেছে—আমি একলা, শরীর ক্লান্ত, আর তন্দ্রার আবেশে ভারাক্রান্ত। এক জানলা থেকে সমুদ্র দেখা যাচ্চে—আর এক জানলা দিয়ে আম নারকেল তেঁতুল বটের সবুজ সঙ্ঘ দেখ্‌তে পাচ্চি। অনেকদিন শুধু কেবল জলের নীল আর আকাশের নীলের মাঝখান দিয়ে আমার সময়স্রোত ভেসে গেচে। আজ এখানে পৃথিবীর নানা রঙের মেলার মধ্যে এসে আরাম পাচ্চি। কিন্তু ডাঙার এক মহা বিপদ অভ্যর্থনা। সে যে কি ব্যাপার না দেখ্‌লে বুঝতে পারবে না। আমার আবার এত বেশি অভ্যর্থনা সহ্য হয় না। ভেবেছিলুম পিনাঙ ছোট সহর, এখানে বেশি কিছু হাঙ্গাম হবে না—ঘাটে নেবেই ত চক্ষুস্থির। সমস্ত

সহরের লোক বোধ হয় ভেঙে পড়েছিল—বাজনদারের দল ঢাক ঢোল সানাইয়ের ধূম লাগিয়ে দিল—মালার স্তূপ আমার গলা ছাড়িয়ে মুখের অর্দ্ধেক ঢেকে দিলে; কোনো মতে নাকটা জেগে ছিল,—চষমাটা সম্পূর্ণ চাপা পড়ে গেল। যা হোক, এ সমস্ত ইতিবৃত্তান্ত বোধ করি, কালিদাসের চিঠি থেকে অনেকটা জানতে পারবে। চিঠি লিখতে আমার কুঁড়েমি ধরে। তাই বলে মনে কোরো না, আমি পেট ভরে কুঁড়েমি করতে পাই। চীনের জন্যে ছটা লেকচার লিখতে হবে—তার মধ্যে দুটো লিখে ফেলেচি। জাহাজের ক্যাবিনের কোণে বিছানার উপর বসে লেখা কি কম কথা! বিশেষত অপরাহ্নের রৌদ্রে যখন ক্যাবিনের কাঠের দেয়াল তেতে উঠে দেহটাকে পাউরুটি সেঁকা করে তুলতে চায়। যাই হোক চীনে যাবার পূর্ব্বে আশা করি লেকচারগুলো চুকিয়ে দিতে পারব। না যদি পারি ত মুখে বলে কোনো-মতে গোঁজা মিলন দিয়ে কাজ সারতে পারব। বড্ড ঘুম পাচ্চে। গরমে দুরাত্রি ভাল ঘুমতে পারি নি। আজ সকালে জাহাজ এসেচে, আজ সন্ধ্যা আটটার সময় ছাড়ব। আবার পর্শুদিন আর একটা বন্দরে থামবে, তারপর সিঙ্গাপুরে।—পুপের কথা মাঝে মাঝে ভাবি।

কিন্তু সে যে আমার বিরহে নিতান্ত কাতর হয়ে পড়েচে এমন মনে হয় না। তাকে 'মানে না মানা' গান শোনাবার অনেক লোক জুটবে।

১৯২৪] শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বৌমা,

পুপের চিঠি পেলুম। ভাগ্যি তোমরা ব্যাখ্যা করে দিয়েচ তাই ভাবার্থটা বোঝা গেল। কিন্তু ভাবার্থটা ওর আসল অর্থই নয়, ওটা বাজে কথা। ওর নাচ যেমন নিরর্থক, ওর লেখাও তেমনি, হিজিবিজির নৃত্য। এই হিজিবিজি বিদ্যায় আমারও সখ আছে, তোমরা জান। এই জন্যে ওর চিঠির ঠিকমত উত্তর আজ সকালে বসে বসে লিখেছি। আমরা যাঁর অতিথি তিনি আমার টেবিলে হঠাৎ এটা দেখে অবাক্। পাছে ভাঁজ করতে গিয়ে এটা নষ্ট হয়ে যায় সেইজন্যে তিনি এর জন্যে একটা বড় লেফাফা আনবার ব্যবস্থা করচেন। এলে পাঠিয়ে দেব। কিন্তু এর একটু ব্যাখ্যা করাও দরকার। গোড়ায় আমি কাগজটার উপর ওর যত আদরের নাম সব লিখলুম, পুপে, পুপু, পুপসি, মাডাম পাভ্লোভা দি সেকেণ্ড, রূপসী, উর্ব্বশী, রম্ভা, মেনকা, তিলোত্তমা ইত্যাদি ইত্যাদি, তার পরে যেমন

করে আমার লেখার ভুলগুলোকে চাপা দিই তেমনি করে নানা আঁকা জোকা দিয়ে ওগুলো সম্পূর্ণ চাপা দিয়েচি। এর মর্ম্ম হচ্চে এই, ঐ আদরের নামগুলো সমস্তই ভুল, আমার মন থেকে এর সমস্তই আমি সরিয়ে ফেলবার চেষ্টায় আছি। ওর সম্বন্ধে আরো একটু আমি আলোচনা করেচি, সেটা কবিতায়— সেটাও তোমাদের কপি করে পাঠাব।

দ্বিতীয় বার পেরু যাবার আয়োজন যখন পাকা করেচি এমন সময় কাল ডাক্তার এসে আবার আমাকে পরীক্ষা করে বললেন, আমার কিছুতেই যাওয়া চলবে না, না সমুদ্রপথে, না শৈল পথে। তাতে হঠাৎ বিপদ ঘট্‌তে পারে—আমার যথাসম্ভব সম্পূর্ণ বিশ্রাম দরকার। তাই এখানকার আশা ছেড়ে দিয়ে য়ুরোপে পাড়ি দেবার ব্যবস্থা করা গেল। জানুয়ারির ৩রা তারিখে। ইটালিয়ান জাহাজ, নাম Giulio Cesare। জেনোয়া বন্দরে পৌঁছব, জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে।

ডাক্তার বল্‌চে আমার দেহযন্ত্র কোনোটা বিকল হয় নি, কিন্তু ফতুর হয়ে গেছে। আর বেশি খরচ সইবে না। চুপচাপ করে থাক্‌লে, পুঁজি যা আছে তা নিয়ে আরো কিছুকাল চলে যাবে। ডাক্তার বলে, আমার

মুস্কিল এই যে বাইরে থেকে আমাকে দেখলে বোঝা যায় না, আমার এমন দেউলে অবস্থা। আমি নিজে অনেকদিন থেকে এটা বুঝতে পারছিলুম কিন্তু বোঝাতে পারছিলুম না। যাহোক এবার দেশে ফিরে গিয়ে অকাজের সাধনায় উঠে পড়ে লাগতে হবে। সে সব কথা মোকাবিলায় আলোচনা করা যাবে।

এতদিন পরে ডিসেম্বরের পয়লা থেকে এখানে গরম পড়েচে। আজ মেঘ করে ঝোড়ো হাওয়া দিচ্চে—আবার হয় ত কিছুদিন ঠাণ্ডা পাওয়া যাবে। আমার বিশ্বাস তোমাদের ওখানে ঠাণ্ডার অভাব কিছুই নেই। লণ্ডনের নবেম্বর যে কি পদার্থ তা আমি খুব জানি। ডিসেম্বরে ক্রিস্টমাসের কাছাকাছি বরফ পড়া সুরু হবে।

[বুয়েনোস এয়ারিস, ১৯২৪] শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১৯)

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, প্রাগে এসে বক্তৃতাগুলো চুকিয়ে দিয়েছি। আজ চেক্‌দের থিয়েটারে পোষ্ট অফিস অভিনয় হবে, সেখানে গোটাকয়েক বাঙলা কবিতা আবৃত্তি করতে অনুরোধ করেছে। বুধবারে জর্ম্মান থিয়েটারে ঐ নাটকটাই অভিনয় করবে, সেখানে চুপ করে বসে শোনা ছাড়া আমার আর কোনো কর্ত্তব্য নেই। এখানে তেমন শীত পড়েনি; বেশ রোদ্দুরও ছিল, আজ সকাল থেকে মেঘ মেদ্দ করচে। কবে কোথায় যাব আমি তার কোনো খবর রাখিনে। যেদিন যেখানে যেতে বলে ভালোমানুষের মত সেইখানেই চলে যাই। ব্যাপারটা এতই জটিল যে ভেবে উঠতে পারিনে—হঠাৎ উত্তর থেকে একেবারে দক্ষিণ তারপরে আবার ফিরে এসে পূর্ব থেকে পশ্চিম লম্বা পাড়ি—কখনো রাত্তিরে কখনো দিনে, কখনো ভোর বেলায়, কখনো ভর্ সন্ধ্যায়। অবশেষে পঞ্চম অঙ্কের শেষ অংশে অপেক্ষা করে আছে আমার

সেই লীলমণি আর সেই লম্বা কেদারা। এখানে কার্ল্‌স্‌বাডের সহরবাসীরা আমাকে নেমন্তন্ন করেছে—তিন চারদিন সেখানে বিশ্রাম করবার জন্যে অনুরোধ। সেই অনুরোধ রক্ষা করতে গেলে হয় ত বুডাপেস্ট বাদ দেওয়া দরকার হবে—যদি তা সম্ভবপর না হয় তাহলে রেলপথে বিষম ঘোরাঘুরি করতে হবে, বিশ্রামের মজুরী পোষাবে কি না সন্দেহ। তোমরা সেই কাইজারহোফে বেশ জমিয়ে বসে আছ, নড়বার সময় মনে কষ্ট পাবে। আমি নড়া দাঁতের মত দিনরাতই নড় নড় করচি সুতরাং সম্পূর্ণ উৎপাটিত হতে পারলেই তবে নিষ্কৃতি। ইতি ১২ অক্টোবর।

[১৯২৬]

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, এখানকার পালা শেষ হল। আজ যাব ভিয়েনায় কাল হবে বক্তৃতা—তার পরে যাব বুডাপেস্টে, সেখানে হবে বক্তৃতা। তার পরে যাব এখানকার প্রেসিডেন্ট ম্যাসেরিকের বাড়িতে—না গেলে সবাই দুঃখিত হবে। আমার দুঃখ কেউ বোঝে না। পোলাণ্ডের বোঝা খসে গেছে— রাশিয়াটা গেলে বাঁচা যায়। একটুও ভাল লাগচে না—কোনো একটা সময় যখন কিছুই করতে হবে না মনে করলে শরীর মন পুলকিত হয়ে ওঠে। রথীর শরীরের উপর দিয়ে যে রকম আঘাত গেল তাতে আমার মনে হচ্চে রাশিয়ার মত জায়গায় লম্বা লম্বা পাল্লায় ঘোরাঘুরি করা তার পক্ষে কোনোমতেই সঙ্গত হবে না। তোমরা যদি না যেতে পার তাহলে রাশিয়ায় যেতে আমার একটুও ইচ্ছে নেই। এর চেয়ে তোমাদের নিয়ে সুইজারল্যাণ্ডে কিম্বা দক্ষিণ

ফ্রান্সে কিছুদিন বিশ্রাম করে দেশে পালানোই আমার পক্ষে শ্রেয় হবে—সেটা রথীর পক্ষেও ভালো হতে পারবে। ইতি ১৫ অক্টোবর

[প্রাগ, ১৯২৬] শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(২১)   ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, যথেষ্ট ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলুম কিন্তু কর্ম্মবন্ধন থেকে কিছুতেই ভদ্রভাবে নিষ্কৃতি পাবার উপায় দেখছিলুম না। এমন সময় ভাগ্যের দয়ায় অল্প একটু জ্বর এল, শয্যা আশ্রয় করতে হল, ডাক্তার বল্‌লে, আর না, বাস্—তবে থাম্‌তে পারলুম। এখন যাক্ পোলাণ্ড, যাক্ রাশিয়া, যাক্ বক্তৃতা। ডাক্তার বল্‌চেন, ভারতবর্ষে যাত্রার আগে অন্তত তিন সপ্তাহ দক্ষিণ সুইজারলাণ্ড বা ফ্রান্সে খুব পেট ভরে বিশ্রাম করে নিতে। শুনে কান জুড়ালো। ভাবছি প্রথমে Villeneuveএ গিয়ে দুচার দিন থেকে অন্য কোনো সূর্য্যালোকের দেশে গিয়ে আড্ডা করব। কিন্তু রথী কি আসবে না? তার পক্ষেও ত এই রকম জায়গায় চুপচাপ থাকা ত ভালো। বর্লিনের মত জায়গায় এখন ত আবহাওয়া ভালো হবার কথা নয়। কানকে একটা চিঠি লিখে জিজ্ঞাসা করলে হয় না যে

তার Mentone-এর বাড়ি পাওয়া যাবে কি না। তাহলে সেখানে সকলে মিলে কিছুদিন বিশ্রাম ভোগ করে নেওয়া যায়। তোমরা কি মনে কর শীঘ্র লিখো। ডাক্তার এ সপ্তাহ এখানে আমাকে তাঁর চিকিৎসাধীন রাখবেন। হয় ত আসচে হপ্তায় ছুটি পাব।

Miss Pott এসেচে—তাকে তো ভালোই লাগ্‌চে। শুনে হয় তো ঈষৎ হাস্য করতেও পারো—কিন্তু আমার চেয়েও মানবচরিত্র সম্বন্ধে যাঁরা বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ তাঁরাও বোধ হচ্চে যেন সন্তোষ অনুভব করচেন। কিন্তু যিনি বৈজ্ঞানিক তিনি হয় ত বল্‌বেন, এখনো বলা যায় না—আরো দীর্ঘকাল দেখলে তবে নির্ভরযোগ্য স্ট্যাটিস্টিক্স্ সংগ্রহ হতে পারে। কিন্তু আমি বৈজ্ঞানিক নই তাই মনে করচি ঠিক এমন মানুষ এত সহজে এত অল্পে পাওয়া যাবে না—অতএব আপাতত দুশ্চিন্তা ছেড়ে দিয়ে এ'কে কাজে লাগানো যাক্—তার পরে যখন পরিতাপের কারণ ও সময় উপস্থিত হবে তখন—তখন তোমরা যা বলবে তাই শুনব।

বাড়ির চিঠিপত্র কি কিছু আসেনি। মীরার জন্যে মনটা খারাপ আছে। যদি আগেই জাহাজ পাওয়া যায় তাহলে শীঘ্রই চলে যেতে ইচ্ছে করচে। এবারকার

মত য়ুরোপের পালা ,সাঙ্গ হল। ইতি ১৯ অক্টোবর ১৯২৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, গোলেমালে দিন কাট্‌চে—মনে হচ্চে যেন বছর পাঁচেক ধরে এই কাণ্ডটা চল্‌চে। এতদিন জয়রথ হাঁকিয়ে চলেছিলুম বক্তৃতার ঘোড়া ছুটিয়ে—সহর থেকে সহরে চলেছিল টপাটপ শব্দে, সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে উঠ্‌ছিল চটাপট হাততালি। সম্প্রতি রথের চাকাটা হঠাৎ একটু বেধে গিয়েচে,—আমার শনিগ্রহ জেগে উঠেচে। ভারতবর্ষের কাগজে চীনে ভারতীয় সৈন্য পাঠানো নিয়ে কড়া মন্তব্য লিখেছিলুম—সেই লেখাটা আমেরিকা ও চীন ঘুরে হঠাৎ এখানকার হাওয়ায় এসে পৌঁচেছে—একজন ফিরিঙ্গি এডিটর এই নিয়ে মাতামাতি বাধিয়ে দিয়েছে—আসর বেশ সরগরম—আমরাও কোমর বেঁধে লড়াইয়ে লেগে গেছি—মনে হচ্চে বেশি ক্ষতি হবে না!

আজ চলেচি ইপো বলে এক জায়গায়। তার পরে পিনাঙে গিয়ে এখানকার লীলা শেষ। এখানকার বর্ণনা

করে তোমাদের খুসি করব এমন কোনো আসবাব দেখিনে। এদেশে প্রাচীনকাল কোনো দিন আসে নি— তার ইতিহাসের ছেঁড়া ঝুলি ফেলে যায় নি। কলা লক্ষ্মীর নির্ম্মাল্য অনেক খুঁজেছি, পাওয়া যাচ্চে না। এখানে বর্ত্তমান শতাব্দী হঠাৎ উড়ে এসে জুড়ে বসে বন কেটে রবার গাছ পুঁৎতে লেগেছে। দেশটা ঘন সবুজ তাতে কোনো সন্দেহ নেই—সর্ব্বত্র ছায়ায় আলোয় যুগল মিলন— রাস্তা দিয়ে মোটর রথে যখন চলা যায় তখন দুই চোখের অঞ্জলি ভরে সবুজ অমৃত পান করা যায়। দেশটা নারকেল গাছের বাহু তুলে কবিকে অভ্যর্থনা করেছে—এখন যথেষ্ট পরিমাণে দক্ষিণা দিয়ে যদি বিদায় করে তাহলে আমিও ভরা হাত তুলে আশীর্ব্বাদ করব। যাই হোকু না, শূন্য হাতে ফিরব বলে বোধ হচ্চে না। ইতিমধ্যে আমার দলবলের বেশ পেট ভরে আহার চল্‌চে—এ সম্বন্ধে সুনীতি সর্ব্বোচ্চ উপাধি পাবার যোগ্য, সুরেন সর্ব্বাধম। সুবিখ্যাত ডুরিয়ান ফল খেয়েছি, খুব বেশি লোভনীয়ও নয় খুব হেয়ও যে তাও বলা যায় না। এখানকার পালা শেষ হবে পনেরই তারিখে, তারপরে জাভা— সেখানে আমার কোন্ গ্রহগুলি অপেক্ষা করচেন দেখা যাবে।

তোমাদের কারো কোনো খবর পাইনি, কেবল দুই শিশি ওষুধ পেয়েছি। এখানে চিঠি পাওয়া সম্বন্ধে সময়ের নিয়ম আমাদের দেশে বিয়ে বাড়িতে খাওয়ার নিয়মের মতো—মধ্যাহ্ন ভোজন বেলা একটাতেও হতে পারে, কিম্বা সন্ধ্যা পাঁচটায় কিম্বা রাত্তির দুপুরে। এই কারণে তোমাদের চিঠির আশা ত্যাগ করেই চিঠি লিখ্‌চি। ইতি ৬ অগস্ট ১৯২৭

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(২৩)　　　　　ওঁ

বৌমা

সেদিন বালিতে থাকতে থাকতে ভোর রাত্রে খুব স্পষ্ট একটা স্বপ্ন দেখ্‌লুম। যেন জোড়াসাঁকোর বারান্দায় রথী গম্ভীরমুখে আমাকে এক কোণে ডেকে নিয়ে বল্‌লেন, ভাবনার বিশেষ কোনো কারণ নেই কিন্তু ডাক্তারের মতে তোমার অসুখটা আসলে Chronic influenza, শিলাইদহে তোমাকে নিয়ে আমি যদি বোটে কাটিয়ে আস্‌তে পারি তাহলে তোমার উপকার হবে। আমি বল্‌লুম, নিশ্চয় নিয়ে যাব। বলে ডাক্তারের সঙ্গে কর্ত্তব্য আলোচনা করতে লাগ্‌লুম— ডাক্তারটি বাঙালী কিন্তু তাকে চিনিনে, জেগে উঠে মনটা বড়ো উদ্বিগ্ন হল। হিসাব করে দেখলুম, এটা ভাদ্র মাস, এই সময়েই তোমার হাঁপানি বাড়বার কথা। মনে হল তোমার হয় তো হাঁপানি এবার বেশি প্রবল হয়েচে তাই এই রকম স্বপ্ন দেখ্‌লুম। যাই হোক্ এখন তো কিছু করবার নেই। ভাবচি ফিরে

গিয়ে সত্যিই তোমাকে কিছুদিন পদ্মাচরের হাওয়া খাইয়ে নিয়ে আসব— আমার বিশ্বাস তোমার তাতে উপকার হবে। এই সব নানা চিন্তায় মনটা দেশে ফিরতে চাচ্চে। ১ অক্টোবরে এখান থেকে জাহাজ ছাড়বে তার পরে শ্যাম বর্ম্মা হয়ে ফিরতে হয় ত অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তাহ হবে— অর্থাৎ এখনো এক মাসের উপর। ইতি ১১ সেপ্টেম্বর ১৯২৭

বাবামশায়

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, ধীরেন এখান থেকে দেশে ফিরচে। এই সঙ্গে আমাদেরও ফেরবার কথা ছিল কিন্তু কপাল খারাপ। একেবারে ঘাটে এসে আবার চললুম অন্য মুখে। ভ্রমণের শেষ দিকটার ভার বড়ো বেশি, সেইজন্যেই দুঃখ বোধ হচ্চে।

কাল সকালে পিনাঙ থেকে রেলপথে রওনা হব। সেদিন সমস্ত দিন, সমস্ত রাত, তার পর দিন সন্ধ্যার সময় ব্যাঙ্ককে পৌঁছব। সেখানে আবার নতুন পর্ব্ব। অভ্যর্থনা, মাল্যগ্রহণ, স্তব শোনা, তার জবাব দেওয়া, বক্তৃতা করা, নিমন্ত্রণ খাওয়া, রাজদর্শন, স্কুল পরিদর্শন, ছাত্রদের হিতোপদেশ দেওয়া, ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি। সেখানকার পালা শেষ হলে আবার এই সুদীর্ঘ রেলপথ অতিক্রম করে এই পিনাঙ ঘাটে এসে এখান থেকে পাড়ি দেবার বন্দোবস্ত করতে হবে। কিন্তু তখনো নিষ্কৃতি নেই। পথে আছে রেঙ্গুন, সেখানে সকলে

মালা গাঁথচে, সভা সাজাচ্চে, ডিনার চা প্রভৃতির জন্যে হাট করতে বেরিয়েচে। অন্তত তিন দিন চলবে আমাকে দলন মলন। তার পরে আমার যেটুকু অবশিষ্ট থাকবে সেইটুকু একদা এসে উত্তীর্ণ হবে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। মনে হচ্চে এক যুগ এখনো বাকি—যদি বলি তিন হপ্তা, তাহলে যেন কম করে বলা হয়, বলতে ইচ্ছে করে প্রায় বিশ লক্ষ সেকেণ্ড। এখান থেকে কোন্ জাহাজে ফেরা সম্ভবপর হবে সেই নিয়ে চিঠিপত্র লেখালেখি চল্‌চে। যদি জাপানী জাহাজ পাওয়া যায় তাহলে আরাম পাওয়া যাবে। ব্রিটিশ জাহাজে আমার মতো ব্রিটিশ সাব্‌জেক্টের কোনো সুবিধা হবে না। একটা কথা বলে রাখি, ধীরেনের মুখে সব গল্প শুনে পুরোনো করে ফেলো না। দেশে ফেরবার কল্পনার সঙ্গে গল্প করবার কল্পনা একান্ত জড়িত সে কথা মনে রেখো। ইতি ৬ অক্টোবর ১৯২৭

বাবামশায়

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, এখনো তোমরা মধ্যধরণী সাগরের নীল জলে ভাসচ। আর হপ্তাখানেকের মধ্যে ডাঙায় নামবে। কথা ছিল ১৭ই তারিখে অর্থাৎ আগামী কাল আমিও জাপানী জাহাজে চড়ে কলম্বো থেকে ভেসে পড়ব। বাধা ঘটল। কলকাতা থেকে যে জাহাজে কলম্বোয় যাবার কথা তার ব্যবস্থা দেখে সেটাতে চড়তে সাহস হোলো না। এণ্ড্রুজ সেই জাহাজে উঠেছিল— আধমরা হয়ে মাদ্রাজেই তাকে নেবে পড়তে হল। ওর শরীর বেশ একটু খারাপ। রেলে করে মাদ্রাজ পর্য্যন্ত আমার ক্লান্ত দেহটাকে টেনে এনে আপাতত আডিয়ারে আশ্রয় নিয়েছি। এখান থেকে কলম্বো পর্য্যন্ত যে গাড়ি যায় সেটাতে চড়তে বন্ধুরা পরামর্শ দিচ্চে না। বিশেষত এই সময়টা অসহ্য গরম। জুনের শেষ সপ্তাহের পূর্ব্বে কোনো জাহাজেই স্থান পাবার কোনো সম্ভাবনা নেই। ইতিমধ্যে নীলগিরিতে পীঠাপুরমের রাজার আতিথ্যে

কুন্নুর নামক পাহাড়ে কাটাবার কথা আছে। রাজার কাছ থেকে নিমন্ত্রণ পাওয়া গেছে। প্রশান্ত রাণী আমাকে সঙ্গে করে এনেছে—কুন্নুর পাহাড়েও তাদের যাবার ইচ্ছে আছে। কোডিতে যেতে পারতুম কিন্তু তার চেয়ে কুন্নুর হয়তো ভালো লাগ্‌বে। এর পরে বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ হলে কলম্বো যাবার রাস্তাটা অসহ্য হবে না।

জন্মদিন খুব ঘটা করেই হয়েছিল— বিশ্বভারতী সম্মিলনী ছিল নিমন্ত্রণ কর্ত্তা। ভিড় হয়েছিল কম নয়। দিনুরা আছে কালিম্‌পং। শুনচি সঙ্গী অভাবে তারা উভয়েই পীড়িত। মীরাকে বলেছিলুম কলম্বো পর্য্যন্ত আস্‌তে কিন্তু সে তার গাছপালা ছেড়ে আসতে রাজি হোলো না— সে আছে শান্তিনিকেতনে।

য়ুরোপে তোমরা কোথায় গিয়ে আশ্রয় নেবে জানিনে। আমারই বা গতি কোথায় হবে ঠিক ভেবে পাচ্চিনে। সুইজারল্যাণ্ডে এক কোণে লুকিয়ে লিখতে বসাই ভালো হবে। এণ্ড্রুজ আরিয়াম দুজনেই আমার সঙ্গে যাবে। য়ুরোপে গিয়ে পৌঁছবার আগে তোমাদের ঠিক খবর পাওয়া যাবে না। সেখানে কোথাও গিয়ে তোমরা ভালো আছ খবর পেলে আমি নিশ্চিন্ত হব। কি রকম আমরা অনিশ্চিত ভাবে দূরে দূরে ছড়িয়ে আছি

ভালো লাগ্‌চে না। কবে যে আবার সমস্ত বেশ গুছিয়ে উঠ্‌বে তাই ভাবি। পুপু নিশ্চয় ভালোই আছে— এবার হয় তো তার শরীর মন দুইই দ্রুত বেড়ে উঠ্‌বে।

তোমরা সকলে আমার আশীর্ব্বাদ জেনো। ইতি
১৬ মে ১৯২৮

বাবামশায়

বৌমা, এবার য়ুরোপ যাওয়া মঞ্জুর হোলো না বলেই বোধ হচ্চে। ঠিক করেছি এখন থেকে দীর্ঘকাল সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্ন থাক্‌ব। কারো সঙ্গে কোনো কারণেই দেখা করব না, কেবল বুধবার দিনে নিজেকে প্রকাশ করা যাবে। আত্মীয়দের চিঠি ছাড়া চিঠি পড়ব না। গভীরভাবে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে নিয়ে থাকব। যদি লেখা জমে আসে তো লিখ্‌ব— যদি য়ুরোপকে কিছু বলবার থাকে তো যথা সময়ে বলব— তাড়াহুড়ো করে যা তা লিখে আপনাকে ও অন্যকে ঠকাব্‌ না।

তোমাদের জন্যে মনটা উদ্বিগ্ন থাকে। কিন্তু তোমরা দুজনেই এবার ভালো রকম চিকিৎসা না করে যেন ফিরে এসো না।

পণ্ডিচেরিতে অরবিন্দের সঙ্গে দেখা করে আমার মনে এল আমারো কিছুদিন এই রকম তপস্যার খুবই দরকার। নইলে ভিতরকার আলো ক্রমে ক্রমে কমে আস্‌বে। প্রতিদিন যা তা কাজ করে যা তা কথা বলে

মনটা বাজে আবর্জ্জনায় চাপা পড়ে যায় নিজেকে যেন দেখতেই পাইনে। কিছুকাল থেকে প্রতি রাত্রে একবার করে মনটা ভারি ছট্‌ফটিয়ে ওঠে— কে যেন কষে ঠেলা মারতে থাকে নিজের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসো। তার থেকেই ভাবছিলুম হয় তো তার মানে য়ুরোপে পালানো। এখন বুঝতে পারচি হাজার লক্ষ তুচ্ছতার থেকে নিজেকে উদ্ধার করা।

পুপুমণি নিশ্চয় ভালই আছে। তোমরা ভালো আছ শুনলে নিশ্চিন্ত হব। ইতি ৩০মে ১৯২৮

বাবামশায়

(২৭) ওঁ শ্রাবস্তী

কলম্বো

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, এবারে আর যাওয়া ঘটে উঠ্‌ল না। আগেকার মতো নড়ে চড়ে বেড়ানোর সামর্থ্য নেই। ঠিক করেচি শান্তিনিকেতনে অরবিন্দর মতো একেবারে সম্পূর্ণ নির্জ্জনবাস গ্রহণ করব—কেবল বুধবারে দর্শন দেব—বাজে চিঠিপত্র লেখা এবং খবরের [কাগজ] পড়া একেবারে বন্ধ। একমাত্র যার মুখ দেখে দিন কাটবে সে হচ্চে বনমালী। সুধীকেও বাদ দেওয়া চল্‌বে না—কারণ বনমালী দর্শন দেয় সুধীই কাজ করে।

আজ পাঁচই, আগামী এগারই এক ফরাসী জাহাজ ছাড়বে মাদ্রাজ অভিমুখে। সেই জাহাজে মাদ্রাজে গিয়ে কলকাতায় রওনা হব—যদি দরকার বোধ করি পথের মধ্যে ওয়াল্‌টেয়রে দুচার দিন থেকে যাব।

তোমরা বৌমা, ভালো করে চিকিৎসা না করিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে এসো না যেন। বারে বারে তোমরা অসুস্থ হয়ে পড়ো, সে ভালো লাগে না। কোথায়

তোমরা আছো কেমন আছো সে সব বিস্তারিত খবর পেতে আরো আরো অনেকদিন লাগবে।

এখানে এসে পুপুমণির ফুল পেলুম— ভারি মিষ্টি লাগল। সে মিষ্টি ঐ ছোট্ট মেয়েটির হৃদয়ের মধ্যে নেই, সে মিষ্টি আমারি আপন মনে। তাকে বোলো দাদামশায় তার জন্যে পথ চেয়ে রইল। ফিরে এসে যেন বাংলা ভাষায় কথা কইতে না ভোলে। ইতি

৫ জুন ১৯২৮

বাবামশায়

(২৮)   ঔঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা এখানকার আর পাঁচ জনের কাছ থেকেই এখানকার খবর নিশ্চয়ই পাও তাই পুরোনো খবরগুলো দিতে ইচ্ছে করে না। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই এখানে ও শ্রীনিকেতনে যে দুটো উৎসব হয়ে গেছে তার সমস্ত বিবরণ তোমরা পেয়েচ। এখানে হোলো বৃক্ষরোপণ, শ্রীনিকেতনে হোলো হলচালন। বৃক্ষরোপণের ইতিহাসটা তোমাকে লিখতে সঙ্কোচ বোধ করি—কিন্তু আমার বিশ্বাস মীরা সব কথা ফাঁস করে দিয়েচে। মীরা কাজটাকে অন্যায় বলেই আমাকে ভর্ৎসনা করেচে কিন্তু আমি ঠিক তার উল্‌টোই মনে করি। তোমার টবের বকুল গাছটাকে নিয়ে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানটা হোলো। পৃথিবীতে কোনো গাছের এমন সৌভাগ্য কল্পনা করতে পারো না। সুন্দরী বালিকারা সুপরিচ্ছন্ন হয়ে শাঁখ বাজাতে বাজাতে গান গাইতে গাইতে গাছের সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞক্ষেত্রে এল— শাস্ত্রীমশায় সংস্কৃত শ্লোক আওড়ালেন—আমি একে

একে ছটা কবিতা পড়লুম—মালা দিয়ে চন্দন দিয়ে ধূপধুনো জ্বালিয়ে তার অভ্যর্থনা হোলো। এখন সে বেশ আছে, তোমার টব থেকে তাকে ধরায় অবতীর্ণ করানো হল বলে তার খেদের লক্ষণ দেখা যাচ্চে না। তার পরে বর্ষামঙ্গল গান হোলো—আমি এই উপলক্ষ্যে ছোট একটি গল্প লিখেছিলুম সেটা পড়লুম। আমার বেশভূষা দেখলে নিশ্চয় খুসি হতে। একটা কালো রেশমের ধূতি, গায়ে লাল আঙিয়া, মাথায় কালো টুপি, কাঁধে জরি দেওয়া কালো পাড়ের কোঁচানো লম্বা চাদর। শ্রীনিকেতনের অনুষ্ঠানটাও সকলের খুব ভালো লেগেচে।

হাঙ্গেরি থেকে তোমাদের তারের খবর পেয়ে বুঝলুম আনন্দে আছ। আমার কপালে ফস্‌কে গেল। আমিও নানা জায়গায় ঘুরে এসেচি, তার মধ্যে কুন্নুরটা লেগেছিল ভালো। ইতি ৯ শ্রাবণ ১৩৩৫

বাবামশায়

(২৯) ওঁ

কল্যাণীয়াসু

শান্তিনিকেতনে ছিলেম আনন্দে—কখনো বা ঘন ঘোর মেঘ আর বর্ষণ, কখনো বা বৃষ্টিধোওয়া আকাশে রোদ্দুর ঝলমল করে। উপরের ঘরে সার্সি নেই বলে আমি বসবার আর লেখবার ঘর করেছিলুম নীচে তোমাদের বড়ো ঘরে, আর শুতুম তোমাদের শোবার ঘরে। চমৎকার লাগত মেঘ বৃষ্টি রোদ্দুরের লীলা দেখতে। এবার একটা আস্ত গল্প লিখে ফেলেচি, সে কথা বোধ হয় আগের চিঠিতে লিখেচি। সবাই বলচে আমার সব গল্পের সেরা হয়েছে। সেইটেই মাজাঘষা করচি। কিন্তু ইতিমধ্যে ডাক্তারের উপদ্রবে আমাকে টেনে আনলে কলকাতায়—দু দিন অন্তর তার বাড়িতে গিয়ে Diathermic উত্তাপ লাগাচ্চি। বলচে দেড় মাস ধরে এই দুঃখ পেতে হবে। প্রথমে উঠেছিলেম আমার তেতালার ঘরে। কিন্তু সেবকদের সংসর্গ থেকে দূরে পড়াতে সামান্য প্রয়োজনের জন্যেও নীচে নাবতে

হোতো। সেইজন্যে বিচিত্রার ঘরে আশ্রয় নিয়েছি। তোমার boudoir এ আমার লেখবার ঘর। কল্পনা করে দেখ যেখানে বসে তুমি ছবি আঁকতে সেই ঘরে বসে আমি লিখচি। তোমার টুকিটাকি অসংখ্য জিনিষের মধ্যে একটা কিছু যদি হারায় আমাকে যেন দোষ দিয়ো না। আমি তাদের প্রতি দৃষ্টি দিইনে, নিজের কাজেই ব্যস্ত। মাঝে মাঝে অপূর্ব্ব আসে প্রশান্ত আসে, বকাবকি করে। রাণী ২১০ নম্বরেই পড়ে থাকে, তাকে আবার নিরেনব্বুইয়ে ধরেচে। নানাবিধ ইন্‌জেকশন ও চিকিৎসাপত্র চল্‌চে। এ রকম ক্ষুদে ব্যামো শিগ্‌গির সারতে চায় না।

কলকাতায় খুব বৃষ্টি চল্‌চে। কাল থেকে বৃষ্টি নেমে আমাদের গলিটা দ্বিতীয় ভেনিস্ হয়ে উঠেচে— ওদিকে গলির একটা কোণের বাড়ি বৃষ্টিতে পড়ে গেছে, তারি রাবিশে কিছুকাল এ গলি দুর্গম ছিল।

আর যাই বলো, তোমার ঘরে মশা আছে, এমন কি, দিনের বেলাতেও— তাই নিয়ে সর্ব্বদাই ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয়—এইমাত্র flytox ছিটিয়ে গেল—তাতে মশারা মিনিট দশেকের জন্যে কিছু দুঃখিত থাকে, তার পরে সামলিয়ে নেয়। খবরের কাগজে পড়েছি,

হাঙ্গেরিতে উত্তাপের মাত্রা কয়েকদিনের জন্যে ভারতবর্ষকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। ঠিক সেই সময়টাই তোমরা ওখানে ছিলে—ফলাফলটা কী হল পরে খবর পাওয়া যাবে।

পুপুমণিকে তার বিরহী দাদামশায়ের কথাটা একটু স্মরণ করিয়ে দিয়ো। ইতি ১ অগস্ট ১৯২৮

বাবামশায়

(৩০)　　　　　ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, এখনো তোমাদের চিঠিপত্র আসচে সেই সময়ের প্রতি লক্ষ্য করে যে সময়টা ছিল মুকুলের আমলের। তার আশ্রয়টা বেশ আরামের ছিল। চারদিকে বাগান, মস্ত একটা পুকুর, ঘরগুলো খুব উঁচু এবং তার জানলার সঙ্গে আকাশের কোন ব্যবধান ছিল না। কেবল একদিকে বারান্দা ছিল বলে অন্যদিকে আকাশের সঙ্গে পূরো মোকাবিলা চল্‌ত—আমার সেইটে খুব ভালো লাগে। বলা বাহুল্য এখন এসেছি শান্তিনিকেতনে— মোটের উপরে এখানে শরীরটা আগের চেয়ে ভালো আছে। তার কারণ, আবার আমি এখানকার বিদ্যালয় বিভাগের কাজটা নিজের হাতে নিয়েচি। তাতে করে মনটা থাকে ভালো। শরীর মন দুইয়ে মিলে যখন ক্লান্তির ডুয়েট চালাতে থাকে তখনি মুস্কিল।

প্রথমে খুব বৃষ্টি হয়ে এখানে বিস্তর ধান হয়েছিল। তারপরে কিছুদিন বন্ধ হয়ে ধানগুলো মারা যাবার জো হল, আবার হঠাৎ দিন দুই তিন বেশ বৃষ্টি হওয়াতে ফসলের আশা হচ্চে। মোটের উপরে বাংলা দেশে এবার ফসলের অবস্থা ভালোই।

ভেবেছিলুম ছুটির সময় বোটে বেড়াতে যাব—বোট মেরামতও হচ্চে। এমন সময় খবর পেলুম আমার সেই চাইনিজ বন্ধু স্যু—যার নামে চাচক্র খোলা হয়েচে—পাঁচই সেপ্টেম্বরে বোম্বাই আসবেন। তাহলে ঠিক ছুটির মুখেই তিনি এখানে উপস্থিত হবেন। তাহলে তাঁকে নিয়ে কিছুদিন শান্তিনিকেতনে কিছুদিন কলকাতায় কাটাতে হবে। স্যু আসচেন বলে আমি ভারি খুসি হয়েছি— তাঁকে আমি খুব ভালোবাসি। তোমরা থাকলে বেশ হোত—ভারি ভালো লোক।

১৬ ডিসেম্বর এখানে ভাইস্রয় আসবেন সঙ্গে তাঁর স্ত্রী ও বোন। এখানে ডিনার খাবেন। তার পূর্ব্বেই তোমরা আসচ বলে আমি নিশ্চিন্ত আছি। ওঁদের একটা কিছু অভিনয় দেখাতে হবে। মনে করচি 'বসন্ত'টা তৈরি করে তোলা যাবে। সঙ্গে একটু নাচ থাক্‌লে সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ হবে। পুপুমণিকে আমার ভালোবাসা

দিয়ো বোলো তার জন্যে আমি অনেক ছবি এঁকে রেখেচি। ইতি ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯২৮

বাবামশায়

আন্দ্রেকে আমার ভালোবাসা দিয়ো— বোলো তারা এলে ভারি খুসি হব।

ওঁ

বৌমা

এ কয় দিন অত্যন্ত গোলমালের মধ্যে ছিলুম। রাজা অভিনয়ের আয়োজন করতে কিছুদিন থেকে ভারি ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। তার পরে অভিনয় দেখবার জন্যে কলকাতা থেকে অনেক অতিথি এখানে এসেছিলেন—তাঁদের আতিথ্য নিয়েও আমার আর কিছুমাত্র অবকাশ ছিল না। মেয়ে আটজন ও পুরুষ নয় দশ জন এসেছিলেন। মেয়েরা হেমলতা বৌমার বাড়িতে ছিলেন, পুরুষেরা শান্তিনিকেতনের দোতলায়। উমাচরণ নেই—ঘুরনকে দিয়ে এ সব কাজ ভাল চলেনা। যা হোক্ একরকম করে হয়ে গেল। পর্শু অভিনয় হতে রাত দুপুর হয়েছিল—তার পরে কাল রাত্রে মেয়েরা অনেক রাত পর্য্যন্ত নানা ব্যাপার নিয়ে আমাদের জাগিয়ে রেখেছিল। আজ ভোর রাত্রে তাঁরা সব চলে গেলেন। আমাদের অভিনয়ে সুধীরঞ্জন সেজেছিল রাণী—বেশ ভাল করে তাকে সাজানো গিয়েছিল—অন্তত তার

চেহারাটা সকলের ভাল লেগেছিল— তার অভিনয়ও মন্দ হয় নি। মোটের উপর লোকদের ভালই লেগেছে। কিন্তু আরো ভাল হওয়া উচিত ছিল। তোমরা সব তোমাদের ঠাকুরঝি ঠাকুরজামাইদের নিয়ে বেশ আনন্দে আছ। আমি দেখ্‌ছি আমি চলে এসেছি তবু তোমার মামাশ্বশুরের নিষ্কৃতি নেই। ঐ বাঙালটিকে দেখ্‌লেই লোকের ঠাট্টা করবার ইচ্ছাটা প্রবল হয়ে ওঠে। বেয়ান যে রকম আবীরটা খেলেছেন, আমি থাক্‌লে বড় সহজে ছাড়া পেতুম না দেখচি— কালী মাখাবার লোক তাঁর আরো একটি বাড়ত।

এখানে জ্ঞান বেশ ভালই আছে। বোধ হচ্চে তার ভাল লেগে গেছে— সে এখন ছেলেদের মধ্যেই তার আড্ডা করে নিয়েছে।

তুমি Arabian Nights পড়চ— বেশ ভাল। ওটা পড়তে তোমার ভাল লাগ্‌বে— এই রকম পড়তে পড়তেই তোমার ইংরেজি শেখা হয়ে যাবে। মেমের জঞ্জাল ঘুচে গিয়ে বোধহয় আরাম পেয়েছ।

আমি সম্ভবত আস্‌চে রবি কিম্বা সোমবারে দু চার দিনের জন্যে কল্‌কাতায় যাব একটু কাজ আছে। তোমাদের আলু এবং টোমাটো আমাকে মিথ্যা পাঠিয়ে

দেবে— যখন ছুটির সময় তোমাদের কাছে যাব তখন খাওয়া যাবে।

শান্তির পড়াশুনা নিয়মমত চল্‌চে ত? তার শরীর ওখানে কেমন আছে? শান্তিকে বাড়িতে রেখে না পড়িয়ে এবার ছুটির পরে তাকে এখানেই পড়তে পাঠান উচিত হবে।

বেয়ানকে আমার সাদর নমস্কার জানিয়ো।

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৩২) P & O. S. N. Co.

S. S.

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, তোমার জন্যে জলপাত্রের নমুনা আঁকছিলুম। আগে যেটা এঁকেছিলুম সেটা পাঠাই। কিন্তু দেখলুম সেটা গড়িয়ে পড়বে। তাই এই কাগজে অন্য রকম করে আঁকলুম। কোনটা তোমার পছন্দ? যদি এই নমুনায় তৈরি করাতে হয় তাহলে রূপোর গায়ে কালো মিনের দাগ লাগানো দরকার হবে। আমাকে হংকঙের ভারতীয়েরা একটা রূপোর বাক্সে ৮০০ টাকা উপহার দিয়েছে, সেই বাক্সটা একদা তোমার ঘরেই পৌঁছবে। যদিও টাকাটা বিশ্বভারতীর। সেই বাক্স পান সুপারি প্রভৃতি দেবার পক্ষে বেশ।

আজ সাংহাই পৌঁছব। খুব শীত। ভেবে দেখ আজ ৩রা চৈত্র, তোমাদের ওখানে নিশ্চয় গরমে জগৎ হাঁপিয়ে উঠচে। পুপের ভালো লাগচে না। তাকে যদি নিয়ে আসতে তার গাল লাল হয়ে উঠত। সমুদ্রও বরাবর খুব শান্ত ছিল, তোমাদের কোনো কষ্ট হত না।

পাঁজিতে দেখলুম ১১ই চৈত্রে দোলপূর্ণিমা। আর তো দেরি নেই—এবারে তোমাদের উৎসব থেকে বঞ্চিত হলুম। তোমরা কি কিছু অভিনয়ের চেষ্টা করচ? নতুন মেয়েদের নিয়ে নটীর পূজা যদি করতে পার ত বেশ ভালো হয়। রাজা ও রাণী অভিনয় কি তোমরা দেখেচ? আমার আপশোষ হচ্চে ওটা আমরা করতে পারলুম না। সংশোধিত বই এক কপি যদি পাই তাহলে তর্জ্জমা করে দিই, নিশ্চয় কাজে লাগ্‌বে।

শান্তিনিকেতনের মেয়েদের দেখবার কর্ত্তৃত্ব তোমরা যদি নিতে পার তাহলে আমি নিশ্চিন্ত হই। খুবই দরকার আছে। ইতি ৩ চৈত্র ১৩৩৫

বাবামশায়

(৩৩)

P & O. S. N. Co.

S. S.

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, কাল রাত্তিরে জাহাজ কোবে বন্দরে এসে নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে ছিল আজ সকালে এইমাত্র ঘাটের অভিমুখে চলেচে। আর দেরি নেই, বিষম গোলমাল ভিড়ের মধ্যে পড়ব। অপূর্ব্ব ভার করেচে সে কোবেতেই আছে— ঘাটে এলেই জাহাজে আসবে। তারপরে— যাই তৈরি হয়ে নিইগে। শীত যথেষ্ট— এরা একে বলে বসন্তকাল— আমাদের পৌষ মাসকে হারিয়ে দেয়। পুনর্জ্জন্ম যদি হয় বাঙলা দেশই ভালো—যদিও— থাক্ সে সব কথায় কাজ নেই। ইতি ১০ চৈত্র ১৩৩৫

বাবামশায়

(৩৪)　　　　　　ওঁ

বৌমা

সুমিত্রা সংশোধন পরিমার্জ্জন শেষ করে কাল পড়ে শোনালুম। লোকে ভালো বল্‌চে বলা বাহুল্য। কিন্তু ধাঁ করে অভিনয় হতে পারবে এ আশা করতে পারিনে। অজিন বিক্রমের পার্ট পারবে না। কে পারবে? লোক কোথায় পাব? এই তর্ক চল্‌চে।

আমাকে আরো দু চারদিন এখানে ধরে রাখবে। প্রথম অনুনয় হচ্চে রাণীর--দ্বিতীয়, আমার বই ছাপার ব্যবস্থা। মহুয়া এবং সহজ পাঠ। ইতিমধ্যে রথী এখানে আসবে এমন একটা কথা শুনচি। যদি অভিনয়ের কোনো সুব্যবস্থা সে করতে পারে চেষ্টা করে দেখুক।

সেই আমার কাঠের Seal গুলো—মহুয়ার এবং আমার bookplate এর, কালীর pad শুদ্ধ কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়ো। ওকুরাকে বই পাঠাব তাতে ছাপ মারতে হবে।

আশা করি হারা-সান সিঙাড়া কচুরি খাজাগজার অনুশীলনে আমার অনুপস্থিতির দুঃখ ভুলেচে।

ভয়ঙ্কর মশা—দিনের বেলাও নিষ্কৃতি নেই। কিন্তু তাদের কামড়ের জ্বালা বীরভূমের মশার চেয়ে অনেক কম।

আজ দিনুরা আসবে শুনচি। ইতি ৩ ভাদ্র ১৩৩৬

বাবামশায়

এই কাটা গানটিও আছে চিঠির এক পাশে :

দিনের পরে দিন যে গেল আঁধার ঘরে
তোমার আসনখানি দেখে মন যে কেমন করে
ওগো বঁধু আমার সাজি
মঞ্জরীতে ভরল আজি
ব্যথার হারে গাঁথব তারে রাখব চরণ পরে।

(৩৫)　　　　　　　ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বক্তৃতা দিতে দিতে ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়েচি রাজধানীতে। আছি আর্য্যভবনে। এতদিন ছিলুম আতিথ্য আদর অভ্যর্থনার ভিড়ের মধ্যে—সর্ব্বদাই ঘেঁষাঘেষি— নব পরিচিতের দৃষ্টির সম্মুখে। এখানে অসংখ্য অপরিচিতের নির্জ্জনতায় আরাম বোধ করচি। এ বাড়িটা বেশ রীতিমত ভালো, আরামের, কোনো নোংরামি বা বিশৃঙ্খলতা নেই। একমাত্র অসুবিধা এই যে এখানে অরবিন্দের আসবার কোনো বাধা নেই। আহারটা সম্পূর্ণ হিন্দুস্থানী দস্তুরের। উপকরণ খাঁটি, রান্নাও ভালো। লোকেরা ভদ্র ও আতিথেয়। কিছু কিছু নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণের সূচনা হয়েচে। আজ রাত্রে আগা খাঁয়ের হোটেলে ডিনার। খুব আমিরী হোটেল, কেবলমাত্র ওমরাওদের অধিকার সেখানে। বামনজি এই কথাটা খুব জোরের সঙ্গে আমার কর্ণগোচর করেচে। আমি ভয়ে সম্ভ্রমে অভিভূত। এত বড়ো সম্মান জীবনে

ক'বারই ঘটে। কাল রাত্রে রোটেনস্টাইন গৃহিণীর আমন্ত্রণ। তারপরে অদৃষ্টে আরো কত সম্মান সমারোহ আছে জানিনে। ৩রা জুনে পেন্ ক্লাব। ৫ই জুনে বার্ম্মিংহাম্ আর্টিষ্ট দরবারে আমার অভ্যর্থনা। তার পর দিনে লেনার্ডের ওখানে। তার পরে কোন্ নাগাদ তোমাদের বাসায় ভিড়তে পারব সেইখানেই সেটা স্থির হবে। মোট কথা একেবারে হয়রান হয়ে গেছি। কয়দিন আগে ইনফ্লুয়েঞ্জায় পড়েছিলুন—আজো তার দুর্ব্বলতার বোঝা পিঠের উপর চেপে বসে আছে। কোথাও এক কোণে হাত পা ছড়িয়ে বসতে পারলে বাঁচি। জগতের হিত করতে আর ইচ্ছা করচে না। নীলমণির সাহচর্য্যে উদয়নের উদ্ধলোকে উত্তীর্ণ হবার বাসনা মনে বেদনা আনয়ন করচে। ইতি ১ জুন ১৯৩০

বাবামশায়

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, বৃষ্টি, বৃষ্টি, বৃষ্টি। দিনের পর দিন। সবাই বল্‌চে এমন কাণ্ড হয় না কখনো। আমি মনে মনে ভাবচি এটা আমারি কীর্ত্তি। আমি বর্ষার কবি। শ্রাবণমাসে বর্ষামঙ্গল আমার পিছনে পিছনে সমুদ্রপার হয়ে এসে হাজির। কিন্তু সত্যি কথা বল্‌তেই হবে, "হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে" এ কবিতাটা ঠিক খাটচে না। হৃদয় নাচ্‌চে না—দমে আছে। আরো দমেচে যেহেতু এণ্ড্রুজ এসে উৎপাত আরম্ভ করেচে। তার মতে চল্‌তে হবে। আমি প্রমাণ করতে চাচ্চি যে আমি নাবালক নই। যাকগে— আগামী মঙ্গলবারে যাব জেনিভায়। সেখানে আর এক পালা। শুনচি আয়োজন করেচে খুব বড়ো রকমের। আদর অভ্যর্থনার অভাব হবে না। কিন্তু সেখানে নানাবিধ শ্রেণীর মানুষ আছে—তার মধ্যে আছে আমার স্বদেশের লোক।

এখানকার ন্যাশনাল গ্যালারিতে আমার পাঁচখানা

ছবি নিয়েচে শুনেচ। তার মানে তারা পৌঁচেচে ছবির অমরাবতীতে। ওরা দামের জন্যে ভাবছিল—টাকা নেই কী করবে। আমি লিখে দিয়েছি যে আমি জর্ম্মানিকে দান করলুম দাম চাইনে। ভারি খুসি হয়েচে। আরো অনেক জায়গা থেকে একজিবিশনের জন্যে আবেদন আসচে। একটা এসেচে স্পেন থেকে— তারা চায় নবেম্বরে। ভিয়েনা চায় ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি যে পোটো সেই নামটাই ছড়িয়ে পড়চে কবি নামকে ছাপিয়ে। থেকে থেকে মনে আসচে তোমার সেই স্টুডিয়োর কথাটা। ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে, শালবনের ছায়ায় খোলা জানলার কাছে। বাইরে একটা তালগাছ —খাড়া দাঁড়িয়ে, তারি পাতাগুলোর কম্পমান ছায়া সঙ্গে নিয়ে রোদ্দুর এসে পড়েচে আমার দেয়ালের উপর, —জামের ডালে বসে ঘুঘু ডাকচে সমস্ত দুপুর বেলা; নদীর ধার দিয়ে একটা ছায়া-বীথি চলে গেছে—কুড়চি ফুলে ছেয়ে গেছে গাছ, বাতাবি নেবুর ফুলের গন্ধে বাতাস ঘন হয়ে উঠেচে, জারুল পলাশ মাদারে চলেচে প্রতিযোগিতা, সজনে ফুলের ঝুরি দুলচে হাওয়ায়; অশথ গাছের পাতাগুলো ঝিল্‌মিল্ ঝিল্‌মিল্ করচে— আমার জানলার কাছ পর্য্যন্ত উঠেচে চামেলি লতা।

নদীতে নেবেচে একটি ছোট ঘাট, লাল পাথরে বাঁধানো, তারি এক পাশে একটি চাঁপার গাছ। একটির বেশি ঘর নেই। শোবার খাট দেয়ালের গহ্বরের মধ্যে ঠেলে দেওয়া যায়। ঘরে একটিমাত্র আছে আরাম কেদারা— মেঝেতে ঘন লাল রঙের জাজিম পাতা, দেয়াল বসন্তী রঙের, তাতে ঘোর কালো রেখার পাড় আঁকা। ঘরের পূবদিকে একটুখানি বারান্দা, সূর্য্যোদয়ের আগেই সেইখানে চুপ করে গিয়ে বসব, আর খাবার সময় হলে লীলমণি সেইখানে খাবার এনে দেবে। একজন কেউ থাক্‌বে যার গলা খুব মিষ্টি, যে আপন মনে গান গাইতে ভালোবাসে। পাশের কুটীরে তার বাসা— যখন খুসি সে গান করবে, আমার ঘরের থেকে শুন্‌তে পাব। তার স্বামী ভালোমানুষ এবং বুদ্ধিমান, আমার চিঠিপত্র লিখে দেয়, অবকাশ কালে সাহিত্য আলোচনা করে, এবং ঠাট্টা করলে ঠাট্টা বুঝতে পারে এবং যথোচিত হাসে। নদীর উপরে তুটি সাঁকো থাকবে—নাম দিতে পারব জোড়াসাঁকো—সেই সাঁকোর তুই প্রান্ত বেয়ে, জুঁই বেল রজনীগন্ধা রক্তকরবী। নদীর মাঝে মাঝে গভীর জল, সেইখানে ভাস্‌চে রাজহাঁস আর ঢালু নদীতটে চরে বেড়াচ্চে আমার পাটল রঙের গাই গোরু, তার বাছুর

নিয়ে। শাকসবজির ক্ষেত আছে, বিঘে দুইয়েক জমিতে ধানও কিছু হয়। খাওয়া দাওয়া নিরামিষ, ঘরে তোলা মাখন দই ছানা ক্ষীর, কুকারে যা রাঁধা যেতে পারে তাই যথেষ্ট— রান্নাঘর নেই। থাক্ এই পর্য্যন্ত। বাইরের দিকে চেয়ে মনে পড়চে আছি বর্লিনে—বড়ো লোক সেজে—বড়ো কথা বল্‌তে হবে—বড়ো খ্যাতির বোঝা বয়ে চল্‌তে হবে দিনের পর দিন—জগৎ জোড়া সব সমস্যা রয়েচে তর্জ্জনী তুলে, তার জবাব চাই। ওদিকে ভারতসাগরের তীরে অপেক্ষা করে আছে বিশ্বভারতী— তার অনেক দাবী, অনেক দায়—ভিক্ষা করতে হবে দেশে দেশান্তরে। অতএব থাক্ আমার স্টুডিয়ো। কত দিনই বা বাঁচব— ইতিমধ্যে কর্ত্তব্য করতে করতে ঘোরা যাক্—রেলে চড়ে, মোটরে চড়ে, জাহাজে চড়ে, ব্যোমযানে চড়ে—সভ্যভব্য হয়ে। অতএব আর সময় নেই। ইতি ১৮ অগষ্ট ১৯৩০

বাবামশায়

(৩৭) ওঁ ১১৭২ পার্ক এভেনিউ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা আজ রাত্রে একটা ভোজ আছে। পাঁচ শো লোক মিলে আমাকে অভ্যর্থনা করবে। এটা যে আমার পক্ষে কত বড়ো পীড়া তা কেউ বুঝবে না। খ্যাতির আড়ম্বরে অনেকখানি মস্‌লা থাকে যা কেবলমাত্র ওজন বাড়াবার জন্যে কিন্তু সেইটের বোঝা বড়ো অসহ্য। এই দেশে সব জিনিষকেই আয়তনে বড়ো করে তোলবার একটা ভয়ঙ্কর নেশা আছে—যে কেউ যে কোনো কাজ করতে চায় আতিশয্যের যন্ত্র সঙ্গে রাখে—তাকে বলে পাব্লিসিটি। তাতে কেবলি আওয়াজ বড়ো করে, আকার বড়ো করে, চীৎকার ক'রে বল্‌তে থাকে আমার দিকে চেয়ে দেখো। হাজার হাজার লোকে এই রকম চীৎকার করচে। হায়রে, এর মাঝখানে আমি কেন? কি পাপ করেছিলুম? বিশ্বভারতী? প্রায়শ্চিত্ত করে বিদায় নিতে পারলে বাঁচি। প্রতি পদে মনে হচ্চে সত্যকে

মিথ্যে করে তুলচি—সেই মিথ্যের বোঝা কি ভয়ঙ্কর। নিজেকে অত্যন্ত সহজ করে বাজে সাজ সরঞ্জাম সব ফেলে দিয়ে হাল্‌কা হয়ে বসব কবে সেই কথাটাই দিনরাত্রি ভাবচি। লিখব পড়ব ছবি আঁকব আমার কাঁকর-বিছানো বাগানে সকালে বিকালে একটু পায়চারি করে আসব—তার পরে জানলার ধারে একটা আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে খোলা আকাশে রঙীন মেঘের সঙ্গে আমার রঙীন কল্পনার মিলন ঘটাব—ইত্যাদি ইত্যাদি কত কি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে মস্ত বড়ো প্রফেট, ফিলজফার এই বাজে কথাটা সম্পূর্ণ লোপ করা আর সম্ভব নয়। সুতরাং দেশ বিদেশ থেকে চিঠি আসবে আগন্তুকের দল আসবে, নানা প্রশ্নের নানা জবাব দিতে হবে—তবু তার মধ্যে থেকে খানিকটা ফাঁকা জায়গা বাঁচাতে পারলে সেইখানে আমার চিত্রশালা খুলব—দর্শনার্থীর মধ্যে কখনো কখনো পুপু আসবে—তাকে বোধ হয় বাঘের গল্প বলে ভোলানো আর সম্ভব হবে না—গল্পের চেহারা বদল করব—সুবিধে এই যে সে আমার কাছ থেকে ফিলজফি দাবী করবে না।—২৭ তারিখে ব্রেমেন জাহাজে এখান থেকে দৌড় দেব। তার আগে একবার কানাডায় যাব। য়ুরোপ থেকে

জাপানী জাহাজে যাত্রা করবার চেষ্টায় রইলুম। ইতি
২৫ নবেম্বর ১৯৩০

বাবামশায়

অমিতার চিঠিখানা তাকে পাঠিয়ে দিয়ো।

ওঁ

কল্যানীয়াসু

বৌমা, পাছে তোমরা ভয় পাও তাই আমি নিজের হাতে তোমাদের চিঠি লিখচি। আমার অবস্থা যে পূর্ব্বের চেয়ে খারাপ তা নয়। সেই রকমই। তবে কি না ডাক্তার বলচে এটা ভালোরকমের অবস্থা নয়। অর্থাৎ পূর্ব্বেও ভালো ছিল না এখনো ভালো নয়। এখানকার একজন সব-সেরা হৃদ্‌রোগতত্ত্বজ্ঞ আমাকে দেখতে এসেছিলেন। উলটিয়ে পালটিয়ে নানা রকম ঠোকাঠুকি করে তিনি খুব জোর্‌সে বল্‌লেন, সব রকম এন্‌গেজমেন্ট এখনি বন্ধ করে দিয়ে অন্তত নবেম্বরের মাঝামাঝি নাগাদ এদেশ থেকে দৌড় দিতে হবে। ডাক্তার রোজ ছুবার করে আমাকে দেখ্‌তে আসেন। কিছু ওষুধ দিয়েচেন তাতে আমি উপকারও পেয়েছি। কিন্তু বক্তৃতাদি বন্ধ। তাঁর উপদেশ এই, দেশে ফিরে গিয়ে ভালোমানুষের মত অত্যন্ত চুপচাপ করে দিন কাটাতে হবে। আমিও তো দৌড়ধাপ করতে চাইনে—

বিশ্বভারতীর ভূতে আমাকে দৌড় করায়। সেই ভূতটাকে ঝাড়াবার জন্যেই এত কষ্ট করে এদেশে আমার আসা। এইমাত্র এখানকার কোয়েকার সমাজের প্রধানবর্গ এখানে এসেছিলেন। তাঁরা আমাদের ভাষায় যাকে বলে মুক্তকণ্ঠ— অর্থাৎ সাদা ভাষায়, খুব দরাজ গলা করেই বল্‌লেন টাকার জন্যে এবার আমাকে ভাবতে হবে না। দৈন্য আমাদের দূর হবেই একথা পাকা। অতএব জীবনের বাকি কয়েকদিন আর পরের দ্বারে হাঁটাহাঁটি করার প্রয়োজন ঘুচল। একটা ইজিচেয়ার, একটা ইজল্ আর একটা স্টুডিয়ো এবং খানকয়েক বই—আর এ ছাড়া লীলমণি, এহলেই আমার দিন কাটবে—ময়ুরাক্ষী নদীটা বোধ হচ্চে যেন সম্ভবপরতার পরপারে।

তারপরে ছবির কথাটা বলে রাখি। আরিয়াম হলেন তার উদ্যোগী। বস্‌টনে কাজ সুরু হয়েচে। সেও দেখি মুক্তকণ্ঠ—অর্থাৎ সেও দরাজ গলায় বল্‌চে, ছবি কসে বিক্রি হবে। লোকে খুসি, এবং যাকে বলে বিস্মিত। তা ছাড়া বোধ হয় এও ভাবচে এ মানুষটার কি জানি কখন্ কি হয়, এর পরে ছবিগুলোর দাম বাড়বে। যাই হোক ভাবগতিক দেখে আরিয়াম ঠিক

করে রেখেচে বস্টনে এবং নিউইয়র্কে ছবি সমস্ত বিকিয়ে যাবে। আমারও সেটা অসম্ভব বোধ হচ্চে না—কারণ আমার সম্বন্ধে এখানকার লোকেরা সত্য সত্যই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেচে।

যদি বিক্রি হয় তা হলে কিছু মোটা গোছের টাকা হাতে আসবে। এই টাকাটা সমস্তই যেন তোমাদের ধার শোধের জন্যেই ব্যবহার হয়। আর কিছুরই জন্যে নয়। তোমাদের ঋণের চিন্তা ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত কাবু করে রেখেচে। তোমাদের বৈষয়িক ব্যাপারে একটুও হাত দিতে চাইনে বলেই নিষ্ক্রিয় হয়ে ছিলুম। অথচ বুঝতে পারছিলুম রথীর শরীর ভেঙে যাবার অন্যতম কারণ এই দুশ্চিন্তা। আমার ছবি বিক্রি করে এই দায় ঘোচাব বলে একান্ত আশা করেছিলুম। এই অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপারটা ক্রমে আমার প্রত্যয়গোচর হয়েচে যে, আমার ছবির দাম আছে এবং সে দাম বাড়বে। আজ হোক কাল হোক এই ছবি থেকে ঋণ শোধ হবেই। তার পরে— তারপরে কি সে কথা বলি।

ধনী পরিবারের ব্যক্তিগত অমিতব্যয়িতার উপরে এবার আমার আন্তরিক বৈরাগ্য হয়েচে। দেনাশোধের ভাবনা ঘুচে গেলেই দেনা বাড়াবার পথ একেবারে বন্ধ

করতে হবে। তা ছাড়া নিজেদের ভরণপোষণের দায়িত্ব আমাদের গরীব চাষী প্রজাদের পরে যেন আর চাপাতে না হয়। এ কথা আমার অনেকদিনের পুরোনো কথা। বহুকাল থেকেই আশা করেছিলুম আমাদের জমিদারী যেন আমাদের প্রজাদেরই জমিদারী হয়— আমরা যেন ট্রস্টির মতো থাকি। অল্প কিছু খোরাক পোষাক দাবী করতে পারব কিন্তু সে ওদেরি অংশিদারের মতো। কিন্তু দিনে দিনে দেখলুম জমিদারী রথ সে রাস্তায় গেল না—তার পরে যখন দেনার অঙ্ক বেড়ে চলল তখন মনের থেকেও সঙ্কল্প সরাতে হল। এতে করে দুঃখ বোধ করেচি—কোনো কথা বলিনি। এবার যদি দেনা শোধ হয় তাহলে আর একবার আমার বহুদিনের ইচ্ছা পূর্ণ করবার আশা করব।

আমি যা বহুকাল ধ্যান করেচি রাশিয়ায় দেখলুম এরা তা কাজে খাটিয়েছে। আমি পারিনি বলে দুঃখ হোল। কিন্তু হাল ছেড়ে দিলে লজ্জার বিষয় হবে। অল্প বয়সে জীবনের যা লক্ষ্য ছিল শ্রীনিকেতনে শান্তিনিকেতনে তা সম্পূর্ণ সিদ্ধ না হোক, সাধনার পথ অনেকখানি প্রশস্ত করেছি। নিজের প্রজাদের সম্বন্ধেও আমার অনেককালের বেদনা রয়ে গেচে। মৃত্যুর

আগে সেদিককার পথও কি খুলে যেতে পারব না ?

আমার বয়স সত্তর হয়ে এল। আজ ত্রিশ বছর ধরে যে দুঃসাধ্য চেষ্টা করেচি আজ হঠাৎ মনে হচ্চে যেন ভিং পাকা হবে। ছবি কোনো দিন আঁকি নি, আঁকব বলে স্বপ্নেও বিশ্বাস করিনি। হঠাৎ বছর দুই তিনের মধ্যে হুহু করে এঁকে ফেল্‌লুম আর এখানকার ওস্তাদরা বাহবা দিলে। বিক্রিও যে হবে তাতে সন্দেহ নেই। এর মানে কি ? জীবনগ্রন্থের সব অধ্যায় যখন শেষ হয়ে এল তখন অভূতপূর্ব্ব উপায়ে আমার জীবনদেবতা এর পরিশিষ্ট রচনার উপকরণ জুগিয়ে দিলেন। আমার Religion of Manও সেই পরিশিষ্টেরই অঙ্গ। জীবনে যা কিছু সুরু করেছি তা সারা করে যেতে হবে। কোনোটা বাকি থাকবে না।

এই পরিশিষ্টের শেষ অংশে ধনীর পোষাক আমাদের ছাড়তে হবে নইলে লজ্জা ঘুচবে না। আমার ভাগ্যবিধাতার আশ্চর্য্য বিধান এই যে এখন থেকে শেষ পর্য্যন্ত নিজের জীবিকা নিজের চেষ্টায় উপার্জ্জন করতে পারব। এদেশ থেকে রঙীন কালী আর ছবির কাগজ নিয়ে যাব—তার পরে ভরসা করচি আমার ছবি আঁকা

নিরর্থক হবে না। দেশের লোকে আমাকে বিশেষ কিছু দেয় নি ভালোই হয়েচে—নিন্দা অনেক সয়েচি সেও ভালো হয়েচে। সুদীর্ঘ নিঃসঙ্গ দুঃখের পথ মনে হচ্চে যেন আজ সফলতায় উত্তীর্ণ হবে—স্বদেশের কাছে অনেক আশা করে বঞ্চিত হয়েচি, বন্ধুরাও পদে পদে প্রতিকূলতা করেচে—কিন্তু কিছু ক্ষতি হয় নি—বরঞ্চ তাদের আনুকূল্যই হয় তো আমার সইত না। ইতি

[১৯৩০] বাবামশায়

(৩৯) ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, এরিয়ামের চিঠিতে সব খবর পাচ্চ জেনে লেখা সম্বন্ধে পরিপূর্ণমাত্রায় কুঁড়েমি করচি। বস্তুত আজকাল আমার লেখার স্রোত একেবারে বন্ধ। ছুটি যখন পাই ছবি আঁকি—যারা সমজদার তারা বলে এই হাল আমলের ছবিগুলো সেরা দরের। একটু একটু বুঝতে পারচি এরা কাকে বলে ভালো, কেন বলে ভালো। তুমি যে একদা বলেছিলে আমার ছবিগুলো ভালো জাতের, সে কথাটার পরখ হয়ে গেল, এরাও তাই বলচে— শুনে আশ্চর্য্য ঠেকচে। কিন্তু ভিক্টোরিয়া যদি না থাকত তাহলে ছবি ভালোই হোক্ মন্দই হোক কারো চোখে পড়ত না। একদিন রথী ভেবেছিল ঘর পেলেই ছবির প্রদর্শনী আপনিই ঘটে—অত্যন্ত ভুল। এর এত কাঠখড় আছে যে সে আমাদের পক্ষে অসাধ্য —আন্দ্রের পক্ষেও। খরচ কম হয়নি—তিন চারশো পাউণ্ড হবে। ভিক্টোরিয়া অবাধে টাকা ছড়াচ্চে। এখানকার

সমস্ত বড়ো বড়ো গুণীজ্ঞানীদের ও জানে—ডাক দিলেই তারা আসে। Comtesse de Noaillesও উৎসাহের সঙ্গে লেগেচে—এমনি করে দেখতে দেখতে চারদিক সরগরম করে তুলেচে। আজ বিকেলে প্রথমে দ্বারোদ্‌ঘাটন হবে—তারপরে কি হয় সেইটেই দ্রষ্টব্য। যাই হোক্‌, এখানকার পালা সাঙ্গ হলে ছবিগুলো ঘাড়ে করে কী করতে হবে ভেবে পাইনে। ডাল বলচে জুনে স্টকহল্‌মে একবার যাচাই করা যাবে সেখানেও একটা সোরগোল হতে পারে। কিন্তু ইতিমধ্যে? বার্লিনে কে দায় নেবে? দায় কম নয়। লণ্ডন ছবি দেখাবার পক্ষে খারাপ জায়গা নয় এই কথা সকলে বলচে—অতএব ছবিগুলো আমার সঙ্গে সেখানে নিয়ে যাওয়া মন্দ পরামর্শ নয়। প্যারিসে যদি ঠিক সুর লাগে তাহলে সব জায়গাতেই তার প্রতিধ্বনি পাওয়া যাবে। ভিক্টোরিয়া ছবি বিক্রির কথা বলছিল—বোধ হয় এই উপলক্ষ্যে নিজে কিনে নেবার ইচ্ছে। আমি বলেচি এখন বেচবার কথা বন্ধ থাক্‌। আর যাই হোক আমার ছবি দেশে ফিরতে দেব না—অযোগ্য লোকের হাতে অবমাননা অসহ্য।

রথীর জন্যে উদ্বিগ্ন আছি। ওখানে যদি যথেষ্ট

উপকার না হয় তাহলে কী করবে? একবার কি ভিয়েনাতে চেষ্টা দেখবে? আমার বোধ হচ্চে রথীকে কোনো ভালো জায়গায় প্রায় বছর খানেক রাখা দরকার হবে। সেই রকম বন্দোবস্ত করা ভালো। Kali Phos এবং Natrum Phos যদি ও অনেকদিন প্রত্যহ খায় তবে আমার বিশ্বাস উপকার পাবে। তোমার নিজের শরীর আশা করি ভালো। আমাকে নিরতিশয় ক্লান্ত করেচে। ভিক্টোরিয়া স্থির করেচে এখানকার একজন বড়ো ডাক্তারকে দিয়ে আমার পরীক্ষা করাবেন। শরীর তো একরকম করে চল্‌চে কিন্তু যে পরিমাণে প্রত্যহ চুল উঠ্‌চে তাতে আন্দাজ দেশে ছবিও যদি না ফেরে চুলও ফিরবে [না]। এখানে আসবার সময় নারকেল তেলের শিশিটাকে [ফেলে এসে] ভালো করিনি ওটা চুলের পক্ষে ভালো।

ভিক্টোরিয়ার আমেরিকায় যাবার তাড়া। কেবল আমার এই ছবির জন্যেই আছে। কিন্তু আর বেশি দিন থাকবে না। এই মাসের ৭ই ৮ই যাবে। তার পরেই আমার ইংলণ্ডের পালা আরম্ভ হবে। সে আবার সম্পূর্ণ একটা নতুন অধ্যায়। এণ্ড্রুজের বিশ্বাস লেকচারটাতেও একটা রব উঠ্‌বে। কিন্তু ওতে আমার মন নেই।

পুপুকে আমার জোব্বার মধ্যে আচ্ছন্ন করবার যে কাজ পেয়েছিলুম সেটা বন্ধ হওয়াতে আমার জোব্বা-গুলো হতাশ হয়ে ঝুলে পড়েচে। কিন্তু তা ছাড়া আর একটা কারণ আছে, আমার অধিকাংশ জোব্বার বোতাম ও তার বন্ধনীতে সামঞ্জস্য নেই সুতরাং সেগুলো বহন করি বাক্সে, দেহে নয়। সুহৃৎ কেমন আছে— ওখানে ভালো পাঁউরুটি ও ফ্রোমাজের অভাব হবে না কিন্তু তার দ্বারাতেই কি সকল অভাব দূর হতে পাববে?

[১৯৩০] বাবামশায়

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, পাড়াগাঁ আমার ভালো লাগে কিন্তু নিজের কোণটুকু আমার আরো ভালো লাগে। নিজের জগৎ নিজের হাতে বানিয়ে তার মধ্যেই বাস করা আমার বরাবরকার অভ্যাস সেইজন্যে সম্পূর্ণ অখণ্ড অবকাশ না পেলে দুই একদিনেই হাঁপিয়ে পড়ি। আদর যত্ন সেবা ভালো লাগে না তা নয়---কিন্তু তাতেও জায়গা জোড়ে, মন বাধা পায়। তাই শান্তিনিকেতনে ফিরে যাবার জন্যে মন উতলা হয়ে উঠেচে। , কালই অপরাহ্ণ চারটের গাড়িতে দৌড় দেব। প্রতাপকে নিতান্তই দরকার আছে বলে মনে করিনে—বনমালীর সঙ্গে মোবারককে জুড়ে দিলে আমার সংসারে তো বিশেষ অভাব থাকে না। তোমাদের ওখানে প্রতাপকে না হলে তোমাদের কষ্ট হবে---ওকে সেখানে রেখে দিলে আমি খুসি হতুম এবং নিশ্চিন্ত হতুম। যদি ইচ্ছে করো ওকে পাঠিয়ে দিতে পারি— নিশ্চয় জেনো আমার শিকি পয়সার

অসুবিধা হবে না। আমি গরমকে ভয় করিনে, মশাকে ভয় করি—তাকে পরাস্ত করবার যতরকম পরীক্ষা সম্ভব, করে দেখব—তার ফলে হয় তো বিশ্বের একটা হিত-সাধন হতেও পারে। অমূল্যবাবু এসেছিলেন—আলো পাখার যন্ত্র রওনা হয়ে গেছে, দাম চুকিয়ে দিয়েছি। তাঁকে ধরেছি আমাদের জল দান করতে—শীঘ্র যাবেন বলেচেন। যতদিন পারো দার্জ্জিলিঙে থেকো, একেবারে অক্টোবরে এলে ভালো হয়। পুপুকে বোলো সে চলে যাবার পর থেকে পুষ্প আমার কাছেও ঘেঁষে না, তাই সম্পূর্ণ একলা পড়ে গেছি। আপাতত বনমালী ছাড়া আমার আর গতি নেই। ইতি ৩ এপ্রেল ১৯৩১

বাবামশায়

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা— পারস্যকে ছাড়াবার চেষ্টা করেছিলুম কিন্তু পারস্য কিছুতেই ছাড়ল না। মরিয়া হয়ে বললে শরীরে দুর্ব্বলতা যদি থাকে ভালো ডাক্তার সঙ্গে এনো সমস্ত খরচ রাজা দেবেন।

মঙ্গলবার অর্থাৎ পর্শু রাত্রে বর্দ্ধমান থেকে বেরোব। সঙ্গে সুরুলের ডাক্তার এবং অমিয়র বদলে ধীরেন। অমিয় এখন পুরীতে বিদায় নিতে গেছে। কিন্তু সে আমার দেখাশোনা করতে পারবে না— সেটা তার ধাতে নেই।...ধীরেনের বুদ্ধিও আছে পটুতাও আছে। যাই হোক সব ঠিক হয়ে গেছে।

পুপুমণির চিঠিতে একটা গল্পের ভূমিকা করেছিলুম এমন কি নায়কের এবং পাল্লারামের ছবিও এঁকেছি। ও যদি একটুও ঔৎসুক্য প্রকাশ করত তবে এতদিনে এ গল্প অনেকটা দূর এগোত।

তোমরা নিশ্চয়ই ভালো আছ। যতদিন পারো

থেকো— বর্ষার আরম্ভেই নেমে এসো না। এখানে এ বছর বৃষ্টিবাদল হয়ে ঠাণ্ডাই চলেচে— গাছপালা মাঠঘাট এখনো সরস সবুজ।

কাপড়চোপড় গোছানোগাছানোর ধূম চলচে।

স্তুটুদের বিয়ে দেখতে দেখতে পুরোনো হয়ে গেছে— এখন গোরার বিয়েটা না হলে ভালো লাগচে না। তারো ভূমিকা চলচে তোমরা নিশ্চয় উপসংহার ভাগ দেখতে পাবে।

জ্যৈষ্ঠমাসের সব কাগজেই দেখা গেল ফাল্গুন মাসের মুক্তধারা বেরিয়েচে— বর্ষার মুক্তধারাও এবার সেই ফাল্গুনেই দেখা দিয়েছিল তার পরে দীর্ঘকাল গেছে খরা। ইতি ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮

বাবামশায়

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, আমাকে বিষম উদ্বেগে ফেলে তুমি তো চলে গেলে, তার পরে এখানে এসে দিনরাত গোলমাল চল্‌চে একমুহূর্ত্ত বিশ্রাম নেই। এ পর্য্যন্ত অভিনয় থেকে ১৪০০০ টাকা পাওয়া গেছে। আরো কিছু পাব। তার পরে ভিক্ষের আয়োজনও চলচে— কিশোরী আর কালীমোহন এই নিয়ে আছে।

প্রথমে শাপমোচন দিয়ে আরম্ভ করা গেল। খুবই জমেছিল, এখানকার কাগজে যেরকম উচ্ছ্বসিত প্রশংসা বেরিয়েছে আমাদের দেশে কোনোদিন তেমন ঘটেনি। তার পর তৃতীয়দিন তাসের দেশ। থার্ম্মোমিটর একেবারে সাব্‌নর্ম্মাল। দমে গেল মন। সকালে উঠেই নতুন নাচ গান ঢুকিয়ে তাসের দেশকে সম্পূর্ণ নতুন করে তোলা গেল। আশ্চর্য্য এই যে আয়ত্ত করতে মেয়েদের কিছুমাত্র বিলম্ব হোলো না। "সঙ্কোচের বিহ্বলতা" গানটাতে যে নাচ ওরা লাগিয়েচে সেটা নতুন ধরণের—

সেটাতে খুব encore পেয়েচে— বুড়ী আশ্চর্য্য করে দিয়েচে সবাইকে। আবার কাল হবে শাপমোচন। কিন্তু নতুন তাসের দেশটা শাপমোচনের চেয়ে ভালো হয়েছে। তাতে রোমান্স্ এবং রিয়ালিজ্‌ম্ পাশাপাশি থাকাতে আশ্চর্য্যরকম জমেচে।

পুপুর সঙ্গে তার বাপ ও দিদিদের দেখাশোনা হওয়াতে ওর ধাক্কাটা একেবারে কেটে গেছে— ভালো হোলো। পুপুর বড়ো বোন (তারা বাই নয়) অসাধারণ সুন্দর দেখতে।

... ...

বৌমা এবার মাঘ মাসে বোটে শিলাইদহে যাবার ব্যবস্থা নিশ্চয় কোরো। তোমার শরীরের জন্যে অত্যন্ত চিন্তিত আছি।

[বোম্বে, ৩০ নভেম্বর, ১৯৩৩] বাবামশায়

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, আমি চলে আসার পর তোমাদের আকাশ পরিষ্কার হয়েছে আর এখানকার আকাশে নেমেছে ঘোরতর বাদল। এখানে এত বৃষ্টি সারাবৎসরের মধ্যে হয় নি। চাষীদের ক্ষেত শুকিয়ে এসেছিল ক'দিনের মধ্যে বেঁচে উঠেছে ওদের মরা ফসল। সত্যি-কথা যদি বলতে হয় এখানে ভালই লাগচে। কালি-ম্পঙের মহিমা স্বীকার করব কিন্তু এখানকার মাধুর্যের সম্বন্ধে পুপুদিদির সঙ্গে আমার মতের মিল অনুভব করচি।

ছাত্রীর দল আসচে, তুমি নেই, কার হাতে তাদের সমর্পণ করা যায়। বুড়ি মেয়েদের স্বভাব জানে সেই জন্যে মেয়েদের দায়িত্ব নিতে নারাজ। সুরেন ভীতু মানুষ, যতটা সম্ভব দূরে থাকতে চায়।

হায়দ্রাবাদ থেকে প্রতিমা এসেছে, আছে তোমার

তেতালার কুঠরিতে। আমি আছি চুপচাপ, আহারের নিয়ম পূর্ব্ববৎ। কবিতার কাপি? ইতি ১০।৮।৩৪

বাবামশাই

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, তোমার জন্যে আমার মন সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন থাকে। তোমার কাছ থেকে বা শান্তিনিকেতন থেকে তোমার কোনো খবর পাইনে। আজ পর্য্যন্ত পুরীতে আছ কিনা বা পুরীতে কোথায় আছ তার কিছুই জানতে পারলুম না। অমিয়র মার কেয়ারে এই চিঠি পাঠাচ্ছি আশা করি পাবে।

আমাদের এখানকার পালা আজ শেষ হবে। জিনিষটা এবার সব সুদ্ধ অন্যবারের চেয়ে অনেক বেশি সম্পূর্ণতর হয়েচে। কিন্তু এখানকার লোকের মন অসাড়। যথেষ্ট উৎসাহ পেয়েচি বল্‌লে অত্যুক্তি হবে।

এখানে এসে অবধি ঘোরতর বাদলা বৃষ্টি চলছিল। কাল থেকে আকাশ পরিষ্কার। সেই কারণেই কাল খুব ভিড় হয়েছিল— অনেককেই দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল। দুঃখ এই যে লোক ৬।৭ শর বেশি ধরেই না। সেটাকে সৌভাগ্যও বলা যেতে পারে। যদি দর্শকের

জায়গা বেশি বড়ো হোতো, তাহলে দর্শকদের অভাব অত্যন্ত কটুভাবে চোখে পড়ত।

৪ঠা পৌঁছব ওয়াল্‌টেয়রে। আমি থাকব বিজয়নগ্রম্ মহারাণীর নিজ আতিথ্যে। মেয়েরা থাকবে বব্‌লির বাড়িতে। ছেলেরা কোথায় থাকবে জানিনে। ওখানে আমাদের কাজ শেষ হবে ৬ই।

তার পরে দুই একদিনের জন্যে তোমাকে দেখে যাবার জন্যে মনটা উৎসুক আছে। কিন্তু আমাকে নিয়ে পাছে ব্যস্ত হয়ে পড়ো বা স্থানাভাব থাকে সেই ভয়ে মন স্থির করতে পারচিনে। কেবল তোমাকে দেখেই চলে যেতে চাই। ওয়াল্‌টেয়রে যদি তোমার চিঠি পাই তাহলে যা হয় স্থির করব। পুপু মাঝে একটু অজীর্ণে ভুগেছিলো— পথ্যের ব্যবস্থা করে সেরে গেছে।

আশার শিশুকে দেখলুম। সময়ের পূর্ব্বে জন্মেছে বলে খুব ছোট্ট হয়েচে। ওরা এই আডিয়ারেই একটা বাসা নিয়েচে। তুমি কেমন আছ ওয়াল্‌টেয়রে গিয়ে যেন তার খবর পাই। ইতি ৩১ অক্টোবর ১৯৩৪

[মাদ্রাজ] বাবামশায়

ওঁ

বৌমা

তোমাদের পথকষ্টের পালা শেষ হয়ে গেছে। অন্তত রেলপথের। ধূলো এবং গরম প্রচুর পরিমাণেই পাবে এই মনে করে উদ্বিগ্ন ছিলুম। যা হোক সে সমস্ত চুকিয়ে জাহাজে চড়ে বসেছ কল্পনা করে নিশ্চিন্ত বোধ করচি। জানি সমুদ্র এখন শান্ত, ধীরেন আছে, তোমাদের যথেষ্ট যত্ন নেবে।— রথীর চিঠিতে জাপানে আমাদের পালা-গানের প্রস্তাব শুনেচ। এ সম্বন্ধে তুমি কী চিন্তা করচ জানিয়ো। এ পালা তোমারি স্বকৃত, এখনো তোমারি অঞ্চলে বাঁধা। বিদেশে ওকে একলা রওনা করে দিলে আমরা ওকে সামলাতে পারব না। জানিয়ে রেখে দিলুম। ভারতে অগষ্ট মাস থেকে অক্টোবরের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত কষ্টকর সময়। সেই সময়টা জাপানে তোমাদের ভালোই লাগবে। সিংহলের বন্ধুরা যেমন সমস্ত দ্বীপ তোমাদের ঘুরিয়েছিল এরাও তাই করবে— এমন সকল দেশে নিয়ে যাবে যেখানে ভ্রমণ আধুনিক

বঙ্গনারীদেরও আয়ত্তের অতীত। তা ছাড়া জাপানে তোমার দেখবার জিনিষ বিস্তর আছে—এমন সমাদরে সহজে বিনাব্যয়ে সেখানকার দর্শনীয় দেখে বেড়ানো তোমাদের ভাগ্যে কখনো ঘটবে না।—সে কথা যাক্। যাদের হাতে তুমি আমাকে সমর্পণ করে দিয়ে গেছ—তাদের মধ্যে সেক্রেটারি ধরাছোঁওয়ার অতীত। সকালে ডাকের চিঠি আসে, প্রাণ হাঁফিয়ে ওঠে। যে বয়সে পরের প্রতি নির্ভর অনিবার্য্য সে বয়সকে ধিক্। গাঙ্গুলি আছেন সদাসর্ব্বদা দৃষ্টিগোচর শ্রুতিগোচর। কোথাও কিছু ত্রুটি হবার জো নেই। আহারের সময় পুপে এসে প্রায়ই দুঃখ জানিয়ে যায় যে আমি অত্যন্ত কম খাই। সুনন্দা পাখা হাতে মাছি তাড়ায়।

তোমার সেই বৈঠকখানা ঘরে বড়ো লেখবার টেবিল আনিয়ে লেখা পড়া করি। ছবি আঁকবার আসবাবেও ছোট ঘর ভরে উঠেছে—এখনো আঁকা আরম্ভ করিনি। সম্মুখে তোমার বাগানের দিকে চেয়ে দেখি গাছপালা সব প্রসন্ন।

আজ থেকে অনিলের আসবাব সরিয়ে আনবার কাজ আরম্ভ হবে। গাঙ্গুলি ভার নিয়েছে। তার পরে সেই কুটীরটা আনন্দের সঙ্গে ভাঙতে লাগব। আমার মেটে

কোঠার ছাদ আরম্ভ হয়েছে। নন্দলালরা রোজ একবার করে এসে ওর সামনে দাঁড়িয়ে ধ্যান করে যান। জিনিষটা যথেষ্ট সমাদরের যোগ্য হয়ে উঠবে এখন থেকে তার নিদর্শন পাচ্চি।

আন্দ্রেকে বোলো, কল্পনা করচি তোমরা তার ভালোবাসা প্রচুর পরিমাণে ভোগ করচো—দূর থেকে আমি কেবল ঈর্ষা করে মরচি। কোনোদিন আমার অদৃষ্টেও যে এই সৌভাগ্য ঘটবে সে আশা করিনে—সময় পেরিয়ে গেছে। ইতি ২৮।৩।৩৫

বাবামশায়

আন্দ্রে দম্পতিকে আমার সর্ব্বান্তঃকরণের আশীর্ব্বাদ ও ভালোবাসা জানাবে। রঙীন কালী ?

কল্যাণীয়াসু

বৌমা আজ পয়লা বৈশাখে মন্দিরের কাজ শেষ করে এসেই তোমাদের চিঠি পাওয়া গেল। চিঠি না এসে তোমরা এলেই খুসি হতুম। সমুদ্রের হাওয়াতে তোমরা উপকার পেয়েছ খবর পেয়ে মনটা খুসি হোলো। আমার মনে হয় কিছু দিন ওদেশে থেকে তুমি যদি ভালো করে সেরে আসতে পারো তাহলে ভালো হয়। এখানকার ভাদ্র আশ্বিন কাটিয়ে যদি অক্টোবরের মাঝামাঝি এসো তাহলেই নিশ্চিন্ত হতে পারি। রথীরও তাই করা উচিত। কিন্তু কাজ কামাই করে রথী অতদিন থাকতে পারবে না। কিন্তু মুস্কিলের কথা আছে যদি জাপানে যাওয়া হয়। তুমি না থাকলে দল-বল নিয়ে কী ফল হবে। আর যাই হোক জাপানটা স্বাস্থ্যের পক্ষে খারাপ নয়—কিন্তু সেপ্টেম্বরে সেখানে আমাদের কাজ আরম্ভ হবার কথা। তার মানে অগষ্টমাসে যাত্রা। মন্‌সুনের সমুদ্রে বেরতে হবে।

অবশ্য ওদিকে মন্‌সুনের প্রভাব প্রবল নয়। যাই হোক কথাটা নানাদিক থেকে ভেবে দেখবার বিষয়। এদিকে আমার মাটির ঘর (শ্যামলী) প্রায় সম্পূর্ণ হোলো। জন্মদিনে গৃহপ্রবেশ করতে পারব এমন আশা পাওয়া যাচ্চে। কিন্তু তোমরা থাকবে না আমি নতুন বাসায় যাব এটা ভালো লাগচে না। উপায় নেই।—আজ পর্য্যন্ত গরম বেশি পড়েনি। দুপুরে শুকনো গরম হাওয়া দেয় কিন্তু রাত্রির মাঝামাঝি থেকে রীতিমতো ঠাণ্ডা। এবারে হয়তো কোথাও যেতে হবে না। যদি দুঃসহ হয় তাহলে মৈত্রেয়ীর আশ্রয় নেব, সে খুব অনুনয় করচে। রাণীরা হয় তো সিমলের নীচের পাহাড় ধরমপুরে যাবে—প্রশান্ত আমাকে যেতে বল্‌চে—কিন্তু অতদূরে গরমের সময় রেলে করে যাবার সখ আমার নেই। খুব সম্ভব আমার শ্যামলীতেই চরম গতি। ওটাকে গোছাতে গাছাতে সময় লাগবে তো।—উদয়নে আছি—তোমার boudoirএ আমার শোবার ঘর—তার পাশের বড় ঘরটাতে লেখার টেবিল পড়েছে সেইখানে বসে লিখচি। গাঙুলি খুব খবরদারি করচে। শরীর মোটের উপর ভালোই। ইতি ১ বৈশাখ ১৩৪২

বাবামশায়

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বেছে বেছে এই বছর তোমরা বিলেতে গেছো যে-হেতু তোমাদের ভাগ্য ছিল সুপ্রসন্ন। দীর্ঘকাল বৃষ্টি নেই, বাতাস শুকনো, গরম ক্রমেই চড়ে যাচ্চে--থেকে থেকে ঝড় আসচে, ধূলো উড়চে, মেঘও করে পূর্ব্বে পশ্চিমে, বৃষ্টি হয় না, বাড়ির চাল উড়ে যায়, গাছ পড়ে যায় রাস্তায়। আমি চিরদিন গরমকে উপেক্ষা করে এসেছি, এবার আমার অহঙ্কার টিকল না—কোথায় যাই কোথায় যাই করে উঠল প্রাণপুরুষ, অনেক চিন্তা করে করে শেষকালে আশ্রয় নিয়েছি বোটে। প্রবীণ লোকেরা নানাপ্রকার ভয় দেখিয়েছিল, মানি নি। উত্তরপাড়ায় বোট বাঁধা ছিল, সেখান থেকে প্রথমে গেলুম শ্রীরামপুরে, কুণ্ডদের বাড়ির ঘাটে, সেখানটা বাসের অযোগ্য। অবশেষে এসেছি ফরাসডাঙায়। প্রথম দিন ছিলুম স্ট্র্যাণ্ড রোডের সামনে, সেখানে দলে

দলে লোক সমাগম হতে লাগল। সেখান থেকে বোট হটিয়ে নিয়ে এখন যেখানে আছি ঠিক এর সামনেই সেই দোতলা বাড়ি, যেখানে একদা জ্যোতিদাদার সঙ্গে অনেকদিন কাটিয়েছি। সে বাড়িটা অত্যন্ত বেমেরামতী অবস্থায়। তার পাশেই একটা একতলা বাড়ি আছে, সেখানে আপাতত আছেন মিসেস মিত্র—তোমরা তাঁকে এবার দেখেছ শান্তিনিকেতনে—বুড়ি তাঁকে জানে কোন্ একজনের রাঙাকাকী বলে। তিনি আর দিনকয়েক পরে চলে যাবেন তখন ঐ বাড়িটা ভাড়া নেব—জুন মাসটা ওটা হাতে রাখতে চাই—ভাড়া ৬০ টাকা। তোমাদের মামা বোধ হয় তাতে খুব বেশি উদ্বিগ্ন হবেন না। বোটে ভালোই লাগচে—জলের উপর দিয়ে হাওয়া আসে অনেকটা তাপ বর্জ্জন ক'রে। এ পর্য্যন্ত লোকজনের উৎপাতও প্রবল হয় নি। তেলেনি পাড়ার বাঁড়ুজ্জে জমিদার আমাকে একটা পাথরের টেবিল ধার দিয়েছেন সেইটে অবলম্বন করে তোমাকে চিঠি লিখচি। এ বোটে শোওয়া বসা খাওয়া নাওয়ার সকলরকম ব্যবস্থাই আছে, কেবল লেখবার প্রয়োজনকে একান্তই উপেক্ষা করা হয়েছিল—যে টেবিলটা বসবার ঘরের কেন্দ্রস্থল অধিকার করে বিরাজমান, সরস্বতীর চরণকমল

পেরিয়ে গিয়ে আরো অনেক নীচে তার পৃষ্ঠদেশ, কলমচালনার পক্ষে একটুও সুবিধাজনক নয়। ··· ···

[১৯৩৫] বাবামশায়

(৪৮)

বৌমা,

নবীন ভালো রকম উৎরেচে শুনে খুসি হলুম। শাপমোচন সম্বন্ধে উদ্বেগ আছে। পড়বে কে? সাগর? তাহলে কি শাপের মোচন হবে, না সেটা আরো জড়িয়ে ধরবে। স্বর্গে তালভঙ্গ হয়েছিল বলেই তো অভিশাপ, তোমরা মর্ত্ত্যে যদি সেই কীর্ত্তি কর তাহলে তো উদ্ধার নেই। একবার ভাবলুম স্বরেনের দলে জুটে স্বয়ং ওখানে অবতীর্ণ হই। এখানে নানা কাজ আছে বলে হয়ে উঠ্‌ল না। দালিয়াটা ভালো লাগল না। মায়াব খেলায় প্রথম দিন অনেক ত্রুটি ছিল দ্বিতীয় দিন নিখুঁৎ হয়েছিল—লোকের ভালো লেগেছে। তোমরা যেবার করেছিলে সেবারকার মতো অত ভালো হয়নি। আমি কলকাতায় এখনো নানা জালে জড়িয়ে আছি—ছাড়াতে পারচিনে। কথা আছে আগামী মঙ্গলবারে ফিরব—নিশ্চিত বলা কঠিন। আগামী রবিবারে রানী প্রশান্তর বিবাহের সাম্বৎসরিক তিথি। একটু ধূম করে উৎসব

করবে। অসিতের বাড়িতে আদর যত্ন পাচ্চ তো। আমার শান্তিনিকেতনে যেতে মন সরে না—যত্ন করবে কে? একটা সুবিধা হয়েছে রথী যে মশা তাড়াবার পাউডার করেছে সেটাতে সত্যিই মশা নিবারণ করে। বরানগরের সন্ধে বেলাতে মশার ভিড়ের মধ্যে পরীক্ষা করেছি একটা মশাও রক্ত পায়নি—গন্ধেই দেয় দৌড়। কাল রাণুরা এসেছিল তারাও আশ্চর্য্য হয়েছে। পুপু-মণির খবর কি।

[১৯৩৫] বাবামশায়

(৪৯)   ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, রাজধানীর উৎপীড়নে হাঁপিয়ে উঠল প্রাণ, পালিয়ে এলুম।

এখানে শরতের চেহারা ফুটে উঠেছে—হাওয়ায় একটুখানি হিমের ছোঁওয়া দিয়েছে, রোদ্দুর কাঁচা সোনার রঙের—গাছপালা চারদিকে ঝিলমিল করচে।

নতুন বাড়িতে মিস্ত্রির আক্রমণ। অবশেষে উদয়নে আশ্রয় নিতে হোলো—হয়তো আরো দিন পনেরো এইখানেই স্থিতি। বৃহৎ পুরী শূন্য। এখান থেকে যখন বেরিয়েছিলুম তখন প্রতি সন্ধ্যাবেলা তোমার সূর্য্যাস্ত প্রাঙ্গণ নূপুরে মুখরিত ছিল এখন "নীরব রবাববীণা মুরজ মুরলী।" কেবল মনে হচ্চে দুঃসাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছিলুম, ভুল করেছি। আমার নৃত্যসাধনা গীতচ্ছন্দে উর্ব্বশীদের মহলে কোনোদিন আসন পাব না। অতএব এখন থেকে তাঁদের সেলাম জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি। যে গানের আসর আমার আয়ত্তের মধ্যে, আন্দাজ করচি

সেখানে রসের অভাব ঘটেনি। সেইটুকুতে কিছু পরিমাণ খুসি করতে পেরেছিলেম। এইবার ছুটি। তোমার শরীরের জন্যে আমার মন সর্ব্বদাই উদ্বিগ্ন থাকে। আমার বিশ্বাস, এখন ক্রমে শীতের হাওয়া পড়্‌বে এই সময়ে অন্তত মাসখানেক বোটে করে চরে যদি থাকতে পারো তাহলে সুস্থ হতে পারবে।

আমি কিছুদিন পতিসরের বোটে পদ্মায় ভাসব স্থির করেছি—সে বোটটা আমার ভালো লাগে। ইতি ১৩ আশ্বিন ১৩৪৩

বাবামশায়

(৫০)　　　　　ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা তুমি পুরী যাচ্চ ভালোই হয়েছে। সেখানে কিছু দীর্ঘকাল থেকে শরীরটা ভালো করে সেরে এসো।

আমি এখানে ভালোই আছি। বোধ হচ্চে অনতিবিলম্বে শীত পড়বে।

চিত্রাঙ্গদার রিহর্সল চলচে। এর নাচের অংশ সম্বন্ধে বিচার করা আমার পক্ষে শক্ত। শান্তি আছে সে একরকম ঠিক করে নেবে।

বুড়ি এখনো কলকাতায় আছে। ডাক্তার দেখাতে হবে বলে আটকা পড়ে গেছে। কী হোলো তার বুঝতে পারচিনে।

স্টেট্‌স্‌ম্যানে পরিশোধের যে বড়ো সমালোচনা করেছে সেটা পড়ে মন কতকটা আশ্বস্ত হোলো। সমস্ত খুঁটিনাটি সাধারণে দেখতে পায় না, মোটের উপর ভালো লাগলেই হোলো।

এখানে সবাই পরিশোধ দেখতে চাচ্ছিল। বুড়ি

ছুটির আগে এসে পৌঁছল না অতএব ওটা স্থগিত রইল

ইতি ২৯ আশ্বিন ১৯৩৬

বাবামশায়

৯

বৌমা পুরীতে গিয়ে তোমার শরীর ভালো আছে শুনে খুসি হলুম। আমিও হাওয়া বদল করবার জন্যে কাল পরশুর মধ্যে বেরিয়ে পড়ব। আমি যাচ্চি বাস্-এ চড়ে লেনর্ড্ রোড বেয়ে স্রুলে শ্রীনিকেতনের তেতালার ঘরে। সেখানে চারিদিকে পরিপুষ্ট ধানের ক্ষেতে সবুর্জ রঙের সমুদ্র। পুরীর সমুদ্রের চেয়ে কম নয়। সেই তেতালার বাসা এককালে আমারি ছিল। জীবনে কতবার কত বাসাই বদল করেছি। নতুন বাড়িতে এখনো মিস্ত্রির উৎপাত লেগেই আছে, ধূলো উড়চে, দুমদাম শব্দ চলচে।

বিজয়ার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করো। কাল আশ্রমের লোকেরা প্রণাম করতে এসেছিল। ১২০ জনকে জলযোগ করিয়েছি—অবশেষে তিন জনের খাবার কম পড়েছিল।

রথীরা এসেছে—মীরা এসেছে। বুড়ি ভালোই আছে।—বাতাসে ঈষৎ ঠাণ্ডার আভাস দিয়েছে। মিস্

বস্‌নেক্ থাকেন রাণীর বাড়িতে—তুচারটি ছাত্রী এখনো আছে আশ্রমে। ফরাসী যুবকেরা আছে প্রান্তিকে।
ইতি একাদশী ১৩৪৩

বাবামশায়

(৫২)   ওঁ

বৌমা

কাল তোমাকে চিঠি লিখেছি হেনকালে আজ তোমার চিঠি পেয়ে মনটা অত্যন্ত নিশ্চিন্ত হয়েছে। আমার সাম্প্রতিক খবর হচ্চে, সুরুলের বাড়িতে তেতলায় চড়ে বসেচি। ভালো লাগচে— আকাশ খুব কাছে এসেছে, আলোর বাধা নেই কোথাও, লোকজন সর্বদা ঘাড়ের উপর এসে পড়চে না।

কাল থেকে আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন, টিপটিপ্ করে বৃষ্টি পড়চে। বাদলা এমনি গট হয়ে বসেচে যে নড়বার মতো কোনো তাড়া নেই— বিদায় হলে বাঁচি।

এখানে এসে স্থির করেছি মাঝে মাঝে আকাশের সঙ্গে মিতালি করবার জন্যে শ্রীনিকেতনের প্রাসাদশিখরে আশ্রয় নেব। এরা একটা ভদ্র রকমের সিঁড়ি গেঁথে দেবে কথা দিয়েছে। ইতি ২৭।১০।৩৬

বাবামশায়

(৫৩)　　　　　　　ওঁ

কল্যাণীয়াসু বৌমা

কোথায় এসেছি বুঝতে পারচিনে। কাল সকালে পৌঁচেছি আত্রাই স্টেশনে। ম্যানেজার ছিলেন, আর ছিল দুটো ডিঙি আর আমার বোট। তোমার মাতুল সেই মুহূর্ত্তে পাল্কী চড়ে মাতুলানীর অভিসারে রওনা হলেন। ভাবলেম আগে থাকতে গিয়ে আমার জন্যে যথোচিত অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করবেন। রাত নটার সময় শূন্য নির্জ্জন নিরালোকিত ঘাটে বোট এল। আমি তখন একলা বসে হাত পা চালনা করচি। খবর দিলে এইটেই পতিসরের ঘাট—জানতেই পারিনি। মাতুল ক্ষণকালের জন্যে এসে তিরোহিত। বেচারা সুধাকান্ত ভাবলে সেখানে গেলে আহার আরামের সুবিধা হবে। কী দুর্ঘটনা হোলো তার কাছেই শুনতে পাবে। সুখের কথা এই যে মশা নেই, দুর্যোগ নেই, বিশেষ গরম নেই। তাই রাত কাটল ভালোই। সকালে বনমালীকে ডেকে কিঞ্চিৎ চা খেয়ে নিয়েছি। আটটা বেজে গেছে

লোকজন কেউ কোথাও নেই। ভাগ্যে আছে কালু আছে বনমালী এবং দুঃখরাত্রির অবসানে এসে পৌঁচেছে সুধোড়িয়া তাই বুঝতে পারচি এটা চন্দ্রলোক নয়, এখানে প্রাণীর চিহ্ন খুঁজলে পাওয়া যায়। 'পুনশ্চ' থেকে উদয়নে যাত্রা করলেও যেটুকু চাঞ্চল্য অনুভব করি এখানকার হাওয়ায় তাও নেই। এখানকার খবর এই পর্য্যন্ত। ক্রমশ আরো কিছু খবর জমবে কি না জানিনে। আজ শুনতে পাই পুণ্যাহ, যদি সত্য হয় তাহলে আজ বোধ হয় ছুটি পাব না। কাল বৃহস্পতিবারে উল্টোরথে হতভাগা জগন্নাথ স্বভবনে যাত্রা করবেন। শুক্রবারের গাড়ি ধরে শনিবারে কলকাতায় পৌঁছব। তার পরে স্বস্থানে। বর্ষামঙ্গলের আয়োজন আশা করি এগোচ্চে। সরাইখেলের নাচ আমরা চাইলেই নিজের খরচে পাঠিয়ে দেবে এমন সংবাদ পেয়েছি। সে চেষ্টা করতে দোষ কী। জিনিষটা মোটের উপর দর্শনীয়।

শুনচি প্রজারা বৃহস্পতিবারে দেখা করতে নারাজ। শুক্রবারে ধরে রাখবে, তাহলে রবিবারের পূর্ব্বে যাওয়া ঘটবে না।

[১৯৩৭] বাবামশায়

(৫৪)

বৌমা, বর্ষামঙ্গলের জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত। ... সঙ্গীত বিভাগের এই কাজটা তোমার, দায়িত্ব তোমারই। গান, নাচ, এবং যন্ত্র সঙ্গীতের প্রোগ্রাম তোমাকেই তৈরি করতে হবে। ডিগ্রি নেওয়ার দুষ্কর কর্তব্য আমিই সেরেছি—সঙ্গীত বিভাগের দুঃসাধ্য কাজ তোমারই পরে নির্ভর করচে। তিন পক্ষকে তোমার সামনে একত্রে বসিয়ে কর্মসূচি যদি বানিয়ে তোলো তাহলে জিনিষটা মানানসই হতে পারবে।

[১৯৩৭] বাবামশায়

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, এখানে বসন্ত উৎসবের জন্যে ধরেছে সবাই। সেটা হবার কথা ১৬ই তারিখে। সুতরাং এখন কলকাতায় গিয়ে আবার ফিরে আসার দুঃখ বাঁচাতে চাই। এইজন্যেই, বারে বারে যাতে জন্মের গোলকধাঁদায় আনাগোনা না করতে হয় আমাদের দেশের ভবভয়-ভীরুরা শান্ত হয়ে বসে তার সাধনা করে থাকে। আমিও আপাতত শান্ত হয়ে রইলুম। বিশেষত শোনা গেল খুলনা থেকে ফিরতি যাত্রীদের সঙ্গে তুমিও এখানে দিন তিনেক কাটিয়ে যাবার সংকল্প করেছ। তাহলে তোমার সঙ্গে চণ্ডালিকা অভিনয়ের পরামর্শ করবার যথোচিত অবকাশ পাওয়া যাবে। এই সময়ে কলকাতা সহরে বা তার নিকটবর্ত্তী কোনো জায়গায় আমার অবস্থিতি লোকের কাছে এত শঙ্কাজনক হয়ে উঠেছে

যে তাদের মনের শান্তি রক্ষার জন্যে এই নিরেনব্বই মাইল দূরে আমার থাকাই শ্রেয়।— গঙ্গাতীরের একটা বাসার সন্ধান নিতে ছেড়ো না। কুষ্ঠিতে আছে আমার মীন রাশি। জলের বাসার জন্যে মন কেমন করে।

কিছুদিন আগে তিনটে উড়ো টাকা আমার পকেটের মধ্যে ঢুকেছিল। সরস্বতীর সঙ্গে আড়াআড়ি করে লক্ষ্মী আমার পকেটে বাসা বাঁধতে চিরদিনই আপত্তি করেন। সেই ঈর্ষাপরায়ণা দেবীর অপদৃষ্টির ভয়ে টাকা তিনটে দিয়েছিলেম আমাদের উপায়-সচিবের হাতে। বলেছিলুম চকোলেট কিনে দিতে—আমি মেয়েদের খুসি করব মাঝে মাঝে তাদের হাতে হাতে বিতরণ করে। সেই প্রতিশ্রুত চকোলেটের বাক্স যদি কোনো গতিকে আমার দখলে আসে তাহলে ওরা যখন এখানে আসবে ওদের পুরস্কার দেব এই মৎলব আমার রইল—দেখি শেষ পর্য্যন্ত সেই তিনটে টাকার কী রকম সৎকার হয়।

আর একটা কথা—খুকু যদি দোল উৎসবের সময় এখানে আসতে পারে তাহলে কাজে লাগবে—তার খবর পাবে কিশোরীর কাছ থেকে—যদি আসে তার ভাড়াটা তাকে দেওয়া উচিত হবে।

তোমার অনুপস্থিতিতেই চণ্ডালিকার অনেক কাটা-

ছাটা করতে হয়েছে—তোমার মঞ্জুরির অপেক্ষায় রইলুম। ইতি ৭।৩।৩৮

৭

বাবামশায়

বৌমা

আর চলল না, কাজের ক্ষতি হচ্চে। ভেবেছিলুম দলের সঙ্গে একত্রে যাত্রা করব কিন্তু তাদের দিনক্ষণ কেবলি পিছতে থাকল। মহাভারত লেখার ভার স্বীকার করে নিয়েছি—অবিলম্বে শুরু করতে হবে। ৭ই তারিখে অর্থাৎ পর্শু সোমবারে শুভক্ষণ দেখে বেরিয়ে পড়ব। সেদিন জোড়াসাঁকোয় তোমার সঙ্গে আলোচনা শেষ করে যাব বেলঘরিয়ায়। সুধোড়িয়াকে বোলো যথাসময়ে হাওড়া স্টেশনে উপস্থিত থেকে যথোচিত নিয়মে আমার অভ্যর্থনা করে।

সেদিন গ্রন্থাগারের প্রাঙ্গণে চণ্ডালিকার অভিনয় দেখে বোঝা গেল ওর নাটকীয় নিবিড়তা অনেকখানি নষ্ট হয়েছে। বাহুল্য নাচ গান বর্জন করা দরকার বোধ হোলো। সেগুলি স্বতন্ত্র ভাবে যতই ভালো হোক সমগ্রভাবে বাধাজনক। এ সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে আলাপ করব।

আজ গরমের প্রচণ্ডতা দেখে একটা আসন্ন ঝড়ের প্রবলতার আশঙ্কা করচি। এই ঋতু পরিবর্তনের মুখে পূর্ব্ববঙ্গে ঝড়ের সম্ভাবনা চিন্তার বিষয়।

মেয়েগুলোকে পথের মধ্যে রওনা করে দিয়ে মন আমার কিছুতে সুস্থির থাকবে না। উত্তর পশ্চিম কোণে আজ মেঘের ষড়যন্ত্র দেখা যাচ্চে। হঠাৎ হয়তো দিনাবসানে আকাশে কাল বৈশাখীর প্রথম রিহর্সল বসবে।

তোমার শরীরের খবর ভালো বলেই শুনতে পাই। আমি যাতে ছায়ার ছায়া না মাড়াই বিবি তাই নিয়ে দোহাই পাড়চে। আমার দেহ বিকার সম্বন্ধে লোকেরা একটা অপরাধী খাড়া করেছে, তাকে অস্পৃশ্য করে তুলে অনেকটা সান্ত্বনা পেয়েছে। ইতি ৫।৩।৩৮

বাবামশায়

(৫৭)　　　　　ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, চমৎকার জায়গা, বাড়িটা তো রাজবাড়ি—স্পষ্ট বোঝা যায় ছিল ইংরেজের বসতি—তকতক করচে, কাঠের মেঝে, আসবাবগুলো পরিষ্কার, উপভোগ্য,—উপরে নিচে ঘর আছে বিস্তর, বিছানা আনবার দরকার ছিল না। মৈত্রেয়ী যখন বল্‌লে একটা কথা দিতে হবে, ছুটির শেষ পর্যন্ত থাকতে হবে, কথা দিতে বিলম্ব হোলো না। তাহলে মাঝে মাঝে তোমাকে কিন্তু আসতে হবে। পরীক্ষা করে দেখো শরীর কী রকম থাকে। তুই একদিন থাকলে বোধ হয় খারাপ লাগবে না। এখানে সুরেন সুধাকান্ত সকলেরই অনায়াসে জায়গা হতে পারবে। কালিম্পঙের ঘরের দাবী আমি ছেড়ে দিচ্চি, ওখানে বরঞ্চ অমিতা কিম্বা তোমার কোনো সখীকে আনিয়ে নিতে পারো। তোমার শরীর কেমন আছে লিখো। কেলি সাল্‌ফ্ আর ম্যাগনেসিয়া ফস্ খেয়ো। তোমার খোকা কুকুরটাকে দিনে তিন চারবার

করে নেট্রম ফস চার বড়ি খাইয়ো। এখানে যত্নের ত্রুটি হচ্চে না। আরো কম হলে চল্‌ত। তোমার জন্যে ভিশি ওয়াটার এক গাড়ি বোঝাই আনিয়ে রেখেছে।
৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫

[স্বরেল, মংপু] বাবামশায়

(৫৮) ওঁ

কল্যাণীয়াসু

না বৌমা, এখানে তোমার এসে কাজ নেই। তোমার শরীরে সইবে না। এখানকার আকাশ বাতাস জলে ভরা— তোমার পক্ষে হয় তো স্বাস্থ্যকর নয়। আমার কোনো অসুখ বা অসুবিধা নেই—ব্যবস্থা ভালোই, সেবাও অক্লান্ত, লোকেরও ভিড় নেই। এখানে লেখার কাজটাও অবাধে চলবে বোধ হচ্চে। মাঝে মাঝে যখন রোদ্দুর ঝলমল করে ওঠে সেটাকে আশার অতীত বলে বোধ হয়। শোনা যায় এই বৃষ্টির উপদ্রব এখানে জ্যৈষ্ঠমাসের পক্ষে স্বাভাবিক নয়—তাই আশা করচি দুর্য্যোগটা সাময়িক। কাল রাত্রে মুষলধারে বর্ষণ হয়ে গেছে, সকালে ঘন কুয়াষায় চারদিক ঢাকা ছিল এখন মেঘ কেটে গিয়ে আকাশ প্রসন্ন হয়েছে। তোমাদের ওখানেও নিঃসন্দেহ বৃষ্টি বাদল ক্ষণে ক্ষণে দেখা দিয়েছে। তোমরা সবাই, বিশেষত তুমি, ভালো আছ আশা করা যাক্। গ্যাণ্টকে যদি যাওয়া স্থির হয় বনমালীকে ভুলো

না। এখানে তার কোনো কাজ নেই, তবু তার মতে কালিম্পঙ এখানকার চেয়ে উৎকৃষ্টতর। বোধ করি উমেশ ও হরিপদর বিচ্ছেদ মনে অবসাদ এনেছে। সুধাকান্ত যত বকচে তত খাচ্চে না। যদি তোমার দরকার না থাকে সেই হজমি চাটনিটুকু পাঠিয়ে দিয়ো। ইতি ৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫

[মংপু] বাবামশায়

বৌমা

আমাকে ওখানে যেতে লিখেছ। চিঠি আজই পেলুম। সেই ডাকেই খবরের কাগজে দেখা গেল কালিম্পঙের রাস্তা আর দার্জিলিঙের রাস্তায় গতিবিধি বন্ধ। গণৎকার বলেচে তুই এক মাসের মধ্যে আমাকে উড়োজাহাজে ভ্রমণ করতে হবে। সন্দেহ হচ্চে কালিম্পং যাব উড়োজাহাজে করে। এদিকে বর্ষামঙ্গলের জন্যে পরিশোধের রিহর্সল চলচে, তুমি নেই, তাই চলচে না বলাই উচিত—চালাবার মতো তেজ আমার দেহে মনে নেই।— যথাসময়ে তোমার সেই লেখাটি পেয়েছিলুম। তার নাম দেওয়া যেতে পারে দিলীপী জিলিপী। ওর মধ্যে কিছু ঢাকাঢুকি নেই— বেরলে ডুয়েল লড়াইয়ের আশঙ্কা আছে।

রাস্তা যদি পাই তো নিশ্চয় যাব কালিম্পং—কিন্তু বর্ষামঙ্গলের দলকে ভাসিয়ে দিয়ে যেতে পারিনে।

মৃণালিনী সাজচে বজ্রসেন—একটুও সুবিধে ঠেকচে না ভালো লাগচে না। ইতি ২৪।৮।৩৮

বাবামশাই

বৌমা

আজ গান্ধী জয়ন্তী হয়ে গেল। সকালে মন্দিরে তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলতে হয়েছে। এদিকে কিছু দিন থেকে যে প্রাত্যহিক ঝড় বৃষ্টির আয়োজন হয়েছিল সেটা নিঃশেষ হয়েছে। আজ সকাল থেকে উজ্জ্বল রোদ্দুর— চারদিকে আকাশে ছড়িয়ে পড়া শরতের সাদা সাড়ির আঁচলা ঝলমল করচে। এবার আবার একবার হাওয়ায় লাগবে গরমের ঝাঁজ, তবু তার উগ্রতা অসহ্য হবে না। খেয়ে এসে বসেচি, এখন বেলা এগারোটা—ফুরফুর করে হাওয়া দিচ্চে—পাহাড়ে চড়ে বসে এখানকার শারদশ্রীর মাধুর্য্য বোধ হয় মনে আনতে পারচ না। আর কিছুদিন পরে ঠাণ্ডা যখন স্থায়িত্ব নেবে তখন যাব গঙ্গার ধারে—আকাশের সাদা মেঘের সঙ্গে পাল তোলা নৌকোর পাল্লা দেওয়া দেখা যাবে। আমার মন অচল পাহাড়ের দিকে যায় না আমার মন নদীর ধারার সঙ্গে ছোটে—কাল হবে বর্ষামঙ্গল—শান্তির সঙ্গে

রফা করে নিয়েছি—ভালোই হবে।—সেই সিন্ধি মেয়েটি খুব ভালো নাচচে,—নাচে তার খুব উৎসাহ—অনতি-কালের মধ্যে এ মেয়েটি রাজনটীর দলে ঢুকবে। এবার যখন অভিযানে বেরবে একে পাবে। এ কারো চেয়ে কম নয়।—মংপুতে যত্নে আদরে থাকবে। আমার ভাগ্যে আদর যত্নের কৃপণতা শোচনীয়। ও জিনিষটা এসিস্টেণ্ট পার্সোনাল সেক্রেটারীর হাত দিয়ে যদি পাবার উপক্রম দেখি তবে সকাতরে থামিয়ে দিতে হয়। ইতি ২১।৯।৩৮

বাবামশাই

(৬১)   ওঁ

বৌমা

তুমি যে কাজের ফরমাস করেচ তাতে মন লাগানো বড়ো শক্ত। পর্বত চূড়ায় বসে তুমি ঠিক কল্পনা করতে পারবে না কী রকম একটা অবসাদের মাকড়ষার জালে জড়িয়ে রেখেছে। কাজ করতে যাই, কেবলি গড়িমসি করতে থাকি। তা ছাড়া তোমার ফরমাসের সঙ্গে আমার সেক্রেটারি সাহেবের প্লানের মিল হচ্চে না। তিনি একটা খুব লম্বা সূচি বানিয়েছেন, টাকার বেড়া জাল ফেলবার উদ্দেশে। ডিসেম্বরের শেষ ভাগ থেকে সুরু করে হায়দ্রাবাদ মৈসোর জামসেদপুর ইত্যাদি ইত্যাদি সহর ঝেঁটাতে ঝেঁটাতে চলতে হবে। তাঁর লক্ষ্য চিত্রাঙ্গদার পরে— দাক্ষিণাত্যে ঐ নাট্যের কোনো পরিচয় হয় নি। নতুন রচনা নিয়ে নতুন জায়গায় পরীক্ষা করতে সাহস হয় না।

আশ্রম এখন শূন্য। অনিল অনিলানী দেশে গেছে।

সুধাকান্ত কলকাতায়। বুড়িকৃষ্ণ আর অমিয় আছে। ইতি ২৮।৯।৩৮

বাবামশাই

শুনচি মমতার শীঘ্রই বিয়ে হয়ে যাবে।

(৬২)　　　　　　　　ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, ডাক্তারি বইয়ে হাঁপানি রোগের অধ্যায়টা পড়ে দেখছিলুম। তার মধ্যে একটা কথা দেখলুম সেটা তোমাকে মনে রাখতে হবে। লিখেচে পোষা জন্তু-জানোয়ারের সম্পর্ক পরিহার করা কর্ত্তব্য। শরীরের খাতিরে বোধ হয় তোমাকে বাঁদরের মায়া কাটাতে হবে। এ ছাড়া আরো অনেক আলোচনা আছে, typist থাকলে কপি করে তোমাকে পাঠাতুম। ওখানে গিয়ে বোধ হয় টেডি কুকুরের সঙ্গেও আবার তোমার পরিচয় আরম্ভ হয়েছে। এখানে বুড়ি এক কাঠবিড়ালি পুষেচে সে দিনরাত তার আঁচলের মধ্যে নড়ে চড়ে বেড়াচ্চে, মানুষের প্রতি কোনো ভয় নেই, বেশ মজা লাগে দেখতে।

এখানে এতদিনে ঠাণ্ডা পড়তে আরম্ভ করেচে। পাখা এখন আর চলে না। রোদ্দুরের রংটি কাঁচা সোনার মতো হয়ে এসেছে, হাওয়া দিচ্চে মৃদুমন্দ,

শিউলি ফুলে ছেয়ে যাচ্চে গাছের তলা। সমস্ত আশ্রম শূন্য প্রায়। তবু বাইরে থেকে ছুটি-সম্ভোগীদের দলের আনাগোনা চলচে।

মহাত্মাজী পুপুকে যে পোষ্টকার্ড লিখেচেন সেটা এই সঙ্গে পাঠাচ্চি। সে ওখানে কেমন আছে। যথেষ্ট বেড়াবার জায়গা না পেয়ে বোধ হয় কিছু বিমর্ষ আছে।

আমি ছোট একটা গল্প লিখেছি—উপার্জ্জন করবার লোভে। শুনে নিশ্চয় যোগাযোগের কথা তোমার মনে পড়বে। অত বড়ো লেখায় হাত দেবার মত সাহস ও সময় নেই। চাকরি নিয়েচি, এবারে তারি দায় বহন করতে হবে। বক্তৃতা লেখা সুরু করতে আর দেরি করা চলবে না—কিন্তু ভালো লাগচে না—ছেলেবেলায় যেরকম ইস্কুল পালাবার জন্যে ছটফট করতুম সেই রকম ভাবটা মনে জাগচে।

আমার অ্যাসিস্টাণ্ট ডাক্তারের পসার বাড়চে। হাতে অনেকগুলি রুগী আছে—এখনো একটাও মরে নি।

তোমাদের শরীর ভালো আছে শুনে নিশ্চিন্ত হয়েছি। বিজয়া দশমী ১৩৩৯

বাবামশায়

(৬৩) ওঁ শান্তিনিকেতন

বৌমা

উদয়নে ডাকাত পড়েছে হাল আমলের দেবী চৌধুরাণী। আমার আশা ছেড়ে দাও। শুনলুম মংপু নামে জায়গায় কোনো বঙ্গ মহিলা হিটলারের অনুকরণ করে Concentration Camp খুলেছে। আমাকে ভাবতে সময় দিল না—ছোঁ মেরে নিয়ে চল্‌ল—কালিম্পঙের নাম করলে আঁচল দিয়ে মুখ চাপা দেয়। আমার হাতে এখন পনেরো আনা সম্বল ভদ্রমহিলা তাতেও দমলো না, সেটাও সেই থলিতে পড়বে যাব মধ্যে অদৃশ্য হয়েছে গরীবের দেড় টাকা। আমার এখন নিঃসহায় অবস্থা, যা ভালো মনে করো কোরো। ইতি

[১৯৩৮] বাবামশায়

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, জায়গাটা ঠাণ্ডা সন্দেহ নেই কিন্তু নিচে থেকে যে অবসাদ দেহ বোঝাই এনেছিলুম সেটা এখনো নামাতে পারিনি। এবার বোধ হয় মংপুর নাম রক্ষা হবে না। অন্যান্য বার পাহাড় প্রদেশে কলম চলত ভালোই— এবার সে কোনোমতে খুঁড়িয়ে চলচে। পালে হাওয়া লাগচে না—মন রয়েছে বিমুখ। গল্প এক আধটা লিখব প্রতিশ্রুত ছিলুম—তাই লিখতে বসেছি—থম্‌কে থম্‌কে লেখা—মাঝে মাঝে অনেকখানি না লেখা ধূসরতা। পাহাড় ডিঙিয়ে শরতের বাঁশির সুর এসে পৌঁছচ্চে শান্তিনিকেতনের নানা রঙের আলপনা দেওয়া দিগন্ত থেকে এখানকার শৈলমালার স্বপ্নে দেখা আবছায়া নীলিমায়। তোমাদের যে বর্ত্তমান পরিস্থিতি তাতে আস্‌তে বল্‌তে পারিনে। যাক আরো কিছুকাল—যদি সুযোগ ঘটে এসো—স্থানাভাব ঘটবে না—রাত তিনটে পর্যন্ত বাক্যালাপ চলবে। মেয়েদের গৃহ নির্ম্মাণের কথা

লিখেছ, কিন্তু ফাউণ্ডর প্রেসিডেন্টের বাসার কী খবর? লিখতে ঘাড় ব্যথা করে ক্লান্তি আসে অতএব আশীর্বাদ করে কেদারায় হেলান দিয়ে পড়িগে। ২১।৯।৩৯

[মংপু] বাবামশায়

(৬৫)   ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, তোমার চিঠিখানি পড়ে মন খুব খুসি এবং নিশ্চিন্ত হয়েছে। অবাধে তোমাদের সংকল্প সিদ্ধ হোক এই কামনা করি। উপসংহারে বিলম্ব না হয় এই ইচ্ছাটাই মনের মধ্যে ঘুরচে।

আমাদের এখানে শীত খুবই তীব্র হয়ে উঠচে—রৌদ্র হয়ে এসেছে বিরল, মেঘে কুয়াশায় আকাশ রয়েছে আচ্ছন্ন। সর্ব্বাঙ্গে এক রাশ কাপড় জড়িয়ে মনে হচ্চে যেন বারো আনা বিলুপ্ত হয়ে আছি। দেহটা মুক্তি কামনা করচে। মোটের উপর স্বাস্থ্য ভালই। এখানে এসে রথীর স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে। এ জায়গায় আছি আর দিন দশেক। ৫ই নবেম্বরে দেব দৌড়। ততদিনে হেমন্তকাল সোনার ধান পাকিয়ে উপভোগ্য হবে। আমার নতুন বাড়ির গাঁথুনি চল্‌চে—তারজন্যে কৌতূহল আছে মনে। বনমালীর জন্যেও উৎসুক আছে মন।

আমার একটা নতুন গল্প শেষ হয়ে গেছে পুপুকে আশীর্বাদ জানিয়ো। ইতি ২৫।১০।৩৯

বাবামশায়

বৌমা তোমাদের বাড়িটা দেখি। শূন্য হাঁ হাঁ করচে। না আছ তুমি, না আছে রথী—প্রধান ব্যক্তি যে আছে সে হচ্চে নাথু।

নিদারুণ শরতের তাপ আকাশে এসেছে। কৃপণ বর্ষণ কালো মেঘের ভিতর থেকে সমস্ত পৃথিবীকে অভিশাপ দিচ্চে। হংস বলাকার দলে যদি নাম লেখা থাকত তাহলে উড়ে চলতুম মানস সরোবরের দিকে, মংপুতে মাগুর মাছের সরোবর তীরেও হয় ত শান্তি পাওয়া যেতে পারত। মধ্য সেপ্টেম্বরের প্রতীক্ষায় রইলুম। গল্পটা শেষ হয়ে গেছে—এখন তাতে প্লাস্টার লাগাচ্চি।

আজ রাত্রে দেবতা যদি প্রসন্ন থাকেন তাহলে গ্রন্থাগার প্রাঙ্গণে বর্ষামঙ্গল হবে। সকালে বৃক্ষরোপণ হয়ে গেছে।

আমার শরীরে ভালো মন্দর জোয়ার ভাঁটা চলছিল। সম্প্রতি ভালই আছি।

মংপুতে যাবার পূর্বে একটা কথা বলে রাখা ভাল। আহার্যের খরচ সম্প্রতি বেড়ে গেছে।

শাকপাতা খাচ্ছিলুম অবশেষে ডাক্তারের পরামর্শে মাছ মাংস ধরতে হয়েছে। আমার সম্বলের মধ্যে শুনচি তোমার কাছে টাকা দশেক প্রচ্ছন্ন আছে। সেটাতে ক'দিন চলবে জানিয়ো—সেই অনুসারে ওখানকার মেয়াদ স্থির করতে হবে।

মংপবীকে আশীর্বাদ জানিয়ো

[১৯৩৯-১৯৪০] বাবানশায়

(৬৭) ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, তোমার কাছে ছেলেমানুষের মতো নালিশ করতে লজ্জা বোধ হয়, কিন্তু আমাকে তোমরা চাপাচুপি দিয়ে ছেলেমানুষ করে রেখেছ, নিরুপায় ভাবে পরনির্ভরতা বহন করচি। একটা দৃষ্টান্ত দিই। পাহাড়ে আসব, জিনিষপত্রের ভার ছিল কানাইয়ের উপর, সে যথেষ্ট বুদ্ধিমান ও সতর্ক। হঠাৎ এক সময়ে আলু এসে আমার আসবাবের এক অংশ ঝড়ের মতো ওদের কাছ থেকে ছিনিয়ে জোড়াসাঁকোয় নিয়ে গেল। তাই নিয়ে বনমালী নিষ্ফল উদ্বেগ প্রকাশ করছিল। ষ্টেশনে এসেও ও তাদের তাড়া দিয়ে বল্‌লে সব ঠিক আছে। তারপরে এখানে এসে পৌঁছে ক্লান্ত দেহে সমস্ত সকাল বেলা হারানো জিনিষের জন্যে খোঁজ করে আবিষ্কার করা গেল সেগুলো পৌঁছয়নি। তার মধ্যে ওষুধপত্র সাবান প্রভৃতি ছিল, সে জন্যে ভাবি নে, কিন্তু লোকশিক্ষা সংসদের জন্যে পশুপতি ডাক্তারের লিখিত manuscript এবং সুকুমার

সেনের রচিত দুখানা বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধীয় বই তার সঙ্গে অদৃশ্য হয়েছে। সেই দুখানা বইয়ের মধ্যে একখানা সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হয় নি—আমি সুনীতিকে বারবার আশ্বাস দিয়েছি হারাবার ভয় নেই, এবং, আমি সে বই মন দিয়ে পড়ব।— দোহাই তোমাদের, আমার অভিভাবকের সংখ্যা কমিয়ে দাও; আমার জীবনযাত্রার প্রয়োজন খুব স্বল্প, একজনের উপর দায়িত্বভার দিলে এ রকম দুর্ঘটনা ঘটে না। আপাতত অন্তত ঐ বই তিনখানা যদি উদ্ধার করে পাঠাতে পার, আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি। বাকি সমস্ত খবর সুধাসমুদ্রের কাছ থেকে পাবে। ইতি ২২।৪।৪০

বাবামশায়

পরিচয়

অজিত—অজিত কুমার চক্রবর্তী

অজিন—শ্রীঅজিনেন্দ্র নাথ ঠাকুর

অনিল—শ্রীঅনিলকুমার চন্দ

অপূর্ব—শ্রীঅপূর্বকুমার চন্দ

অবন—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অমিতা—শ্রীঅজিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী

অমিয়—ডক্টর অমিয় চক্রবর্তী

অমিয়র মা—অনিন্দিতা দেবী

অমূল্যবাবু—শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ বিশ্বাস

অরবিন্দ (পৃ: ৬০)—শ্রীঅরবিন্দ

অসিত—শ্রীঅসিতকুমার হালদার

আত্রাই—ঐ নামের নদীসংলগ্ন স্টেশন

আন্দ্রে—শ্রীমতী আন্দ্রে কার্‌পেলে, ফরাসী চিত্রশিল্পী

আরিয়াম—ই, এইচ, আর্যনায়কম্‌, শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন অধ্যাপক

আলু—সচ্চিদানন্দ রায়

আশা—শ্রীমতী আশা দেবী

উদয়ন—উত্তরায়ণের মূল বসতবাটী

উমেশ—ভৃত্য

একজন মহিলা—ম্যাডাম ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো (বিজয়া)

এসিস্টেন্ট পার্সোনাল সেক্রেটারী—শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরী

ওকুরা—জাপানী বন্ধু

কানাই—ভৃত্য

কালীমোহন—কালীমোহন ঘোষ

কিশোরী—কিশোরীমোহন সাঁতরা

কৃষ্ণ—শ্রীকৃষ্ণ কৃপালানী, মীরা দেবীর জামাতা

কুণ্ড—প্রাক্তন ছাত্র, শ্রীব্রজেন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীরামপুর বয়ন-কলেজের অধ্যক্ষ

খুকু—অমিতা সেন

খোকা—নীতীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, মীরাদেবীর পুত্র

গগন—গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

গাঙ্গুলি—প্রমোদলাল গাঙ্গুলি

গোরা—গৌরগোপাল ঘোষ

ঘুরন—ভৃত্য

ছায়া—ঐ নামের চলচ্চিত্রভবন

জ্যোতিদাদা—জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর

জ্ঞান—শ্রীজ্ঞান গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভ্রাতা

ডাল—হগম্যান, আন্দ্রে কার্পেলের স্বামী

তোমার মা—বিনয়িনী দেবী

তোমার মাতুল }
তোমার মামাশ্বশুর } শ্রীনগেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী

দিনু—দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

দ্বিপু—দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ধীরেন (পৃ: ৫৫)—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দেববর্মা

ধীরেন (পৃ: ১০১)—ডক্টর ধীরেন্দ্রমোহন সেন

নগেন (পৃ: ১০, ১৬, ২০)—কনিষ্ঠ জামাতা, ডক্টর নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

নীতু—নীতীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

নীলমণি—ভৃত্য বনমালী, রহস্যচ্ছলে উক্ত

নুটু—রমা দেবী, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ করের পত্নী

পতিসর—ঠাকুরবাবুদের জমিদারী কাছারি

পশুপতি ডাক্তার—ডাক্তার পশুপতি ভট্টাচার্য

পিসিমা—রাজলক্ষ্মী দেব্যা, যশোরের সম্পর্কে কবিপত্নীর পিসিমা

পুনশ্চ—শান্তিনিকেতনের অন্যতম বাসভবন

পুষ্প—পুপের কাল্পনিক বন্ধু

পুপে—শ্রীমতী নন্দিনী দেবী

প্রতাপ—শ্রীপ্রতাপচন্দ্র তলাপাত্র, কর্মচারী

প্রতিমা—শ্রীমতী প্রতিমা গাঙ্গুলী, মীরা দেবীর জা

প্রভাত—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শান্তিনিকেতনের
গ্রন্থাগারিক

প্রশান্ত—শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ

ফাউণ্ডর প্রেসিডেণ্ট—কবি স্বয়ং

বঙ্গমহিলা—শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী

বড়দাদা—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বড়দিদি—সৌদামিনী দেবী

বব্‌লি—মাদ্রাজের ববিলির রাজা

বসনেক, মিস্—শান্তিনিকেতনের শ্রীভবনের প্রাক্তন
ফরাসী পরিদর্শিকা

বামনজি—বোম্বাইয়ের এস. আর. বমনজী

বিচিত্রা—জোড়াসাঁকোর নিজস্ব বাসভবন

বিনয়িনী—বিনয়িনী দেবী, গগনেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা ভগ্নী

বিবি—শ্রীমতী ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী

বুড়ী—শ্রীমতী নন্দিতা দেবী

বুর্ডেট, মিস্—মার্কিন মহিলা

বেলা—মাধুরীলতা দেবী, জ্যেষ্ঠা কন্যা

ভাইস্‌রয়—লর্ড আরুইন

ভিক্টোরিয়া—কুমারী ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো

মংপবী—শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী, মংপু-বাসিনী

মমতা—শ্রীমতী মমতা দেবী, জগদানন্দ রায়ের নাতিনী
মীরা—শ্রীমতী মীরা দেবী, কনিষ্ঠা কন্যা
মুকুল—শ্রীমুকুলচন্দ্র দে
মোবারক—ভৃত্য
রাণী (পৃ: ৫৮)—শ্রীমতী রানী মহলানবিশ,
শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের পত্নী
রাণী (পৃ: ১২৪)—শ্রীমতী রানী চন্দ, শ্রীঅনিল কুমার চন্দের পত্নী
রাণু—স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পুত্রবধূ
রোটেনস্টাইন—উইলিয়ম রোটেনস্টাইন, বিলাতের বিখ্যাত শিল্পী
লীলমণি—ভৃত্য বনমালী, রহস্যচ্ছলে উক্ত
লেনার্ড—এল. কে. এলমহর্স্ট
বনমালী—ভৃত্য
শান্তি (পৃ: ৭৩)—শ্রীশান্তি গঙ্গোপাধ্যায়,
শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভ্রাতা
শান্তি (পৃ: ১২১)—শ্রীশান্তিদেব ঘোষ
শাস্ত্রীমশায়—মহামহোপাধ্যায় শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী
শিলাইদহ—কুষ্টিয়ায় ঠাকুরবাবুদের তদানীন্তন জমিদারী কাছারি
সন্তোষ—সন্তোষচন্দ্র মজুমদার, শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের পুত্র,
প্রাক্তন ছাত্র ও কর্মী
সমর—শ্রীসমরেন্দ্র নাথ ঠাকুর
সুধাকান্ত—শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরী
সুধাসমুদ্র—শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরী
সুধী—ভৃত্য
সুধীরঞ্জন—শ্রীসুধীরঞ্জন দাস, প্রাক্তন ছাত্র, অধুনা কলিকাতা
হাইকোর্টের এডিশন্যাল জজ
সুধোড়িয়া—শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরী
সুনন্দা—শ্রীনগেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরীর কন্যা

সুনীতি—ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
সুরুলের ডাক্তার—ডাক্তার জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
সুরেন—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর
সুহৃৎ—ডাক্তার সুহৃৎনাথ চৌধুরী
সেক্রেটারি—শ্রীঅনিল কুমার চন্দ
হরিপদ—ভৃত্য
হারা-সান—প্রাক্তন জাপানী ছাত্রী
হেমলতা—শ্রীহেমলতা ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ
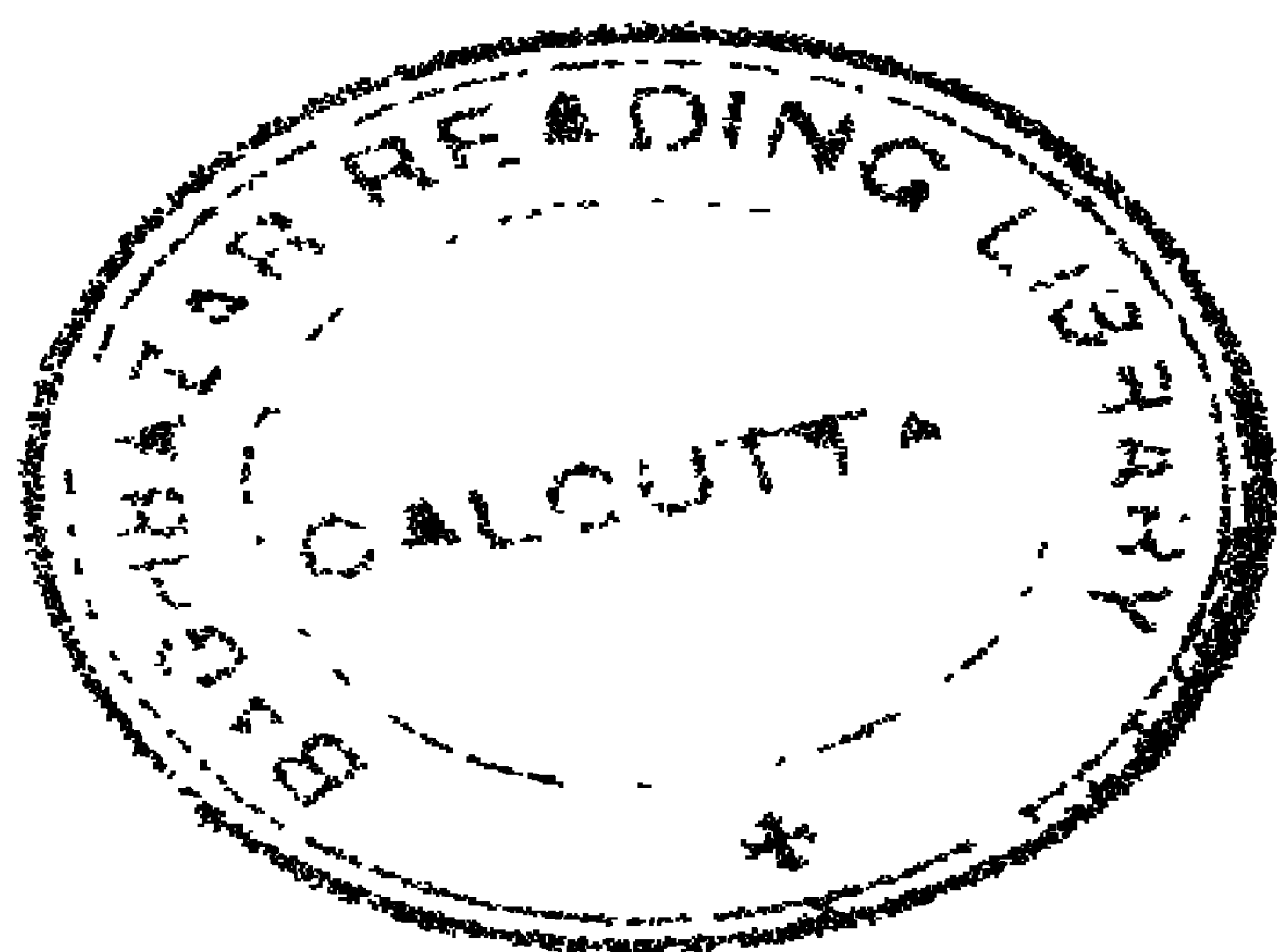
চিঠিপত্র

চিঠিপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন

প্রথম প্রকাশ পৌষ, ১৩৫০

মুদ্রাকর শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা

২১০০

জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতা দেবীকে লিখিত

মাধুরীলতা দেবীকে লিখিত এই কয়খানি মাত্র চিঠির সন্ধান এ-পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে।
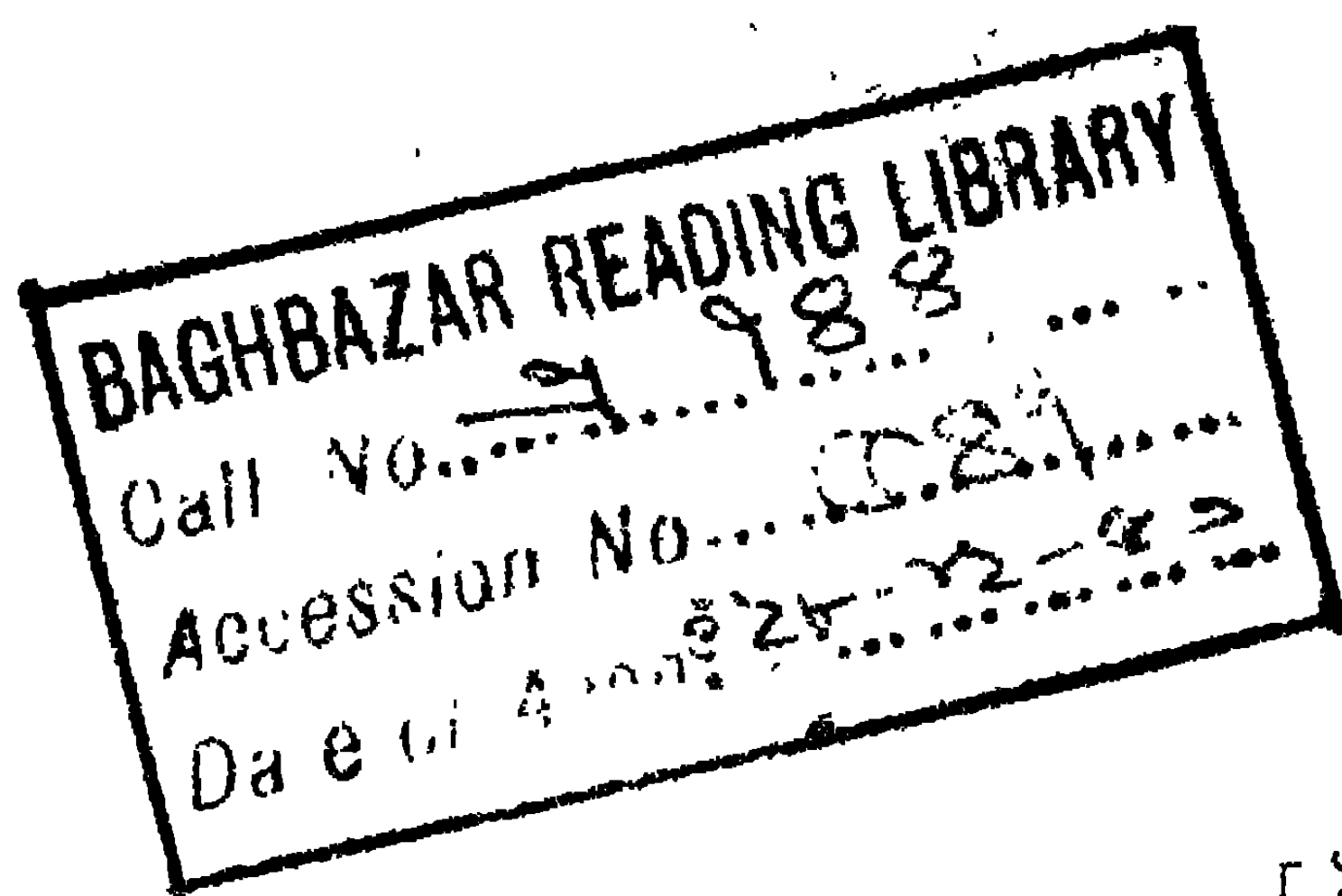
শিলাইদা
নদীয়া
[চৈত্র ১৩১৮

বেল্, শরীরটা অত্যন্ত খারাপ হয়ে পড়েছিল। মনে হচ্ছিল সেই সেবারে বিলাতে যাবার আগে একদিন হঠাৎ যেমন একেবারে ভেঙে পড়েছিলুম আবার তেমনিতর হবে—তাই তাড়াতাড়ি কাজকর্ম্ম গোছানো গাছানো সমস্ত ফেলে একেবারে এক দৌড়ে পদ্মার কোলে এসে আশ্রয় নিয়েছি। যেমনি এসেছি অমনি আমার সেই ভয়ঙ্কর ক্লান্তি এক মুহূর্ত্তে কোথায় দূর হয়ে গেছে। পদ্মা আমাকে যেমন করে শুশ্রূষা করতে জানে এমন আর কেউ না। এতদিন চারদিকে নানা জায়গায় ঘোরাঘুরি না করে যদি এইখানে স্থির হয়ে পদ্মার কলধ্বনিতে কান পেতে চুপচাপ পড়ে থাক্‌তে পারতুম তাহলে ভারি উপকার পেতুম— এবারে এখানে এসে সেটা স্পষ্ট বুঝতে পারচি।

সেদিন আমাদের ওখানে রাত করে এবং নানা অনিয়ম করে তোর শরীর ত খারাপ হয় নি? আমার মনে সেদিন সেই উদ্বেগ ছিল। তোর জন্যে আমার একটা হোমিয়োপ্যাথি ওষুধ মনে পড়চে একবার চেষ্টা করে দেখ্‌বি? Sulphur 200— এই চিঠির মধ্যে এক পুরিয়া পাঠাচ্চি। বিকেলে তোর যে হাত

পা জ্বালা করে জ্বর জ্বর বোধ হয় সেটা এতে সারবে বলে আমার বিশ্বাস। যদি খেয়ে উপকার বোধ করিস্ তবে আমাকে বলিস্ আবার ৮।১০ দিন পরে আর একবার দেব।

তুই যদি একবার কিছুদিনের জন্য এখানে বোটে এসে থাক্‌তে পারতিস্ তাহলে তোর বিশেষ উপকার হত— আর আমিও কত খুসি হতুম সে বল্‌তে পারিনে। কিন্তু তোর বোধ হয় কিছুতেই নড়া হয়ে উঠ্‌বে না। একবার ৫।৬ দিনের জন্যেও যদি আসতে পারিস তাহলে নিশ্চয়ই তোর শরীর ভাল হবে।

বাবা

[২] ওঁ [পোর্স্টমার্ক
Paris, 15 Juin '12]

বেল, কাল মার্সেল গিয়ে পৌঁছব। সমুদ্র যাত্রাটা নির্বিবঘ্নে কেটে গেছে। কাল একটু ঝোড়ো ছিল— বৌমার একটু মাথা ঘুরেছিল আমার ত কোনো কষ্ট বোধ হয় নি। সোমেন্দ্রটা বরাবর খুব কসে boiled ham খেয়ে পর্শু থেকে সাগু খাচ্চে। সে জ্বর করে বসেছে। আজ ভাল হয়েই আবার টেবিলে গিয়ে boiled ham স্থুরু করেছে। এ'কেই বলে ক্ষত্রিয় বালক। কালই ট্রেনে চড়ে লণ্ডনে রওনা হব— পর্শু পৌঁছব।

বাবা

[৩]

[পোস্টমার্ক
Hampstead, London
12 June '12]

বেল, লণ্ডনে এসে ত পৌঁচেছি। সমুদ্রে শেষ দুদিন খুব নাড়া খেয়ে নিয়েছি এখন ডাঙায় নাড়া খাবার পালা। বাসার সন্ধানে ঘোরা যাচ্চে। একটা ছোট বাড়ি নিয়ে নিজেদের ঘরকন্না পাতবার চেষ্টা চল্‌চে। কেদারকে পাকড়ানো গেছে, তাকে নিয়ে রথী ঘুরে বেড়াচ্চে। আমি এখানে খুব লোকজনের পাকের মধ্যে পড়ে গেছি, যথেষ্ট টানাটানি চল্‌চে। শরীর নিতান্ত মন্দ নেই। একজন ভাল ডাক্তারকে দেখাতে হবে। তোদের খবর কি?

বাবা

[৪]　　　　　ওঁ　　　508 W. High Street

Urbana , Illinois

U. S. A.

[পোস্টমার্ক

Cambridge, Feb 19 1913]

বেল,

তোর শরীর তেমন ভাল নেই শুনে আমার মন বড় উদ্বিগ্ন হয়ে আছে। তোকে চিঠি লিখে ত উত্তর পাইনে আর কারো কাছ থেকেও খবর পাবার সুবিধা হয় না। মাঝে মাঝে এক একটা পোষ্টকার্ডে তোদের খবর দিস্। শরতের শরীর আজকাল কেমন আছে লিখিস্।

আমেরিকায় এসে অবধি আমি অনেকদিন আর্ব্বানা বলে একটি ছোট্ট সহরের এক কোণের ঘরে চুপচাপ করে পড়ে ছিলুম— কারো কাছে ধরা দিই নি। কিন্তু এ দেশের লোকের ভয়ানক বক্তৃতা শোনবার সখ। তাই এখানে এরা আমাকে ক্রমাগত বক্তৃতা করবার জন্যে পীড়াপীড়ি করেছে। প্রথম প্রথম অবিচলিত ছিলুম— কেননা, আমার দৃঢ় ধারণা ছিল ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতা করতে গেলে কোনোমতেই নিজের সম্মান রক্ষা করতে পারব না— সেই জন্যে চাণক্যের উপদেশ স্মরণ করে একেবারে মুখ বন্ধ করে সুগম্ভীর হয়ে বসে ছিলুম। অবশেষে

আর্ব্বানায় Unity Club বলে একটি ক্লাবে কিছু বলবার অনুরোধ এড়াতে পারা গেল না। ক্লাবটি ছোটখাট— তেমন দুর্দ্ধর্ষ গোছের নয়, তার সভ্যসংখ্যা সামান্য সেইজন্যে কোনোমতে রাজি হওয়া গেল। তার পরে একটা প্রবন্ধ লিখে সেখানে গিয়ে দেখি লোকে হল ভরে গিয়েছে— তখন পালাবার পথ বন্ধ। প্রবন্ধ পড়া শেষ হলে সকলেই বাহবা দিতে লাগ্‌ল। এতে আমার সাহস জন্মে গেল। একে একে পাঁচটা প্রবন্ধ তাদের সেই সভায় পাঠ করেছি। তার পর থেকে কেবলি বক্তৃতার নিমন্ত্রণ পাওয়া যাচ্চে। শিকাগো য়ুনিভর্সিটিতে বক্তৃতা করে আমার ভয় একেবারে ভেঙে গেছে। রচেষ্টারে Religious Liberals দের একটা বার্ষিক কন্‌গ্রেস সভা ছিল সেখানে কুড়ি মিনিট সময়ের মেয়াদে Race Conflict সম্বন্ধে একটা বক্তৃতার ফরমাস পেয়েছিলুম। রচেষ্টার বষ্টন সহরের কাছে। মনে করলুম যখন এতদূরেই আসা গেল তখন বষ্টনটা সেরে যাওয়া যাক। বষ্টনে এখানকার হার্ভার্ড্‌ য়ুনিভর্সিটি বলে সব চেয়ে বড় য়ুনিভর্সিটির স্থান। আপাতত এইখানে এসে পৌঁছন গেছে। কাল একটা বক্তৃতা দিয়েছি— আরো তিনটে দিতে হবে। তার পরে কোথায় যাব কি করব কিছুই ঠিকানা নেই।

আর যাই হোক্‌ এখানে একটা সুবিধা এই দেখা যাচ্চে শীতকালের দিনেও যথেষ্ট রোদ্দুর পাওয়া যায়। ইংলণ্ডে সেটি হবার জো ছিল না। সেখানে গরমির দিনেই যে কয়মাস ছিলুম

প্রায় রোজই বৃষ্টিবাদল গিয়েছে। কিন্তু এখানে শীত সেখানকার চেয়ে অনেক বেশি— বরফে প্রায় সমস্ত ঢাকা পড়ে আছে— কিন্তু তার উপরে যখন রোদ্দুর পড়ে তখন সে দেখতে খুব ভাল লাগে। চার দিক একেবারে ঝলমল করতে থাকে। আর্ব্বানায় যখন ছিলুম তখন একদিন রাত্রে খুব বৃষ্টি হয়ে গিয়ে সেই বৃষ্টির জল জমে বরফ হয়ে গিয়েছিল— রাস্তার ধারের গাছপালা যেন কাঁচ দিয়ে মুড়ে দিয়েছিল— সেই বরফের ভারে মাঝে মাঝে গাছের বড় বড় ডাল মড়মড় করে ভেঙে ভেঙে পড়ছিল। সমস্ত রাস্তার উপরে পুরু বরফ— তার উপর দিয়ে চলা শক্ত— পা পিছলে পড়ে যেতে হয়— অনেককেই পড়তে হয়েছিল। আমি পড়বার ভয়ে সাহস করে বাড়ি থেকে বেরতেই পারতুম না। শেষকালে দু তিন দিন বাড়িতে কয়েদির মত বন্ধ থেকে একদিন বেরিয়ে পড়লুম। অল্প একটু দূর গিয়েই পতন। পথে লোক প্রায় ছিল না। কেবল এক জন মাত্র পথিক আমার পিছন পিছন আসছিল। নিজের দেহভার সামলাতেই তাকে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে হয়েছিল— কাজেই তার আর হাসবার সময় ছিল না। আর এক পা অগ্রসর হবার উৎসাহ আমার রইল না। সেইখান থেকেই বাড়ি ফিরলুম— তার পরে যে পর্য্যন্ত না বরফের পাষাণ হৃদয় সম্পূর্ণ বিগলিত হল সে পর্য্যন্ত আর আমার কোণের থেকে বেরই নি।

এখানে আর্ব্বানা থেকে বেরিয়ে পড়বামাত্রই ধীরে ধীরে নানাবিধ বন্ধুবান্ধব জুটচে। এখানকার একজন সুবিখ্যাত

কবির বিধবা স্ত্রী Mrs. Moodyর বাড়িতে আমরা শিকাগো সহরে অতিথি ছিলুম। তিনি আমাদের খুব যত্ন করেছেন। আমাদের সঙ্গে তাঁর এমনি জমে গিয়েছে যে তিনি আমাদের আর ছাড়তে চান না। হপ্তাখানেকের জন্যে আমরা নিউইয়র্কে এসেছিলুম, সেখানে তিনি আমাদের তাঁর বাসায় নিয়ে রেখেছিলেন। বষ্টনেও ত ন আসবেন। তাঁর মধ্যে ভারি একটি স্বাভাবিক মাতৃভাব আছে।

এখানে একটা জিনিষ খুব আমার মনে লাগে— এখানে, অন্তত পশ্চিম আমেরিকায়, প্রায় সকল অবস্থার মেয়েদেরই নিজের হাতে সমস্ত ঘরকরনার কাজ করতেই হয় কেননা এখানে চাকর দাসী পাওয়া অসম্ভব বল্লেই হয়। রাঁধা, বিছানা করা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, বাসনমাজা সমস্তই প্রায় গৃহকর্ত্রীরা করেন— অনেক সময় গৃহকর্ত্তাদের তার সঙ্গে যোগ দিতে হয়। কিন্তু কাজ করবার এত রকম সুবিধা আছে যে তাতে যথাসম্ভব ভার লাঘব করে। রান্না গ্যাসের উনুনে হয়— তাতে কষ্ট নেই— অনেক কাজ ইলেকট্রিসিটির সাহায্যেই চলে যায়। এ সমস্ত সুবিধা এখনকার দিনে আমাদের দেশে চালানো অসম্ভব নয়— যদি তা করা যায় তাহলে চাকরদের অধীনতা থেকে অনেক পরিমাণে মুক্তিলাভ করা সম্ভব হয়। বৌমাকেও দীর্ঘকাল সমস্ত কাজ করতে হয়েছিল—অবশেষে দুজন ভারতবর্ষীয় ছাত্র বেতন এবং খোরাকি নিয়ে তাঁর এই সমস্ত কাজ নির্ব্বাহ করে দিচ্ছিল। এ দেশের গরীব ছাত্ররা এরকম সামান্য কাজে

কিছুমাত্র অপমান বা লজ্জা বোধ করেনা— তারা হোটেলে খানসামারও কাজ করচে পড়াশুনাও দিব্যি চালাচ্চে। অনেক সময় যে সব ছাত্রের সঙ্গে তারা একত্রে পড়ে তাদেরই সেবকতা করে তারা নিজেদের ব্যয় নির্ব্বাহ করে। আমাদের দেশে হলে মুখ দেখাতে পারত না। তোর সেবকদের খবর কি? সেই তোর বাবুর্চ্চি আছে ত? তার ছেলের খবর কি? দাসীর সুবিধা করতে পেরেছিস? এবারকার এগারই মাঘ কি রকম হল এখনো তার সংবাদ পাই নি— আর হপ্তাদুয়েক পরে ফাল্গুনের মাঝামাঝি তার সমস্ত বিবরণ পাওয়া যাবে। এগারই মাঘের দিনে এবার আমরা পথের মধ্যেই ছিলুম। অনেকদিন পরে আমার এগারই মাঘ বাদ পড়ল। ৭ই পৌষের ভোরের বেলায় আমাদের আর্ব্বানার শোবার ঘরের একটি কোণে আমরা পাঁচটি বাঙালীতে উৎসব করেছিলুম। ভিড় ছিলনা— কিন্তু বেশ ভাল লেগেছিল।

বাবা

[৫] ওঁ Hotel Earle

103, Waverly Place

New York [1]

[পোস্টমার্ক

March 3, '13]

বেল,

প্রায় এক মাসের উপর আমরা ঘোরাঘুরি করে বেড়ালুম। অনেক পাঠ বক্তৃতা আলাপ পরিচয় ইত্যাদি সেরে আজ বিকেলের ট্রেনে আবার আমাদের আর্ব্বানার কোটরের মধ্যে আশ্রয় নিতে চলেছি। সেখানকার মেয়াদও খুব লম্বা নয়। মনে করচি আগামী এপ্রেলের ১৭ই তারিখে আমেরিকা থেকে ইংলণ্ডে পাড়ি দেব। সেখানে আমার বই ছাপাবার ব্যবস্থা করতে হবে। অনেক নতুন তর্জ্জমা হাতে জমেছে। সেগুলো এখানকার লোকদের ভাল লাগ্‌চে— সুতরাং বই আকারে ছাপা হলে মন্দ হবে না। ইংলণ্ডের ম্যাকমিলান কম্পানি আমার সব বইয়ের প্রকাশক হবে বলে কথাবার্ত্তা চল্‌চে। এই সব বই ছাপার কাজ সারতে যে আমার কতদিন হবে তা বুঝতে পারচি নে। অন্তত

[1] চিঠির কাগজের উপরে মুদ্রিত ঠিকানা।

আগামী শরৎকাল পর্য্যন্ত হয় ত এই ব্যাপার নিয়ে আমাকে লেগে থাকতে হবে। তারপরে সম্ভবত শীতের আরম্ভে আমি দেশে ফিরে যাবার আয়োজন করব। আমার খুব ইচ্ছা ছিল জাপান চীন জাভা ব্রহ্মদেশের পথ দিয়ে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে ভারতবর্ষে ফিরব— ··· আবার [?] যে কোনোদিন এ পথে আস্‌তে পারব এমন আশা করিনে। কিন্তু এ যাত্রায় সে আর ঘটে উঠল না। যদি কোনোমতে সময়ের ও অর্থ-সামর্থ্যের সুবিধা করতে পারি তাহলে সাইবীরিয়ান রেলপথ দিয়ে জাপানে গিয়ে সেখান থেকে ভারতবর্ষে যাব এই রকম সংকল্প মাঝে মাঝে মনের মধ্যে উদয় হচ্চে— কিন্তু এটাকে বেশ সম্ভবপর বলে ঠেকচে না অথচ প্রস্তাবটা আমার কাছে খুব লোভনীয় বোধ হচ্চে— যদি ঘটে ওঠে ত ভালই, যদি না ঘটে ত কল্পনা করতে আরাম আছে।

এ পর্য্যন্ত এখানে শীত খুব প্রবল হয় নি— বরাবর সূর্য্যালোক ভোগ করে এসেছি। মার্চ্চ মাস পড়েছে— এখন বসন্তের অভ্যুদয় হবার সময় এল— কিন্তু বিদায়ের সময় শীত আপনার তূণ নিঃশেষ করে শেষ ব্রহ্মাস্ত্র বর্ষণ করে যাবে এই রকম ভাবখানা দেখ্‌তে পাচ্চি। গত তিন চার দিন থেকে খুব ঠাণ্ডা পড়েছে— প্রায় ক্রমাগতই বরফ পড়চে, আর কন্‌কনে বাতাস দিচ্চে। এমেরিকার সুবিধা এই যে বরফ পড়ুক আর শীতই হোক্, সূর্য্যালোকের অভাব হয় না— সেইজন্যে শীতটা এখানে কাটিয়ে যাওয়া আমার পক্ষে খুব আরামের হয়েছে। গত

গ্রীষ্মের দিনেও ইংলণ্ডে আমরা ক্রমাগত বৃষ্টি পেয়েছিলুম, আশা করচি এবারকার গ্রীষ্মে দেবতা আমাদের পক্ষে অনুকূল হবে। যদি চিঠি লিখিস্ এখানকার ঠিকানায় লিখিস্‌নে— ইংলণ্ডের ঠিকানা :—

C/o. W. Rothenstein Esq., 11 Oak Hill Park, Hampstead, London N. W.

বাবা

কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমীরা দেবীকে লিখিত

[১] ওঁ গিরিডি

মীরু

আমি বোধ হয় আজ সন্ধ্যার গাড়ীতেই কলকাতায় যাব। যেদিন থেকে এখানে এসেছি সেই দিন থেকেই একটা লেখা নিয়ে ঘাড়মোড় ভেঙে পড়েছি। আজ সেই লেখাটা শেষ করে ফেলে আজই দৌড় দিতে হচ্চে। আস্‌চে শনিবারে কলকাতায় জাতীয় শিক্ষাপরিষদে এটা পড়তে হবে। ইতিমধ্যে এখানেও আমাকে একদিন মুখে মুখে বক্তৃতা দিতে হয়েছে। তাছাড়া লোকজনের দেখাশুনার উৎপাত এখানেও নিতান্ত কম নয়। এদিকে কদিন ধরে খুবই দুর্যোগ চলচে— ঝড়বৃষ্টি বাদলা প্রায় লেগেই আছে। সেইজন্যে শীতও কিছু কম পড়ে আবার রীতিমত কনকনিয়ে উঠেছে। আজও আকাশ ঘন মেঘে আচ্ছন্ন। আমার যাবার সময় যদি বৃষ্টি আরম্ভ হয় তাহলেই আমাকে মুস্কিলে ফেলবে। বল্‌তে বল্‌তেই খুব বাতাস দিয়ে বৃষ্টি হতে আরম্ভ হল। শীতের সময় এ রকম বাদলা ভারি বিশ্রী লাগে। আশা করচি আমি যাত্রা করবার পূর্ব্বেই পরিষ্কার হয়ে যাবে। তোদের প্রাইজের জিনিষপত্র কি ভাবে পৌঁছল জানবার জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ে আছি। শৈলেশকে যে-সব বই পাঠাতে লিখেছি তা পাঠালে কিনা কে জানে? খেলনাগুলো কি ভাঙাচোরা

অবস্থাতেই পৌঁচেছে ? সেখানকার কারো কাছ থেকে কিছু পেলিনে ? শুনতে পাচ্চি মেজ বৌঠান কিছুদিনের জন্যে বোলপুরে যাবেন। খুশি বৌমাও তাঁর সঙ্গে যাবেন বলে আমাকে চিঠি লিখেচেন। বোলপুরেরও যদি এখানকার মত ঝোড়ো অবস্থা হয় তাহলে তাঁরা মুস্কিলে পড়বেন। সেদিন বোলপুরে ঝড় বৃষ্টির সময় বিদ্যালয়ের কুয়োর কাছে একটা উঁচু খুঁটির উপরে বজ্র পড়েছিল। সে সময়ে পিসিমার না জানি কি রকম অবস্থা হয়েছিল। ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন। ইতি ২২শে মাঘ ১৩১৩

বাবা

[শান্তিনিকেতন
ফাল্গুন ১৩১৭]

মারু

তোরা শিলাইদহে গিয়ে তোদের ঘরকন্না গুছিয়ে নিচ্চিস্ শুনে খুব খুসি হলুম। দূরে তোদের বাড়ি হলে সুবিধা হবে না। বিশেষত তোর পক্ষে যাতায়াত করা চলবে না—পাল্কী করে রোজ আনাগোনা করা ত সহজ ব্যাপার নয়। তোরা কাছাকাছি বাড়ি করে থাকলেই বেশ ভাল হবে। তোদের বাড়িটা কি রকম প্ল্যানে করবি জানতে ইচ্ছা করচে। এমন যেন না হয় যে বর্ষার সময় damp হয়ে তোদের অসুখ হয়। সেইজন্য গোড়াতেই ভিতটা যাতে damp-proof হয় সেই রকম করা কর্ত্তব্য। ভিত যদি ছাই বালি দিয়ে ভরাট করা যায় তাহলে damp কৈশিক আকর্ষণে উপরে উঠ্‌তে পারে না। তাছাড়া ইঁট গাঁথার সময়েও এমন উপায় নিতে হবে যাতে damp উপরে না উঠ্‌তে পারে।

রাজা অভিনয়ের রিহার্সাল চলচে। কিন্তু শীঘ্র যে হয়ে উঠ্‌বে এমন আশা হচ্চে না। বড় শক্ত। শুনে হয় ত খুব এক চোট হাস্‌বি অজিত সুদর্শনা সাজ্‌বে। তাকে খুব করে মেজে ঘষে পরচুলো পরিয়ে ঢেকে ঢুকে কোনোমতে কাজ চালিয়ে

নিতে হবে। অন্ধকারের Sceneএ কোন মুস্কিল নেই—কিন্তু আলোর Sceneএ কি রকম effect হয় বলা যায় না। কিন্তু উপায় নেই। আর কোনো ছেলে সুদর্শনার part অভিনয় করতে পারবে না।

শৈল বৌমার সঙ্গে আমার প্রায় দেখা হয় না—সে নীচে বাংলায় থাকে আমার কাজ ফেলে যেতে পারিনে। সন্তোষের মা বুধবারে এসে শিশুবিভাগের দোতলা বাড়িতে থাকবেন—তখন বৌমার সঙ্গে দেখাশোনা চেনাপরিচয় হতে পারবে।

জ্ঞান এখানে বেশ ভালই আছে। সে আমাদের Science class পড়ায়। কিছুদিন এখানে থাকলে নিশ্চয়ই সে এখান থেকে আর যেতে চাইবে না।

তোরা একটু নিয়মিত পড়াশুনো করতে ভুলিসনে। নইলে মনের সুরটা ক্রমেই নেবে যাবে।

বেয়ানের আমাদের শিলাইদা কেমন লাগচে? তাঁকে আমার নমস্কার জানাস্।

ঈশ্বর তোদের মঙ্গল করুন।

বাবা

[৩] [শান্তিনিকেতন

চৈত্র ১৩১৭]

মীরু

তোর চিঠি এইমাত্র পেলুম। পয়লা বৈশাখের উৎসবের জন্যে আমাদের প্রস্তুত হতে হচ্চে। বোধ হচ্চে অনেকে আসবেন। রামানন্দ বাবুর মেয়েরা এবং ব্রাহ্মসমাজের অনেক মেয়ে বোধ করি এসে পড়বেন। আমাদের আশ্রমের সঙ্গে মেয়েদের এই যোগটি আমার খুব ভাল লাগে। এতে মেয়েদেরও বেশ উপকার হচ্চে বলে বোধ হয়। তোদের ওখানে যেমন কাব্যগ্রন্থের ক্লাস বসে গেছে আমাদের এখানেও তেমনি বসেছে। রোজ দুপুর বেলা খাওয়ার পর অধ্যাপকেরা আসেন আমি জীবনের ইতিহাসের সঙ্গে মিলিয়ে কবিতাগুলো ব্যাখ্যা [করে] তাঁদের শোনাই— দেখি তাঁদের অনেকে খাতা নিয়ে তার নোট নিতে থাকেন। অজিত বোধ করি আমার জন্মদিনে আমার রচনা সম্বন্ধে কিছু একটা পাঠ করবে, তারই জন্যে আমার জীবনবৃত্তান্তের ও ভিন্ন ভিন্ন কাব্য রচনার দিন ক্ষণ তারিখ নিয়ে আমাকে অস্থির করে তুলেছে— কোনো দিন আমি সময় ঠিক মনে রাখতে পারিনে— আমার চিঠির তারিখের সঙ্গে পাঁজির তারিখের সর্ব্বদা কি রকম অনৈক্য হয় সে তো তোরা জানিস্—

ইস্কুলে ইতিহাসে কোনোদিন আমি খ্যাতিলাভ করতে পারিনি। আমার ত এই মুস্কিল অতএব আমার জীবনচরিত তারিখ সম্বন্ধে একেবারে নিষ্কণ্টক হয়েই প্রকাশ হবে।

উমাচরণ অনেক চেষ্টায় নিজের যোগ্য একটি পাত্রী জুটিয়েছিল— কিন্তু উপযুক্ত পণ জোটাতে পারেনি। পাত্রীর বয়স তিন বছর সুতরাং তিনশো টাকার কমে তাকে পাওয়া সম্ভব নয়— আরো দুই এক বছর বয়স কম হলে বোধ করি সেই পরিমাণে দামও কম হতে পারত। কিন্তু উমাচরণ অনেকদিন ব্রাহ্ম বাড়িতে কাজ করচে বলে বাল্যবিবাহের প্রতি তার আন্তরিক বিদ্বেষ। এইজন্যে সে অতি কঠোর পণ করেচে যে তিন বছরের কম বয়সের মেয়েকে সে কোনো মতেই বিয়ে করবে না— মরে গেলেও না— তার এই সাধু সঙ্কল্পের দৃঢ়তা দেখে আমরা সকলেই আশ্চর্য্য হয়ে গেচি— কত দুমাস তিন মাসের মেয়ে তাদের মার কোলে শুয়ে চীৎকার শব্দে কাঁদচে কিন্তু সে কান্নায় সে কিছুতেই কর্ণপাত করচে না— এমনি ওর হৃদয় পাষাণের মত অটল— কত সদ্যোজাত নবনীতকোমলা কুমারী দুই চক্ষু মুদ্রিত কোরে অহোরাত্রি ধ্যান করচে কিন্তু তাদের সেই তপস্যার প্রভাবও উমাচরণের হৃদয়কে লেশমাত্র বিচলিত করতে পারচে না— ওর এই চরিত্রবল দেখে সকলে স্তম্ভিত হয়ে গেচে। তার এই সাধুতার পুরস্কারস্বরূপ তোরা যদি আপনা আপনির মধ্যে তিনশো টাকা কোনোমতে চাঁদা করে তুলতে পারিস্ তাহলে এই একটি তিন বৎসরের বয়স্থা মেয়ের আইবড়দশা ঘুচে যায়—

বৌমাকে বলিস তাঁদের উচিত গয়না বিক্রি করেও এই সৎকার্য্যটি করা।

পশু দিন রথীকে লিখেছিলুম কোনো লোক দিয়ে ওখান থেকে পয়লা বৈশাখের জন্য ওখানকার তরমুজ খরমুজ ইত্যাদি পাঠাতে— অত্যন্ত সহজে ও সস্তায় কাজ সারবার এই অসামান্য দৃষ্টান্তে এখানকার লোকের আমার বুদ্ধির প্রতি এমন একটু শ্রদ্ধা বেড়ে গিয়েছে যে আমি সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছি। আমার এই অনুরোধটা রথী যদি কাজে পরিণত করে তাহলে এই ব্যাপারটা আমাদের বিদ্যালয়ের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। বিশেষত দেখ্তে পাচ্চি আমার জীবনবৃত্তান্ত নিয়ে গোপনে ও প্রকাশ্যে একটা আলোচনা চল্‌চে এই সময়ে যদি শিলাইদহ থেকে বোলপুরে তরমুজ ও ফুটি এসে পড়ে তাহলে সেই কীর্ত্তিটা হয়ত কারো অমর লেখনীর দ্বারা অবিনশ্বরভাবে লিপিবদ্ধ হয়ে যেতে পারে। অতএব তোর দাদাকে লিখিস্ খবরদার যেন তরমুজ না পাঠায়।

আমাদের বিদ্যালয়ের ছুটি আরম্ভ হবে ২৬শে বৈশাখে। তখন তোদের ওখানে বোধ হয় রীতিমত গরম পড়বে। বড়দাদা হেমলতা ও কমল পুরীতে যাচ্চেন। কিন্তু ছুটির সময় দিনুকে আমার কাছে না রাখলে নিশ্চিন্ত হতে পারব না। তাই, যদি আমি সে সময় শিলাইদহে যাই তাহলে দিনুকেও সেখানে আমার সঙ্গে নেব। সেখানে তাকে স্থান দেবার কি বিশেষ অসুবিধা হবে? ইস্কুলের আর কোনো ছেলেকে আমি নিতে চাইনে।

পটল পুরীতেও যেতে পারে। কিন্তু অরবিন্দ এবার হয়ত আমার সঙ্গ ছাড়তে চাইবে না। দিনুকে নীচে পশ্চিমের দিকের দক্ষিণের ঘরটাতে এবং অরবিন্দকে মাঝের হলে বোধ হয় রাখা চলবে। আমি ত তেতালায় থাকব। সেখানে যদি একটা bathroom ছোটখাট রকম তৈরি হয় তাহলে দিনুকেও আমার তেতালার ঘরে আর একটা খাট দিয়ে অনায়াসে রাখা যেতে পারবে। রথীর সঙ্গে এই বেলা পরামর্শ করে সমস্ত ঠিক করিস্। তোরা কে কোথায় আছিস্ আমি ত কিছুই জানিনে— কিন্তু তোরা নিজেদের কিছুমাত্র disturb করিস্‌নে যেন।

বাবা

বৌমাকে আমার অন্তরের স্নেহাশীর্ব্বাদ জানাস্ এবং তোরাও গ্রহণ করিস্।

[শান্তিনিকেতন
চৈত্র ১৩১৭]

মীরু

গোলেমালে অনেকদিন তোর চিঠির উত্তর দিতে পারিনি। কিছুদিন থেকে নানা ব্যাপারে নানা প্রকারে ব্যস্ত হয়ে ছিলুম। এখনো চলচে। তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদক হয়ে আমার কাজ আরো বেড়ে গেছে। আমার জন্মদিনে ছেলেরা উৎসব করবে বলে আর একটা হাঙ্গাম চলচে। সেদিন এরা "রাজা" আবার অভিনয় করবে। তাছাড়া আরো কি কি উৎপাত করবার মৎলব আছে— ওর পূর্ব্বে কোথাও পালাতে পারলে ভাল হত।

তোদের ওখানে লট্‌কানের গাছ আছে, রথীকে বলে এক প্যাকেট লট্‌কান পাঠিয়ে দিস্ তো। থিয়েটারের সময় ছেলেরা কাপড় রঙাতে চায়।

এখানে তো প্রায়ই মাঝে মাঝে বৃষ্টি বাদল হয়ে এ পর্য্যন্ত বেশ ঠাণ্ডা আছে। তোদের ওখানে কি রকম? তোরা কি বাগান করিস? আমরা যেরকম দেখে এসেছিলুম তার থেকে কিছু বদল হয়েছে কি? তোদের আলুর ক্ষেত থেকে আলু কত পেলি? চৈতালি ফসলই বা কি রকম হল? আমাদের আম বাগানে খুব আম ধরেছে। তোদের আমের অবস্থা কি রকম?

লিচু গাছে বিস্তর ছোট ছোট লিচু ধরেছিলো কিন্তু আমাদের একটা হরিণ আছে সে এসে লিচুগুলো প্রায় সমস্ত খেয়ে ফেল্লে— সফেটা গাছের নীচু ডালে যত সফেটা হয়েছে সেও আর রাখা যাচ্চে না। হরিণটা খুব পোষা বলে ওকে বাঁধতে ইচ্ছা করে না। আজকাল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনেক মেয়েদের সঙ্গে আমাদের আলাপ হয়েছে। তাঁরা আশ্রমে এসেছিলেন— এখানকার সঙ্গে তাঁদের খুব একটা শ্রদ্ধার যোগ হয়ে গেছে। এবার কলকাতায় গিয়ে উপরি উপরি তিন দিন তাঁদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চলেছিল। বোধ হয় পয়লা বৈশাখে তাঁরা এখানে আসবেন।

তোদের পড়াশুনা কি রকম চলচে? তুই বুঝি Botany পড়তে আরম্ভ করেছিস্? কেমন লাগছে? বৌমার পড়া এগোচ্চে ত? তোর বন্ধু Miss Bourdatteও তোদের খুব নিন্দে করে দিব্যি তোদের টাকায় পেট ভরিয়ে আমেরিকায় ফিরে গেছে। Yankeeদের সঙ্গে আমরা পেরে উঠবো কেন?

তোরা মাঝে মাঝে কখনো নদীতে বেড়াতে যাসনে? উমাচরণ কলকাতায় ফিরেছে এই একটা সুসংবাদ— তার বিয়ে হয়নি এই আর একটা। আগামী সোমবারে শুনচি এখানে তার শুভাগমন হবে। কি রকম অভ্যর্থনা করা যাবে তাই ভাবছি।

বাবা

তোর মামা কিম্বা মামাশ্বশুরকে বলিস সেই বাউলদের গান আমাকে শীঘ্র সংগ্রহ করে পাঠাতে। দেরি না করে।

১৫

[পোস্টমার্ক
ॐ
Santiniketan
1 Aug 11]

মীরু

অনেকদিন পরে তোর চিঠি পেয়ে খুসি হলুম। রথী তোদের Ball এর Astronomy পড়ে শোনাচ্চেন? ও বইটা প্রথম যখন পড়েছিলুম তখন আমার এত ভাল লেগেছিল যে, আমার আহারনিদ্রা ছিল না। বৌমারও বোধ হয় খুব ভাল লাগচে। Fairy Land of Science বইটা থেকে তাঁকে কিছু পড়ানো হচ্চে কি? সে বইটা থেকেও তিনি অনেক শিখ্‌তে পারবেন। তাঁর দেখলুম Science এর দিকে খুব একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। তাঁর মাস্টার মশায় কালকায় দৌড় দেওয়াতে করে তাঁর পড়াশোনার কিছু ক্ষতি হচ্চে না ত? তুই তাঁকে পড়াস্‌নে কেন? তোর শরীর এখন ভাল আছে তো? তোর মেজমা তোকে তাঁর কাছে রাঁচিতে রাখবার প্রস্তাব আমাকে জানিয়েছেন। সে জায়গাটি খুব ভাল—তোর বেশ ভাল লাগবে—শরীরও ভাল থাক্‌বে। জ্যোতিদাদার কাছে স্বরলিপি এবং গান শিখতে পারবি। জানিনে নগেনের সঙ্গে তাঁর এ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হয়েছে কিনা। নগেন নিশ্চয় এতদিনে শিলাইদহে

ফিরেচে। কিন্তু তোরা তো জলে জলে ঘুরে বেড়াচ্ছিস, তোদের নগেন ধরবে কোথায়? তোর মামার খবর কি? আমি চলে আসাতে বেচারার খুব কষ্ট হয়েছে— মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে তার সদালাপ হত— এখন সে সকল প্রসঙ্গ তাকে শোনাবার লোক কাউকে পাবে না।

প্রবাসীতে তোর ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান বেরিয়েছে— দেখেছিস্ ত? এখন তোর কলম বোধ হয় বন্ধ আছে। বোটে এই বৃষ্টি-বাদলের দিন তোদের অসুবিধা হচ্চে না ত? অমাবস্যা পড়েছে— এইবার থেকে আবার বাদলা আরম্ভ হবে।

বাবা

[শান্তিনিকেতন]

মীরু

জগদানন্দ এবং সন্তোষ আজ ভোরে কলকাতায় গেছেন—অতএব তুই যে যন্ত্রটা চেয়েছিস্ সেটার সন্ধান করতে পারলুম না। যদি সেটাকে কোনোখানে আস্ত দেখতে পাই তাহলে তোদের পাঠিয়ে দেব। চাঁদের কলাগুলো সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা জন্মানো শক্ত এবং পৃথিবীর সঙ্গে সূর্য্যের অবস্থাগত সম্বন্ধ অনুসারে ঋতুর ভেদ কি রকম করে হয় সেটাও কেবল ছবি দেখে বুঝিয়ে দেওয়া কঠিন।

নগেন কাল বুধবারে বড়দিদিকে নিয়ে তোদের ওখানে যাত্রা করবে লিখেছে। এ চিঠি পাবার পূর্ব্বেই তোদের সভা জমে উঠেছে সন্দেহ নেই। ও জায়গাটা বড়দিদির বোধ হয় ভালই লাগবে। আমার সেই ছাতের ঘরটা তাঁকে দিস্ তাহলে তিনি নিরিবিলি থাক্‌তে পারবেন।

ললিতাকে দেখবার জন্যে আজ হেমলতা বৌমা কলকাতায় রওনা হলেন। কমল অনেকদিন পরে তার সখী দুর্গাকে পেয়ে মনের আনন্দে আছে। কালিমোহনের স্ত্রী মনোরমাও তাদের সখি-সমিতির সভ্য, বিপিনের বৌও বিশিষ্ট সভ্যের মধ্যে। লাবণ্যের মেয়েটি বেশ সুন্দর দেখতে হয়েছে। বেচারা অসুখে

ভুগচে কিন্তু তবু তার প্রফুল্লতার অবসান নেই। তাকে নিয়ে আমার দাড়ি সামলানো ভারি শক্ত হয়েছে। লাবণ্য ভারি রোগা হয়ে গেচে। আমি যে নাপিত চাকরটিকে পেয়েছি সে বেশ ঘড়ি মেরামৎ করতে পারে, হাতের কাজে তার একটু দক্ষতা আছে। উমাচরণের কাছে সে রান্না প্রভৃতি শিখ্‌চে— এ চাকরটা সকল রকমে বেশ কাজের হয়ে উঠবে বলে মনে হচ্চে। কিন্তু আমার ত দুজন চাকরের দরকার নেই। রথীকে জিজ্ঞেস করিস তার যদি দরকার থাকে একে তাহলে শিলাইদহে পাঠিয়ে দিতে পারি। একে তৈরি করে নিতে পারলে এ ল্যাবরেটারির কাজও করতে পারবে। দরকারের সময় মাথা খুঁড়লেও চাকর পাওয়া যায় না বলেই ছেড়ে দিতে কোনোমতে ইচ্ছা করচে না।

রথীকে বলিস্ যে মাদ্রাজি যুবকটির কথা তাকে বলেছিলুম তার সম্বন্ধে কি স্থির করলে আমাকে যেন লেখে। ইতি ১৬ শ্রাবণ ১৩১৮

বাবা

[শান্তিনিকেতন
ভাদ্র (?) ১৩১৮]

মীরু

তোর দাদা আর বৌমা আমাকে সুদ্ধ সিঙাপুরে সমুদ্র পথ ঘুরিয়ে আনবার প্রস্তাব করে এক চিঠি লিখেছে। আমার শরীরটা ভাল নয়— হয় ত কিছুদিনের মত এখানকার সমস্ত ভাবনা চিন্তার ঝঞ্ঝাট একেবারে ভুলে ঘুরে আসতে পারলে কতকটা শুধ্‌রে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু ভাবচি কেবল ২২ দিনের মত সমুদ্র ঘুরে আমার হবে কি ? তাতে কেবল ঘোরাঘুরির কষ্ট এবং seasicknessএর ধাক্কাই খেয়ে আসা হবে। তাই তাকে আজ লিখেচি যদি তিন মাসের ছুটি নিয়ে জাপান বেড়িয়ে আসতে সে রাজি থাকে তাহলে আমি এই সুযোগে একটু ভাল রকম করে হাওয়া খেয়ে নিতে পারি। একবার কিছুদিনের মত সমস্ত বোঝা নামিয়ে ছুটোছুটি করে আস্‌তে পারলে একটু তাজা বোধ হবার সম্ভাবনা আছে। তোর মেজমাকে এই প্রস্তাবটা জানাস— দেখি তিনি কি পরামর্শ দেন। আশু আমাকে টেলিগ্রাফ করেছিলেন। কিন্তু পর্শু থেকে অর্শের রক্তপাত আরম্ভ হয়ে আমাকে কাহিল করে ফেলেছে এখন যদি রেলে করে কলকাতায় যাতায়াত করি

তাহলে আমাকে খুবই ভোগাবে— সেই ভয়ে ওদের সভায় যেতে পারলুম না। তাছাড়া সভাসমিতিতে যাওয়া ছেড়ে দেবার বয়স হয়েছে— লোকের টানাটানি আর সহ্য করতেই পারিনে। এখানে ৬ই আশ্বিনে শারদোৎসব অভিনয়ের প্রস্তাব চলচে। দিনু অধিকারী তার ছেলের দলকে নিয়ে তাদের খুব কষে নাচগান অভ্যাস করাচ্চে। ৭।৮ই আমরা এখান থেকে ছুটি পাবো।

এখানে শরতের হাওয়া দিয়েছে— শিউলি ফুলের গন্ধে আকাশ ভরে উঠেছে— টুক্‌রো টুক্‌রো মেঘের মধ্যে রোদ্দুরটি ভারি সুন্দর হয়ে ফুটে উঠেছে। বেশ লাগচে। কাল জ্যোৎস্নারাত্রে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মাঠের মধ্যে চৌকি নিয়ে বসেছিলুম।

বাবা

৮]
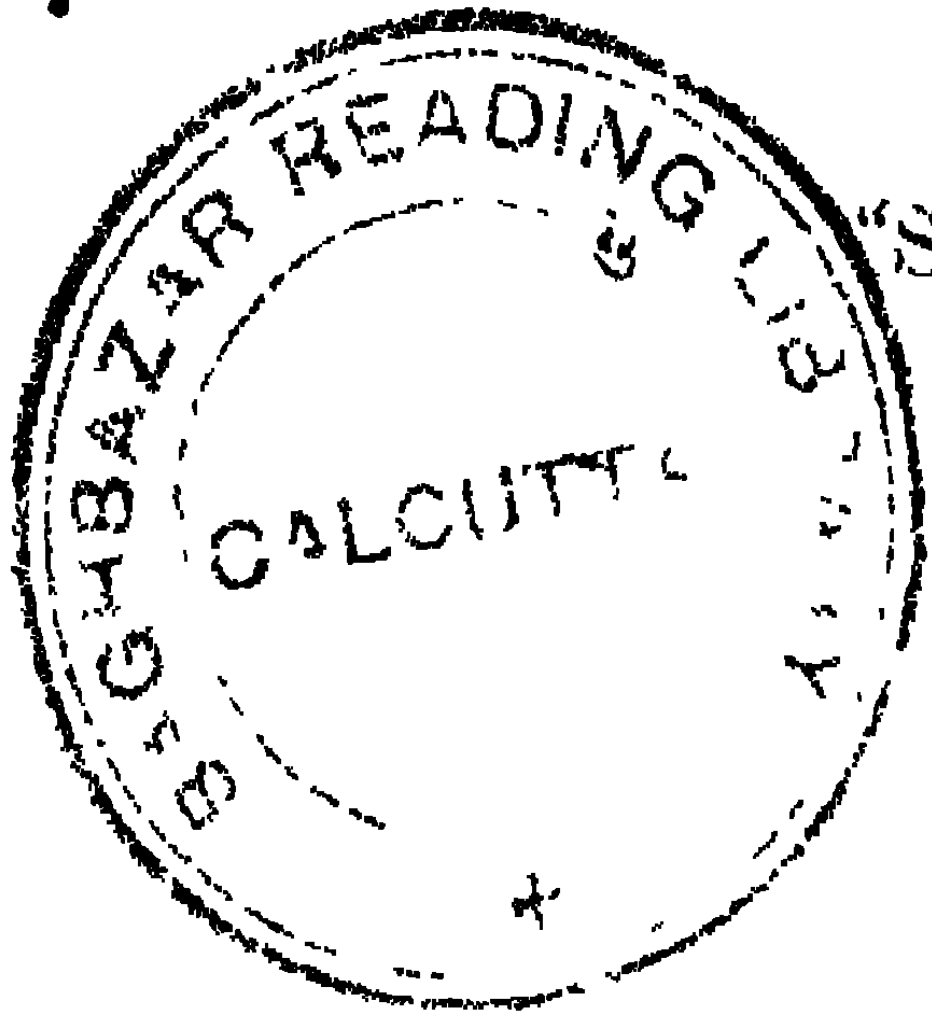
"S. S. City of Glasgow"
at আরব-সমুদ্র
৩১ মে, ১৯১২

মারু

জাহাজ তো ভেসে চলেছে। ভয় করেছিলুম খুব sea-sickness হবে কিন্তু তার কোনো লক্ষণ দেখচিনে। সমুদ্র তেমন উতলা নয়। অথচ ঢেউ একেবারে নেই তা নয়। ঠিক আমাদের মুখের সামনে দিয়ে পশ্চিমে হাওয়া দিচ্চে তাই এক একদিন বেশ একটু দোলা লাগাচ্চে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত আমার তাতে কোনো অসুবিধা হয়নি। সোমেন্দ্রটা মাঝে মাঝে মাথা ঘুরচে বলে ক্যাবিনে চিৎ হয়ে পড়ে চব্বিশ ঘণ্টা একটানা ঘুমিয়ে নিচ্চে। আমার বিশ্বাস ওর মাথা ঘোরাটা একেবারেই ফাঁকি— কারণ, ঘুম খুব গভীর এবং আহারের পরিমাণও যথেষ্ট প্রচুর। একেবারে রাজকীয় চালে বিছানায় শুয়ে শুয়ে আহার চলচে— স্বয়ং ত্রিপুরার মহারাজকেও কোনো দিন এত আরাম করতে দেখিনি। বৌমা বেশ কাটিয়ে দিচ্চেন। ওঁর ভাবটি বেশ নিঃসঙ্কোচ। নতুন জায়গায় নতুন পথে নতুন লোকদের মধ্য দিয়ে যাচ্চেন বলে যে কোথাও কিছুমাত্র সঙ্কোচ আছে তা দেখচিনে। ইতিমধ্যে একদিন কেবল seasick হয়েছিলেন।

জাহাজের যাত্রীদের সঙ্গে আমাদের যে প্রাণের বন্ধুত্ব হয়েছে তা বলতে পারিনে। দূরে দূরে চুপচাপ থাকি। কেবল ওদের মধ্যে দুজন আমার সঙ্গে আলাপ করেছে। তাদের একজন আমাকে জিজ্ঞাসা করছিল, তোমার নামে একজন কবি আছেন শুনেছিলুম তিনি কে? আমি বল্লুম তিনিই হচ্চেন আমি। লোকটি সৈনিকদলের অধ্যক্ষ— সুতরাং কবিতা পড়ে শোনাবার জন্যে আমাকে একদিনো অনুরোধ করেনি। বুঝতেই পারছিস্ এতে আমি মনে মনে বেদনা বোধ করেছি।

তোরা কোথায় আছিস্ তাও জানিনে। কলকাতার ঠিকানাতেই চিঠি দেব। কারণ শিলাইদহে থাকলেও চিঠি কলকাতা হয়েই যাবে সুতরাং তোদের পেতে দেরি হবে না।

নিতাইয়ের খবর কি? তার বঙ্গভাষা শিক্ষা কতদূর অগ্রসর হল? আর তার Sandow Practice আশা করি উত্তরোত্তর প্রবলতর বেগে চল্‌চে। মুখের মধ্যে পায়ের গোড়ালি পূরে দেওয়া প্রভৃতি ব্যায়াম সুরু হয়েছে কি? তার শরীর কেমন আছে? তাকে আমার হামি দিস্। বেয়ান এবার একলা তাঁর ক্ষুদ্র বন্ধুটির চিত্ত অধিকার করে নিচ্চেন— আমি যতদিনে ফিরব ততদিনে তাঁর দখল ভয়ঙ্কর পাকা হয়ে যাবে। বেয়ানকে বলিস্ শিলাইদহে একদিন আমাকে যে স্থান দিয়েছিলেন ফিরে গিয়ে যেন সেই আশ্রয়টি থেকে বঞ্চিত না হই।

শিলাইদহে তোদের কেমন চলচে লিখিস্। আশা করি বাদলা বৃষ্টি কেটে গিয়ে এখন সেখানটা স্বাস্থ্যকর হয়েছে।

যদি ডাঙায় তোদের শরীর তেমন ভাল না থাকে তাহলে এক একবার কিছুদিনের মত বেশ নিরাপদ নিরালা জায়গা দেখে গোরাইয়ের নির্জ্জন চরে বোটে গিয়ে থাকিস্। বোট আজকাল অনেকগুলো হয়েছে সুতরাং তোদের থাকবার কোনো কষ্ট হবে না। বর্ষার সময় একটু অসুবিধা হতেও পারে কিন্তু পর্দ্দার বন্দোবস্ত ভাল করে রাখতে পারলে কোনো ভাবনা থাকবে না। তাছাড়া তুই একটা গোরু কুঠিবাড়ি থেকে চরে নিয়ে গিয়ে রাখলে কিছুই ভাবতে হবে না আর তোদের তো কুকারে দিব্যি রান্না হতে পারবে।

তোরা আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদ জানিস।

বাবা

[৯]

[লণ্ডন
শরৎ ১৯১২

মীরু

তোকে দীর্ঘকাল চিঠি লিখিনি কেন, এই সম্বন্ধে তুই মনে মনে আলোচনা করচিস্। আমি নিশ্চয় জানি বৌমা তোকে প্রতি সপ্তাহেই প্রায় চিঠি লিখ্‌চেন এবং তাতে ছোট বড় কোনো খবর বাদ যাচ্চে না— আমার চিঠিতে তারই পুনরুক্তি হবার সম্ভাবনা আছে। পৃথিবীতে মেয়ে এবং পুরুষের মধ্যে যে কর্ম্মের বিভাগ হয়েছে তার মধ্যে এটাও একটা— পুরুষরা দেশের কাজ করবে, মেয়েরা ঘরের কাজ করবে; পুরুষরা বই লিখ্‌বে, মেয়েরা চিঠি লিখ্‌বে। চিঠি লেখার নৈপুণ্য মেয়েদেব পক্ষে স্বভাবসিদ্ধ— পুরুষদের ওটা নেই বল্লেই হয়। আমরা কাজের চিঠি লিখ্‌তে পারি— অকাজের চিঠিতে আমাদের কলম সরে

এই ত চিঠি লেখা সম্বন্ধে তোকে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে লিখলুম; ভাগ্যে এটা বৈজ্ঞানিক তাই এতখানি লেখবার সুবিধা হল। আমি তত্ত্ববোধিনী এবং প্রবাসীর একজন সুবিখ্যাত লেখক তা বোধ হয় তুই পরম্পরায় শুনেছিস্;— এখানকার লোক সমাজের লৌকিকতার দাবি মিটিয়ে যখনি সময় পাই প্রবন্ধ রচনায় মনোযোগ দিতে হয়; কিন্তু বৌমা এখনো সাময়িক পত্রের হাতে পড়েননি এই জন্য অসাময়িক পত্র লেখা

তাঁর পক্ষে নিতান্তই সহজ। এই সকল কারণে স্বভাবতই আমাদের মধ্যে একটা কর্ত্তব্য বিভাগ হয়ে গেছে। আর একটা কথা আমার বলবার আছে; লোকে মনে করে যারা নূতন দেশে যায় বিস্তারিত খবর লেখা তাদের পক্ষেই সহজ। ঠিক তার উল্টো। যে খবর একেবারে নূতন সে ত অন্ধকার— পুরোণো খবরই খবর। একবার ভেবে দেখ আমরা গত সপ্তাহে ছিলুম South Kensingtonএ— এ সপ্তাহে এসেছি Worsely Roadএর একটা বাসায়— এ খবরটা তোদের কাছে একেবারেই ব্যর্থ। কিন্তু তোরা যে আমাকে খবর দিয়েছিস্— কুঠিবাড়ী থেকে তোরা বোটে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিস্ সেটা আমার পক্ষে একটা যথার্থ খবর। যদি বিস্তারিত করে তন্ন তন্ন করে লিখ্‌তিস্ তাহলে এই Worsely Rd. এর অন্ধকার বাসায় বসে তোদের সেই পদ্মানিবাসের ছবি মনের মধ্যে অনেকক্ষণ উলটপালট করতে পারা যেত। তোদের ঘর দুয়োর, বাবুর্চ্চি, মালী, বছির, গোরুবাছুর, সজারু, ডোডো, পাটের ক্ষেত, অনঙ্গ, জমাদার, বৃষ্টিবাদল, রৌদ্র, আমগাছ, জামগাছ, পুকুর, রাস্তা, মাছি, মশা, গাঁদাপোকা, ডাক্তার, ডাক্তারের স্ত্রী, ওলাউঠো, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি যা-কিছু তোর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে আছে তার কথা তোলবামাত্র সেটা আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। আমাদের এখানকার পনের আনা খবরই তোদের পক্ষে একেবারেই নিরর্থক। এই দেখ্ চিঠি লেখার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সম্বন্ধে আর এক অধ্যায় সমাপ্ত হোল।

কিন্তু সত্যি তোরা কোথায় আছিস্, কি ভাবে আছিস্, বোটে থাকার কি রকম ব্যবস্থা করেছিস্, সেখানে খোকা কি ভাবে দিন যাপন করচে, সেখানে তার আহার বিহারের কিরকম আয়োজন, আজকাল তার অনুপানের কি রকম বন্দোবস্ত, লোকজনের প্রতি তার ব্যবহার কি রকমের এ সমস্ত জানবার জন্যে মন উৎসুক আছে অথচ নগেন্দ্রের চিঠিতে একটা লাইনমাত্র পাওয়া গেল যে তোরা শরীরের স্বাস্থ্যের জন্য বোটে গিয়ে বাস করচিস্। হয়ত বৌমাকে তুই বিস্তারিত খবর দিয়েছিস্ কিন্তু বৌমা আমাকে কেবল একটিমাত্র কথা বল্লেন ছোট্ ঠাকুরঝির চিঠি পেয়েছি, ছোট ঠাকুরঝি জানতে চেয়েছে বাবা অনেকদিন চিঠি লেখেননি কেন? এখানে গরমিকালেও এ বছর সূর্য্য ফাঁকি দিয়ে সেরেছেন— শরৎকালে দিন দুই চার একটু আশা দিয়ে আবার আজ এমনি অন্ধকার করে এসেচে এবং রীতিমত শীতের হাওয়া দিয়েচে যে সুবিধা বোধ হচ্চে না। কালিদাসের একটা কাব্য আছে জানিস বোধ হয় তার নাম ঋতুসংহার। এখানে এবার সেই কাব্যটারই আধিপত্য দেখা যাচ্চে। গ্রীষ্ম ঋতুর সংহার ত হয়েইচে— আবার শরৎ-ঋতুরও ভথৈবচ। অথচ এদেশে গোটা তিনেক বই ঋতুই নেই। যদি সংহার করতে হয় তাহলে আমার মতে ভারতবর্ষে গ্রীষ্মটাকে সংহার করতে পারলে ইলেক্‌ট্রিক পাখার খরচ বাঁচে।

তোরা কার্ত্তিক মাসে বোটে করে বরিশালে যাবার প্রস্তাব করেছিস। কিন্তু সেটা ভয়ঙ্কর ঝড়ের সময়— আমি যত বড়

বড় ঝড় পেয়েছি সব ঐ সময়ে। তার উপরে ম্যালেরিয়ারও সময় ঐ। যদি তোরা অগ্রাণ মাসে যেতিস্ তাহলে চিন্তার কোনো কারণ থাকত না— কিন্তু আশ্বিন-কার্ত্তিকে বোটে করে দীর্ঘ নদী পথ বেয়ে যাওয়া কোনোমতেই সুযুক্তিসঙ্গত নয়। নদীতে আমি অনেকদিন কাটিয়েছি— নদীর ধাত আমি বুঝি।

বাবা

মীরু

এবার তোর কোনো চিঠিপত্র আসেনি। তোরা সবাই ভাল আছিস্ ত? আজ ত আশ্বিনের ১০ই তারিখ, তোদের ছুটির সময় কাছাকাছি হয়ে এসেছে। এ চিঠি যখন পৌঁছবে তখন তোরা খুব সম্ভব শিলাইদহে থাকবি নে। যদি বোটে করে বরিশালে যাওয়াই স্থির করে থাকিস্ তা হলেও এ চিঠি পেতে দেরী হবে। বরিশালে যাবার পথে তুই একজায়গায় খুব বড় বড় নদী পড়ে সেইজন্যে আমার মনে একটু ভয় আছে। যাই হোক্ এতদূরে বসে বৃথা ভয় করে কোনো লাভ নেই। এখানে গ্রীষ্মকালটা বৃষ্টি বাদলের মধ্যে কেটেছে সে কথা তোকে পূর্ব্বেই বলেছি। অবশ্য এরা যাকে গ্রীষ্ম বলে আমাদের পঞ্জিকা অনুসারে তার অনেকটা অংশই বর্ষা— সুতরাং বর্ষায় বৃষ্টি ভোগ করলে সে সম্বন্ধে নালিশ করাটা আমাদের ঠিক শোভা পায় না। কিন্তু অন্যায়টা হচ্চে এই যে, এখানে শীতকালেই রীতিমত বৃষ্টির আড্ডা বসে— মানুষের সহিষ্ণুতার পক্ষে সেই যথেষ্ট— আর উপরি পাওনা কিছুতেই সহ্য হয় না কিন্তু এবারে সেপ্টেম্বরটি খুব ভদ্র ব্যবহার করচে। প্রায় প্রত্যহই রৌদ্র দেখা দিচ্চে— বহুকাল একেবারেই বৃষ্টি হয়নি। আমাদের দেশের শরৎকালের মতই নির্ম্মল উজ্জ্বলতায় আকাশ

পূর্ণ হয়ে গেছে— জানলার বাইরে তাকিয়ে দেখ্‌লে মন উতলা হয়ে যায়। আমার এই লণ্ডন ছেড়ে আর কোথাও বেরিয়ে পড়তে প্রতিদিনই ইচ্ছা করচে। কিন্তু বাঁধা পড়ে আছি আমার বইটা ছাপতে গেছে—১৪ই অক্টোবরের মধ্যে বের হবার কথা। বের হলেও নিষ্কৃতি নেই— কারণ, এঁরা বল্‌চেন, এ বইটা প্রকাশ হলেই এখানকার প্রকাশকেরা আমার অন্য লেখাগুলো ছাপাবার জন্য নিশ্চয় আগ্রহ প্রকাশ করে আস্‌বে— সেই শুভদিনের জন্যে আমাকে অপেক্ষা করতেই হবে। অর্থাৎ অন্তত নবেম্বরটা এখানকার কুয়াশা ভোগ করতে হবে। নবেম্বরটাই লণ্ডনে সকলের চেয়ে দুর্দ্দিন। চিত্রাঙ্গদা মালিনী এবং ডাকঘর তর্জ্জমা করেছি সেইগুলো ছাপাবার জন্যে আমার বন্ধু রোটেনষ্টাইন খুব উৎসাহ করচেন। তা ছাড়া "শিশু" থেকে এবং অন্যান্য বই থেকেও অনেকগুলো তর্জ্জমা করেছি। সব শুদ্ধ নিতান্ত কম জমেনি।

এবার এদেশে বিস্তর চেনা বাঙালী আমদানী হয়েছে। কাল বিমলার ওখানে গিয়েছিলুম। তাঁর মেয়ে মায়ার বড় অসুখ করেছিল— তাই তাঁকে খবর পেয়েই তাড়াতাড়ি ছুটে আস্‌তে হয়েছে। মায়া হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় অনেকটা ভাল হয়ে উঠেছে— তার সম্বন্ধে খুবই আশঙ্কার কারণ হয়েছিল। বিমলাকে আমার বড় ভাল লাগে। কোনো রকম উগ্রতা নেই।

খোকাকে হামি দিস্। ইতি ১০ই আশ্বিন [১৩১৯]।

বাবা

মীরু

তোর চিঠিখানি পেয়ে খুব খুসি হলুম। এখানে এসে অবধি সহরে সহরে বক্তৃতা দিয়ে ছুটে ছুটে বেড়াচ্চি। দেশে চিঠিপত্র লেখার কারবার তুলে দিতে হয়েচে। এক হোটেল থেকে আর এক হোটেলে, এক সহর থেকে আর এক সহরে এই হচ্চে আমার জীবনযাত্রা। যতদিন না দেশে ফিরি ততদিনের জন্যে দেশ আমার কাছে একরকম লুপ্ত হয়ে গেচে। এদেশের ঝোড়ো হাওয়ায় আমার প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে— এক মুহূর্ত্ত এখানে থাকতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু এদের কাছে আমার বলবার কথা আছে নইলে এখানে আমার আসা হতই না। আজকের দিনে পৃথিবীকে যদি সত্যের পথে জাগাতে হয়, তবে সে আমাদের দেশে হবে না। এরা এখনো বেঁচে আছে। এরা আজ সত্যের বিরুদ্ধে লড়াই করচে সেইজন্যে এরাই সত্যের সঙ্গে সন্ধি করবে। আর আমরা চাকরী করব, ভিক্ষে করব, কুইনাইনের বড়ি গিলব আর পিলে বড় করে মরতে থাকব। অতএব যতই কষ্ট হোক্ এখানকার ক্ষেত্রে ঈশ্বর আমাকে জোর করে টেনে আনলেন শেষ বয়সে আমার জীবনের ফসল এইখানেই বুনে যেতে হবে। দেশের গণ্ডী আমার ঘুচে গেছে— সকল

দেশকেই আমার হৃদয়ের মধ্যে এক দেশ করে তুলে তবে আমি ছুটি পাব। আমার নামের সঙ্গে আমার কাজের যোগ আছে। পূর্ব্বদিগন্তে আমার প্রথম জীবনযাত্রা আরম্ভ হয়েছে পশ্চিম গন্তেই আমার জীবনযাত্রার অবসান হবে। নইলে জীবনের অর্দ্ধেকের বেশি সময় বাংলা গদ্য কাব্য লিখে আসচি— হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই ইংরেজিতে গীতাঞ্জলি লিখতে যাব কেন? খামকা একদিন আমার ঘরবাড়ি ইস্কুল ফেলে বিলেতে দৌড়তে যাবার জন্যে কেন এত বড় একটা তাগিদ এল। এর থেকেই বুঝচি আমার জীবনের পথ আমার ইচ্ছা এবং হিসাব অনুসারে তৈরি হবে না— আমাকে যিনি কাজে লাগাবার জন্যে এতদিন ধরে নানা সুখে দুঃখে গড়ে তুলেচেন তিনিই আমাকে নিজে চালনা করে কাজে খাটাবেন। আমার দেশের কাজ নয়— তাঁর জগতের কাজ। কাজেই কোণের মধ্যে বসে থাকা আমার কপালে লেখা নেই।

সুরুলের বাড়িটা তোদের দেবার জন্যে রথীকে টেলিগ্রাফ করে দিয়েচি। ঐখানে তোদের জিনিসপত্র গুছিয়ে ঘরকন্না ফেঁদে বসবি, আমি গিয়ে দেখবো। পুকুরের মাছ, ক্ষেতের ফসল, বাগানের ফল, ঘরের গরুর দুধ দিয়ে তোদের গৃহস্থ ঘরের দৈনিক প্রয়োজন বেশ আরামে চলে যাবে। আমার জন্যে তেতালার ঘরটা রেখে দিস, যখন দেশে ফিরে যাব ঐখানে তোদের সঙ্গে জমিয়ে বসে খোকা আর খুকিকে নিয়ে আমার দিন কাটবে। বেশ বুঝতে পারচি আমার এই শেষ বয়সে তোর

খুকীর প্রেমে গীতিকাব্যের ডুবজলে আমাকে আবার একবার ঝাঁপ দিতে হবে। তাকে দেখবার জন্যে আমার মনটা ব্যাকুল আছে। একটা কথা মনে রাখিস্ ভাদ্র মাস থেকে অগ্রাণ পর্য্যন্ত শান্তিনিকেতনে আমার সেই দোতলা ঘরে আশ্রয় নিস্ নইলে ম্যালেরিয়ার হাত এড়াতে পারবিনে। আমারও মনে হয় সুরুলের বাড়িতে চাষবাস করে শান্তিনিকেতনের বাড়িতে যদি তোরা থাকিস তাহলে মোটের উপরে তোদের পক্ষে স্বাস্থ্যকর হবে। আমি ফিরে গিয়ে শান্তিনিকেতনের বাড়ির আর তুই একটা ঘর বাড়িয়ে নিতে পারব— তোদের থাকবার কোনো অসুবিধা হবে না। Mrs. Moodyর বাড়িতে এসে পৌঁচেছি— সেইখান থেকে তোদের চিঠি লিখচি। খোকা খুকিকে আমার হামু দিস্। ইতি ২২শে অক্টোবর [১৯১২]।

বাবা

মীরু

এবার সমুদ্র পার হতে যে দুঃখ পেয়েছি সে তোকে লিখে আর কি জানাব ! শরীরটাকে অহোরাত্র কসে ঝাঁকানি দিয়ে দিয়ে মহাসমুদ্র প্রাণটাকে অনেকটা আলগা করে এনেছিল— এখনো ডাঙায় উঠেও মনে হচ্চে সেটা নড় নড় করচে। সী সিক্‌নেস্ অনেকবার হয়েছে কিন্তু এমন কখনো হয়নি। আবার এই সমুদ্র ফিরে পার হতে হবে মনে করলে আমেরিকায় স্থায়ী হয়ে যেতে ইচ্ছে করে। তার উপরে আবার জাহাজের যাত্রীগুলোও বড় লক্ষ্মীছাড়া ছিল। কারো সঙ্গে যে ক্ষণকাল আলাপ করে সুখ পাব এমন সম্ভাবনামাত্র ছিল না। অনেকে ছিল যাদের ভাষা আমরা জানিনে— আর যাদের ভাষা আমরা জানতুম তাদের সঙ্গে জানাশুনো করবার প্রবৃত্তি হয়নি। যাই হোক্ আমরা দলে ভারি ছিলুম। সঙ্গে ডাক্তার মৈত্র ছিলেন— গল্প জমাতে তিনি খুব মজ্‌বুৎ, আর একটি বাঙালী সহযাত্রী ছিলেন, গল্প না বল্‌তে তাঁর অসাধারণ শক্তি, তিনি প্যাণ্টুলুনের দুই পকেটের মধ্যে দুই হাত গুঁজে দিয়ে নিঃশব্দে ডেকের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে পদচারণ করে কাটিয়েছেন। আর একজন মারাঠি ছিলেন, তিনি আকারে আয়তনে নিতান্ত ছোট্ট মানুষটি কিন্তু তিমি

মাছের সঙ্গে কেবল একটা বিষয়ে তাঁর মিল দেখা যায়— অহোরাত্র কেবল তিনি ক্যাবিনের মধ্যেই থাকতেন কেবল ক্ষণে ক্ষণে মিনিট পাঁচেকের জন্যে ডেকে উঠে তিমিমাছের মত একবার হুস করে নিশ্বাস নিয়ে আবার পরক্ষণেই ক্যাবিনের মধ্যে তলিয়ে অদৃশ্য হয়ে যেতেন। সমুদ্র যতই শান্ত থাক, দিন যতই সুন্দর হোক্ তিনি তাঁর বিবর ছাড়তেন না। যাক্ শেষকালে কাল কূলে এসে পৌছন গেছে। ইংলণ্ডে বিদেশীদের সুবিধা এই যে, জাহাজ থেকে নাববার সময় কোনো উৎপাত নেই। এখানে মাশুল যাচাইয়ের ঘরে দুটি ঘণ্টা বন্দীর মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভারি কষ্টে গিয়েছে। এখন ত হোটেলে এসে আশ্রয় নিয়েছি। আজ একবার এখানকার কোনো হোমিওপ্যাথ ডাক্তারের খোঁজ নিতে যেতে হবে। তারপরে ওষুধপত্রের জোগাড় করে ইলিনয়ে রথীদের কলেজের দরজায় গিয়ে গট হয়ে বসে পড়ব এই রকম মনে করচি। কিছুদিন নিরালায় চক্ষু বুজে বিশ্রাম করবার জন্যে মনটা অত্যন্ত উৎসুক হয়ে আছে। আমেরিকায় বিশ্রাম জিনিষটা শস্তায় পাওয়া যায় কিনা আমার সন্দেহ হচ্চে— যা হোক্ চেষ্টা করে দেখা যাক। ইলিনয়ের ঠিকানাতেই তোদের সমস্ত খবর দিয়ে চিঠি লিখিস্। ইতি ২৯ অক্টোবর ১৯১২

বাবা

[১৩]
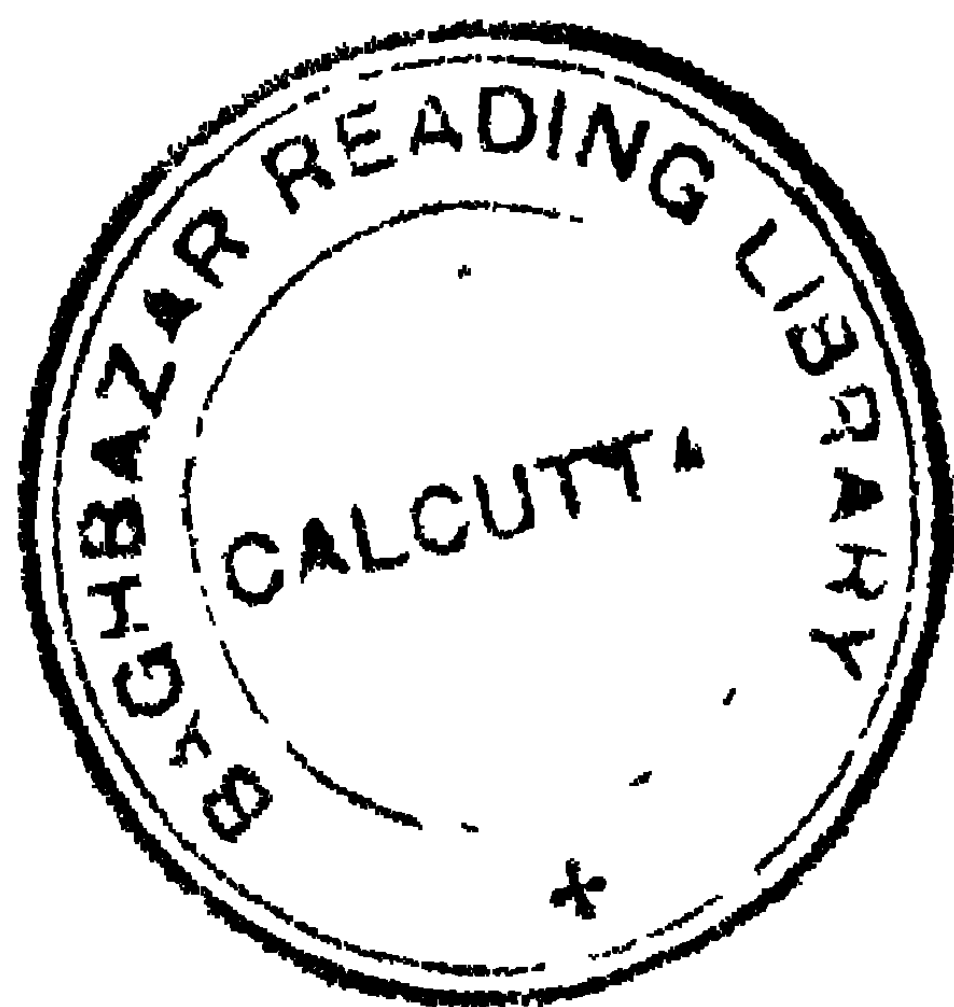
508 W. High Stree:
Urbana, Illinois.
২৫শে পৌষ ১৩১৯

মারু

আজ তোর চিঠি পেয়ে খুব খুসি হলুম। এখানে অনেকদিন পর্য্যন্ত আমরা সূর্য্যের আলো প্রায় অবিচ্ছিন্ন ভোগ করে এসেছি। এতদিন পরে এই জানুয়ারীর আরম্ভে দেবতার ভাবগতিকের একটু পরিবর্ত্তন দেখা যাচ্চে। একদিন বরফ পড়ে বেশ সাদা হয়ে গেল— তারপরে রাতের বেলায় খুব বৃষ্টি সকালে উঠে দেখি সেই রাস্তার উপরে গাছের উপরে একেবারে কাঁচের মত জমে গিয়েছে। রাস্তা এমন ভয়ানক পিছল যে তার উপর দিয়ে চলা শক্ত। দুদিন ধরে তাই ঘরে বন্ধ হয়ে আছি। আজ রোদ্দুর উঠে ভারি চমৎকার দেখতে হয়েছিলো। গাছপালা সমস্ত একেবারে হীরের মত ঝক ঝক করছিল। বিকেলের দিকে আর থাকতে পারলুম না ভাবলুম একবার একটুখানি প্রকৃতির শোভা সন্দর্শন করে আসি। দু পা যেতেই বরফের উপর এমনি পড়া পড়ে গেলুম যে কবিত্ব সুদ্ধ কবি ভেঙে যাবার জো। তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে এসেছি। বরফ না গল্‌লে আমার এই রকম বন্দীদশা।

তোর বৌঠানকে এখন আর নিজের হাতে কাজ করতে হয় না। চাঁদ বলে একজন পাঞ্জাবী ছাত্র আমাদের রেঁধে দেয়, বঙ্কিম বাসন মাজা এবং ঘর ঝাঁটের কাজে নিযুক্ত বৌমা কেবল বিছানা করেন। আর সোমেন্দ্র আহার করে থাকে। এখানে ঘরকন্নার ব্যাপারটা তেমন অত্যন্ত গুরুতর কিছুই নয়— এখানে সমস্ত কাজই প্রায় কল টিপে চলে। বাজার করা টেলিফোনেই হয়ে যায়। দোকানদারেরাই সমস্ত জিনিষপত্র দরজায় পৌঁছে দেয়— এ দেশী রান্নায় বাটনা বাটা কোটনা কোটার জুলুম অতি বৎসামান্য— তারপরে গ্যাসে ইলেকট্রিসিটিতে মিলে রাঁধাবাড়া অতি অল্প সময়ে সম্পন্ন হয়ে যায়। অতএব এখানকার ঘরকন্নার বিদ্যা যে দেশে গিয়ে কাজে লাগবে এমন কথা মনে করিস নে। সেখানে আবার সেই বঁটি নিয়ে বসতে হবে— এবং মোচা ও থোড়ের মুণ্ডপাত করতে কুরুক্ষেত্র করতে হবে। এখানে পান সাজার বালাই একেবারেই নেই। দেশে তোদের সেই এক বিষম সাজা।

আমি New York-এর একজন হোমিওপ্যাথ ডাক্তারের চিকিৎসাধীনে আছি। কিছুদিন ঠিক ওষুধটা বের করতে অনেক হাৎড়াতে হবে— এখনো সেই হাৎড়াবার পালাই চলচে— আশা করচি একটা কোনো ওষুধ খেটে যেতে পারবে।

আমি এবারকার চিঠিতে খবর পেলুম যে আজ পর্য্যন্ত বোলপুরে আমার বইয়ের বাক্স যায়নি। এতে আমি যে কি পর্য্যন্ত বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ হয়েছি সে বলে উঠতে পারিনে। আমি

তাদের বইগুলি পাঠালুম এবং ইচ্ছা করলুম যে সেখানে সেগুলি কাজে লাগে— অথচ তারা পেলই না, এ ত নিদারুণ অন্যায়! এ যে কার দোষে হোলো, আমি আজ পর্য্যন্ত খবরই পেলুম না। এ যদি গোপালের শৈথিল্য হয় তাহলে সে অমার্জ্জনীয় কেননা জগদানন্দরা তাকে তাগিদ দিতে ত্রুটি করেনি। এ যদি আর কারো কাজ হয় তবে সেও গুরুতর অন্যায়। আমি ত এরকম ব্যবহার প্রত্যাশা করতেই পারিনে। যাকে আমি যে জিনিষটা দেব সে সেটা পাবেই না, অন্যে সেটা অবরুদ্ধ করে রাখবে এমন অদ্ভুত অধিকারও আমি কাউকেই দিইনি। আমার কাছে এটা অপমানকর বলে মনে হয়। তোরা কলকাতায় আছিস এ সম্বন্ধে সন্ধান করে ঠিক খবরটা আমাকে জানাবি এবং যথোপযুক্ত প্রতিকার করতে একমুহূর্ত্ত বিলম্ব করবিনে। আজ আমি দেড়মাস ধরে এইটে সম্বন্ধে প্রতি মেলেই নিরুপায় ভাবে বেদনা পাচ্চি— কিছু বুঝ্‌তেও পাচ্চিনে কিছু করতেও পারচিনে। খোকাকে হামি দিস্।

বাবা

পুঃ

বেয়ানকে আমার সাদর নমস্কার জানাস্

2970 Groveland Avenue
Chicago

নীরু

আমরা কিছুদিনের জন্যে আর্ব্বানা থেকে বেরিয়ে পড়েছি। রচেষ্টার বলে একটা সহরে আমার বক্তৃতার নিমন্ত্রণ আছে সেখানে যেতে হবে। নিতান্ত কাছে নয়। এ দেশটা এত প্রকাণ্ড বড় এবং ঢিলে যে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাওয়া বিষম ব্যাপার। ভেবে দেখ না, আমাদের দেশে বম্বাই থেকে খামকা কলকাতার লোককে বক্তৃতা করতে নিমন্ত্রণ করা কারো মনেও আসে না। অবশ্য এরা আমাকে পথ খরচ দেবে। কিন্তু কুড়ি মিনিটের বেশি বলতেই দেবে না। কেননা আরো অনেক বক্তা আছে। কুড়ি মিনিটের বকুনির জন্যে দেড়শো দুশো টাকা দিয়ে মানুষকে হাজার মাইল দূর থেকে ডাক পাড়া পাগলামি বল্লেই হয়। প্রথমে আমি অস্বীকার করেছিলুম— কিন্তু তোরা ত জানিস শেষ পর্য্যন্ত আমার অস্বীকার টেঁকেনা। পীড়াপীড়ি এড়াতে পারিনে। বিশেষত এই সভায় Dr. Eucken বক্তৃতা করবেন, এবং তিনি আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে বিশেষ ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। Dr. Eucken এবং Bergson এঁরা দুজনে এখন য়ুরোপের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান দার্শনিক। গীতাঞ্জলি পড়ে Eucken আমাকে

ভারি সুন্দর একটি চিঠি লিখেছেন। এখানে শিকাগো য়ুনিভার্সিটিতে Ideals of the Ancient Civilisation of India তে একটা বক্তৃতা দিয়েছিলেম সেটা এদের খুব ভাল লেগেচে। কাল আর এক জায়গায় Problems of Evil সম্বন্ধে বল্‌তে হবে। রচেষ্টার থেকে বষ্টন প্রভৃতি জায়গায় ঘুরতে হবে। তারপরে ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি আর্ব্বানায় ফেরবার কথা আছে। এখানে Mrs. Moodyর বাড়ীতে আছি। তিনি আমাদের খুব যত্ন করেন। এমন স্বাভাবিক মাতৃভাব অল্পই দেখতে পাই। তিনি আমাকে ধরে বসেছেন তাঁর সঙ্গে নিউইয়র্ক কালিফর্ণিয়া প্রভৃতি স্থানে ঘুরে বেড়াই লোভ হচ্চে কিন্তু আমার পক্ষে শেষকালে ক্লান্তিকর হবে কিনা তাই ভাবছি। তিনি চান আমি নিউইয়র্কে গোটা কতক বক্তৃতা করি। দেখা যাক্ কি হয়। তুই নগেনকে বলিস আমি অগ্রাণ পৌষ দুই মাসেরই তত্ত্ববোধিনী পাইনি— গ্রাহক হলে বোধ হয় পেতুম, কিন্তু সম্পাদক হয়ে এমনিই কি গুরুতর অপরাধ করেছি? বলিস পত্রিকা পাঠাবার সময় মোড়কটা যেন মোটা রকমের হয়— মোড়কে ব্যয় সংক্ষেপ করলে সস্তা হয় না কারণ কাগজটাই খোওয়া যায়। ইতি ২২শে জানুয়ারী [১৯১৩]

বাবা

পুঃ নগেনকে নিশ্চয়ই ভাল জায়গায় কোথাও কিছুদিনের জন্যে changeএ পাঠানো দরকার হবে। আমাদের সেই শৈলধাম কি রকম?

[Urbana
মার্চ্চ ১৯১৩]

মীরু

আমাদের এখান থেকে যাবার সময় আসন্ন হয়ে এল। এপ্রেল মাসের মাঝামাঝি আমরা আটলাণ্টিকে পাড়ি দেব এবং হয় তো ২০শে নাগাদ লণ্ডনে গিয়ে পৌঁছব। সেখানে আমার বই ছাপাবার বন্দোবস্ত করতে হবে। বইয়ের খোরাক অনেক জমে উঠেচে— এক ভল্যুমের মধ্যে সব যাবে কিনা আমার সন্দেহ আছে। দেখা যাক কি হয়। আপাতত রথী এইগুলো সমস্ত টাইপরাইটরে কপি করতে প্রবৃত্ত হয়েচে। শীঘ্রই এখানকার লীলা সম্বরণ করতে হবে বলে রথী তার কলেজের পড়া ছেড়ে দিয়েচে সুতরাং এখন তার হাতে সময় যথেষ্ট আছে।

বৌমা বেহালা শিখতে আরম্ভ করেছিলেন কিন্তু বেহালা ত অল্প দিনের মামলা নয়— সুতরাং ফিরে এসে সেটাও ত্যাগ করতে হল। বৌমার শেখার মধ্যে একটা শনির দৃষ্টি আছে— যা কিছু আরম্ভ করেন খানিক দূরে গিয়ে বাধা পড়ে যায়। এখানে একজন মেয়ের কাছ থেকে ইংরেজি শিখতে আরম্ভ করেছিলেন— তাও বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু শিকাগো, বষ্টন, নিউইয়র্ক প্রভৃতি ঘুরে আসা ওঁর পক্ষে একটা কম শিক্ষা নয়।

সেটাতে ওঁর যথেষ্ট উপকার হয়েছে বলে আশা করচি। অনেক বন্ধুলাভ হয়েছে। রথীর পক্ষে এইবারই যথার্থ আমেরিকায় আসা সার্থক হল। আর বারে ছাত্রের মত কেবলমাত্র এই কুণো সহরের মধ্যেই ওর দিন কেটেছে। এদেশে রথীর চেহারার প্রশংসা অনেকের কাছেই শুনতে পাই— সেদিন এখানকার একজন অধ্যাপকের স্ত্রী বলছিলেন most beautiful face. ইংলণ্ডেও ওর সৌন্দর্য্যের খ্যাতি অনেক শুনেছি। আজ তোর সুরেনদাদার এক চিঠি পেলুম। তাতে লিখেছে মে মাসে সুরেন সম্ভবত ইংলণ্ডে আসবে। তাহলে আমি ত খুব খুসি হব। এদেশে এলে ওর কাজের হয় তো অনেক সুবিধা হতে পারবে। অন্নপ্রাশনে তোর খোকার বর্ণনা শুনে তাকে দেখবার জন্যে আমার খুব লোভ হচ্চে। ও কি বক্তৃতা করবার কোনো রকম আয়োজন এখনো সুরু করে দেয়নি? ওর রসনাটি কি কেবলমাত্র ভোজন ব্যাপারেই একাগ্রভাবে নিযুক্ত? নগেন্দ্রের শরীর যদি এখনো দুর্ব্বল থাকে তাহলে কিছুদিনের জন্যে কেন একবার রামগড়ে বেড়িয়ে আসে না? সেখানে বাড়ি তো পড়ে আছে। ম্যালেরিয়ার পক্ষে উঁচু পাহাড়ের হাওয়াই সব চেয়ে ভাল।

বাবা

মীরু

আমরা আটলান্টিক পার হয়ে লণ্ডনে এসে পৌঁচেছি। যে জাহাজে আমরা এসেছি সেটা বোধ হয় আজকাল পৃথিবীর সকল জাহাজের চেয়ে বড়। যে ডেকে আমাদের ক্যাবিন ছিল সেটা হচ্চে পাঁচতলার ডেক— অর্থাৎ তার উপরের আরো চারতলার ডেক আছে— আবার আমাদের ডেকের নীচেও আরো অনেক ডেক। এর থেকে বুঝতে পারবি জাহাজটা উঁচুতে আমাদের জোড়াসাঁকোর বাড়ির চেয়েও বেশি — আর লম্বায় এক মাইলের পঞ্চম ভাগ, অর্থাৎ শান্তিনিকেতনের বাড়ি থেকে বাঁধ পর্য্যন্ত হবে। তা ছাড়া এর মধ্যে আরামের আমোদের আহারের বিহারের যে কত বিচিত্র ও প্রচুর ব্যবস্থা আছে সে বলে শেষ করা যায় না। কেবলমাত্র ছদিনের জন্যে এত হাঙ্গামা করবার কি যে দরকার আছে আমরা ত তা ভেবেই পাই না। এবারে সমুদ্রে দোলা নিতান্ত কম দেয়নি— কিন্তু জাহাজটা প্রকাণ্ড বলে তাকে কাবু করতে পারেনি— আমার এবার এক দিনের জন্যেও সীসিক্‌নেস্ হয়নি। লণ্ডনে এসে পৌঁছে সুরেনের সঙ্গে দেখা হয়েছে— সে প্রায় রোজই আমাদের হোটেলে আসে।

আমেরিকায় থাক্‌তে সমস্ত শীতকালটাই প্রায় অবিচ্ছেদে আমরা রোদ্দুর পেয়েছি— এখানে এসে অবধি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন এবং প্রায়ই কিছু না কিছু বৃষ্টি বাদ্‌লা চল্‌চেই— এইটেতে আমাকে বড় দমিয়ে দেয়। এবার আমাদের পয়লা বৈশাখ সমুদ্রের মাঝখানে দেখা দিয়েছে— সকাল বেলায় যখন সব যাত্রীরা ক্যাবিনে পড়ে ঘুমুচ্চে তখন আমরা তিনজনে সেলুনের এককোণে বসে নববর্ষের উপাসনা করলুম। যতদিন থেকে আমার ইস্কুল হয়েছে— পয়লা বৈশাখটা বরাবর সেইখানেই সম্পন্ন করেছি। —এগারো বৎসরের মধ্যে এইবার প্রথম বাদ পড়ল।

আমরা শিকাগো থেকে নিউইয়র্কে আস্‌বার পথে নায়েগ্রা ফল্‌স্‌ দেখে এসেছি। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে সেদিন ঘোরতর মেঘ বৃষ্টি বরফপাত চলছিল—গত দু তিন হপ্তা দেশের কোনো চিঠি পাইনি। সব চিঠি বোধ হয় রোটেনস্টাইনের ওখানে জমেচে। তিনি কিছুদিন লণ্ডন থেকে অন্যত্র গেচেন বলে চিঠিগুলো আট্‌কা পড়ে আছে। আজ তাঁর ফিরে আস্‌বার কথা। খোকাকে আমার চুমো দিস্‌।

বাবা

[১৭]

16, More's Garden
Chegne Walk, S. W, London
[জুন ১৯১৩]

মীরু

অনেকদিন তোদের চিঠিপত্র পাইনি। এখন তোরা কোথায় আছিস্ কে জানে। এখনো কি Waltair এ আছিস্ না কি? Mrs. Moody আমেরিকা থেকে এসেছেন। লণ্ডনে Thames নদীর ধারে তাঁর একটি বাসা আছে সেইখানে আমরা তাঁর সঙ্গে আছি। সুরেন এতদিন লণ্ডনে ছিলেন তিনি এই মেলেই দেশে ফিরে যাচ্ছেন এই চিঠির সঙ্গে সঙ্গেই দেশে গিয়ে পৌঁছবেন। আমি যদি তাঁর সঙ্গে ফিরতে পারতুম তাহলে খুসি হতুম—কিন্তু আমার এখানকার বন্ধন এখনো কাটেনি। প্রথমত এখনো আমার বইগুলো ছাপাবার ব্যবস্থা শেষ করতে পারিনি। আমার কবিতার manuscripts য়েট্‌সের হাতে আছে—আমার বক্তৃতাগুলোর কপি আর একজনের হাতে—সেগুলোর সংশোধন ও নির্ব্বাচন হয়ে গেলে প্রকাশকদের হাতে দিতে পারব। আগামী শরৎ ঋতুতে তারা ছাপাতে চায়। তারপরে জুলাই মাসের শেষাশেষি আমার ডাকঘর নাটকের তর্জ্জমাটা এখানকার ষ্টেজে অভিনয় হবে। তার রিহার্সালটা

আমাকে দেখে দিতে হবে। তারপরে আবার আর এক উৎপাত আছে— ডাক্তাররা আমার অর্শের জন্য অস্ত্রচিকিৎসার পরামর্শ দিয়েছে। খুব সম্ভব আগামী সোমবারে operation হবে। তাহলে তারপরে অন্তত তিন সপ্তাহ আমাকে nursing home-এ পড়ে থাকতে হবে। এ কয়দিন আমার কোনো চিঠিপত্র পাবিনে। সেইজন্যে তার আগে এই চিঠি লিখে রাখচি। সমস্ত হিসাব করে দেখ্‌তে পাচ্চি অক্টোবর মাসের পূর্ব্বে দেশে যাত্রা করা ঘটে উঠ্‌বে না। এখন বর্ষা এবং গরমের মধ্যে দেশে যাওয়াও আরামের হবে না। একবার কথা হচ্ছিল রথীরা আমার আগেই ফিরে যাবে— কিন্তু ওরা গেলে আমার এখানে কাজ চলা শক্ত সেইজন্যে এই তিন চার মাস তাদের রাখ্‌তে হল। বৌমা সেইজন্যে আবার একজন শিক্ষয়িত্রীর কাছে পড়াশোনা আরম্ভ করে দিয়েছেন। এখন তিনি এক রকম কাজ চালানো মত ইংরেজি চালিয়ে দিতে পারেন। এই দেড় বছরে তাঁর যেটুকু ইংরাজি সহজে আয়ত্ত হল— দেশে থেকে পাঁচ বছর পরিশ্রম করলেও তা হতে পারত না। এখানে ওঁর সেই tonsilটা কাটাবার কথা হচ্চে। খোকার খবর কি? তার সেই eczema কি কিছু সারবার দিকে গেছে? তার ছবি দেখে আমার ভারি মজা লাগে। তাকে আমার হামি দিস্।

বাবা

[১৮]

[লণ্ডন
জুলাই (?) ১৯১৩

কল্যাণীয়াসু

মারু, তোর খোকার হাঁ করা হাবলা ছবিটা mantle piece এর উপর আছে— সেটা প্রায়ই আমার নজরে পড়ে এবং ওকে দেখবার জন্যে আমার মনটা উতলা হয়। ওর Eczema সেরে গেছে অথচ ওর শরীর খারাপ হয়েছে লিখেছিস্। ডাক্তারি বই দেখলেই জানতে পারবি Eczema বসে গেলে শরীর ভারি অসুস্থ হয়— অল্পেতেই অসুখ বিসুখ করতে থাকে। এই জন্যে তাড়াতাড়ি Eczema সারানো ভাল নয়। Sulphur 260 আনিয়ে দুটো বড়ি খোকাকে খাইয়ে দিস্। তারপরে আবার এক মাস অপেক্ষা করে আবার খাওয়াস্। Eczema যদি বসে গিয়ে থাকে তবে Sulphur এ সেই দোষ নিবারণ করবে।

আমার অপারেশন চুকে গেল। প্রথম কয়েকটা দিন খুব দুঃখ পেতে হয়েছিল। ব্যারামটা কষ্টকর বটে কিন্তু চিকিৎসাটাও বড় আরামের নয়। কিন্তু প্রথম সপ্তাহের পর থেকে nursing home এ নিতান্ত মন্দ ছিলুম না। লোকজনের নিয়ত উৎপাত থেকে ঐ কটা দিন রক্ষা পেয়ে বিশ্রাম করতে পেরেছিলুম। বিছানায় পড়ে পড়ে দুঘণ্টা অন্তর আহার করা যেত আর বই

পড়তুম এবং কিছু কিছু লেখাও চলত। সেবা শুশ্রূষার ব্যবস্থা খুব ভালই। যাঁরা বিশেষ বন্ধু তাঁরা মাঝে মাঝে দেখা করতে আসতেন। এখনো অল্প একটু উপসর্গ বাকি আছে। সেজন্যে আজ ডাক্তারের ওখানে গিয়েছিলুম। বিষম দুঃখ দিলে। অজ্ঞান অবস্থায় কাটাকাটি করেছিল সেটা টের পাইনি— কিন্তু সজ্ঞান অবস্থায় যখন উপদ্রব তখন বড় অসহ্য বোধ হয়। যাই হোক্ বোধ হচ্চে ত অর্শের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া গেল। চিরকালের মত কিনা তা নিশ্চয় বলা যায় না। কেননা অপারেশনের পরেও কারো কারো আবার হয়। কিন্তু অন্তত চার পাঁচ মাসের মত ছুটি পাওয়া গেল আশা করচি। তোদের খড়গপুরের রাস্তা দিয়ে একদিন যেতে হবে। কবে তা নিশ্চয় বলতে পারচি নে। বোধ হচ্চে অগ্রাণের মাঝামাঝি গিয়ে পৌঁছতে পারবো। কার্ত্তিকটা না কাটিয়ে যেতে সাহস হচ্চে না। সুতরাং আর তিন মাস মেয়াদ আছে। ইতিমধ্যে আমার বই ছাপানোর বন্দোবস্ত কতকটা গুছিয়ে দিয়ে যেতে পারবো। একটা কবিতার বই এবং বক্তৃতাগুলো ছাপাখানায় দেওয়া গেছে। ও দুটো অক্টোবরে বের হবার কথা। তারপরে 'শিশু'র তর্জ্জমাটা Christmas Publication এর Seasonএ বেরবে।

বৌমার সেই tonsil এবং adenoid কাটানো হয়ে গেছে সে খবর নিশ্চয় পেয়েছিস্। এখন সে ভালই আছে।

বাবা

[১৯]

C/o Messrs. Thomas Cook & Sons
Ludgate Circus
ওঁ London
[Aug (?) 1913]

মীরু

তোরা সমুদ্রের ধারে বসে সমুদ্রের হাওয়া খেয়ে মনের আনন্দে এবং শরীরের স্ফূর্ত্তিতে আছিস্ শুনে খুব খুসী হলুম। কিছু দীর্ঘকাল সেখানে থেকে বেশ ভাল রকম করে শরীরটা সুস্থ করে গরমের দিন কাটিয়ে কলকাতায় ফিরলেই ত ভাল হয়। তোর চিঠিতে খোকার কথা শুনে প্রত্যেকবারেই তাকে দেখ্‌বার জন্যে আমার মনটা ব্যস্ত হয়ে ওঠে। ঠিক কবে যে আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হবে তা এখনো নিশ্চয় বল্‌তে পারিনে। কেননা এখনো আমার কাজ সম্পূর্ণ সমাধা হয়নি। হতে কর্‌তে হয়ত আরো মাসখানেক কেটে যাবে। এদিকে বর্ষা এসে পড়ল। সমুদ্র এখন অশান্ত এবং দেশে এখন গুমোটের পালা। তাই বোধ হচ্চে যেন নবেম্বরের পূর্ব্বে আমার যাত্রা ঘটে উঠ্‌বে না। কিন্তু কিছুই বলা যায় না। কারণ, যাবার জন্যে মনটা উতলা হয়ে উঠেছে। এখানকার লোক সমাজের টানাটানিতে আমার মনের ভিতরটাতে অত্যন্ত ক্লান্তি এসেছে। আমাদের দেশের জনশূন্য

নিভৃত কোণটির মধ্যে কিছুদিন চুপচাপ করে বসে থাক্‌তে পারি তাহলে হাড়গুলো জিরয়। কিন্তু আবার ভাবি সেখানে গিয়ে নানা ঝঞ্ঝাটের মধ্যে গিয়ে পড়্‌তে হবে— তা ছাড়া এবার ফিরে গেলে সেখানে মানুষের ধাক্কা পূর্ব্বের চেয়ে অনেক বেশি বেড়ে যাবে— তার থেকে নিজেকে বাঁচানো আমার পক্ষে ভারি শক্ত হবে— এর ওপরে আবার আমার সমালোচক বন্ধুদের দল আছে— তাদের কণ্ঠস্বর নিশ্চয়ই পূর্ব্বের চেয়ে আরো অনেক উচ্চতর সপ্তকে চড়বে। মানুষকে উদ্‌ভ্রান্ত করে তোলবার উপকরণ সেখানে যে কিছু কম আছে তা বল্‌তে পারিনে। তাহোক তবু সমস্ত স্বীকার করে নিতে হবে— নিজের বাসা ছেড়ে কোথায় বা ঘুরে বেড়াব।— এবার আমার বক্তৃতাগুলো পুস্তকাকারে ছাপাবার বন্দোবস্ত করা যাচ্চে— বোধ হয় আগামী শরৎকালের মধ্যে বেরিয়ে যাবে। এই বক্তৃতাগুলি এখানকার লোকের ভাল লেগে গেছে— এদেশে এবং আমেরিকায় বিক্রী হবার সম্ভাবনা আছে। আমার ডাকঘরের ইংরেজী তর্জ্জমাটা শীঘ্রই লণ্ডনে অভিনয় হবার আয়োজন হচ্চে। আইরিশ থিয়েটার ওয়ালারা এটার অভিনয় করবে। এরা খুব চমৎকার অভিনয় করতে পারে। বোধ হয় ভালই করবে। রাজার ইংরেজীটা এখানকার লোকের ভাল লাগ্‌চে কিন্তু এটা অভিনয় করা শক্ত।

বাবা

কল্যাণীয়াসু

মীরু, এবার কালীগ্রাম ও বিরাহিমপুর ঘুরে কাল কলকাতায় ফিরে যাচ্চি। সেখানে দুই একদিন থেকেই বোলপুরে যাব—বোলপুরে এবার শারদোৎসব হবার কথা আছে— হয়ে উঠবে কিনা জানিনে। পিয়ার্সন এণ্ড্রুজের সঙ্গে ফিজি দ্বীপে কুলি-দাসত্ব তদন্ত করবার জন্যে যাচ্চে। তার ফিরে আসতে মাঘ মাসের কাছাকাছি হবে শুনতে পাচ্চি। পিয়ার্সন গেলে বিদ্যালয়ে মস্ত একটা ফাঁক পড়বে। যাহোক্ ইতিমধ্যে তার বাড়িটা তৈরি হয়ে যাবে। ফিরে এসে নিজের ঘরে সিংহাসন দখল করে বসতে পারবে। নিশিকান্তরা চলে গেলে কিছুদিন তোদের খুব একলা ঠেকবে। যাহোক Sweatenhamরা তোদের প্রতিবেশী আছেন এটা তোদের খুব সুবিধে হয়েচে। তুই কি পাহাড় ভেঙে তাদের ওখানে হেঁটে উঠতে পারিস ?

তোর শরীর কেমন আছে ? খোকাই বা কেমন আছে ? এবারকার অতিরিক্ত বাদ্‌লাটা ধরে গেলে শরৎকাল বোধ হয় খুব রমণীয় হয়ে উঠবে।

আমাদের এদিকে বৃষ্টির পালা শেষ হয়ে গিয়ে শরতের রোদ্দুর বেশ ফুটে উঠেচে। গোরাই পদ্মা মিলে এক হয়ে

গেছে। মাঝখানের চরে পাড়াগুলো কেবল ভাস্‌চে আর সমস্ত ডুবে গিয়েছে। ভেবেছিলুম বোট নিয়ে নদীতে কোথাও থাক্‌ব। কিন্তু বোট বেঁধে রাখবার ভালো জায়গা কোথাও নেই বল্লেই হয়। তাই শিলাইদহের সেই তেতালার ঘরটাতেই আশ্রয় নিয়েচি। আলু তোদের ওখানে কেমন আছে বল্‌ত? উৎপাত করে না ত? কাজকর্মে কিছু সাহায্য করে? যদি গোলমাল করে তাকে ভালুক শিকারে পাঠিয়ে দিস্‌।

আমাদের বোটের তপ্‌সি মাঝি বেচারা মারা গিয়েচে খবর পেয়েছিস্‌ কি? তার লিভারে ফোড়া হয়েছিল। এখানকার ডাক্তারের অযত্নে যখন সে মর মর তখন তাকে কলকাতায় মেয়ো হাঁসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেইখানে সে মরেচে। আমাদের মুস্কিল হয়েচে। বোটের কাজে তপসিটাকে বরাবর এমনি অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল যে আর কাউকে তেমন পছন্দ হয় না। বিশ্বনাথ চামরু ফটিক তপ্‌সি একে একে সব কটা পুরোনো লোক গেছে। সোনা বুড়োটা এখনো টিকে আছে।

আমি এবার দুই পরগণা থেকে একশো টাকা নজর পেয়েছি— খোকাকে আমার হামু দিস্‌। ইতি ২৩শে ভাদ্র ১৩২২

বাবা

মীরু

তোর শরীর ভাল নেই, জ্বর হয়েচে শুনে মন উদ্বিগ্ন হয়ে আছে কেমন থাকিস্ যেন খবর পাই।

আমরা কাশ্মীর ঘুরে এলুম। আমার ত কিছুমাত্র ভাল লাগল না— আমি যেখানে যাই কেবলি গোলমাল— লোক-জনের উৎপাত থেকে একদণ্ড নিষ্কৃতি নেই। শ্রীনগরে নৌকোয় ছিলুম— কিন্তু একটুও শান্তি বা আনন্দ পাইনি বলে তাড়াতাড়ি পালিয়ে এলুম। এখন মনে হয় এর চেয়ে রামগড়ে গেলে শরীর মনের বিশ্রাম পাওয়া যেত। যা হোক্ কাশ্মীরটা না দেখলে মনে একটা আক্ষেপ থেকে যেত সেইটে কেটে গেল এইটুকুই যা লাভ। আসলে আমার পদ্মার বালির চরে বোটের কাছে কেউ লাগে না—সেখানে নির্ম্মল আকাশ, নির্ম্মল নদী, নির্ম্মল নদীতীর, নির্ম্মল অবকাশ— সেই আমার ঠিক মনের মত। কেবল ওখানে বিষয় কর্ম্মের যে গন্ধ আছে সেইটেতে আমাকে তাড়া দেয়— নইলে সেই জলের ধারে চুপচাপ করে পড়ে থাকতুম। ভারতবর্ষে কোথাও আমাকে স্থির থাকতে দেবে না। মনে করচি আবার একবার সমুদ্র পাড়ি দেব— এখন য়ুরোপে যাওয়া মিথ্যা— প্যাসিফিক পাড়ি দিয়ে জাপান হয়ে

এমেরিকায় যাবার ইচ্ছা আছে। এমেরিকাটা ভারী গোলমালের জায়গা বটে কিন্তু সেখানে Mrs. Moody প্রভৃতি কোনো একজনের আশ্রয় নিলে সেই আর সবাইকে ঠেকিয়ে রাখবে। এবার আর রথীদের নিয়ে যাব না— ওদের ত সংসার স্থিতি চাই— আমার সঙ্গে ঘুরে বেড়ালে চল্‌বে কেন। আমার একজন সঙ্গী খুঁজে বের করবার চেষ্টায় আছি।

খোকার শরীর ওখানে ভাল আছে ত? দিল্লি সহরটা স্বাস্থ্যকর জায়গা নয় বলেই ভাবনা হয়। ওখানে ম্যালেরিয়া জ্বরের উৎপাত যথেষ্ট আছে। নিশিকান্ত বাবুদের পরিবারে ত অনেকদিন থেকেই রোগ লেগে আছে— ওঁদের প্রতিবেশীদেরও ত সেই দশা। আমার বোধ হয় তুই একটু সেরে উঠ্‌লেই ওখান থেকে যদি একদম বোলপুরে চলে আসিস্‌ ত ভাল হয়। শীতকালটা বোলপুরে বেশ ভালই থাকবি।

এখানে এসে দেখি এখনো শীতের কোনো আভাসমাত্র নেই— এখনো পাখা চালাতে হচ্চে। আজ খুব মেঘ করে এসেচে— হয়ত দুই একদিনের মধ্যে একটা ঝড় ঝাপট হয়ে যেতে পারে— তারপরে শীত পড়তে আরম্ভ হবে।

এই আসন্ন বাদলার ঝোঁকটা কেটে গেলে পর মনে করচি একবার শিলাইদহে যাব। সেখান থেকে বোটে করে ধীরে ধীরে পতিসরে যাবারও ইচ্ছা আছে— অনেকদিন বোলপুরের মাঠে কেটেচে— বাংলা দেশের নদীপথে বেড়ানো হয়নি।

আজ অষ্ট্রেলিয়া থেকে পিয়ার্সন এণ্ড্রুজের চিঠি পেয়েচি।

পিয়ার্সন বেচারার একজন পরম বন্ধুর যুদ্ধে মৃত্যু হয়েচে। ওরা যে কবে ফিরবে সে খবর দেয়নি। বোধ হয় হতে করতে মাঘ-ফাল্গুন এসে পড়বে।

খোকাকে আমার হামি দিস্— তাকে দেখবার জন্যে আমার মন উৎসুক হয়ে আছে। ইতি ১৯শে কার্তিক ১৩২২

বাবা

২২

শিলাইদহ

[অগ্রহায়ণ ১৩২২]

মারু

এবার কাশ্মীরে শরীর ভাল ছিল না— বড়ই ক্লান্ত হয়ে ফিরেচি। তাই শিলাইদহে কিছুদিন বিশ্রাম করতে এলুম। শিলাইদহের মত এমন মনের মত জায়গা আর তো কোথাও দেখলুম না। আমার সেই ছাদের ঘরে একলাটি বসে উত্তর দিকের খোলা দরজার ভিতর দিয়ে মাঠের উপর দিয়ে দূরে পদ্মার জলরেখা এবং চরের গাছের শ্রেণী দেখতে পাচ্চি— ভারি ভাল লাগচে। কলকাতায় গরম পেয়েছিলুম— এখানে অল্প অল্প শীতের হাওয়া দিচ্চে— কাঞ্চন ফুলে গাছ ভরে গিয়ে দূর পর্য্যন্ত তার গন্ধ আসচে— আকাশে আলোতে হাওয়াতে পাখীর গানে ফুলের গন্ধে আমার চারিদিক এবং আমার মগজের ভিতরটা পর্য্যন্ত ভরে গিয়েছে— এত শান্তি এত সৌন্দর্য্য আর কোথাও নেই।

তোর আর খোকার জন্যে আমার মন উদ্বিগ্ন হয়ে আছে। দুদিন তোদের কোনো খবর ছিল না— আসবার দিন টেলিগ্রাফ করে খবর পেয়েচি তোরা অপেক্ষাকৃত ভাল আছিস্। কিন্তু বোধ হয় ঠিক আরাম হতে পারিস্‌নি। রথী হয় ত এ সম্বন্ধে

চিঠি পেলে আমি জানতে পারব। কিন্তু ইতিমধ্যে তোরা আর বেশিদিন দিল্লিতে না থেকে একবার এলাহাবাদে সত্যদের ওখানে যানা কেন। তারপরে শীত একটু জম্‌লে যদি বোলপুরে আসতে চাস ত সেত সোজা— নইলে আর যে-কোনো জায়গায় খুসি যেতে পারিস। দিল্লিতে কখনই তোদের শরীর ভাল থাকবে না।

বাবা

[২৩]

শান্তিনিকেতন

৯ই পৌষ ১৩২২

মীরু

তোদের জন্যে আমার মন উদ্বিগ্ন আছে। আবার বোম্বাই পুণা অঞ্চলে প্লেগের উপদ্রব আছে বলেও ভাবনা হয়। পুণা সহরটা ত বেশ সুন্দর জানি— আমরা কিছুদিন ওখানে ছিলুম। কিন্তু ওখানকার স্বাস্থ্য বোধ হয় তেমন ভাল নয়। যাহোক্ ভেবে কোনো লাভ নেই— ঈশ্বর তোদের মঙ্গল করুন।

৭ই পৌষের উৎসব বেশ হয়ে গেল। বেশ বুঝতে পারি এই উৎসবে আমাদের প্রয়োজন আছে— এতে সম্বৎসরের স্নান হয়। পুরোণো ছাত্র এবার অনেক জমেচে। দেবল বিলেত থেকে ফিরে এসেচে। সে এখন কলকাতায় আমাদের শিল্প বিদ্যালয়ে মূর্ত্তিগড়ার কাজ শেখাবার ভার নিয়েচে। এরা সবাই মিলে কাল ৮ই পৌষে আশ্রমসঙ্ঘের একটা উৎসব করলে। আজ সকালে পরলোকগত ছাত্র ও অধ্যাপকদের শ্রাদ্ধসভা ছাতিমতলায় হল। ভেবেছিলুম ৭ই পৌষ সেরেই পণ্ডিসরের কাজ দেখতে যাব। কিন্তু ৩০ ডিসেম্বরে গবর্মেণ্ট হাউসে আমাকে নিমন্ত্রণ করেচে— কাটাতে অনেক চেষ্টা করেও হল না। তাই বোধ হচ্চে দিনদশেক এই রকম গোলেমালে

কেটে যাবে। ভাল লাগ্‌চে না। একটু বিশ্রাম করতে চাই ; সে আমার কপালে নেই। দেশ না ছাড়লে দেশও আমাকে ছাড়বে না। সুকেশী বৌমা বলছিলেন তোরা যদি আসিস এখানে থাকবার কোনো অসুবিধা হবে না। আমি কিছুদিন বোটে বেড়িয়ে মনে করচি দক্ষিণ ভারতে ভ্রমণ করতে বেরব। যদি তোরা ততদিন ওখানে থাকিস্ তাহলে তোদের সঙ্গে সেইখানেই দেখা হতে পারে। কিন্তু খোকার শরীর যে রকম দেখচি তাতে বোধ হয় তাকে নিয়ে এখানে এসে পড়লে শান্তি ও স্বাস্থ্যলাভ করবি। এখানে তোদের জন্যে আরো দুই একটা ঘর বাড়িয়ে নেওয়া যেতে পারে।

বাবা

।২৪।

শান্তিনিকেতন
পোস্টমার্ক Janu : 1916

মারু
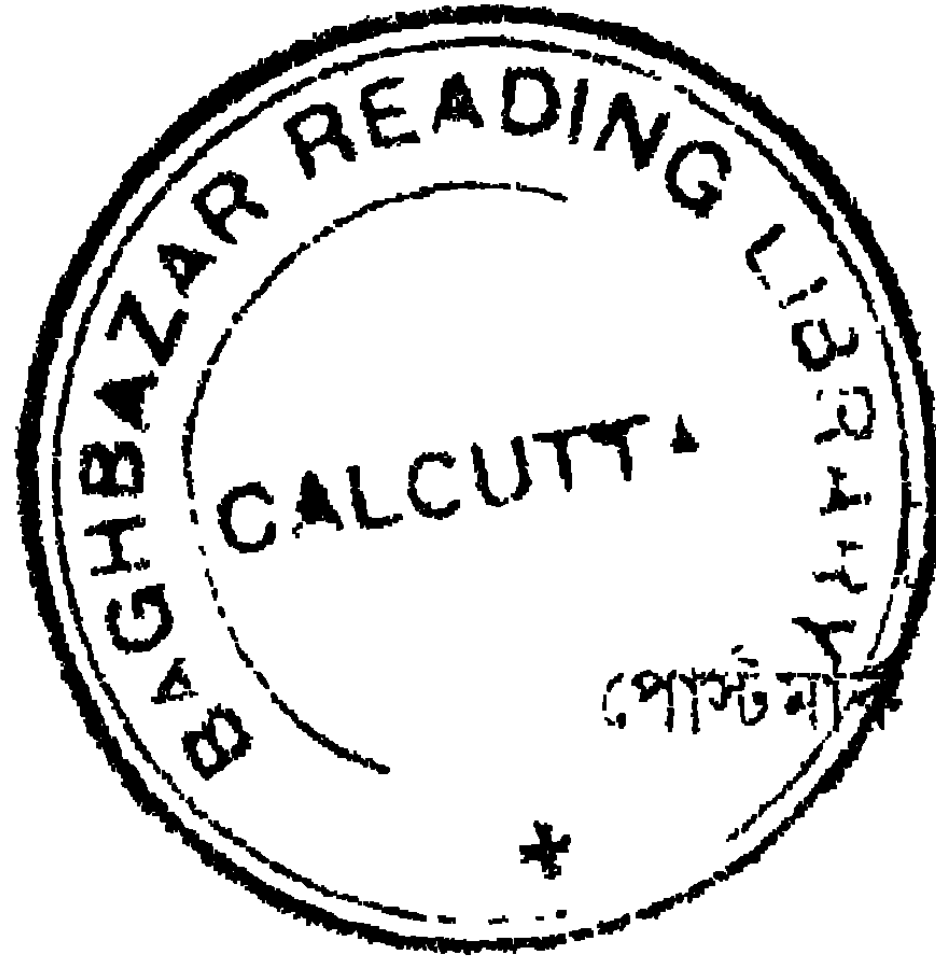
ভেবেছিলুম বোটে কিছুদিন পদ্মায় ভেসে ভেসে বেড়াব। কিন্তু আমার কুষ্ঠিতে বিশ্রাম লেখে না। বাঁকুড়ায় ভয়ানক দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েচে তারই সাহায্যের জন্য ১৬ই মাঘে আমার বিদ্যালয়ের ছেলেদের কলকাতায় ফাল্গুনী করাবার চেষ্টা চলচে— সেইজন্যে আবার শান্তিনিকেতনে ফিরে আসতে হয়েচে। তার পরে এখানে এসেই হিন্দু য়ুনিভার্সিটির তরফ থেকে এক টেলিগ্রাম পাওয়া গেল— সেখানে ৭ই ফেব্রুয়ারীতে 'সঙ্গীত বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার অঙ্গ কিনা' এই সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দেবার জন্যে অনুরোধ পেয়েচি। একবার ভাবলুম কাটিয়ে দেব কিন্তু এখানে সকলেই পীড়াপীড়ি করে ধরলেন যে, এই সুযোগে এই কথাটার আলোচনা হয়ে যাওয়া উচিত। সেখানে অনেক লোক জমা হবে তাঁদের অনেকের কানে উঠবে। আজ সকালে ধাঁ করে তাঁদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে বসে আছি। অতএব এখন কিছুকাল ধরে এই সব হাঙ্গাম নিয়ে আমাকে ব্যস্ত থাকতে হবে— ছুটি কবে পাব জানিনে।

এবার ফাল্গুনীর আয়োজনটা বোধ হয় বেশ ভালই হবে।

আমাদের উঠোনেই ষ্টেজ হবে। সাজসজ্জা আলো Scene প্রভৃতির ত্রুটি হবে না— তারপরে ছেলেদের গান প্রভৃতি ত আছেই। গোড়ায় 'বশীকরণ' বলে আমার একটি ছোট প্রহসন অভিনয় হবে। গগনরা তার ভার নিয়েছেন। যাতে অন্তত হাজার পাঁচেক টাকা ওঠে তার চেষ্টা করতে হবে। খোকা ভাল আছে শুনে নিশ্চিন্ত হলুম। পুণা সহরটা মোটের উপর ত বেশ ভালই। কেবল মাঝে মাঝে ওখানে বড় প্লেগের উপদ্রব হয়। পুণায় যদি ভালো গাইয়ের সন্ধান পাস ত খবর দিস্। আমাদের সঙ্গীত শিক্ষকের দরকার আছে।

আমার কুষ্ঠিতে সমস্তই যেরকম গোলমেলে তাতে আগে থাকতে কিছুই বলা যায় না। যদি হঠাৎ কোনো বাধা না ঘটে তাহলে কাশী থেকে দক্ষিণ ভারতের দিকে যাবার চেষ্টা করব।

ওখানকার লোকজনদের সঙ্গে তোদের আলাপ পরিচয় হচ্চে? কোনো বন্ধু জুটিয়ে নিতে পেরেচিস? পুণায় অনেক বাঙালী ছাত্র আছে শুনতে পাই— তারা নিশ্চয় তোদের ওখানে জুটেচে। খোকাকে আমার হামু দিস্।

বাবা

[শান্তিনিকেতন]
১লা বৈশাখ ১৩২৩

কল্যাণীয়াসু

মীরু, তোরা আমার নববর্ষের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর।

এইমাত্র আমাদের এখানে নববর্ষের উপাসনা শেষ হয়ে গেল— মনটা তাতেই পূর্ণ হয়ে আছে।

কোথাও যাব যাব করছিলুম। গতবার বিলেত যাবার আগে যেমন একটা ছটফটানিতে আমাকে পেয়েছিল এবারেও কতকটা সেই রকম চঞ্চলতা আমাকে দোলাচ্ছিল। কিন্তু যুদ্ধের উপদ্রবে যাওয়ার রাস্তা বন্ধ ছিল। এমন সময় আমেরিকা থেকে যেই টেলিগ্রাম এল অমনি আমার মনে হল বড় পৃথিবীর নিমন্ত্রণ এসেচে। আমি বারবার পরীক্ষা করে এবং চেষ্টা করে শেষকালে স্পষ্ট বুঝেছি আমাকে বিধাতা গৃহস্থ ঘরের জন্যে তৈরী করেননি। বোধ হয় সেইজন্যেই ছেলেবেলা থেকেই কেবল ঘুরে বেড়াচ্চি— কোনো জায়গায় ঘরকন্না ফাঁদতে পারিনি। বিশ্ব আমাকে বরণ করে নিয়েচে আমিও তাকে বরণ করে নেব। তোরা কিছু ভাবিসনে—আমার যা কাজ সে আমাকে করতেই হবে—আরাম করা বিশ্রাম করা লোক লৌকিকতা করা বিধাতা আমার জন্যে কিছুতেই মঞ্জুর করবেন না। অতএব পথিকের প্রশস্ত রাজপথে সর্ব্বলোকের মাঝখানে চললুম— তোদের জন্যে আমার আশীর্ব্বাদ রইল— সুখের আশীর্ব্বাদ নয় কল্যাণের আশীর্ব্বাদ।

বাবা

রেঙ্গুন

২৫ বৈশাখ ১৩২৩

মীরু,

বিষম ঝড় কাটিয়ে কাল রেঙ্গুনে এসে পৌঁচেছি। সন্ধ্যার সময়ে নদীর ঘাটে দেখি লোকারণ্য। আমাদের গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে বন্দে মাতরং জয় রবীন্দ্রনাথকি জয়, চেঁচাতে চেঁচাতে তিন মাইল রাস্তা তারা ছুটে এল, সহরের দুধারের দোকানে বাজারে সকল লোকে অবাক্, আমি লজ্জায় মরি।

আজ বিকেলে এখানকার জুবিলি হলে সকলে মিলে আমাকে অভ্যর্থনা করবে— বিষম একটা হট্টগোল বাধাবে। কোনো উপায় নেই— চুপ করে সইতে হবে। চুপ করে সইতে হলেও বাঁচতুম— কিছু না বলেও চলবে না। সেদিন এত বড় একটা ঝড় গেল তারপরে আবার এই হাঙ্গাম— এ সাইক্লোনের বাড়া। কাল মঙ্গলবারে বিকেলে জাহাজে যাবার কথা। জাহাজটা বেশ— আমরা যা খুশি করি— কাপ্তেন খুব ভদ্র— আদরে ও আরামে আছি।

এখানে আছি P. C. Senদের বাড়ী। ধনীর সঙ্গে খুব কথা কাটাকাটি হাসাহাসি চলচে। সকাল বেলায় একটা বুদ্ধ

মন্দির দেখতে গিয়েছিলুম। এ সমস্ত বৃত্তান্ত তোরা নানা লোকের চিঠি থেকে পাবি-- অতএব খোকাকে হামি দিয়ে এবং তোদের সকলকে আশীর্ব্বাদ জানিয়ে ইলেক্‌ট্রিক পাখার তলায় একটু বিশ্রাম করতে যাই। কাল ভাল ঘুম হয়নি।

বাবা

[হাকান

১৮ আষাঢ় ১৩২৩

কল্যাণীয়াসু

মীরু, খুব এক চোট বর্ষার পালা কেটে গিয়ে এখন রোদ উঠেচে। এই পাহাড়ের পাইন বনের ভিতর থেকে সমুদ্র বড় সুন্দর দেখাচ্চে। এদের জাপানী বাড়ি বড় সুন্দর। আমার ভারি ইচ্ছে এই রকম বাড়ি আমি তৈরি করাব। এমন পরিষ্কার, এমন আরাম, এমন সুবিধে! আমাদের গৃহস্বামী খুব ধনী, খুব চমৎকার লোক, তাঁর বাড়িতে চমৎকার সব ছবি আছে এ রকম জাপানের আর কারো বাড়িতে নেই। আজ ১৮ই আষাঢ়। ভারতবর্ষে এতদিনে বোধহয় ঝমাঝম বর্ষা আরম্ভ হয়েচে। এখানে বর্ষা অল্প দিন থাকে—বোধ হয় শেষ হয়ে গেল। আজ এখনি তোকিয়োতে বক্তৃতা দিতে যাচ্চি। আজ সন্ধ্যার সময় সেখানে মেয়েদের কলেজে আমার খাবার নিমন্ত্রণ আছে। খোকাকে আমার হামু দিস। ঈশ্বর তোদের কল্যাণ করুন।

বাবা

মীরু

অনেকদিন তোর কোনো খবর না পেয়ে মনটা উদ্বিগ্ন আছে। আমেরিকায় যাবার আগে বোধ হয় তোদের কোনো চিঠিপত্র পাওয়া যাবে না। সেখানে যাবার সময় খুব কাছে এল। আসচে বৃহস্পতিবার [৭ সেপ্টেম্বর] বিকেলবেলায় জাহাজ ছাড়বে। আমেরিকায় পৌঁছতে প্রায় দশদিন লাগবে। তারপরে সেখানে প্রথম যে সহরে পৌঁছব সেইখান থেকেই আমাকে বক্তৃতা সুরু করতে হবে। এখানে মোটের উপরে আমার দিনগুলো এক রকম চুপচাপ করে কেটে গেছে। কিন্তু এখন যাবার মুখে মনটা ছট্‌ফট্ করে উঠেচে। যখন জাহাজের ডেকে ডেক্ চেয়ারের উপর পা ছড়িয়ে দিয়ে আর একবার আরাম করে বসব, আর জাহাজ অকূলে ভাসবে তখন একবার হাঁফ ছাড়ব। এখানে এখন আমার কোনো কাজ নেই— লেকচারগুলো লেখা শেষ হয়ে গেল। এখন কেবল সেইগুলোকে নিয়ে মাজাঘষা করচি। তারপরে আবার এখানে বেশ রীতিমত গরম পড়েচে। আমাদেরই দেশের মত। মাঝে মাঝে খুব মেঘ করে দুই একদিন ঝমাঝম বৃষ্টি চলে তারপরে গুমট। সেইসঙ্গে যথেষ্ট মশার উপদ্রব আছে। জাপানী মশাগুলো আমাদের বাঙালী মশার চেয়ে ঢের

বড়, ডাকে কম, কামড়ায় বেশি। এই রকম বাদলে গুমটে শরীর কেমন ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে থাকে। এখানে কলকাতার মত ইলেকট্রিক পাখার চলন নেই— যদিচ ইলেকট্রিক আলো এখানে খুব শস্তা। পাখা নেই তার একটা কারণ বোধ হয় এখানকার ঘরের ছাদ অত্যন্ত নীচু। তারপরে এখানকার মশারি বেজায় মোটা— ঘর জুড়ে এক একটা যেন তাঁবু পড়ে যায়। বোধ হয় এখানকার বীর মশাদের আক্রমণের পক্ষে আমাদের সৌখীন নেটের মশারি যথেষ্ট নয়। এখন আমরা রেলগাড়ীতে, টোকিয়ো সহরের দিকে চলেচি। দুধারে পাহাড়, ধানের ক্ষেত, তুঁতের বন্ (রেশমের চাষের জন্যে) পাইনের অরণ্য, বর্ষার জলে ভরা ছোট ছোট নদী— সমস্ত জাপান দেশটা যেন আগাগোড়া ছবির পর ছবি—আর এখানকার লোকেরাও তেমনি সৌন্দর্য্য অন্তরের সঙ্গে ভালবাসে। আর মেয়ে পুরুষে পরিশ্রম করে কাজ করতে জানে—শুধু পরিশ্রম করে নয় পরিপাটি করে—তাই এদের সমস্ত দেশটা এমন শ্রীসম্পন্ন হয়ে উঠেচে।

খোকাকে আমার হামু দিস্।

বাবা

২২।

Palace Hotel
San Francisco

মীরু

এখানে এসে যে তোদের কারো চিঠি পাব সে আমি আশা করিনি। কেননা এখানে সহর থেকে সহরে বক্তৃতা দিয়ে হাততালি এবং টাকা কুড়িয়ে ঝড়ের মত ঘুরে বেড়াচ্চি। হঠাৎ কাল তোর একখানি চিঠি পেয়ে খুব খুসী হলুম। এ চিঠি Mrs. Moodyর ঠিকানা থেকে সিয়াটল্ সহর হয়ে আমাকে খুঁজতে খুঁজতে San Francisco তে এসে আমার নাগাল পেয়েচে। সোমেন্দ্র সিয়াটেলের বন্দরে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল— সে সান্‌ফ্রান্সিস্কো পর্য্যন্ত এসেচে— এখান থেকে আর পাঁচদিন পরে দেশে রওনা হবে। জাপানে দিন পনেরো থেকে ভারতবর্ষে যাবে। ও যেমন ছিল তেমনিই আছে। সেই রকম ভোজন নিদ্রাপরায়ণ, সেইরকম অকর্ম্মণ্য অলস, সেই রকম অসম্বন্ধ প্রলাপী। দেশে গিয়ে ও যে পৃথিবীর কোন্ কাজে লাগ্‌বে তা ত জানিনে। যা হোক্ ও গেলে আমাদের কিছু কিছু খবর পাবি। মুকুলটা অল্প অল্প করে ফুটে উঠ্‌চে। ওর বিদেশে আসা নেহাৎ ব্যর্থ হবে না। এখানে আমাদের ভারতবর্ষীয় ছবির Exhibition আজ থেকে আরম্ভ হবে। বোধ

হচ্ছে লোকদের ভালই লাগ্‌বে। আমি যত দেখ্‌লুম জাপানের ছবি এবং এখানকার, আমার ততই দৃঢ় বিশ্বাস হয়েচে আমাদের বাংলা দেশে যে চিত্রকলার বিকাশ হচ্চে তার একটা বিশেষ মাহাত্ম্য আছে। এ যদি নিজের পথে পূরো উদ্যমে চল্‌তে পারে তাহলে পৃথিবীর মধ্যে আপনার একটা খুব বড় জায়গা পাবে। দুঃখের বিষয় এই যে— বাঙালীর প্রতিভা যথেষ্ট আছে কিন্তু উদ্যম ও চরিত্রবল কিছুই নেই। আমরা নিজের দেশকে এবং কাজকে একটা বৃহৎ দেশ এবং কালের উপর দাঁড় করিয়ে উদারভাবে দেখ্‌তে জানিনে। সেইজন্যে আমাদের যার যেটুকু শক্তি আছে সেইটুকু নিয়ে ছোট ছোট ভাবে কারবার করি— তারপরে একটু ফুঁ লাগ্‌লেই সেই শিখা নিবে যায় তারপর আবার যেমন অন্ধকার তেমনি অন্ধকার। জাপানে আধুনিক শিল্পীদের জন্যে ওকাকুরা যে স্কুল করে গেছে তাতে কত কাজ চল্‌চে তার ঠিক নেই। তার মানে এই কাজে ওরা যথার্থভাবে আত্ম বিসর্জ্জন করেচে— কেবলমাত্র সৌখীনভাবে কুণোভাবে কাজ চল্‌চে না। সিয়াটেলে একটা স্টুডিয়োতে গিয়ে দেখলুম সেখানে জন কয়েক আর্টিস্টে মিলে কাজ করতে লেগে গেছে। অর্থাৎ এ দেশে যে কোনো মানুষকে যে কোনো আইডিয়াতে পেয়ে বসে, সেই আইডিয়াকে বৃহৎ দেশ ও কালের সঙ্গে সংলগ্ন না করে সে থাক্‌তেই পারে না— এটাই হচ্চে এদের স্বভাব— সেইজন্যেই এরা বড় হয়ে উঠেচে। আমরা বিচ্ছিন্ন, বিভক্ত, অলস, আমরা নিজের একাকীত্বের বাইরে পা বাড়াতে পারিনে—

আমাদের আনন্দ সমস্ত মানুষটিকে নিয়ে নয়, নিজের কোণটুকুকে নিয়ে—আমাদের যা কিছু অর্থ এবং সামর্থ্য সমস্তই আমরা নিজের উপর খরচ করি— কৃপণতার অন্ত নেই। কিন্তু এ কথাটা বুঝিনে যে আমরা যেখানে নিজে একলা সেখানে আমরা ফুটো কলস, যা আমরা কেবল নিজের উপরে ঢালি তা সমস্তই নিকেশ হয়ে যায়। কবে আমরা সকলের হয়ে চিন্তা করতে এবং সকলের হয়ে বেদনা বোধ করতে পারব? কবে আমাদের শক্তি—সকলের যোগে সার্থক হয়ে উঠ্‌বে? আমাদের দীনতা কৃপণতার অন্ত নেই যে— সেই দীনতার ভারেই আমাদের দেশ ডুবেচে

নইলে আমাদের মধ্যে যে শক্তি আছে তা কম নয়— সে শক্তির মহত্ত্ব বিদেশে আস্‌লে আমরা বেশি করে বুঝতে পারি। কিন্তু যে ঔদার্য্য যে মহদাশয়তা থাক্‌লে সেই শক্তি চিরন্তন হতে পারে, সর্ব্বদেশে ও নিত্যকালে সফল হয়ে উঠ্‌তে পারে আমাদের সেই তেজ, সেই আত্মোৎসর্জ্জন নেই। আশা করেছিলুম বিচিত্রা থেকে আমাদের দেশে চিত্রকলার একটা ধারা প্রবাহিত হয়ে সমস্ত দেশের চিত্তকে অভিষিক্ত করবে কিন্তু এর জন্যে কেউ যে নিজেকে সত্যভাবে নিবেদন করতে পার্‌লেনা। আমার যেটুকু সাধ্য ছিল আমি ত করতে প্রস্তুত হলুম কিন্তু কোথাও ত প্রাণ জাগল না। চিত্রবিদ্যা ত আমার বিদ্যা নয়, যদি তা হত তাহলে একবার দেখাতুম আমি কি করতে পারতুম। যা হোক্ আর কোনো সময়ে আর কেউ উঠ্‌বে— এবং দেশের মধ্যে চিত্রকলার যে শক্তি বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত হয়ে রয়েচে তাকে

বিপুল বেগে চলবার জন্য পথ করে দেবে।···কিছুরই সৃষ্টি হোলনা কিছুই প্রাণ পেলে না কেবল কতগুলো তুচ্ছ মালমস্‌লা আমার মত হীনশক্তি গোরুর গাড়ীকে অবলম্বন করে আমারই বাড়ির পথ রোধ করে জমে রইল কিন্তু রাজমিস্ত্রি কোথায় যে গড়ে তুল্‌বে; সেই বেদনা কোথায় কল্পনা কোথায়, আত্মদান কোথায় যার জোরে বিধাতার অভিপ্রায়কে মানুষ সার্থক করে তোলে?

তোর খুকীকে দেখবার জন্যে আমার মন খুব ব্যগ্র হয়ে আছে। মাঝে মাঝে তার ছবি আমার কাছে পাঠিয়ে দিস্। তার জন্যে জাপান থেকে যে কাপড় পাঠিয়েছি পেয়েছিস্? আমি নিতান্ত আনাড়ি— জানিনে তার পরবার মত হয়েচে কিনা। তাকে আমার হামু দিস্ আর খোকাকে। ঈশ্বর তোদের কল্যাণ করুন এই আমার একান্ত মনের প্রার্থনা। ইতি ১৭ই আশ্বিন ১৩২৩

বাবা

[৩০]

[কলিকাতা]

মীরু

বেলা আগের চেয়ে একটু ভাল আছে, অর্থাৎ জ্বর কমেচে। ওকে আরো ভালো দেখলে তারপরে বোলপুরে যেতে পারব। কবিরাজ গণনাথ বলেন নৈরাশ্যের কারণ নেই।

আজ কমল দিনু যাচ্চে তাদের কাছে সমস্ত বিস্তারিত খবর পাবি। আমি দিনটা বেলার ওখানেই কাটাই তাই সময় পাইনে।

তোর খুকীর নাম অহনা কিম্বা উষসী রাখতে পারিস। দুইয়ের মানে ঊষা। এবারে গেলে ও বোধহয় আমাকে চিনতে পারবে না। ইতি ১৩ আষাঢ় [১৩২৪]

বাবা

[৩১] [বোম্বাই]

১৫ই মে ১৯২০

কল্যাণীয়াসু

মীরু, আর ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে জাহাজে চড়তে হবে। তাই খুব ব্যস্ত আছি। এণ্ড্রুজের টেলিগ্রামে জানা গেল তোরা এখনো কিছুদিন বোলপুরে থাকবি— কলকাতার বাড়ি প্রস্তুত হলে তারপরে যাবি। ওখানে রামানন্দ বাবুদের বাড়ির সামনেই তোদের বাসা ঠিক করেচে। যাই হোক্ আমরা বেশি দিন য়ুরোপে থাকব না— যত শীঘ্র পারি ফিরে আসব। সুখ দুঃখ আমাদের আয়ত্তের মধ্যে নেই। কিন্তু ভাগ্যে যাই ঘটুক সেইটেকেই নিজের অন্তরের তেজে কল্যাণে পরিণত করবার সাধনা আমাদের নিজের হাতে। তোরা সুখী হবি এই কামনা করি কিন্তু এই প্রার্থনা পূর্ণ হওয়া সকলের ভাগ্যে কঠিন— আমি কেবল এই আশীর্ব্বাদ করি দুঃখকে মহত্ত্বের সঙ্গে বহন করবার এবং দুঃখকে আত্মার শক্তিতে অতিক্রম করবার সাধনা তোর প্রতি মুহূর্ত্তে সফল হতে থাক্। এই সংসার নিত্য সত্য নয় এর সঙ্গে অত্যন্ত আসক্ত হওয়া একটা মোহ— সেই আসক্তি থেকে মনকে যদি ছাড়িয়ে নিস্— প্রতিদিনের আপনকে যদি চিরদিনের আপন থেকে বাইরে রেখে দেখ্‌তে পারিস্—সংসারের

তলায় মনকে পিষ্ট করে না রেখে সংসারের উপরে যদি মনকে নির্লিপ্ত করে রাখ্‌তে পারিস্‌, তাহলেই সত্যের মধ্যে বিচরণ করতে পারবি, এবং সকল দুঃখ অবমাননা থেকে মুক্তি পাবি। ঈশ্বর তোদের কল্যাণ করুন।

বাবা

মীরু

জাহাজ ত চলেইচে। কাল এডেনে পৌঁছব। তাই আজ দলে দলে সবাই চিঠি লিখ্‌তে বসে গেছে। সমুদ্র খুবই শান্ত— এমন কি মঞ্জুরও sea-sickness এর কোনো উপসর্গ হয়নি। কিন্তু জাহাজে যাত্রী একেবারে ঠাসা। ভিড়ের মধ্যে থাকতে আমার ভাল লাগে না, তাই ডেকে অন্য সকলের সঙ্গে ঠাসাঠাসি করে বসে থাকতে পারিনে— music saloon বলে একটা ঘর আছে সেই ঘরের এক কোণে চুপচাপ করে থাকি। এখানে বসে সমুদ্রের সঙ্গে চাক্ষুষ দেখাশোনা হয় না— তবে কিনা তার কলধ্বনি শোনা যায়। বেশিদিন যে য়ুরোপে থাকবো না সে সম্বন্ধে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই। কেননা ভাল লাগচে না। আমার সেই উত্তরায়ণের কাঁটাবনে আমার মন নিয়ত বিচরণ করে। পাশ্চাত্য দেশে বাস করবার একটা মস্ত অসুবিধা এই যে সর্ব্বদাই বেশভূষা করে জুতো মোজা পরে প্রস্তুত হয়েই থাকতে হয়। দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই অপ্রস্তুত হয়ে থাকা আমার অভ্যাস হয়ে গেছে— সেই জন্যে বোতাম এঁটে থাকতে আমার বড় খারাপ লাগে। তোকে আমাদের সঙ্গে নিয়ে আসবার প্রস্তাব মাঝে মাঝে আমার মনে জেগেছিল—কিন্তু আমি তোর স্বভাব যতটা বুঝি তাতে আমি নিশ্চয় বুঝি যে তোর পক্ষে

এই ভিড় ঠেলাঠেলি, এই সর্ব্বদা সিধে খাড়া হয়ে কাটানো প্রতিমুহূর্ত্তে অসহ্য হত।

সাধু যখন বোম্বাই থেকে ফিরে গেল তার সঙ্গে তোকে দেবার জন্যে, এক ঝুড়ি বোম্বাই আম পাঠিয়েছিলুম— পেয়েছিলি কি? আমার সন্দেহ আছে সে আমগুলো হয়তো সাধু সেবাতেই লেগে গেল। শেষ পর্য্যন্ত সাধুর ইচ্ছা ছিল এবং আশা ছিল যে তাকে আমাদের সঙ্গে বিলেতে নিয়ে আস্‌ব। আমরা জাহাজে চড়ে বসলেও সে প্রায় তিন চার ঘণ্টা dockএ বসে জাহাজের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে বসে ছিল। যদি ওকে নিয়ে আসতুম তাহলে ওর যে কি দুর্গতি হত সে কথা বোঝবার ক্ষমতা ওর নেই। আজ খুব গরম পড়েচে। কাল থেকে Red Seaর মধ্যে গরম আরো বেড়ে উঠ্‌বে। তারপরে Mediterraneanএ পৌঁছে তবে একটু ঠাণ্ডা পাওয়া যাবে। আর ১১ দিন পরে জাহাজ মার্শেল্‌স্ বন্দরে পৌঁছবে। কিন্তু আমরা সেখানে না নেবে একেবারে সমুদ্র পথে ইংলণ্ডে যাবো। তাতে আরো ৭ দিন সময় লাগবে।

ঈশ্বর তোদের কল্যাণ করুন। ইতি ১৯ মে ১৯২০

বাবা

১৮ জুন ১৯২০

মীরু

এখানে এসে অবধি আর সময় পাইনে। শুধু যে কেবল লোকজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাতে দিন কাটচে তা নয়— নতুন জায়গায় নতুন অবস্থার সঙ্গে নিজের মিল করে নিতে অনেক কাল লাগে। আমি কুণো মানুষ, ভিড়ের মধ্যে আমার জায়গা নয়। পিয়ার্সন আমার সঙ্গে আছে সেই আমার একটা মস্ত সুবিধে। প্রতিদিনই একবার কোবে ইচ্ছা করে দেশে ফিরে যাই, আবার এও মনে হয় এখানে আমার কাজ আছে। বিশেষত য়ুরোপের অন্য দেশ থেকে প্রায় চিঠি পাই, তারা আমাকে বারবার যেতে বলচে। এখানে না থেকে এবার সুইডেন নরোয়ে ডেন্‌মার্ক প্রভৃতি জায়গায় ঘুরে আসবো মনে করচি। আজকাল পাসপোর্টের হাঙ্গামায় ধাঁ করে কোথাও যাওয়া চলে না। পাসপোর্টের চেষ্টা করচি। কাল অক্সফোর্ডে যাবার নিমন্ত্রণ আছে। তারপরে কেম্ব্রিজ যাব, তারপরে আর দুই এক জায়গায়। লণ্ডনে আর বেশিদিন থাকবো না, তোরা পিয়ার্সনের ঠিকানায় চিঠি না দিয়ে C/o. Thomas Cook & Sons,

Ludgate Hill, London এই ঠিকানায় দিলে চিঠি পেতে দেরি হত না— একবার ম্যাঞ্চেস্টরে গিয়ে তারপরে ফিরে আস্‌তে অনেকটা সময় লাগে। কুকদের ঠিকানায় চিঠি দিলে তোদের চিঠি পাঁচ ছয় দিন আগে পাওয়া যেত। এদেশে আজকাল আসাও যেমন শক্ত বেরনও তেমনি। বহুদিন আগে থাকতে প্যাসেজ ঠিক না করলে জাহাজে জায়গা পাওয়া যায় না। ইচ্ছা করলুম আর চলে গেলুম সে হবার জো নেই। মঞ্জু প্রথমটা এখানে এসে বিমর্ষ হয়ে পড়েছিল— এখন আবার বেশ প্রসন্ন হয়েচে। তাকে কোথায় পড়তে দিই তারই সন্ধান করচি। সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এখানকার সব ইস্কুল বন্ধ। চেষ্টা করচি আপাতত কোনো পরিবারের মধ্যে ওকে স্থান দিতে পারি। বৌমা বেশ ভালই আছেন—কোনো আর্টিস্টের স্টুডিয়োতে মূর্তি গড়া শেখবার জন্যে প্ল্যান করচেন।—বুড়ির জ্বর হচ্চে শুনে উদ্বিগ্ন হয়েচি। হাতের কাছে কোনো হোমিওপ্যাথ নেই বলেই মুস্কিল হয়েচে। ক্ষিতিমোহনবাবু ওখানে থাকলে ভাবনা থাকত না। এতদিনে তোরা কোথায় আছিস কে জানে। কলকাতাতেই তোর বাসা চিরস্থায়ী হবে কেন মনে করচিস্? আমার ত বোধ হয় আমরা ফিরে গেলে বোলপুরেই তোদের পাকা রকম থাকবার ব্যবস্থা হতে পারবে।

এবার এখানে এখনো যথেষ্ট শীত আছে। এণ্ড্রুজ বলেছিল ঠাণ্ডা কাপড় পরতে হবে— তার কোনো লক্ষণ দেখচি নে। গরম কাপড়ের বোঝা বয়ে বেড়াচ্চি। সেটা আমার ভাল লাগে না।

দেশে ফিরে গিয়ে এই সব বোঝা ফেলে দিয়ে আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে বারান্দায় বসতে পারলেই আমি বাঁচি।

এণ্ড্রুজ লিখেচে খোকাকে সে ইংরেজি পড়াচ্চে— খোকা বেশ দ্রুত উন্নতি করচে। পিয়ার্সন খোকার কথা প্রায় জিজ্ঞাসা করে।

বাবা

৩৬।　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[লণ্ডন

জুন ১৯২০

মীরু

ক'দিন থেকে কেবলি তোর কথা মনে হচ্চে। ভাবচি হয়ত তুই কষ্ট পাচ্চিস। আমাকে যদি কেউ কলকাতার বাড়ির খাঁচায় পূরে রাখ্‌ত আমার কি অসহ্য কষ্ট হত সে ত বুঝ্‌তে পারি। এমন কি এখানকার এই মেঘাচ্ছন্ন আকাশ এবং লণ্ডনের ভিড় আমাকে যেন চেপে মারচে। প্রতিদিনই দেশে ফেরবার জন্যে চিত্ত ব্যথিত হয়ে উঠ্‌চে। বোলপুরের আকাশ আলোক মাঠ সেখানকার স্বাধীনতা তোর পক্ষে কতখানি সেত আমি জানি। কিন্তু জগতে যত জীবজন্তু আছে সব চেয়ে পরাধীন মানুষ। কেননা মানুষ স্বাধীনতার মূল্য জানে অথচ পদে পদে তার থেকে বঞ্চিত। বিশেষত মেয়েদের কথা যখন ভাবি তখন মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। আমরা পুরুষ, কত যুগ থেকে মেয়েদের জেলখানার দারোগাগিরি করে আস্‌চি— এর নিষ্ঠুরতা যে কতদূর যেতে পারে তা কল্পনা করবার শক্তি পর্য্যন্ত হারিয়েচি। আমার জীবনে সব চেয়ে বড় দুঃখ এই যে আমি তোকে সুখী করতে পারলুম না। আমার এইটুকুমাত্র আশা ছিল যে তোকে বোলপুরে ফাঁকায় রাখ্‌তে পারব।

কিন্তু সেও আমার সাধ্যের অতীত। তাই আমি ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করি তিনি তোকে ধৈর্য্য দিন, তোর অন্তরের মধ্যে তিনি তাঁর স্থান গ্রহণ করুন। এই পরম দুঃখের আগুনে তিনি তোকে উজ্জ্বল এবং বিশুদ্ধ করে তুলুন। আজ এখানে এসে দেখতে পাচ্চি সমস্ত জগৎ জুড়ে বেদনার হোম হুতাশন জ্বলে উঠেচে। এই কষ্টের মূলে আছে দুই দলের সংঘর্ষ, একদল জবরদস্তি করে নিজেরই ইচ্ছাকে বলবান করে তুল্‌তে চাচ্চে, আর একদল সেই চাপে পিষ্ট হচ্চে, একদলের হাতে অস্ত্র আছে আর একদল নিরুপায় কিন্তু এই নিরুপায়ের দল জগতে জিৎবে ;— যারা চিরদিন কেবল জবরদস্তি করতে অভ্যস্ত তারা নিজের অস্ত্রের চাপে ভেঙে পড়বে। ইতিমধ্যে ব্যথা সইতে হবে— কিন্তু যারা ব্যথা পায় তারা যেন সেই ব্যথা বড় করে সইতে পারে। জীবনে এমন সব দুঃখ আসে যাকে এড়াবার কোনো জো নেই, কিন্তু সেই দুঃখের শিখায় আত্মদান করাটা যজ্ঞের আগুনে আহুতি দেওয়ার মতই পবিত্র করে তোলা মানুষের শক্তিতে আছে। তুই অন্তর্যামীকে বল্‌তে পারিস্ 'এই বেদনার মধ্য দিয়ে আমাকে আমি তোমার হাতে দিচ্চি তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক্।'

সুখং বা যদি বা দুঃখং প্রিয়ং বা যদিবাপ্রিয়ম্
প্রাপ্তং প্রাপ্তমুপাসীত হৃদয়েনাপরাজিতঃ।

বাবা

১৭]

C/o Thomas Cook & Sons
Ludgate Circus, London
[July 1920]

বৌমা

আজ তোর চিঠি পেলুম। এখানে এত লোকের ভিড় এবং গোলমাল যে, কিছুতে কোথাও মন বসাতে পারিনে। তার উপরে প্রায়ই বৃষ্টি বাদল মেঘ অন্ধকার। ভেবেছিলুম এখান থেকে হপ্তায় একটা করে বড় চিঠি লিখ্‌ব, সবাই আমার খবর পাবে। কিন্তু ছুলাইন চিঠি লিখ্‌তেও ভাল লাগে না। তাই এখানে এসে অবধি কিছুই লিখিনি। তুই ভেবেছিস্ এখানে কোনো জায়গায় একটুও নিরিবিলি কোণ্ পাওয়া যায় সেখানে লোকচক্ষুর আড়ালে আপন মনে কাটানো যেতে পারে— কোথাও না। বিশেষত আজকাল এখানকার জীবন যাত্রা কঠিন হওয়াতে জায়গার টানাটানি, আহারের টানাটানি, চাকর দাসীর টানাটানি। এ দেশে আমাদের মত কুণো লোকের পক্ষে কোথাও স্থান নেই।— ব্রিস্টলে দু তিনদিনের জন্য গিয়েছিলুম। সেখানে মেয়েদের স্কুলে মেয়েরা মিলে King of the Dark Chamber করেছিল। বেশ সুন্দর হয়েছিল। Crescent Moon থেকে কবিতা আবৃত্তি করেছিল, সেও বেশ

ভাল লেগেছিল। এদেশে একটা জিনিষ দেখে পদে পদে আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাই। আমাকে এদের বিস্তর লোক সত্যি সত্যিই ভালবাসে— এদের ভক্তি খুব সত্য, খুব অকৃত্রিম ও নির্ভর যোগ্য। আমি নিজেই ভেবে পাইনে আমার কাছ থেকে এরা কি পেয়েচে যার জন্যে এরা এত বেশি কৃতজ্ঞ। আমার যা দেবার সে ত বাল্যকাল থেকে নিজের দেশকেই দিয়েচি, কিন্তু সেখানে আমার ভাগ্যে যে বক্‌শিস্ মেলে সে ত জানি। য়ুরোপের অন্য দেশ থেকে আমার কাছে এত সমাদরের চিঠি আস্‌চে যে সে কি বল্‌ব। আমাকে সকলে বল্‌চে সেখানে আমার আদর আরো অনেক বেশি। তাই মনে মনে ভাবি, যেখানে মানুষ আমাকে চাচ্চে এবং আমার কাছ থেকে কিছু পাচ্চে সেখানেই আমার সত্যকার জায়গা। পৃথিবীতে ত চিরদিন থাক্‌ব না, যতটা পারা যায় কিছু রেখে যেতে হবে— সেই রেখে যাবার পক্ষে এই জায়গাই প্রশস্ত, কেননা, এরা আমাকে আপন বলে স্বীকার করেচে, এরা আমার কাছে হাত পেতেচে। পর যখন আপন বলে মানে তখন সেই মানার মধ্যে খুব বড় সত্য থাকে—সেই সত্যকে কোনো কারণে অগ্রাহ্য করা চলে না। এই সব কথা মনে করেই এখানে আমার যা কাজ তাই করার চেষ্টা করচি। যারা আইডিয়া নিয়ে কাজ করে তাদের পক্ষে সেই দেশই দেশ যেখানে সেই সব আইডিয়ার বীজ ক্ষেত্র পায়, সফল হয়— চাষী যদি সমস্ত সাহারা মরুভূমির মালেক হয় তাহলে সে তার পক্ষে ফাঁকি। আমার পরে

ঈশ্বরের দয়া এই যে, তিনি আমাকে যা শক্তি দিয়েচেন তার এমন ক্ষেত্র দিয়েচেন সমস্ত পৃথিবীকে আমি আপন বলে বিদায় নিতে পারব— সমস্ত পৃথিবীতে আমার বাসা তৈরী হল। এণ্ড্রুজের কাছ থেকে নীতুর খবর প্রায় পাই। শান্তিনিকেতনে তার রীতিমত পড়াশুনা আরম্ভ হলে নিশ্চিন্ত হব। ওখানে ওকে প্রাইভেট পড়াবার জন্যে কোনো মাষ্টারের সঙ্গে বিশেষ ব্যবস্থা করে দিস্— তাকে মাসে কিছু বেতন দিলেই চল্‌বে।

বাবা

৩৬।

Boulogne (Seine)

[২০ অগস্ট ১৯২০]

মীরু

আমরা এখন প্যারিসে আছি। যাঁর আতিথ্যে আছি তিনি খুব ধনী কিন্তু ভাব-পাগলা। নিজে খুবই সামান্যভাবে থাকেন, নিতান্ত গরীবের মত খাওয়া দাওয়া বেশভূষা চালচলন। কিন্তু মানুষের উন্নতি ও উপকারের জন্যে নানারকম ভাব দিনরাত ওঁর মাথায় ঘুরচে, আর তাই নিয়ে মুক্তহস্তে টাকা খরচ করচেন। এই যে বাড়িতে আছি এখানে ইনি দেশবিদেশের লেখক ও ভাবুক লোকদের থাক্‌তে দেন— প্যারিস থেকে একটু তফাতে, নিরিবিলি জায়গায়, সীন নদীর ধারে, এর সঙ্গে চমৎকার একটি বাগান আছে, মস্ত একটি লাইব্রেরী, কাছেই একটি ঘর আছে, সেখানে দেশবিদেশের নানা ছবি ম্যাজিক ল্যাণ্ঠনে দেখাবার বন্দোবস্ত আছে। ইচ্ছা করলে আমরা বন্ধু বান্ধবদের ডেকে নিমন্ত্রণ খাওয়াতে পারি— এজন্যে আমাদের কোনো খরচ নেই। দক্ষিণ ফ্রান্সে সমুদ্রের ধারে এর চমৎকার একটি জায়গা আছে, হপ্তা দুইতিন সেইখানে গিয়ে থাকবার জন্যে আমরা নিমন্ত্রণ পেয়েচি। সে রকম জায়গায় থাকা আমাদের নিজের সামর্থ্যে কিছুতেই কুলোত না। খুব ধনী লোকের পক্ষেও সেখানে বাড়ী পাওয়া কঠিন। সেই দক্ষিণ ফ্রান্সে

এখানকার চেয়ে অনেক বেশি গরম— ফলে ফুলে গাছে পালায় মনোরম। সেখানে অনেকটা আমাদের ভারতবর্ষের ভাব পাওয়া যাবে। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সেখানে কাটিয়ে তারপরে হল্যাণ্ডে আমাদের নিমন্ত্রণ আছে। সেখানে প্রায় দু হপ্তা কাটবে, তারপরে অক্টোবরের আরম্ভে প্যারিসে এসে এক হপ্তা কাটিয়ে ৮ই অক্টোবরে জাহাজে চড়ে আমেরিকায় পাড়ি দিতে হবে। এবারে আমেরিকায় গিয়ে চেয়ে চিন্তে ভিক্ষে করে যেমন করে হোক্ শান্তিনিকেতনের জন্যে কিছু টাকা সংগ্রহ করতেই হবে। সেজন্যে কোমর বেঁধে চলেছি— নইলে কিছুতেই যেতে ইচ্ছে করচে না। এই বর্ষার দিনে আমার সেই উত্তরায়ণের বারান্দায় কাঁটাবনের সামনে বসে মেঘের লীলা দেখবার জন্যে মন যে কতবার ব্যাকুল হয়েচে সে আর কি বলবো। কিন্তু একবার বিলেতে এসে যেমন অর্শের ব্যামো ফেলে দিয়ে আয়ু বাড়িয়ে গেছি এবার তেমনি আমেরিকায় টাকার ভাবনা কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে গেলে আয়ুর কোঠায় আরো বছর কুড়ি সময় পাওয়া যাবে। দেখা যাক্ কপালে কি আছে।

পর্শুদিন আমরা এখানকার যুদ্ধে উচ্ছিন্ন জায়গা দেখতে গিয়েছিলুম। কতদূর পর্য্যন্ত একেবারে মরুভূমি হয়ে গেছে। গ্রাম সহরের চিহ্ন নেই— জমিও ক্ষত বিক্ষত। কতদিনে যে এই সমস্ত জায়গা আবার সুস্থ হয়ে উঠবে তা বলতে পারিনে। কলকাতায় গিয়ে বুড়ি কেমন আছে লিখিস্নি কেন?

বাবা

মীরু

এণ্ড্রুজের চিঠিতে খবর পেলুম তুই শান্তিনিকেতনে এসেচিস। সে চিঠি একমাস আগে লেখা এবং আমার এ চিঠি প্রায় তিন সপ্তাহ পরে পৌঁছবে। অতএব তত দিনে তুই কোথায় থাকবি তা নিশ্চয় করে বল্‌তে পারিনে। তবু শান্তিনিকেতনের ঠিকানায় পাঠাচ্চি। বর্ষার সময় ও জায়গা নিশ্চয় তোর খুব ভাল লাগ্‌চে। কিন্তু তোরা কোন্ বাড়ীতে আছিস বুঝতে পারচিনে তোর সাবেক আড্ডা ত সঙ্গীতশালা দখল করে বসেচে। তাহলে বোধ হয় তুই আছিস নেবুকুঞ্জে। সেখানে তোদের থাকবার কোনো অসুবিধা হচ্চে নাত? আমার উত্তরায়ণ ত পড়ে আছে কিন্তু সেটা বড় দূরে, সেখানে একলা বোধ হয় তোর থাকা পোষাবে না। যাই হোক একটা মনের মত ব্যবস্থা নিশ্চয় হয়েছে।

আমরা দক্ষিণ ফ্রান্সে সমুদ্রের ধারে পাহাড়ের উপর ভারী সুন্দর একটা জায়গায় এসেচি। প্যারিসের একজন মস্ত ধনীর এই বাড়ি। রাজপ্রাসাদ বল্‌লে হয়। কিন্তু এমনি অদৃষ্ট যে আমাদের কয়জনেরই তোরঙ্গ রেলের থেকে খোয়া গেছে। তাতে আমাদের সব কাপড় ছিল, বইও ছিল। যা পরে বেরিয়েছিলুম তাছাড়া আর কিছুই নেই। মহামুস্কিল। তাই এখানে তিন চারদিন মাত্র কাটিয়েই আজ আবার বিকেলের

গাড়ীতে প্যারিসে ফিরে যাচ্চি। সেখানে গিয়ে তাড়াতাড়ি বোধ হয় কিছু কাপড় চোপড় কিনে এবং তৈরী করিয়ে নিতে হবে নইলে ভদ্রতা রক্ষা অসম্ভব হবে। সেখানে যে বাড়ীতে থাকব সেও খুব সুন্দর, সীন্ নদীর ধারেই— বাড়ীর সঙ্গেই একটি চমৎকার বাগান আছে কত যে ফলের গাছ কি বল্ব। বাগানের ফল রোজ চার বার করে খাচ্ছিলুম। সেখানে এক সপ্তাহ কাটিয়ে হল্যাণ্ডে যেতে হবে। হল্যাণ্ডেও সুন্দর একটি বাড়ীতে আমাদের নিমন্ত্রণ আছে, তারা আমাদের ভ্রমণের জন্যে মোটর গাড়ি পর্য্যন্ত ঠিক করে রেখে দেবে। সেখানে নানা জায়গায় আমার নিমন্ত্রণ আছে— বক্তৃতা করতে হবে। তারপরে প্যারিসে আবার ফিরে এসে আমার বক্তৃতা আছে।

এণ্ড্রুজের মত এমন পাগল দেখিনি। সে আমাকে দুটো চিঠিতেই আশ্বাস দিয়ে লিখেচে যে তোর পা সেরে গেছে। কিন্তু পায়ে যে কি হয়েছিল তা কোনো চিঠিতেই লেখেনি। যাই হোক যখন সেরে গেছে তখন আর জান্বার দরকার নেই।

এবার শান্তিনিকেতনে গিয়ে বোধ হয় অনেক নূতন লোক এবং নতুন ব্যবস্থা দেখ্তে পাচ্চিস্। আমরা যখন ফিরব তখন অনেক বদল দেখ্তে পাব। এবারে খুব চেষ্টা করব যাতে এত টাকা নিয়ে যেতে পারি যাতে আশ্রমের খরচপত্রের জন্যে আমাকে কোনোদিন আর না ভাবতে হয়। তারপর থেকে আর আমার কাঁটাবন থেকে কোনোদিন নড়ব না।

বাবা

[৩৮]

[নিউ ইয়র্ক

২৯ অক্টোবর ১৯২০

মীরু

জাহাজ কাল রাত্রে তীরে এসে পৌঁচেছে, আজ সকালে ডাঙায় উঠ্‌ব— এখন ভোর রাত্রি, অন্ধকার আছে, খুব শীত —আলো হলেই ডাক পড়বে, সকাল সকাল খেয়েই বেরিয়ে পড়্‌ব। তারপর থেকে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্ত এত গোলমালের মধ্যে থাকতে হবে যে চিঠিপত্র লেখার সময় পাব না। আমাদের জাহাজ হল্যাণ্ডের, খুব মস্ত এবং ভাল। অত্যন্ত পরিষ্কার। জাহাজের লোকরা ভদ্র। এত বড় জাহাজ না হলে মাঝে মাঝে খুব বেশী দোলা লাগ্‌ত। এট্‌লাণ্টিকের মাঝদরিয়ায় যখন এসেছিলুম তখন কিছুদিন সমুদ্র খুব উতলা ছিল— মেঘ বাদলা অন্ধকার। কিন্তু শেষের দুতিনদিন বেশ রোদ্দুর উঠে সুন্দর হয়েছিল— এ বছরের লক্ষ্মী পূর্ণিমা সমুদ্রের উপরেই দেখা দিয়েছিল। লক্ষ্মী যে সমুদ্রমন্থনে প্রকাশ পেয়েছিলেন। তিনি কোজাগর রাত্রে আমাকে ভোলেননি— আমি প্রায় ছশো টাকা পেয়েছিলুম। যাত্রীরা আমাকে কিছু বক্তৃতা দিতে বলেছিল আমি বক্তৃতা দিয়েছিলুম সেই বক্তৃতা থেকে টাকা পেয়েছি। লক্ষ্মী যদি সমুদ্রের ওপারেও প্রসন্ন

হন তাহলে আমার যাত্রা সফল হবে। মনে হচ্চে এবার যেন আমার ভাগ্য অনুকূল— যেখানে গেছি সেখানেই অভ্যর্থনা পেয়েছি অর্থও পেয়েছি। এখন কিছু হাতে করে নিয়ে আস্‌বার ইচ্ছে আছে যাতে চিরদিনের মত আমাদের আশ্রমের অভাব মোচন হয়— তারপরে আমি ছুটি পাব। বৌমাদের খবর তুই বোধ হয় তাঁদের কাছ থেকেই পাস্। এতদিনে বৌমা Nursing Home থেকে নিশ্চয় বেরিয়েচেন কিন্তু এখানে তাঁর আসা হবে কিনা সন্দেহ— ঘোরাঘুরি করতে হবে তাঁকে নিয়ে অসুবিধে হতে পারে।

এখনো কার্ত্তিকমাস— তোদের ওখানে এখনো রীতিমত শীত দেখা দেয়নি— কেবল মাত্র শিশিরে হাওয়া একটুখানি ঝির্‌ঝির্ করচে। কিন্তু অসুখ বিসুখের সময় এল— কলকাতায় তোরা কি রকম থাকবি কে জানে। শান্তিনিকেতনেও বোধ হয় জ্বরের পালা পড়েচে। আমি থাক্‌তে যে রকম রোজ পাঁচন খাওয়াবার ব্যবস্থা করেছিলুম এখন সেরকম আছে কিনা কে জানে।

একটু একটু আলো হয়ে আস্‌চে— ক্যাবিনে ক্যাবিনে সবাই জেগে উঠে প্রস্তুত হচ্চে। এখনো পিয়ার্সনের দেখা নেই— সে বেচারা বেশ একটু বেলা পর্য্যন্ত ঘুমোতে ভালবাসে। আজকে তার অকাল-বোধন হবে, সমস্ত দিন হাই তুল্‌তে থাকবে। তার শরীর এখনো তেমন বেশ সুস্থ হয়নি— পেটের অসুখের ভাব এখনো আছে।

এইমাত্র আমার চা এনে দিলে। আমার জন্যে ক্যাবিনে থেকে এক প্লেট ফল মজুদ থাকে—আপেল আঙুর কমলা লেবু— তারপরে ভোরেই আমাদের ষ্টুয়ার্ড আমাকে চা এনে দেয়— তখনো অধিকাংশ লোকের আর্দ্ধেক রাত্তির। আমি চা খেয়েই লিখতে বসি। একটা লেকচার লিখচি। আমার ক্যাবিনটা বেশ বড়— খুব আলো আছে— এখানে লেখার খুব সুবিধে, কিন্তু এর জন্যে আমাকে কম দাম দিতে হয়নি। এ রকম ক্যাবিন না হলে লিখতে পারতুম না— তাই ব্যয় স্বীকার করতে হল। এ খরচ এই বক্তৃতা থেকেই তুলে নিতে পারব।

এইবার ব্রেকফাষ্টের সময় হল— আজ খুব সকালেই খেতে যেতে হবে। এখনি ডাঙা থেকে ডাক্তার আসবে- তার পরীক্ষা শেষ হলে নেমে যেতে হবে। আর সময় নেই।

বাবা

৩৯

Hotel Algonquin
New York
[ডিসেম্বর ১৯২০]

মারু

এক মুহূর্তের জন্যেও এদেশ আমার ভাল লাগ্‌চে না। রোজ সকালে উঠে জানলার কাছে বসে ভাবি কেন এ বিড়ম্বনা। বেশ ছিলুম তোদের সবাইকে নিয়ে, আমার সেই মরুভূমির মাঝখানে, উত্তরায়ণের খোলা বারান্দায় লম্বা কেদারার দুই হাতার উপরে দুই পা তুলে দিয়ে। কোথা থেকে বড় আইডিয়ার ভূত পেয়ে বসে, আর দেশে দেশান্তরে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়। এর থেকে জোর করে বেরিয়ে পড়বার জন্যে মন খাঁচার পাখীর মত ছটফট করতে থাকে, অথচ কর্তব্য বুদ্ধির ধমকানি খেয়ে বেরুতে পারিনে। এখানকার জীবনযাত্রা আমাদের সমস্ত অভ্যাসের এতই বিরুদ্ধ, যে দিনরাত্রি মনকে যেন উজানস্রোতে সাঁতার দিতে হয়— প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। কেবলি মনে হচ্চে, শান্তিনিকেতনকে বড় করে তুললেই যে শান্তিনিকেতন সার্থক হবে এমন ক কথা আছে। হয়ত তাতে করে ওকে চেপে মারা হবে। কিন্তু এসব তর্কের দিন আর নেই। এখন মাঝদরিয়ায় এসে পড়েচি— শেষ পর্য্যন্ত

শাড়ি দিতেই হবে। যদি বিশেষ কিছু না হয় তাহলে বুঝব বিধাতা বঞ্চিত করেই আমাকে বাঁচালেন।

আজ নিয়ুইয়র্ক সহর ছেড়ে সপ্তাহখানেকের জন্যে একটা পাহাড়ে একটি নিরালা জায়গায় যাচ্চি। সেখানে এখানকার চেয়ে শীত পাব কিন্তু তেমনি শান্তিও পাব। বৌমা গেছেন চিকাগো Mrs. Moodyর বাড়ি। Pearson গেছেন আর এক জায়গায়। রথী আছে আমার সঙ্গে। এবৎসর এখানে বিশেষ শীত পড়েনি— প্রায় Christmas এল কিন্তু বরফের লক্ষণ নেই। খুব সম্ভব আমাদের ভাগ্যক্রমে এই রকমই কেটে যাবে। এণ্ড্রুজের চিঠি পেয়েছি। সে অনেক দিন নানা জায়গায় ঘুরে ফিরে শেষকালে আশ্রমে এসে পৌঁচেছে। ওরা আমাদের উল্টো—এক জায়গায় বেশিদিন স্থির হয়ে বসে থাকতে পারে না। পিয়ার্সনেরও সেই দশা। তুই কোথায় আছিস জানিনে। সাতই পৌষে আশ্রমে তোর যাবার কথা আছে। আশা করি কোনো বাধা ঘটেনি। তোর জন্যে আমার মন বড়ই ব্যথিত হয়ে আছে।

বাবা

[নিউ ইয়র্ক
৭ মার্চ '২১]

রথী

অনেকদিন তোকে চিঠি লিখিনি— কেননা আমি জানি আমার সব খবর তুই এণ্ড্রুজের কাছ থেকে পাস্। এখানে চিঠি লেখ্‌বার সময় পাইনে— সময় পাইনে মানে ঘণ্টা হিসেবে নয়— কি এক রকম চারদিকে হিজিবিজি মনে হয় যেন আকাশটা পর্য্যন্ত ঠেলাঠেলি কর্‌চে— কোথাও একটুখানিও ফাঁকা নেই— এক মুহূর্ত্তও এখানে থাক্‌তে ইচ্ছা করে না। প্রতিদিনের বোঝা যে এমন ভয়ানক বোঝা আমার জীবনে তা আর কোনোদিন এমন করে অনুভব করিনি— যে চারমাস এখানে কেটেচে সে চারমাস ওজনে নিরেট চার বছরের সমান ভারি। জাহাজ যেদিন পূব মুখে পাড়ি দেবে সেদিন আবার একটু একটু করে আমার নাড়ীতে প্রাণ সঞ্চার হতে থাকবে। যা হোক্ আর বেশি দেরী নেই— আজ ৭ই মার্চ্চ, আগামী ১৯শে জাহাজে উঠ্‌ব— এ চিঠি যখন পাবি তখন আমরা খুব সম্ভব সুইডেনে। তারপরে আর খুব বড় জোর দুমাস বাদে দেশে ফিরব। স্কুলের ছুটি হবার আগে যদি কোনোমতে শান্তিনিকেতনে যেতে পারতুম তাহলে যে কত খুসি হতুম তা বল্‌তে পারিনে। অন্ততঃ আমার

এবারকার ৬০ বছর বয়সের জন্মদিনটা যদি দেশের মাটিতে ঘট্‌ত তাহলে ভারি তৃপ্তি বোধ করতুম। মনে হচ্ছে হয়ত জীবনে একটা নূতন অধ্যায় আস্‌চে। ১০ বছর আগে ৫০ এর কোঠায় যখন পড়েছিলুম তখন এর ভূমিকা আরম্ভ হয়েছিল। সেদিন হঠাৎ বলা নয় কওয়া নয় পশ্চিমের পালা আরম্ভ হল। আজ সমস্ত পৃথিবী আমার কাছাকাছি হয়ে এসেচে। আজ আমার নিজেকে কেবলমাত্র 'স্বদেশী' করে আমার পরিত্রাণ নেই। আমি সমস্ত দেশের সঙ্গে আমার দেশকে মেলাতে বসেচি, অথচ আজ আমার দেশের লোক ভারতবর্ষকে জেনেনার মধ্যে পাঁচিল তুলে রাখতে চাচ্চে, পর পুরুষের মুখ দেখা বন্ধ। সাম্‌নে এই আমার এক বিষম মুস্কিল—আমার সঙ্গে আমার দেশের লোকের বনিবনাও কিছুতে যেন হতে চায় না— শেষ পর্য্যন্ত কেবলি ঝটোপুটি চল্‌তে থাক্‌বে।

গোঁসাইয়ের মৃত্যু সংবাদে আমি বড়ই ব্যথিত হয়েচি। ঠিক অমন মানুষ আমরা আর পাব না। গাইয়ে হিসাবেও লোকটি খুব উপযুক্ত ছিল। আর একজন লোকের সন্ধান নিতে হবে।

অসিত খোকার একটা ছবি এঁকেছিল এণ্ড্রুজ সেটা আমাকে পাঠিয়েচে। বোধ হচ্ছে সেটা ঠিক হয়নি— যদি হয়ে থাকে তাহলে ওর অনেকটা বদল হয়েচে বল্‌তে হবে। ফিরে গিয়ে বুড়িরও হয়ত অনেক বদল দেখ্‌তে পাব।

বাবা

মীরু

তোর চিঠি ঠিক আমার জন্মদিনে এসে পেঁচেছে। আমরা স্থইজারল্যাণ্ডে। এখান থেকে যাব ইটালি। এখানকার লোকে আমাকে কত ভালবাসে এবং ভক্তি করে তা দেখ্‌লে আশ্চর্য্য হতে হয়। এদের শ্রদ্ধা আমাদের দেশের লোকের চেয়ে অনেক গভীর এবং অকৃত্রিম। য়ুরোপের মহাদেশে আমি এর আগে কখনো আসিনি। এবারে এসে ভারি আনন্দ পেয়েচি।

তোরা এখন ছুটির আশ্রমে আছিস— সব চুপচাপ গাছের পেয়ারা গাছেই পাকচে। দিনুরা কোথায় কে জানে। এণ্ড্রুজের শরীর খারাপ— শুনে আমার মন উদ্বিগ্ন আছে। এই গরমে কোথায় যে সে টোঁ টোঁ করে বেড়াবে তার ঠিকানা নেই। কিন্তু দেশের গরম এখানে কল্পনা করা শক্ত। কেননা এখানে এবার শীতের সময় বসন্তের আমেজ দিয়েছিল তাই গরমের সময় শীত এসে হাজির। মে মাসে জেনীভাতে বেশ একটু গরম পড়ে কিন্তু এবার বড় ঠাণ্ডা। হয়ত ইটালিতে এখানকার চেয়ে একটু গরম পাওয়া যাবে। ইতি ২৫ বৈশাখ [১৩২৮]

বাবা

মীরু

সেই শিলাইদা সেই রকমই আছে। বেশ লাগচে। চারদিক সবুজ, দিনরাত পাখী ডাক্‌চে, আর সিসু গাছের পাতা ঝরঝর সরসর করচেই। আমবাগানময় ছোট ছোট আম ধরেচে— আরো নানারকম ফল ফলবার চেষ্টায় আছে। আমি থাকি তেতালায় সেই সিঁড়ির ঘরে। অনেক রাত পর্য্যন্ত ছাদে বসে থাকি— আশ্চর্য্য এই যে একটিমাত্রও মশা নেই। কিন্তু পৃথিবী যে অমরাবতী নয় সেই কথা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য দেবরাজ ইন্দ্র এখানকার সমস্ত আসবাবেই ছারপোকার বসতি স্থাপন করিয়েচেন। সুতরাং এখানে বাস করবার জন্যে মাশুল স্বরূপ কিছু রক্ত খরচ করতে হয়। বন্ধুবর এণ্ড্রুজ আছেন নীচের তলার পূর্ব্ব মহলে— সেখানে নাবার ঘরের ঠিক পাশের ঘরটাই লেখবার-পড়বার জন্যে পছন্দ করে নিয়েছেন। অহরহ টেবিল আঁকড়ে ধরে দিস্তা দিস্তা কাগজ লেখায় ভরতি করচেন আর দিগ্বিদিকে চিঠি ও টেলিগ্রাম পাঠাচ্চেন।

আমি একটা সোনার মেডেল পেয়েছি সেইটে তোকে পাঠিয়ে দেবার জন্যে গোপালকে বলে এসেছিলুম। পেয়েছিস্ কিনা আমাকে খবর দিস্। আমি পয়লা বৈশাখের কিছু আগেই শান্তিনিকেতনে ফিরব। তোদের ওখানে আশা করি সব ভালই চল্‌চে। ইতি ১২ই চৈত্র ১৩২৮

বাবা

[৪৩]

[San Isidore,
Argentine
3 Dec. '24]

মারু

যে চিঠি তুই ধীরেনের হাতে দিয়েছিলি এতদিনে সে আমার হাতে এসে পৌঁছল। অনেক দূরে আছি। তোরা আছিস্ Equatorএর উত্তরে, আমরা আছি দক্ষিণে। তাই যখন আমাদের শীত এদের তখন গর্ম্মিকাল। আজ ৩রা ডিসেম্বর— এখন বসন্তকাল কেটে গিয়ে পূরো গরম আসবার উপক্রম করচে। এবার দৈবাৎ সমস্ত নবেম্বর এখানে শীত ছিল, এমন কখনো হয় না। এবারকার যাত্রাটা বোধ হয় ভাল লগ্নে হয়নি, এখানে পৌঁছবার দিন সাতেক আগে জাহাজে শরীর খুব খারাপ হয়েছিল— বোধহয় ইনফ্লুয়েঞ্জায় পেয়েছিল। এখানে এসে কিছুকাল ধরে ডাক্তারের হাতে ছিলুম। এখন আর কোনো উপদ্রব নেই, কিন্তু বক্তৃতা প্রভৃতি সব বন্ধ। সহরের বাইরে সুন্দর জায়গায় একটি বাড়ি আমাদেব জন্যে ঠিক করে দিয়েচে। মস্ত একটা নদীর ধারে। আমাকে খুব নিকট আত্মীয়ের মতন এরা যত্ন করে— আমার যা কিছু দরকার সমস্ত এরা জুগিয়ে দিচ্চে। আমি সমস্ত দিন খোলা জানলার কাছে বসে কুঁড়েমি করে কাটাচ্চি। আমার আসল নিমন্ত্রণ পেরুতে— এখন আছি

আর্জেন্টিনে। ভেবেছিলুম পেরু যাওয়া বন্ধ করতে হবে, কারণ তখন ডাক্তার আমাকে নিষেধ করেছিল। কিন্তু এখন বোধ হয় যাবার কোনো বাধা হবে না। আজ বিকেলে ডাক্তার আবার আমাকে পরীক্ষা করে দেখবে— যদি বলে কুছ পরোয়া নেই, তাহলে এই মাসের শেষে পেরুতে রওনা হব। শুনেছি পেরু এখানকার চেয়ে বেশি গরম— কিন্তু সেখানে দেখবার জিনিষ অনেক আছে। আমার যে ঘুরে বেড়াবার উৎসাহ বেশি আছে [তা নয়] কিন্তু এখানে আসবার খরচ বাবদ পেরু গবর্মেণ্টের বিস্তর টাকা খরচ হয়ে গেছে। তার উপরে যদি না যাওয়া হয় তাহলে ভারি অন্যায় হবে। এখানকার সব চেয়ে উঁচু পাহাড়ের উপর দিয়ে আমাদের যাবার পথ। আণ্ডেস্ পাহাড় উচ্চতায় হিমালয়ের পরেই। এ একটা দেখবার জিনিষ। তারপরে চিলিতে গিয়ে জাহাজে করে পেরু যেতে হবে, সমুদ্র পথে ছয় দিন লাগবে। তারপরে সেখানে আমাকে কতদিন আটক করে রাখবে কে জানে। একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, এখানে ঘরে ঘরে সবাই আমার বই পড়েছে, আর আমাকে একান্ত শ্রদ্ধা করে। সেইজন্যে আমি এদেশে এসেচি এবং এখানে আছি বলেই এরা খুসি—আমার কাছে এর বেশি আর কিছু চায় না। এ পর্য্যন্ত আমি কোনো মিটিংএ যাইনি, অনেকেই আমাকে এখন দেখতে পায়নি— চারিদিক থেকে কেবল চিঠি আসচে, ফুল আসচে, আর আমার নাম সই নেবার জন্যে বই আস্চে। তোরা যখন এই চিঠি পাবি তখন কোথায় যে আমি বলা শক্ত—হয় তো

মস্কিকোয়। তোদের সাতই পৌষ আস্‌চে, এতদিনে নিশ্চয় তার আয়োজন আরম্ভ হয়েচে। আমার উত্তরায়ণের বাড়ি যদি শেষ না হয়ে থাকে তাহলে কষে তাড়া লাগাস্‌— এবার ফিরে গিয়ে যেন সমস্ত প্রস্তুত দেখ্‌তে পাই। আমার নীলমণি কোথায়? তার যত্ন নিস্‌।

বাবা

[৪৪]
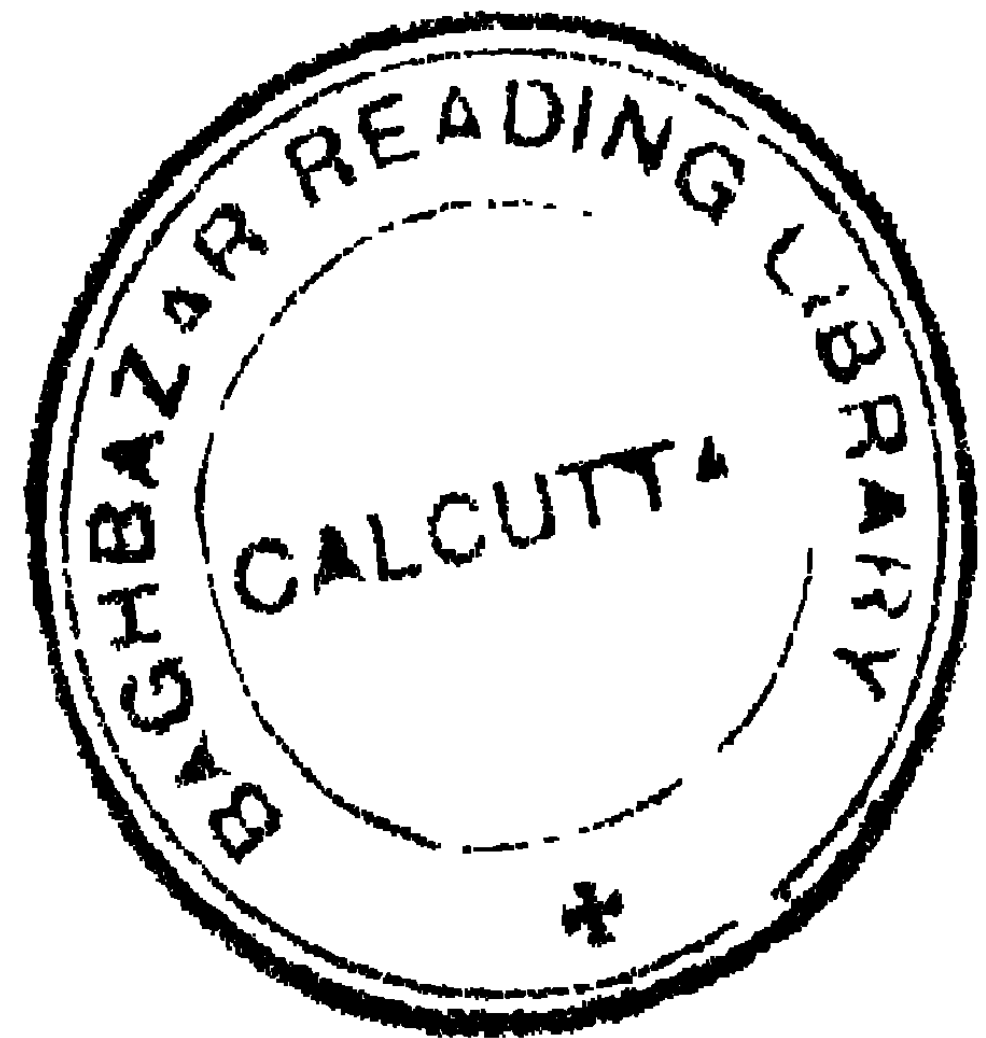
মীরু

আমার সঙ্গে পুপের ভাব কতটা জমেচে নীচের কবিতা থেকে কতকটা আভাস পাবি। গদ্যে সব কথা খুলে বলা যায় না। পেরু যাওয়া হল না। পশু ডাক্তার এসে পরীক্ষা করে বারণ করেচে। তাই জানুয়ারীর ৩রা তারিখে এখান থেকে স্পেন ও ইটালীতে রওনা হব।

বাবা

কাছের থেকে দেয় না ধরা, দূরের থেকে ডাকে
তিন বছরের প্রিয়া আমার, দুঃখ জানাই কাকে। ইত্যাদি [১]

[সান ইসিডোর,
৪ ডিসেম্বর, '২৪]

[১] সমগ্র কবিতাটি 'তৃতীয়া' নামে 'পূরবী' কাব্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

মীরু

তোর চিঠি পেয়ে নিশ্চিন্ত হলুম। সমুদ্রের ধারেই কিছুদিন যদি থাকতে পারতিস তো বেশ হ'ত। আমেদাবাদ সহরটাতে দেখবার কিছুই নেই, আবহাওয়াও যে মনোরম তা বলতে পারিনে। ওখান থেকে যাবার বা আসবার পথে কোনো এক সময়ে সত্যর সঙ্গে দেখা করে আসিস।

আমি ভালোই আছি। অতি ধীরে ধীরে একটু একটু শীতের আমেজ দিচ্চে। কাল মেয়েরা লক্ষ্মীপূর্ণিমায় আমার কোণার্কের ছাতে গান গেয়ে উৎসব করেছিল।

পুপে হঠাৎ দেখি পর্শু দিন মাথাখানি একেবারে সম্পূর্ণ মুড়িয়ে ফেলেছে। শরতের আকাশে যেমন বর্ষার কালো মেঘ কেটে গিয়ে দিনগুলি নির্ম্মল হয়েছে তেমনি কালো চুল অন্তর্ধান করে ওর মুখখানি সবটাই শুভ্র দেখাচ্চে। দেখতে একটুও খারাপ হয়নি। ওর মাথাটি বেশ সুডোল গোলাকার। মাঝে মাঝে ওকে আবার বাঘের গল্প শোনার নেশা পেয়ে বস্‌চে। কিছুদিন সেটা একেবারে ভুলে গিয়েছিল। আজকাল জয়জির সঙ্গে বন্ধুত্ব করেই দিন কাটাচ্চে।

গবা রামানন্দবাবুর ঘরে আশ্রয় নিয়ে বেশ আনন্দে আছে।

ওকে দিয়ে আমি অনেক কাজ পাই। এণ্ড্রুজ সেই অবধি অদৃশ্য। একটা পালাবার ছুতোয় ছিল— সুবিধে পেয়ে বেঁচে গেছে গুরুদয়াল আমার ইংরেজি চিঠি লেখা এবং অন্যান্য অনেক কাজ চালিয়ে দিচ্চে। তাতে ভারি সুবিধে হয়েচে। আমার নীলমণির কোনোপ্রকার পরিবর্ত্তন হয়নি— নতুন কোনো চিন্তার বিষয় উপস্থিত হলেই সকরুণভাবে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে— অত্যন্ত শোকাবহ রকমের চেহারা হয়। সে তার মীরাদিদিকে বিজয়ার প্রণাম পাঠাচ্চে। ইতি ১৩ আশ্বিন ১৩৩:

বাবা

মীরু

তুই হঠাৎ মনে করতে পারিস আমি বুঝি জাহাজে চড়ে বসেছি। এখনো সময় হয়নি। জাহাজের একটা চিঠির কাগজ হঠাৎ হাতে ঠেকল তাই এটার ব্যর্থতা দূর করবার জন্যে ব্যবহারে লাগাচ্চি।

আমেদাবাদে পৌঁচেছিস— সেখানে গুজরাটি খাবারের দিকে দৃষ্টি দিস্‌নে যেন। বুড়ি যদি তার প্রতি মনোযোগ দেয় তাহলে বেশ একটু ভারি হয়ে আসবে কেননা ওদের রান্নায় ঘিয়ের খুব প্রাদুর্ভাব আছে। আমাদের এখানে গরম আর নেই। তার উপরে মেঘ করে আজ খুব কষে পূবে হাওয়া লাগিয়েচে। কিছুদিন আকাশের শুকনো মূর্ত্তি দেখে আমি নিশ্চিন্ত মনে লেখবার পড়বার সরঞ্জাম টেনেটুনে গুছিয়ে নিয়ে বসেছিলুম। যদি বৃষ্টি নামে তাহলে আবার পাৎতাড়ি গুটিয়ে সেই কোণের ঘরটাতে দৌড় মারতে হবে। বেশ বুঝতে পারচি নতুন বারান্দায় বৃষ্টির ঝাপটা যথোচিত নিবারণ করতে পারবে না।

সত্যকে সুপ্রকাশের ঠিকানায় চিঠি লিখ্‌লেই সে পাবে। সুপ্রকাশ হচ্চে Curator, Baroda Museum সেখানে তাকে খুঁজে পাওয়া খুব সহজ। স্কুল বন্ধ, বুড়ি নেই, পুপে

আজকাল একমাত্র জায়জিকে নিয়ে দিনযাপন করচে। আমার কাছে সকালে সন্ধ্যায় দুটো করে গল্প দাবী করে— সকালে বাঘের গল্প, রাত্রে শিউলি ফুলের। শ্রীমতীর মাকে আমার নমস্কার জানাস। আর শীতের সময় আশ্রমে আসবার জন্যে তাঁকে নিমন্ত্রণ দিস— অভয় দিস দস্যুবৃত্তির চেষ্টা করব না। ইতি [আশ্বিন ?] ১৩৩২

বাবা

মীরু

ভেবেছিলুম পথের গরম ও কষ্টে ক্লান্তি বাড়বে। কিন্তু প্রথমত পথের অধিকাংশই মাঝারি গোছের ঠাণ্ডা ছিল, অনেকদূর পর্য্যন্ত মেঘ বৃষ্টি পেয়েছি। বম্বাইয়ের কাছাকাছি এসে খুব গরম হয়েছিল তাছাড়া ট্রেন এক ঘণ্টা হয়েচে লেট্। সমস্ত পথটাই একলা বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে কাটিয়েছি। বোলপুরে যতটা ক্লান্তি ছিল সেটাও পথের মধ্যে কেটে গেছে— দুদিন সম্পূর্ণ চুপ করে পড়ে থাকা আমার পক্ষে চিকিৎসার মত কাজ করেচে। অথচ ওরই মধ্যে একটা কবিতাও লিখেছি— ট্রেনের ঝাঁকানিতে লেখা সহজ নয়।

আজ আর একটু পরেই জাহাজে উঠবো। লীলমণি এখান থেকে আমাদের বিছানাপত্র নিয়ে বোলপুরে ফিরবে— আশা করি পথের মধ্যে সে হারিয়ে যাবে না। আমার সেই মধুমালতী এতদিন আমার উচ্ছিষ্টে পুষ্ট হয়েছে এখন থেকে তোর স্নানের জলে তাকে ঠাণ্ডা করতে ভুলিসনে। দিনের মধ্যে চারবার করে তার জলপান বরাদ্দ ছিল। আমার ঘরের সামনের রাস্তার দুধারে বর্ষার সময়ে নীম শিরিষ প্রভৃতি গাছ লাগাতে বলিস, দুই একটা কাঁঠাল লাগালে দোষ নেই— তাছাড়া বাতাবি লেবু।

মন্দিরের যে লোহার চূড়ো ভেঙে ফেলা হয়েছে সেটা আমার বাগানের এক কোণে রেখে তার উপরে ঝুমকোলতা চড়িয়ে দিস্।

আশ্রম বোধ হয় আরো খালি হয়ে গেছে। যে কয়জন বাকি আছে আমার আশীর্ব্বাদ জানাস্। নুটু যেন ইতিমধ্যে আমার নতুন গানগুলো ভুলে না যায়। আমার বাড়ির ছাতের উপরে তোরা তোদের রাত কাটাবার ব্যবস্থা করিসনে কেন? পুপে ভয়ে ভয়ে রথী বৌমাকে আঁকড়ে আছে— পাছে তাকে ফেলে চলে যায় এ আশঙ্কা তার কিছুতে ঘোচে না। ১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩

বাবা

মীরু,

আমার শরীর বেশ ভালোই আছে। পুপেরও স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েচে।

কাল অর্দ্ধেক রাত্রে এডেনে পৌঁছব— সেখান থেকে এ চিঠি ডাকে রওনা হবে। সমুদ্র শান্ত আছে।

পশ্চিমদিকে আমার যে নতুন ঘর হয়েছে তাতে মস্ত একটা ভুল হয়ে গেচে— বীরেনকে ডেকে বলে দিস্। ঘরে অকারণে দুটো সিঁড়ি করা হয়েচে। পশ্চিম দিকের সিঁড়ি রেখে অন্য সিঁড়িটা ভেঙে দিয়ে সেখানে একটা চ্যাপটা প্যারাপেট বানাতে হবে, যাতে তার উপরে বসা বা জিনিষপত্র রাখা যেতে পারে। বর্ষার সময়ে বাড়ির সামনে পূবদিকে যাতে বীথিকাটা সম্পূর্ণ হয় তা বলে দিস। অন্য গাছের সঙ্গে মহুয়া ও ছাতিম লাগালে ভাল হয়। বর্ষা ঘন হলে কাসাহারাকে দিয়ে আশ্রম থেকে গোটা কয়েক বড় গাছ তুলিয়ে আনলে খুসি হব। কলকাতায় কাসাহারা জগদীশের বাগানে এমনি বড় গাছ লাগিয়ে ছিল। প্রণালীটা ছেলেদের পক্ষে একটা শিক্ষার বিষয় হবে। আসবার সময় বীরেন বলেছিল শীঘ্রই তোর বাড়ি তৈরিতে হাত দেবে। হয় ত এতদিনে আরম্ভ হয়েচে—যদি শুনি হয়নি আশ্চর্য্য হব না।

পঞ্চবটির কাছাকাছি বর্ষার সময় বড় বড় গাছের বীজ বেশি করে যেখানে সেখানে পুঁতে দিস্। তার কিছু হবে কিছু মরবে। ভবিষ্যতে একদিন ঐ উত্তর পশ্চিম কোণে একটা বন হয়ে ওঠে এই আমার ইচ্ছা। আমার কোণার্ক বাড়ির সেই নীলমণি লতার বিপরীত দিক্ যে শ্বেতমণি লতাটা বেড়ে উঠে আশ্রয় খুঁজচে তার জন্যে জড়িয়ে ওঠবার একটা ভালো ব্যবস্থা করে দিতে বলে দিস্—আর মধুমালতীর ঊর্দ্ধগতির জন্যে যে তিন তাল খাড়া হয়েছে তার তিনটে ঢালু চালের বাঁখারির জাফরি করে না দিলে তার উপর দিয়ে লতা উঠতে পারবে না। সুরেনকে ডেকে এ সম্বন্ধে পরামর্শ করিস।

সন্তোষ কি আশ্রমে আছে না পালিয়েচে? তাকে একটা লম্বা চিঠি লিখে দিলুম।

বুড়ির বন্ধুবান্ধবেরা সব চলে গিয়ে বোধ হয় একলা ঠেকচে। ওখানে খুব কি গরম পড়েচে। আমার মনে হচ্চে এবার সমস্ত গর্মি তোর মাঝে মাঝে বৃষ্টি পাবি— তেমনি বেশি গরম হবে না। সমুদ্রেও আমরা দুদিন বৃষ্টি পেয়েচি। রীতিমত গরম বটে কিন্তু দিনরাত হু হু করে হাওয়া দিচ্চে— বিশেষত আমার ক্যাবিনটা একেবারে জাহাজের সামনেই বলে কখনো হাওয়ার অভাব হয় না। মরিসের কি অবস্থা? এই অবকাশে সে যদি বাইসীক্‌ল্ চড়তে ভালো করে শিখে নেয় তাহলে অনেক কাজে লাগবে। সে আমার বাক্স বোঝাই করে একরাশ আমার সেই ফিলজফিকাল কনগ্রেসের বক্তৃতার চটি ঠেসে দিয়েচে—

না দিয়েচে চিঠির কাগজ, না দিয়েচে একটা ব্লটিংয়ের কিছু। কলমগুলো থেকে হঠাৎ মোটা মোটা ফোঁটা কালী পড়ে যাচ্ছে, হতাশ হয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকচি— অথচ তার হাতে স্বয়ং একটা ব্লটিং বুক দিয়েছিলুম। যারা নিজের কাজ নিজে করে না তাদের এই দুর্গতি। ঐ বক্তৃতার প্যাম্ফ্লেট্‌গুলো দেখি আর সমুদ্রে টান মেরে ফেলে দিতে ইচ্ছে করে। ইতি ১৯ মে ১৯২৬

বাবা

[৪৯]

Marittima Italiana

Genova,

S/S Aquileja

মীরু

কাল ডাঙায় পৌঁছব। তার পর থেকে অনন্ত গোলমাল। এ কয়দিন চুপচাপ ছিলুম্—যদিও লেখার অন্ত ছিল না—একটা লেকচার শেষ করেছি। পথে দিন দুই খুব গরম ছিল—এখন মধ্যধরণী সাগরে তেমনি রীতিমত ঠাণ্ডা। রোহিত সমুদ্রের গরমের সঙ্গে খানিকটা মিশিয়ে নিলে বেশ উপভোগ্য হতে পারত। এখন জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি—আজ ঠিক ১৫ই। তোদের ওখানে রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করচে আর তোরা গরমে ছটফট করছিস্—সে কথা কল্পনা করাও শক্ত। পর্শু লাবুর বিয়ের দিনে তাকে স্মরণ করে একটা কবিতা লিখেচি—কাল ডাকে দেব—সে খুব খুসি হবে। সে হয়ত তখন রেঙ্গুনে পাড়ি দিয়েচে।

আমার চিঠি পত্র আর পাবিনে। গোলমালের ভিতরে লিখ্‌তে ইচ্ছে করে না। বৌমারা লিখ্‌তে পার্‌বেন—কারণ উপদ্রব সব আমার উপর দিয়েই যাবে—তাঁরা স্বচ্ছন্দ মনে আরামে থাক্‌বেন।

লালমণি (মরিস্) বোধ হয় আশ্রমে আছে। তার কাছ থেকে সব খবর পাওয়া যাবে। তাকে খাইয়ে দাইয়ে মোটা করে রাখিস্— আর খাবার হজম করবার জন্যে— বাইসিক্‌ল্ অভ্যেস্ করতে বলিস্। ইতি ২৯ মে ১৯২৬

বাবা

।৫৫

মীরু

পনের দিন রোমে কাটিয়েছি। আজ যাচ্চি ফ্লরেন্সে। খুব ধূমধাম আদর অভ্যর্থনা হয়েছে। তার বিস্তারিত বর্ণনা করবার সখ আমার নেই। সমাদরের সমুদ্রমন্থন বললেই হয়— হয়ত অন্য কারো চিঠি থেকে কিছু শুনতে পাবি। এতে বিশ্রাম পাবার কোনো সম্ভাবনা নেই--- আরো ৭।৮ দিন ইটালিতে কাটাতে হবে— সব জায়গাতেই এই রকম গোলমাল চল্‌বে তার পরে দিন আষ্টেক থাকব সুইজারল্যাণ্ডে। ১৫ সেপ্টেম্বরের জাহাজে ভারতবর্ষে ফেরা স্থির হয়ে গেছে— অর্থাৎ কার্ত্তিকমাসে পৌঁছব--- ১ অক্টোবরের কাছাকাছি। তোদের ওখানে এতদিনে আষাঢ়ের বর্ষা নেবেচে। মনটা বলাকার মত সেইদিকে পাখা মেলেচে। কিন্তু পৌঁছব যখন, তখন শিউলি ফুলের পালা— মালতীরও পরিশিষ্ট দেখতে পাব। ইতিমধ্যে আমার মধুমঞ্জরীর হয়ত বর্ষাধারায় শ্রীবৃদ্ধি হবে। তুই এখন হয়ত দার্জ্জিলিঙে। পুপে খুব ফূর্ত্তিতে আছে। সেই ডেনিশ মেয়েকে পাওয়া গেছে— তাকে ও ভারি ভালবাসে একমুহূর্ত্ত ছাড়তে চায় না। প্রশান্ত রাণীরাও এখানে এসে জুটেচে। গোরা রোমেই থেকে যাবে, এখানেই তার পড়াশুনা চল্‌তে পারবে। ১৪ জুন ১৯২৬

বাবা

১১] Hotel Bristol

Wien

রু

তোদের অব্যবস্থার কথা শুনে অবধি দেশে যাবার জন্যে মনটা চঞ্চল হয়ে উঠেচে। সেপ্টেম্বরে যাত্রা করবার জন্যে জাহাজও ঠিক করেছিলুম। কিন্তু ভিয়েনার একজন বড় ডাক্তার আমার চিকিৎসার ভার নিতে চান— সমস্ত অক্টোবর মাসটা লাগবে চিকিৎসা শেষ হতে। যদি ঠিকমত লাগে তাহলে আমার শরীর সম্পূর্ণ নতুন হয়ে উঠবে এই রকম এরা আশ্বাস দিচ্চে। এতদূরে যখন এসেইছি তখন এইটুকুর জন্যে পরীক্ষা শেষ না করে যাওয়া ঠিক নয়। অতএব নভেম্বরের মাঝামাঝি দেশে যেমন করে হোক পৌঁছনো যাবে। এখানে চারিদিকেই খুব আদর যত্ন পাচ্চি, এত অত্যন্ত বেশি যে, কারণ বুঝে ওঠা আমার পক্ষে কঠিন। কিন্তু ব্যাপারটা যে অকৃত্রিম তার কোনো সন্দেহ নেই। এই সমস্ত দেখে শুনে মনে হয় যে যদি প্রতি বৎসরে গরমের ছটা মাস এখানে কাটিয়ে ঠাণ্ডার ছ'টা মাস দেশে থাকি তাহলে এখানে অনেক কাজও করতে পারি শরীরও ভাল থাকে।

পুপুকে নিয়ে বৌমা প্যারিসে আঁদ্রেদের বাড়িতে আছেন।

পুপে সেখানে খুব ফূর্ত্তিতেই আছে। ফরাসী ভাষায় আলাপ সুরু করে দিয়েছে। আমাদের দলের সঙ্গে রাণী আছে। ডাক্তার তাকে নানাবিধ পরীক্ষা করে কোথাও কোনো গলদ খুঁজে পাচ্চে না। আশা করচে কিছুদিন সুইজারল্যাণ্ডের মত স্বাস্থ্যকর জায়গায় থাকলে ওর শরীর শুধ্‌রে উঠতে পারবে। এবারে দেশের খবর যা পাচ্চি তাতে বোধ হচ্চে বৃষ্টির খুব অভাব, গরমের খুব প্রাদুর্ভাব, ওদিকে হিন্দুতে মুসলমানে খুব চোখ রাঙারাঙি চলচে। "আমার জন্মভূমি"তে মানুষের টেঁকা দায় হয়ে উঠলো। এদের দেশেও যে লোকে সুখে আছে তা নয়। নানা মতের নানা দলের লোক তাল ঠুকে বুক ফুলিয়ে বেড়াচ্চে। যে যুদ্ধটা হয়ে গেল তার থেকে স্থায়ী কোনো শিক্ষা হয়েচে এমন তো বোঝা যায় না— আবার একটা যুদ্ধ বাধলে এরা আবার রক্তে ধরাতল রাঙা করে তুলতে রাজি আছে।

এখনকার মত কালই ভিয়েনার থেকে বিদায় নেব। আবার অক্টোবরের গোড়ায় ফিরে আসতে হবে। ইতিমধ্যে দিনগুলো একরকম করে কেটে যাবে। ইতি জুলাই ২১, ১৯২৬

বাবা

[শান্তিনিকেতন
মাঘ (?) ১৩৩৩]

মীরু

তোর চিঠি পেয়ে নিশ্চিন্ত হলুম। অসিতের বৃহৎ ঘরের এক প্রান্তে যদি তোর একটি কোণ ঠিক করে নিতে পারিস তাহলে বোধ হয় কিছুদিন চলে যেতে পারে। তারপরে আমি ফেব্রুয়ারী নাগাদ এক সময় গিয়ে তোদের সন্নিধানে উপস্থিত হয়ে যথাকর্ত্তব্য স্থির করব। ভরতপুরের মহারাজের কাছ থেকে নিমন্ত্রণ পেয়েছি— ফেব্রুয়ারীর শেষ সপ্তাহে— যাওয়া স্থির— খুব সম্ভব লক্ষ্ণৌ যাওয়া সহজ হবে। এখানে নটীর পূজার তালিম চলচে। আজ গৌরী এবং সম্ভবত স্বরূপা আসবে।

নুটুর জন্যে বড় উদ্বিগ্ন আছি। ওর যে রকম শরীর ওকে কিছুদিন লক্ষ্ণৌয়ে যদি তোর কাছে আনিয়ে নিতে পারিস তাহলে ভালো হয়। সেখানে ভাটখণ্ডের কাছ থেকে গানও শিখতে পারে। রেখার বিয়ে ২৩শে তার হাঙ্গামা চুকুক্— ফাল্গুনের গোড়াতেই যদি ওকে সেখানে ডাক দিস্ তো ছুটির ব্যবস্থা করে দেব। জয়ার বিবাহ ২৪শে। আমার পক্ষে বড় মুস্কিল। এখানে কাজ সেরেই কলকাতায় দৌড়তে হবে। অসিতকে আশীর্ব্বাদ জানাস্।

বাবা

মীরু

তুই ঘুরে বেড়াচ্চিস সে খবর পেয়েছি। আমি তোকে দিল্লির ঠিকানায় চিঠি লিখেচি। আমার ভরতপুরে যাওয়া এবার ঘটল না।...ফাল্গুনী অভিনয়ের রিহার্সল বসিয়ে ছিলুম কিন্তু এখানকার বাঙালদের কাছে হার মানতে হল। একেবারে অচল। অতএব ওটা স্থগিত রইল।

ঝুণু তোর সেই কুটীরেই আছে। তার শরীর মোটের উপর অনেকটা ভাল হয়েচে--- কিন্তু অল্প একটু জ্বরের উপসর্গ এখনো ছাড়েনি।

বিশ্রী বাদল পড়েছে--- আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন, ঠাণ্ডা পূবে হাওয়ায় শরীর কাঁপিয়ে তুলেচে। এবার জয়ার বিবাহের একটু আগেই হঠাৎ মেঘ করে খানিকটা বৃষ্টি হয়ে গেল। বিবাহ সভা সাজানো হয়েছিল খোলা মাঠে। সৌভাগ্যক্রমে ঠিক বিয়ের সময়টাতে কোনো উৎপাত হয় নি। রেখা শ্বশুর বাড়ি থেকে এসেচে। আবার দুতিন দিনের মধ্যেই ফিরবে। খুব ফূর্ত্তিতে আছে। শ্বশুর বাড়িতে ফিরে যাবার জন্যে ষোলো আনা আগ্রহ। বেশ একটু মোটাসোটা হয়েচে।

নুটু মোটের উপর ভালোই আছে জ্বর নেই। এখন বোধ হয় ও কোথাও নড়বে না। গর্ম্মির ছুটীতে যদি পুরীতে যায় ত তার সুযোগ ঘটতেও পারে।

তোর চিঠিতে আবুর বর্ণনা শুনে লোভ হয়। দেখি যদি আমেদাবাদে অর্থ সংগ্রহের প্রত্যাশায় যাই তবে একবার ওদিকটা ঘুরে আসতেও পারি। কিন্তু ভিক্ষের ঝুলি হাতে আর ঘুরতে ইচ্ছে করে না। তুই যতদিন খুসি দেশ দেখে বেড়াস—তোর ভালো লাগচে জানলেই আমি খুসি থাকব। ইতি ১০ ফাল্গুন ১৩৩৩

বাবা

মীরু

তোর জন্যে আমার মন দুশ্চিন্তায় পীড়িত হয়ে আছে। রোজ ভাবি একখানা চিঠি আসবে, কোথায় আছিস্ কেমন আছিস্ জান্‌তে পাব। বৌমাদের জিজ্ঞাসা করেও কোনো সন্ধান পাইনে। তোরা নিজের ইচ্ছেমত থাকিস আমি সাধারণত কখনো জিজ্ঞাসা করিনে। যদি জানতুম একটা কোনো ব্যবস্থার মধ্যে স্থির হয়েছিস্ তাহলে আমার চুপ করে থাক্‌ত। সংসারে স্নেহ করলেও সুখী করবার ক্ষমতা কারো নেই। দুঃখ ভোগ সকলেরই ভাগ্যে আছে। মনকে সেই দুঃখের উপর নিয়ে যাওয়া ছাড়া আর উপায় নেই। আপনার মধ্যে যে মানুষটা দুঃখ পায় তাকে দূরে বাইরে সরিয়ে রাখার অভ্যাস করতে হয়। কেন না সে তো ছায়া, আজ আছে কাল নেই— তার সুখ দুঃখের বোঝা নিয়ে ফেনার মত কালের স্রোতে ভেসে যায়, কিছুদিনের পরে তার চিহ্নও দেখা যায় না। নিজের গভীর অন্তরে ধ্রুব শান্তির জায়গা আছে সেইখানে আমাদের সত্তা আছে যা চিরকালের, যা সংসারের জন্ম মৃত্যু, মিলন বিচ্ছেদ,

লাভ ক্ষতি সকলেরই অতীত। সেইখানে আসন নিতে পারলেই মানুষ বাঁচে, সংসারের বাঁচা বাঁচাই নয়।

ভরতপুরে যাব না স্থির করেছিলুম। কিন্তু যখন কথা দিয়েছি তখন কোনোমতে কথা রক্ষা করা চাই। তাই স্থির করেছি ১৫ই মার্চ্চে রওনা হয়ে আগ্রা দিয়ে যাব। কাছাকাছি তুই কোথাও আছিস জানতে পারলে তোকে দেখে যেতে চাই। ভরতপুরের কাজ সেরে অর্থ সংগ্রহের জন্যে আমেদাবাদ প্রভৃতি দুই এক জায়গায় যেতে হবে। এ কাজটা আমার শরীর মনের পক্ষে অনুকূল নয়— কিন্তু এই দুঃখটাকে এড়াবার জো নেই।

কিছুদিন আগে আমার ডান হাতের আঙুলটায় আঘাত লেগে কিছুকাল আমার লেখা বন্ধ ছিল। কাল থেকে আঙুলটা মুক্তি পেয়েছে— তাই চিঠি লিখতে পারছি।

ফাল্গুনের শেষাশেষি, কিন্তু মেঘ করে এমন প্রবল শীতের হাওয়া চলচে যে ঘোর শীতের সময়েও এমন হয়নি। ক্ষণে ক্ষণে টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি পড়চে। গরম কাপড় জড়িয়ে ঘর বন্ধ করে বসে থাকতে হয়। পশ্চিমে এখন কি রকম কে জানে, গরম কাপড় নিয়ে যেতে হবে কিনা ভেবে পাচ্চিনে। এবার আমার সঙ্গে প্রভাতকুমার যাবে, কারণ, ভিক্ষা করা সম্বন্ধে সে নির্লজ্জ।

মেয়েরা আগামী দোল পূর্ণিমায় কিছু নাচ গান করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েচে। দিনু তাদের নিয়ে রিহার্সল চালাচ্চে। ঝুনু এখনো আছে। মোটের উপরে ভালোই ছিল— এই দুর্যোগে

ভিজে হাওয়ায় কেমন থাকে বলা যায় না। এপ্রিল মাসে পাহাড়ের দিকে যাবে কল্পনা করচে।

আন্দাজে দিল্লিতে তোকে চিঠি লিখে দিচ্চি। যদি নাও থাকিস্ আশা করি নিশিকান্ত তোর ঠিকানা জানে। ইতি ১১ মার্চ্চ ১৯২৭

বাবা

[৫৫]

[শান্তিনিকেতন
চৈত্র ১৩৩৩]

ভরতপুর থেকে টেলিগ্রাম এলো তাদের দিন পিছিয়েছে। ২৯শে মার্চ্চ। এখান থেকে ২৫শে ছেড়ে আগ্রায় ২৭শে পৌঁছব। সেখানে তুই যদি আসতে পারিস বেশ হবে। আর একবার ঠিকমত খবর দেব। ভরতপুরের অবস্থাটা ঠিক বুঝতে পারচিনে। দোল পূর্ণিমার পরদিনে এখানে মেয়েরা বসন্ত উৎসব করবে। তারিজন্যে গান রচনা ও নাচ শেখানোর ব্যাপার চলচে। শ্রীমতীর খুব উৎসাহ। ফাল্গুনের প্রায় শেষ পর্য্যন্ত এখানে রীতিমত শীত ছিল— এমন কি শীতকালের চেয়ে বেশি শীত। হঠাৎ বেশ গরম পড়েচে। চৈত্রে যদি গরম পড়ে দেবতাকে দোষ দেওয়া যায় না। বুনু এখানে এসে ভালোই আছে। মনে করচে লক্ষ্ণৌ যাবে— তারপরে সেখানে থেকে ডাক্তার দেখিয়ে পরামর্শ নিয়ে ভাওয়ালি যাবার সঙ্কল্প করেচে। পশ্চিমে এখন কতটা গরম পড়েচে তাই ভাবচি।

বাবা

[৫৬]

[শান্তিনিকেতন
দোলপূর্ণিমা, চৈত্র, ১৩৩৩]

মীরু

আজ দোলের দিনে এখানকার ছেলে মেয়েরা গোলমাল করে বেড়াচ্চে। তুই নেই আমার একটুও ভালো লাগচে না— মনের মধ্যে যেন ভার চেপে আছে।

আজ কলকাতা থেকে অনেক লোক আস্‌বে কেউ বিদেশী কেউ স্বদেশী তাদের নিয়ে আলাপ আলোচনা করতে হবে—মনে করে ভয় হচ্চে। আমার ইচ্ছে করে কিছুকাল সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে নির্জ্জনে গিয়ে নিজের সঙ্গে নিজে স্থিরভাবে আলাপ করি— নইলে যে সত্যের মধ্যে শান্তি, গোলেমালে তার স্পর্শ হারিয়ে ফেলি। যখনি একটু স্থির হয়ে বসবার সময় পাই তখনই মনের ভিতরে আশ্রয় মেলে। কথা আছে ২৫শে মার্চ্চ এখান থেকে রওনা হয়ে ২৭শে ভরতপুরে পৌঁছব— কিন্তু এখনো ওদের শেষ চিঠি হাতে পাইনি।

বাবা

মীরু

অনেকদিন পরে তোর চিঠি পেয়ে খুসি হলুম। এখানে হাওয়া বদল হয়েচে সন্দেহ নেই কিন্তু তার ফল আনন্দজনক হয়নি। আমি পড়েছিলুম। সেরেচি। তারপর পুপে। দুতিনবার জ্বর হল। ডাক্তার ভাবচে কৃমি। যাই হোক হাওয়া বদল না করলে এর চেয়ে বিশেষ খারাপ হোত না। শান্তিনিকেতনে ঝড় বৃষ্টি থেকে থেকে হচ্চে শুনে অবধি বদল ভাঙতে ইচ্ছে করচে।

নুটু কি জয়পুরে চলে গেল? এই প্রচণ্ড গরমে সেখানে ওর কী উপকার হবে। হাওয়া বদল হবে, অর্থাৎ সহনীয় হাওয়া থেকে অসহনীয় হাওয়ার বদল। তাকে কেন ওয়াল্টারে নিয়ে গেলিনে? সেখানে সমুদ্রের হাওয়ায় নিশ্চয় ওর উপকার হত। জষ্টিমাসে রাজপুতানার মরুভূমিতে বেড়াতে যাওয়ার মধ্যে ওরিজিনালিটি আছে।

এখানে দিনু কমলরা লাবান খুব সরগরম রেখেচে। চেষ্টা করচে একদল ছেলে নিয়ে চিরকুমার সভা করবে— উপাদেয় হবে বলে বোধ হচ্চে না। ইতি ৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪

বাবা

|৫৮|

পিনাঙ

[১৪ অগস্ট ১৯২৭]

মীরু

মালয় উপদ্বীপের শেষ বক্তৃতা আজ বিকেলে সমাধা হলে এখান থেকে ছুটি পাব—তারপরে কাল বিকেলে জাহাজে চড়ে চলব জাভায়। দেশটা বেজায় গরম— অথচ ইলেক্‌ট্রিক পাখা কেন যে চলে না আজ পর্য্যন্ত বুঝতে পারলুম না। গবর্ণরের বাড়িতে যখন ছিলুম একটা টেবিল পাখা চালিয়ে প্রাণরক্ষা করা যেত। এখানে সামনে সমুদ্র অথচ বাতাস প্রায়ই পাওয়া যায় না। সর্ব্বদা একটা হাত পাখা সঞ্চালন করা যাচ্চে। এদিকে একজন সামান্য লোকের বাড়িতেও অন্তত একটা মোটর গাড়ি আছে। বোধ হয় মোটর গাড়ী চালিয়ে এরা হাওয়া খায়— তার চেয়ে পাখা চালানো অনেক শস্তা। পাখা না থাকুক, এখানকার লোকেরা খুব উঠে পড়ে যত্ন করচে। গলায় মালা দিচ্চে, স্তুতিবাদ করচে, বক্তৃতা শুনচে, হাততালি চালাচ্চে, সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু টাকাও দিচ্চে। মাঝে মাঝে এখানে তামিল কারি খেতে হয়েছে—স্পষ্টই বোঝা গেছে, যে-দ্বীপে লঙ্কাকাণ্ড হয়েছিল এরা তার খুব কাছেই থাকে। সৌভাগ্যক্রমে চীনেরা তাদের খাওয়া দাওয়ার জন্যে ধরাধরি করেনি। তা না

হলে হাঙরের পাখনা, দুশো বছরের পুরোনো ডিম, পাখীর বাসা প্রভৃতি খেয়ে তারপরে সেগুলোকে অন্তত তখনকার মত পেটের মধ্যে ধরে রাখবার চেষ্টা করতে হত। আজ ১৪ই অগস্ট। বোধ হয় ভাদ্রমাসের সুরু, তোদের ওখানেও যথেষ্ট গুমোট পড়ে থাকবে। কিন্তু শিউলির গন্ধে বোধ হয় আকাশ ভরা— মালতীরও অভাব নেই। এখানে ফুল বড়ো একটা চোখে পড়ে না— গাছ অনেক, ফলও যথেষ্ট পাওয়া যায়। পাখী কেন যে এত কম তা বোঝা যায় না। কদাচিৎ দোয়েল দেখা যায়। কাক নেই, কোকিল নেই। ডুরিয়ান বলে কাঁঠালের মত ফল আছে, তার দুর্গন্ধ জগদ্বিখ্যাত। সাহস করে খেয়ে দেখেছি। যারা এ ফল ভালোবাসে তারা বলে এই ফল ফলের রাজা। বিশ্বভুবনে আম থাকতে এমন কথা যারা বলে তাদের জেলে দেওয়া উচিত। এখানে একদল বাঙালীর সঙ্গে আলাপ হয়ে গেছে। তারা বেশ ব্যবসা জমিয়েছে। সবাই বলে এদেশে টাকা করা খুব সহজ।

তুই এখন কোথায় আছিস? তোর নতুন বাড়িতে কি গুছিয়ে নিয়েছিস? এখন বর্ষায় মাটিতে রস আছে, বাড়ির চারদিকে বাগান করতে চাস তো গাছ লাগাবার এই সময়। আমার কোণার্কের গাছগুলোর অবস্থা কি রকম? তাদের জন্যে মনটাতে টান পড়ে। অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে আছি।

বাবা

মীরু

আজ বিকেলে যাব। কদিন বড়ো লোকের ভিড়ে, কাজের ভিড়ে কেটেচে। জন্মদিনের দিন সমস্তক্ষণ গোলমাল গেছে। সভায় গান বাজনা প্রভৃতি নানা কাণ্ড হোলো। এখন পালাতে পারলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। রানী প্রশান্ত মাদ্রাজ পর্য্যন্ত যাবে। তারপর থেকে আরিয়াম আমার সঙ্গী। রানীদের বৃথা কষ্ট দিতে হোলো।

মেঘ করে আছে। তোদের ওখানে আশা করি একটু আধটু পাচ্চিস্। রানীরা ফিরে এলে সব খবর পাবি বর্ষার ধারা নামলে তোর বাগানে ফলের গাছ লাগাস্। আম, লিচু, কাঁঠাল, পেয়ারা ইত্যাদি— কুয়োর ধারে কলা। বড় ব্যস্ত আছি। আশীর্ব্বাদ ইতি ২৮ বৈশাখ ১৩৩৫

বাবা

Messageries
Maritimes.

মীরু

জাহাজ এসে পৌঁছল কলম্বোয়। Andrews যেদিন সকাল বেলায় এই জাহাজের ক্যাবিন্ প্রভৃতি দেখে এলেন আমাকে জড়িয়ে ধরিয়ে প্রায় নৃত্য আর কি। এমন চমৎকার ক্যাবিন মেলা ভার বলে খুব উৎসাহ দিলেন। নিজে গেলেন ট্রেনে চড়ে সিংহলে। আমরা উঠে এসে দেখি, ক্যাবিনের সঙ্গে প্রাইভেট বাথরুম প্রভৃতি নেইই। সরকারী জায়গা কেবলমাত্র একটি। প্রায়ই খোলা পাওয়া যায় না, তারপরে আবার নোংরা এ জাহাজে আর তিন হপ্তা কাটালে শরীর বলে কোনো বালাই অবশিষ্ট থাকবে না। কলম্বোতে নেবে এ জাহাজে ফিরব না। শুনচি হপ্তাখানেকের মধ্যে আর একটা ভালো জাহাজ পাওয়া যেতে পারে। যদি পাই তো পাড়ি দেব, যদি না পাই তবে এ যাত্রাটা এইখানেই সংক্ষিপ্ত করতে হবে। এত বার বার বাধা পূর্ব্বে কখনো হয়নি। স্থির করেছি এবার ফিরে গিয়ে অরবিন্দ ঘোষের মতো সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্নতা অবলম্বন করব— কেবল প্রতি বুধবারে সাধারণকে দর্শন দেব— বাকি ছয়দিন চুপচাপ নিজের নিঃশব্দ নির্জ্জন শান্তি অবলম্বন করে

গভীরের মধ্যে তলিয়ে থাকব। অরবিন্দকে দেখে আমার ভারি ভাল লাগল— বেশ বুঝতে পারলুম নিজেকে ঠিক মত পাবার এই ঠিক উপায়। তোরা কোথায় আছিস্ কে জানে? শান্তিনিকেতনের বর্ত্তমান অবস্থা কি? তোর গাছপালার উন্নতি কতদূর হোলো। জাহাজ বন্দরে এসেচে। এখানে ঘাট নেই। অতএব ছোট ষ্টীম বোটে করে ডাঙার উঠ্‌তে হবে।

পণ্ডিচেরীতেও এই অবস্থা— আমাকে যে ভাবে জাহাজ থেকে ওঠা নানা করেছিল তাতে মর্য্যাদা রক্ষা হয় না— তার বিবরণ পরে দেব। ইতি ৩০ মে ১৯২৮

বাবা

[Woodbrooke
Birmingham]

কল্যাণীয়াসু,

মীরু, বক্তৃতা ইত্যাদি নানা কাণ্ড কারখানা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত আছি। তার বিস্তারিত বিবরণ লেখা আমার দ্বারা ঘটে ওঠে না। মোটের উপরে বলা যায় ছবি এবং বক্তৃতা দুটোই উৎরে গেছে। আমি আছি এই সব ব্যাপারে এখানে ওখানে— রথীরা আছে অন্যত্র স্থির হয়ে। তার শরীর ভালোই আছে।

জ্যৈষ্ঠমাসের খরা তোর ফুলবাগানে কি রকম দৌরাত্ম্য করচে এখানে তা আন্দাজ করা কঠিন। কেননা এখানে মাঠে ঘাটে অজস্র ফুল—ঠেসাঠেসি ভিড়। সমস্ত দেশের যেন ফুলশয্যা। এখানে প্রকৃতির লাবণ্য আর তোদের ওখানে পোলিটিকাল লাবণ্য দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ বিস্তর।

হৈমন্তীর একটি মেয়ে হয়েচে নিশ্চয় খবর পেয়েছিস্। তার নাম রেখেচে সেমন্তী। অর্থাৎ সেঁওতি ফুল। কিন্তু সেঁওতিফুল যে কী পদার্থ তা জানিনে।

অক্সফোর্ডে শ্রীমতীর ভাইকে দেখলুম। শ্রীমতীর অসুখ হয়ে কোন্ এক জায়গায় আছে। তার মা তার কাছে এসেচে। কোথায় আছে ঠিক খবর পেলুম না।

এখানকার বসন্ত এবার বাতুলে অনেকদিন পরে আজ একটু ভদ্র রকমের রোদ্দুর উঠেচে।

তোদের ওখানে আষাঢ় তো আসন্ন। আকাশের ভাবগতিক কী রকম? আমার কঙ্কর কুঞ্জের প্রতি কখনো দৃষ্টিপাত করিস্ কি? ইতি ২৭ মে ১৯৩০

বাবা

কল্যাণীয়াসু

মীরু তোর চিঠি থেকে শান্তিনিকেতনের পাশ্চাত্য পাড়ার খবর কিছু কিছু পাওয়া গেল। ঐ পাড়ার উপর বিশ্বভারতীর ঝাঁটা বোলাবার প্রস্তাব করে পাঠাতে হবে। কেননা এখন থেকে এখানকার অনেক ছেলে মেয়ে ওখানে প্রতি বৎসর যাবে তার ব্যবস্থা হচ্চে অতএব আবর্জ্জনা যদি না এখনি সরানো যায় তাহলে ওদের সংসর্গে য়ুরোপের সম্বন্ধ বিষাক্ত হয়ে উঠ্‌বে। ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে এসেছি জেনিভাতে। এখানে এসে প্রথম রৌদ্রের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। মনে হচ্ছে যেন জাহাজ ভাড়া করে সমুদ্র পার হয়ে এখানে এসে পৌচেছে। আমাদের দেশের রোদ্দুর, অঘ্রাণ মাসের দুপুর বেলার মত— আকাশ নির্ম্মল নীল, হাওয়াতে গরমের অল্প একটু ছোঁয়াচ লেগেছে, গাছের পাতাগুলো ঝিলমিল করে উঠ্‌ছে। আমার জানালার ঠিক সাম্‌নে একটা বাঁশ বন আছে। বলরামের গদা তৈরী করবার বাঁশ নয়, শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি বাজাবার বাঁশ, সরু লম্বা চিকন শ্যামল, যাকে বলে মুরলী বাঁশ, এখানে এনেচে জাপান থেকে। ঐ বনের দিকে চোখ ফিরিয়ে হঠাৎ ভুলে যাই য়ুরোপে আছি। বনমালীর দেশ বলে ভুল হয়।

রাণীর চিঠিতে খবর পেলুম নীতুকে বম্বাই পাঠানো হয়েছে ছাপার কাজ শিখ্‌তে। ভালো লাগ্‌লো না, কারণ বম্বাই অস্বাস্থ্যকর। ওখানে এক জাতের ম্যালেরিয়া আছে যেটা খুব খারাপ। এখানে বিশেষ চেষ্টা করে ভালো ব্যবস্থা করেছি। এ রকম সুবিধা ভারতবর্ষীয়ের ভাগ্যে সহজে জোটে না। সব চেয়ে ভালো শিক্ষা পাবে সব চেয়ে আদর যত্নে এবং সব চেয়ে কম খরচে। ওকে আমি কাজে লাগিয়ে দিতে পার্‌লে নিশ্চিন্ত হব। এই সুযোগটা ছাড়্‌লে নীতুর প্রতি নিতান্ত অন্যায় করা হবে। এখানে ও মানুষ হয়ে উঠ্‌বে কেবলমাত্র মজুর নয়।

রথীর খবর বোধ হচ্চে ভালোই। এতদিন নানা ডাক্তারকে নানা অর্ঘ্য জুগিয়েচে—চিকিৎসা চলেছিল ভুল রাস্তায়। এতদিন পরে আরোগ্যের পথ পেয়েচে একেবারে বিনামূল্যে। যেখানে আছে সেখানে সুখে আছে সস্তায় আছে। ইতি ২৫শে আগষ্ট ১৯৩০।

বাবা

কল্যাণীয়াসু মীরু,

তোর চিঠি পেলুম। বৃষ্টি তো নাম্‌ল কিন্তু মাটিতে এতদিন যে তাপ সঞ্চিত ছিল তা বোধহয় ভাপ হয়ে উঠচে। মাটির তাপ মলে তবে আরাম পাবি। রৌদ্রের অত্যাচারে ধরণী অনেকদিন আকাশের পরে অভিমান করে থাকে—প্রসাদবারি বর্ষণের পরে প্রথমটা তার উষ্মা আরো বেড়ে ওঠে ঠাণ্ডা হতে সময় লাগে। এদিকে রানী মহলানবিশ তাঁর স্বামীটিকে সঙ্গে নিয়ে বিনা নোটিশে হঠাৎ আবির্ভূত। কলকাতায় যতদিন গরম অসহ্য ছিল ততদিন নড়বার কথা মনে উদয় হল না—যখন সেখানে ঠাণ্ডার আয়োজন জমে এল তখন তাঁরা এখানে উত্তীর্ণ। বেশিদিন থাকবে না। আমরা ঠিক করেছি জুলাইয়ের পয়লা কিম্বা তারি কাছাকাছি নীচে নাম্‌ব। ততদিনে ধরণীতল প্রসন্ন হবে।

পুপু এখন ভালো আছে। আমার টেবিলের উপর কাগজপত্র দোয়াত কলম যতই আমি এলোমেলো করি, সে এসে গুছিয়ে দেয়। বৌমাও ভালো আছেন—রথীর শরীরও ভালো। আমার শরীরটাও ভালো আছে মানতে হবে। কিন্তু দুঃসহ গরমে আমার কঙ্কর কুঞ্জ কঙ্কালসার হোলো কিনা সেই কথাটা ভাবি। এবার বর্ষায় সেঁউতি ফুলের খবর নিস্‌তো। হৈমন্তীর মেয়ের

নাম রেখেছি সেঁউতি কিন্তু পরিচয় জানিনে। আর একটা কবি-পরিচিত ফুল আছে বাঁধুলি কিন্তু সেও অচেনা। এইগুলো তোর মালঞ্চে আমদানি করে আমাদের চেনবার সুবিধে করে দিস। পিয়াল, পারুল এ দুটো গাছের সন্ধান করা উচিত। ভাঁটি ফুল বোলপুরের কাছে ঢের আছে, লাগাসনে কেন ? ওটা বৈষ্ণব পদাবলীর ফুল, রূপে ও গন্ধে আদরের যোগ্য। ইতি আষাঢ় ১৩৩৮

বাবা

[৬৪]

* Visva-Bharati
Santiniketan, Bengal.
২২ জুলাই ১৯৩২

মীরু এডেন থেকে তোদের কেব্‌ল্‌ পেয়ে নিশ্চিন্ত হলুম। প্রথম যে কদিন দোলা খাচ্ছিলি আমার মনটা উদ্বিগ্ন ছিল। আজ বাইশে, এতদিনে প্রায় জেনোয়ার কাছে এসে পৌঁচেছিস। নীতুকে নতুন যে জায়গায় নিয়ে গেছে তার খবর নিশ্চয় তোদের কাছে পৌঁচেছে। হয় ত বা এণ্ড্রুজের সঙ্গে ঘাটে তোদের সঙ্গে দেখা হয়েছে। নীতুর পক্ষে সব চেয়ে কোন্‌ জায়গা ভালো সে পরামর্শ ঠিক কোনো জর্ম্মান ডাক্তারের কাছ থেকে পাওয়া যাবে কিনা আমার মনে সন্দেহ হয়। ওরা কোনোমতে জর্ম্মনীতে রাখতে চাইবে। এণ্ড্রুজ কিম্বা ধীরেন কোনো নিঃস্বার্থ লোকের কাছে পরামর্শ নেয় তো ভালো হয়। সৌম্যর সঙ্গে দেখা হলে এ সম্বন্ধে সে তোকে সাহায্য করতে পারবে।—Black Forestটা যথেষ্ট শুক্‌নো হবে না বলে আমার আশঙ্কা হয়। এডেন থেকে তোদের চিঠি এলে তোদের জাহাজের বিবরণটা পূরোপূরি পাওয়া যাবে।

আমাদের এখানে ভালোই চল্‌চে। বুড়ির শরীর বেশ আছে। পড়াশুনো চল্‌চে, রথীর কাছে চামড়ার কাজ শিখ্‌চে। ভেবেছিলুম

কোণার্কে ওকে এনে রাখব, কিন্তু ওর এখানে খুব অসুবিধে হোত। এখন আছে উদয়নের কাঁচের ঘরে—সেখানে বেশ গুছিয়ে নিয়েচে—ওর মন বসে গেছে। রোজ দুবেলা মালঞ্চে তদারক করতে যায়, ওখানকার জীবজন্তুর খবর নিয়ে আসে।

শ্রাবণমাস পড়েচে তবু এবারকার বর্ষা এখনো যথোচিত রকম হয় নি। অর্থাৎ চাষের উপযুক্ত বর্ষণ নয়, ক্ষেতে জল দাঁড়াবার মতন বৃষ্টি হচ্চে না। এক একবার হঠাৎ খুব ঝমাঝম করে বাদল নামে, তার পরে আবার থেমে যায়—রোদ্দুর ওঠে। অনেকটা শরৎকালের মতো। কিন্তু গরম নেই। হুহু করে বাতাস দিচ্চে। গাছপালাগুলো দেখাচ্চে ভালো, মাঠ ঘাট খুব সবুজ। তোর মুরগী রোজই ডিম পাড়চে সেটা আমারি ভোগে লাগে। তোর বাগানে একটা আনারস পেকেছিল, সেটা আমাদের চেয়ে হুঁসিয়ার কোনো একজন অজানা লোকের দৃষ্টিগোচর ও হস্তগত হয়েচে।

অমিয়ারা তোর বাড়িতে আসবে কথা ছিল কিন্তু এখনো তাদের কোনো খবর পাইনি। মাঝের থেকে আশারা তোর বাড়ি ছেড়ে দিয়ে নিজেদের বাসায় গেছে। বৌমাকে বলেছি ওদের চিঠি লিখে জানতে ওরা কবে আসবে অথবা আসবে কিনা। কমলের কাছে তোর বাছুরের খবর পাই,—সে আদরে আছে এবং ভালোই আছে। তার সহবাসী হরিণের সঙ্গে তার ভাব হয়ে গেছে। তোর খরগোষ এবং ঘুঘুদের বংশোন্নতি হচ্চে। ···র মুর্গিমহলে মৃত্যুর চেয়ে জন্মের পরিমাণ বেশি

দেখা যাচ্চে—তার ফল আমাকে ভোগ করতে হয়—আমার সামনের চাতালটার পরে তাদের নিত্য উপদ্রব। গাছের টব সার করে তাদের পথ রোধ করবার চেষ্টায় আছি। টবের বদলে কলসী আনিয়েছি, তাতে দেখতে ভালো হবে। কোণার্কের সামনেই সিমুল গাছে যে মালতীলতা উঠেছে বর্ষায় তাতে ফুল ধরেছে—গাছের তলায় টুপ্‌টুপ্‌ করে কেবলি ফুল ঝরে পড়চে—এইবার আমার লতাবিতানে চামেলি ফোটবার সময় হয়ে উঠ্‌ল। আমার কামিনী গাছে কামিনী মঞ্জরীও দেখা দিয়েছে। বুড়ি গর্ব্ব করে বল্‌লে, মালঞ্চেও কামিনী ধরেছে। তোদের ঘন পাপ্‌ড়িওয়ালা জুঁইগুলোরও পরিচয় পাচ্চি, মাঝে মাঝে বুড়ি তুলে এনে দেয়। ইতি

বাবা

জুলাই-অগস্ট, ১৯৩২

মীরু,

পোর্ট সয়েদ থেকে তুই যে চিঠি লিখেছিস পেয়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত হলুম। রেড্ সীতে তেমন গরম পাস নি, সে কম কথা নয়। তুই যতটা শয্যাগত হয়ে পড়বি ভয় করেছিলুম তা হয় নি। বোধ হয় কোনো ওষুধ খাওয়াও অনাবশ্যক হয়েছিল। Black Forest-এ এই Summer-এ মনে হচ্চে খুব সুন্দর হবে—গাছপালার মধ্যে থাকবি। ইতিমধ্যে নীতু বুড়িকে চিঠিতে লিখেছিল তার জ্বর ও কাশী বেড়েছে। স্যানাটেরিয়মে গিয়ে কোনো উপকার হোলো কিনা জানিনে। এণ্ড্রুজের কেব্‌ল্ পেয়ে জানলুম সে জেনোয়াতে গিয়ে তোকে জর্ম্মনীতে নিয়ে যাচ্চে—সেখানে তোকে গুছিয়ে দিয়ে তবে সে চলে যাবে। এত খুসি হয়েছি বল্‌তে পারিনে—জানি তাকে জাহাজঘাটে দেখে তোরও মন খুব নিশ্চিন্ত হয়েছিল। এলা আর তার স্বামীও বোধ হয় ছিল। স্যানাটেরিয়মের আইন কানুন কী রকম জানিনে। সেখানে বায়োকেমিক চিকিৎসায় ওরা কি মত দেবে না আমার বিশ্বাস, যখন ঘনঘন কাশি বা অন্য কোনো উপদ্রব ঘটে তখন এই সব নিরীহ ওষুধে আশু

উপকার পাওয়া যায়। নিশ্চয় সহরে বায়োকেমিক ডাক্তার আছে—অন্তত হোমিয়োপ্যাথ চিকিৎসক। দূরে থেকে কিছু বলা যায় না—ভেবে চিন্তে দেখে পরামর্শ করে যা হয় ঠিক করিস।

এখানে বর্ষা এবার এখনো ভদ্ররকম নামল না। গাছপালার পক্ষে যথেষ্ট বর্ষণ হচ্চে কিন্তু ফসলের পক্ষে নয়। গরম আর নেই—বেশ বাতাস দিচ্চে। চারদিকের জঙ্গল সাফ করিয়ে মশা বিস্তর কমেছে।

অমিয়ারা এখনো আসেনি। তার ছেলের জ্বর—বল্‌চে কাল শুক্রবারে আসবে।

বুড়ি শরীরে মনে বেশ ভালোই আছে। তোদের এডেনের চিঠি বোধ হয় আসচে মেলে পাওয়া যাবে।

গ্রেচেনের চিঠি[১] তোকে পাঠাই। তাকে জবাব দিয়ে দিস্। সে যদি কাছাকাছি থাকত তাহলে বেশ হোত।

বাবা

১ এই চিঠিখানি প্যারিস থেকে লেখা, তার তারিখ ১৭ জুলাই [১৯৩২]

মীরু

অন্ধকারে আমরা হাৎড়ে বেড়াই যাদের ভালোবাসি তাদের না জেনে ক্ষতি করি, না বুঝে কষ্ট পাই। কিন্তু সেইটেই তো শেষ কথা নয়, সেই সমস্ত ভুল চুক দুঃখকষ্টের মধ্যে বড়ো কথাটা এই যে, আমরা ভালোবেসেছি। বাইরে থেকে বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়, কিন্তু ভিতরদিকের যে সম্বন্ধ তার থেকে যদি বঞ্চিত হতুম তা হলে সে অভাব গভীর শূন্যতা। এসেছি সংসারে, মিলেচি, তারপরে আবার কালের টানে সরে যেতে হয়েচে, এমন কত বারবার হোলো, বারবার হবে—এর সুখ এর কষ্ট নিয়েই জীবনটা সম্পূর্ণ হয়ে উঠ্‌চে। যতবার যত ফাঁক হোক আমার সংসারে, বৃহৎ সংসারটা রয়েছে, সে চলচে, অবিচলিত মনে তার যাত্রার সঙ্গে আমার যাত্রা মেলাতে হবে। লজ্জা হয় যদি আমার শোক নিয়ে একটুও সরে পড়ি সকলের সংসার থেকে, লেশমাত্র ভার চাপাই নিজের অচল বেদনা দিয়ে বিশ্ব-সংসারের সচল চাকার উপরে। কত অসহ্য দুঃখ বেদনা ঘরে ঘরে আছে, কাল প্রতিদিন তা একটু একটু করে মুছে মুছে দিচ্ছে। আমার জীবনের উপরেও সেই বিশ্বব্যাপী কালের

গত কাজ করচে। আর সেই জগৎ জোড়া আরোগ্যের কাজকে যেন একটুও কঠিন না করি—শোকদুঃখের চলাচল সহজ হয়ে যাক, প্রাত্যহিক দিনযাত্রাকে বাধা না দিক্।—নীতুকে খুব ভালবাসতুম তা ছাড়া তোর কথা ভেবে প্রকাণ্ড দুঃখ চেপে বসেছিল বুকের মধ্যে। কিন্তু সর্ব্বলোকের সাম্‌নে নিজের গভীরতম দুঃখকে ক্ষুদ্র করতে লজ্জা করে। ক্ষুদ্র হয় যখন সেই শোক সহজ জীবনযাত্রাকে বিপর্য্যস্ত করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমি কাউকে বলিনে আমাকে রাস্তা ছেড়ে দাও, সকলে যেমন চল্‌চে চলুক, এবং সবার সঙ্গে আমিও চল্‌ব। অনেকে বল্‌লে এবারে বর্ষামঙ্গল বন্ধ থাক্,—আমার শোকের খাতিরে—আমি বল্‌লুম সে হতেই পারে না। আমার শোকের দায় আমিই নেব—বাইরের লোকে কি বুঝবে তার ঠিক মানেটা। অন্তত তাদের এইটুকু বোঝা উচিত, বাইরে থেকে কোনো রকম সান্ত্বনার চিহ্ন, কোনোরকম আনুষ্ঠানিক শোক একটুও দরকার নেই তাতে আমার অমর্য্যাদা হয়। ভয় হয়েছিল পাছে সবাই আমাকে সান্ত্বনা দিতে আসে, তাই কিছুদিনের জন্যে বারণ করেছিলুম সবাইকে আমার কাছে আস্‌তে। কিন্তু আমার সকল কাজকর্ম্মই আমি সহজভাবে করে গেছি। লোক দেখিয়ে কোনো কিছুই বাদ দিতে চাইনি। ব্যক্তিগত জীবনটাকেই অন্য সব কিছুর উপরে প্রত্যক্ষ করে তোলাই সব চেয়ে আত্মাবমাননা। অনেকদিন ধরে একান্তমনে কামনা করেছিলুম যে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যদি আমার 'বিশেষ বন্ধু কেউ থাকেন

তিনি আমাকে দয়া করুন। কিছু জানিনে, হয়ত দয়াই করেছেন; হয়ত আরো বেশি দুঃখের হাত থেকে রক্ষাই পেয়েছি। এমনতরো প্রার্থনা করাই দুর্ব্বলতা। আমার জন্যে বিশ্বনিয়মের বিশেষ ব্যতিক্রম হবে এমনতরো আশা করি যখন মন অত্যন্ত মূঢ় হয়ে পড়ে। কষ্ট যখন সকলকেই পেতে হয় তখন আমিই যে প্রশ্রয় পাব এত বড়ো দাবী করবার মধ্যে লজ্জা আছে। যে রাত্রে শমী গিয়েছিল সে রাত্রে সমস্ত মন দিয়ে বলেছিলুম বিরাট বিশ্বসত্তার মধ্যে তার অবাধ গতি হোক্, আমার শোক তাকে একটুও যেন পিছনে না টানে। তেমনি নীতুর চলে যাওয়ার কথা যখন শুনলুম তখন অনেকদিন ধরে বারবার করে বলেচি, আর তো আমার কোনো কর্ত্তব্য নেই, কেবল কামনা করতে পারি এর পরে যে বিরাটের মধ্যে তার গতি সেখানে তার কল্যাণ হোক্। সেখানে আমাদের সেবা পৌঁছয় না, কিন্তু ভালোবাসা হয়তো বা পৌঁছয়—নইলে ভালোবাসা এখনো টিঁকে থাকে কেন? শমী যে রাত্রে গেল তার পরের রাত্রে রেলে আসতে আসতে দেখলুম জ্যোৎস্নায় আকাশ ভেসে যাচ্চে, কোথাও কিছু কম পড়েচে তার লক্ষণ নেই। মন বল্‌লে কম পড়েনি—সমস্তর মধ্যে সবই রয়ে গেছে, আমিও তারি মধ্যে। সমস্তর জন্যে আমার কাজও বাকি রইল। যতদিন আছি সেই কাজের ধারা চল্‌তে থাকবে। সাহস যেন থাকে, অবসাদ যেন না আসে, কোনোখানে কোনো সূত্র যেন ছিন্ন হয়ে না যায়—যা ঘটেচে তাকে যেন সহজে স্বীকার করি, যা কিছু রয়ে গেল

তাকেও যেন সম্পূর্ণ সহজ মনে স্বীকার করতে ত্রুটি না ঘটে। এডেনে এ চঠি পাঠালে তুই পাবি কিনা জানিনে, তাই বম্বাইয়েতেই পাঠাব মনে করচি। ইতি ২৮ আগষ্ট ১৯৩২

বাবা
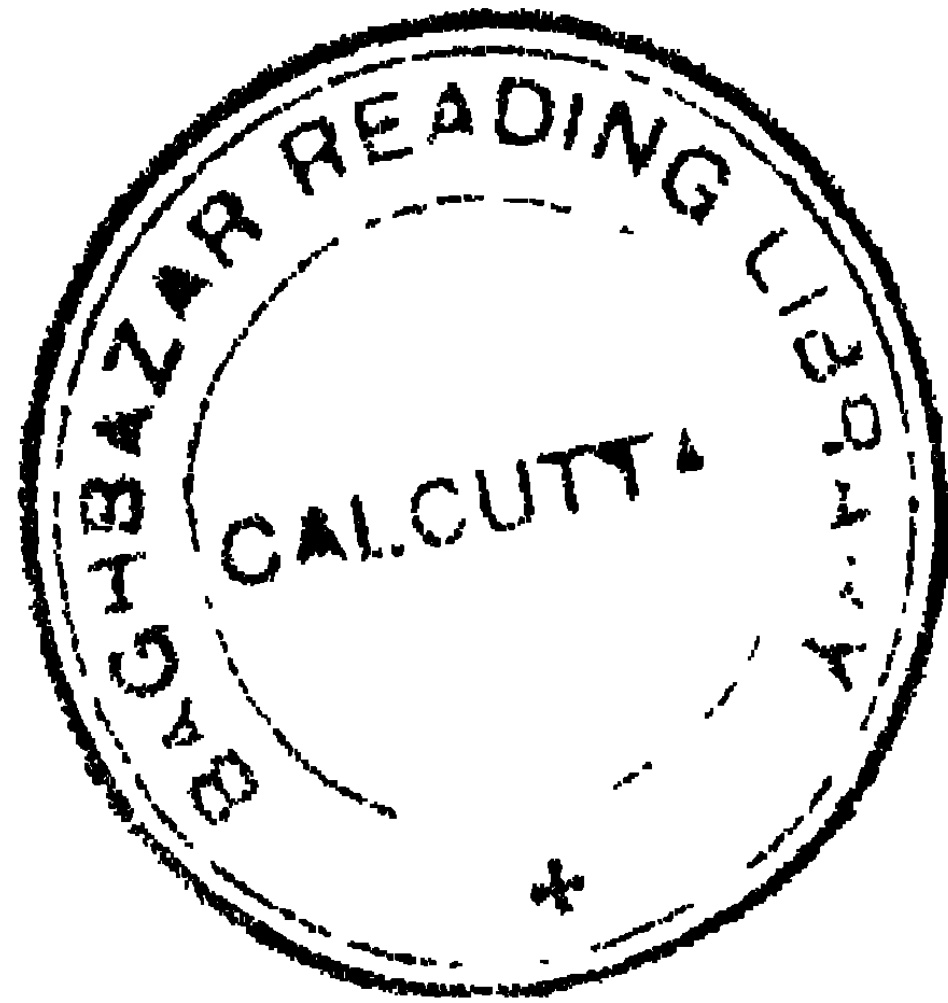
মীরু

তোরা কেমন আছিস। বুড়ির শরীর তেমন ভালো নেই ওকে নিয়ে একবার রাজগিরে গেলে ভালো হোত। সেখানে যে সব স্নানের কুণ্ড আছে বাতের পক্ষে সে ভালো, মোটের উপর শরীরের পক্ষে সেটা স্বাস্থ্যকর। কিছুদিন রোজ যদি সেখানে স্নান করা যায় এবং তার জল পান করা যায় তাহলে Constipationএর পক্ষে খুবই উপকার হয়। তাই বলে দু তিন দিন থাকার কোনো মানে নেই—অন্তত পনেরো দিন থাকা উচিত হবে। এখন সেখানে ভক্তি আছে বুড়ি তাকে সঙ্গিনীরূপে পেতে পারবে। অল্প অল্প শীত পড়েচে। প্রথমটা এসেই রীতিমত বাদলা পেয়েছিলুম। তোদের ওখানে কি রকম? এখন বোধ হয় সময়টা ভালো। এখানে আর কিছু না হোক্ যথেষ্ট নিরিবিলি। আমার লেখাপড়ার পক্ষে বেশ উপযুক্ত। শান্তিনিকেতনে বড্ড বেশি মন বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। আমার নতুন গৃহ নির্ম্মাণ আরম্ভ হোলো কি না জানিনে। প্রভাপ আজ যাচ্চে, সে গিয়ে ইঁটকাঠের জোগাড় সুরু করবে। পুপু এখানে পূর্ণিমাকে পেয়ে সহজে দিনযাপন করচে। রথী দুই একদিনের মধ্যে শান্তিনিকেতনে যাবে। ইতি ১০ কার্ত্তিক ১৩৩৯

বাবা

মীরু

একজামিনেশন তো হয়ে গেলো এখন বুড়ির শরীর মনের অবস্থা কী রকম ? আর কত দিন কলকাতায় কাটাবি এখানে বেশ রীতিমতো ঠাণ্ডা। এখন বেলা দুপুর তবু ইচ্ছা করচে গায়ে একটা মোটা কাপড় চড়াতে। ওদিকে বেল ফুল ফুটতে সুরু করেছে—বৌমার বাগানে রজনীগন্ধা দেখা দিয়েছে — বাসন্তী ফুলে গাছ ছেয়ে গেল, বনপুলক ফুটতে আর দেরি নেই। শিমুলের ফুল ঝরে গিয়ে এখন নতুন পাতা ওঠবার আয়োজন দেখচি—শিলবৃষ্টি ও কুয়াশার উপদ্রবের ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠে অবশেষে আমার সেই আমের গাছটায় আর এক দফা বোল দেখা দিয়েচে। যখন ফল ধরবে তখন হয় তো আমরা কোথাও চলে যাব। সূর্য্যমুখীর দল কিছুদিন খুব ধুমধাম করে দেউলে হয়ে ঝাড়ে মূলে অন্তর্ধান করেচে। দু চার রকমের সীজ্‌ন্ ফুল আজো আমার দুয়োরে হাজরে দিচ্চে। আর সেই লাল রঙের লিলি, একেবারে সার বেঁধে রাস্তার ধারে বাহার দিয়েচে।

মণিপুরের নবকুমার এসেছে, ছুটিতে থাক্‌বে। নাচ শেখবার দুর্লভ সুবিধে হয়েচে— এটাকে কিছুতেই উপেক্ষা করিস্‌নে। বুড়ির যে স্বাভাবিক শক্তি আছে তাতেই তার যথার্থ আনন্দ ও

সার্থকতা। একটুও দেরি করিস্‌নে, চলে আয়। সেই মালাবারী নাচনিও আছে, কিন্তু নবকুমারের নাচ দেখে আরো ভালো লাগল।

আজকাল বৌমা, রথী দুজনেরই শরীর ভালোই আছে। ইতি
১৮ মার্চ্চ ১৯৩৪

বাবা

মারু

বুড়ির শরীরের খবর পেয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে রইলেম। কৃপালানি আজ গেলেন। ডাক্তারদের সঙ্গে পরামর্শ করে যা কর্ত্তব্য হয় স্থির করে আমাকে জানাস। আমি সুরেনকে বলে দিয়েছি চিত্রাঙ্গদার দল নিয়ে বম্বে যাওয়া চলবে না। প্রথম থেকেই এতে আমার উৎসাহ ছিল না —আমি সঙ্গে থাকতুম না ওরা ঘুরে বেড়াত এ কল্পনা আমার একটুও ভালো লাগে নি। বুড়িকে হাওয়া বদলের জন্যে যদি কোথাও নিয়ে যাওয়ার দরকার হয় সে কথাও ভেবে দেখিস।

এখানে গরম বিশেষ নেই। কয়েকদিন ধরে মেঘ করচে, বোধ হয় শীঘ্রই বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। তার পরে পড়বে শীত। ইতি ৩১ চৈত্র[১] ১৩৪৩

বাবা

[১]আশ্বিন হবে। পোস্টমার্ক—17 Oct. 36 = ৩১ আশ্বিন ১৩৪৩

[৭০]

* "Uttarayan"
Santiniketan, Bengal

মীরু

বুড়ির স্থান পরিবর্ত্তনের জন্যে ডাক্তাররা যা পরামর্শ দেয় করিস। ইতিমধ্যে ওর টন্‌সিলের জন্যে Calcarea Sulph 6x বায়োকেমিক, দিনে তিনবার করে দিস। নিশ্চিত উপকার হবে। ভুলিস্‌নে। ওর সম্বন্ধে ডাক্তাররা যা স্থির করবে নিশ্চয় কৃষ্ণ তাতে আপত্তি করবে না। ওর জন্যে মনটা উদ্বিগ্ন হয়ে রইল। ইতি ১ কার্ত্তিক ১৩৪৩

বাবা

[৭১]

* "Uttarayan"
Santiniketan, Bengal.
[পোস্ট মার্ক 17 Jan. 37]

কল্যাণীয়াসু

মীরু, বুড়ির চিঠিতে খবর পেলুম তোর শরীর খারাপ হয়েচে। বুঝতে পারচি শীতের ভয়ে তুই কেবলি রান্না নিয়ে আগুন পোয়াচ্ছিস। সেটা স্বাস্থ্যকর নয়। তোদের পাড়ায় তো হোমিয়োপ্যাথ আছে, একবার দেখা না কেন। আমার কিছু দিন লিভারের দোষ ঘটে রোজ সন্ধের দিকে জ্বর আসছিল ক্ষিতিবাবুর কবিরাজি বিধানে সেটা সেরে গেছে। তোরা মায়ে ঝিয়ে একবার এখানে যদি আসিস্ তাহলে চিকিৎসার চেষ্টা দেখা যায়—উপকার হবে বলে খুবই আশা করচি। বুদ্ধি উজ্জ্বল রাখবার জন্যে আমি একটা কবিরাজি ওষুধ খাচ্চি। তোর বুদ্ধির দোষ ঘটেনি কিন্তু শরীরটাকে মাটি করবার একগুঁয়েমিকে কী নাম দেব।

বৌমা, রথী বোটে, আমি আছি একলা উদয়নের সর্ব্বোচ্চ চূড়ায়। সঙ্গদানের জন্য গাঙুলি আছেন কিন্তু সেটা অ্যালাপ্যাথি ডোজের সঙ্গ।

বাবা

[৭২]

* "Uttarayan"
Santiniketan, Bengal

মীরু

এখানে যদি আসিস নিশ্চয় তোর শরীর ভালো হবে, বিশ্রাম করতে পারবি। বুড়িদের জন্যে মোবারক আছে, সেখানকার রান্নাঘরের দায় পোয়াতে হবে না। আমার একটা প্ল্যান আছে— আমার নতুন বাড়িতে জ্যোৎস্নাকে নিয়ে তুই থাকতে পারবি— আমি আছি উদয়নের তেতালায়। ১০ ফেব্রুয়ারি নাগাদ কলকাতায় যেতে হবে —ইচ্ছা করিস তো সেই সময়েই তুই দৌড় দিতে পারবি। শীত চলচে কিন্তু শুকনো শীত। ইতি ১২ মাঘ ১৩৪৩

বাবা

। মীরু

……ছোট সংসারের মধ্যেই একান্ত আসক্ত হয়ে থাকলে প্রত্যেক ছোট ব্যথা কল্পনায় বড়ো হয়ে উঠতে থাকে। জীবনে ত কম দুঃখ পাই নি কিন্তু জীবনের ভূমিকা যদি ব্যক্তিগত ভালোমন্দ লাগার পরিধির মধ্যে সঙ্কীর্ণ হয়ে থাকত তাহলে কেবল যে আমার দুঃখ বাড়ত তা নয় আমার মন অবিচারপরায়ণ হয়ে উঠ্‌ত। আমার সাহিত্যিক জীবনে এই দুর্গতি ঘটেছিল দেশের লোকের সম্বন্ধে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছি—এই অত্যুক্তির মূল কারণ এই সম্বন্ধে আমার মনের অস্বাস্থ্য। এবার নববর্ষ থেকে চেষ্টা করছি মনকে প্রকৃতিস্থ করতে। বিরাট এই মানববিশ্ব, অতি বৃহৎ সুখে দুঃখে তার ইতিহাস বিক্ষুব্ধ; আমি যদি তার সঙ্গেই নিজের ইতিহাস মেলাতে না পারি তাহলে কোণে বসে কেবলি নিজেকে খোঁচা দেওয়া ও অন্যের বিরুদ্ধে কণ্টকিত হওয়ার মতো লজ্জা আর কিছুই নেই। ক দিনের জন্যেই বা জন্মেছি, এই কটা দিন যদি "sweetness and light" থেকে নিজেকে অবরুদ্ধ করে যাই তাহলে এ ক্ষতিপূরণ হবে কবে? প্রাণপণ সাধনায় চেষ্টা কোরব বাকি কটা দিন জীবনের পরে ক্ষমা ও ধৈর্য্য বিস্তীর্ণ করে যেতে। ইতিমধ্যে

যখন অত্যন্ত অসুস্থ ছিলুম তখন সকলের প্রতি নিজের অকারণ অধৈর্য্যে ও অবিচারে নিজেই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলুম। আর যেন এমন না হয় এই আমার কামনা। ব্যক্তিগত সংসার থেকে বেরিয়ে চলতে চাই বিরাটের দিকে। ১লা বৈশাখ ১৩৪৪

বাবা

৭৪।   ওঁ   * "Uttarayan"

Santiniketan, Bengal.

কল্যাণীয়াসু

তোর শরীর ভালো নেই তা নিয়ে আমার মন উদ্বিগ্ন থাকে। আমরা এপ্রিলের শেষ দিকে আলমোড়া পাহাড়ে যাচ্চি। বুড়িকেও নিয়ে যাব। তুই যদি সেখানে যেতে রাজি হোস খুসি হব। সেখানে তোর ঘরকন্নার কোনো দায়িত্ব থাকবে না। কিছুদিন বিশ্রাম করতে পারবি। আমারও বিশ্রামের দরকার আছে। ইতি ১৯।৪।৩৭

মীরু

পথে বিষম কষ্ট পেয়েছি বিশেষত বেরিলি স্টেশনে। কিন্তু সে দুঃখ ভুলেছি এখানে পৌঁছিয়েই। হাওয়াটি ঠাণ্ডা, বেশি ঠাণ্ডা নয়, খুব শুকনো,— বাড়িটি বেশ বড়ো, বারান্দা প্রশস্ত, মেঘমুক্ত আকাশ, চারিদিক খোলা, ফুল ফুটেছে নানাবিধ, লোকের আনাগোনা নেই বল্লেই হয়। আর সকলেই ভালো আছে, ভালো থাকবে বলেই আশা করি। জ্যোৎস্নাকে কেমন দেখলি? তাকে আশীর্ব্বাদ জানাস। তোরা যাবি কোথায়? ২৫শে বৈশাখের উপদ্রব এড়িয়েছি বলে মন প্রসন্ন আছে। ইতি ২৩ বৈশাখ ১৩৪৪

বাবা

কল্যাণীয়াসু

মীরু, এখানে দিন ভালোই যাচ্চে। তোরা আছিস গ্রীষ্মের অধিকারে, সেখানে আরাম কম বেয়ারাম বেশি, সেইজন্যে তোদের কথা চিন্তা করলেও ঐ পাহাড়ের উপরকার বরফ করুণায় বিগলিত হয়। এখানে পাহাড়ের শীতের কড়াক্কড় একটুও নেই, কর্ত্তব্যের বোধে গরম কাপড় পরি, খুলে ফেলবার ইচ্ছা সর্ব্বদাই মনে থেকে যায়। এই মধ্যাহ্নে খোলা বারান্দায় বসে আছি, আতপ্ত হাওয়া বইচে দেবদারু গাছের শাখা দুলিয়ে, পাইনবনের গন্ধ আসচে, পাখী ডাকচে অজানা ভাষায়। বুড়ি ভালোই আছে, কোনো উপসর্গ নেই। কাল সন্ধেবেলায় কৃষ্ণ এসেছে।— জ্যোৎস্নার খবর কী? বিকেলের জ্বরের পক্ষে Kali Sulph এবং Fer. Phos ব্যবস্থা। ১৭ মে, ১৯৩৭

বাবা

[৭৭] ওঁ * "Uttarayan"

Santiniketan, Bengal.

[পোস্টমার্ক 3 Oct. 37]

মীরু

আমার জন্যে একটুমাত্র ব্যস্ত হোস নে। আমি সম্পূর্ণ খাড়া হয়ে উঠেছি। সেবার শাসন থেকে ছুটি পাবার সময় এসেছে। পানাহারের তুই যে ব্যবস্থা করে দিয়ে গিয়েছিস তিনজনে মিলে উঠে পড়ে সেটা চালাতে লেগে গেছে। আমার প্রাণপুরুষ সর্ব্বৎসাগরে হাবুডুবু খাচ্চে। ওষুধ পথ্য কিছুরই ত্রুটি হচ্চে না।— কিছুদিন পরেই তো কলকাতায় যেতে হবে— কেন তুই মিছিমিছি কষ্ট করে আসবি।

বাবা

মীরু

আমার সংশোধিত তারিখের জন্মোৎসব আজ হয়ে গেল। তুই আসিসনি ভালো করেছিস। আমার সেক্রেটারি বলছে আজকের মতো এমন নিষ্ঠুর গরম অনেককাল হয়নি। আমি এ নিয়ে মুখে নালিশ জানাই নে কিন্তু বোধ হয় আমার দেহটা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। তুই এ সময়ে সমুদ্রতীর ছেড়ে আসিস নে। আমরা দু চারদিনের মধ্যেই কালিম্পং যাচ্ছি। শুনেছি জায়গাটি ভালো, বাড়িটি খুবই ভালো। বৌমারা দুই একদিন আগে যাবেন— আমি যাব আগামী সপ্তাহে।

আমাদের চিত্রাঙ্গদার দল ফিরে এসেছে। সর্বত্রই তারা আদর পেয়েছে, আর পেয়েছে মাছের ঝোল এবং তজ্জাতীয় উপাদেয় জিনিস। বাঙাল দেশে মণিকার নাচের আদর অন্য সকলের কীর্তি ছাড়িয়ে গেছে— বাঙালদেশের জন্যে উদ্বিগ্ন আছি— আমার সেক্রেটারি এ সম্বন্ধে কোনো কথা বলতে রাজি নয়— বোধ হয় মতের মিল আছে। ইতি ২[১?] বৈশাখ ১৩৪৫

বাবা

[৭৯] ওঁ * "Uttarayan"
Santiniketan, Bengal

মীরু

কাল রাত্রে বুড়ির কাছে তোর অসুখের কথা শুনে মনটা ভারি উদ্বিগ্ন আছে। আজ থেকে কয়েকদিন এখানে বিয়ের হাঙ্গাম— সেটা না চুকলে আমাকে ছেড়ে দেবেনা— এটা শেষ হলেই আমি কলকাতায় যাব। ইতিমধ্যে দিনে তিন বার পালা করে Kali Mur এবং Natrum Phos খাস— অবহেলা করিস নে। খুব সম্ভব সোমবারে যাবার চেষ্টা করব যদি না বিশেষ বাধা ঘটে। ইতি, শুক্রবার

বাবা

ওঁ

* "Uttarayan"
Santiniketan, Bengal.

কল্যাণীয়াসু

আজ রাণীর চিঠিতে তোর অসুখের খবর পেয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়েছি। আমার নিজের বিশ্বাস এ রকম লেগে থাকা জ্বর হোমিয়োপ্যাথিতেই শীঘ্র সারে।—আমার শরীর যাতায়াত করবার যোগ্য নয়—নইলে তোকে একবার দেখে আস্‌তুম। আজই পাঠিয়ে দিচ্চি সুধাকান্তকে। সে তোকে পরামর্শ আর আমাকে খবর পাঠাতে পারবে। একবার জীবনকে দেখালে ক্ষতি কী

বাবা

মীরু

বিপদে পড়েছি। হঠাৎ সংবাদ পেয়েছি, একঝাঁক জাপানী আসচে আমাদের নাচের পরীক্ষার জন্যে। আগামী রবিবারেই পরীক্ষার দিন। নানা দুর্গ্রহে এখানকার নাচের দল ফোঁকলা হয়ে গেছে। শনি ও রবিবারের জন্যে বুড়িকে না পেলে এমন একটা লোকহাসানো হবে যা সমুদ্রপার হয়ে যাবে। বুড়ি আসুক শুক্রবারে, ফিরুক সোমবারে। উপযুক্ত সঙ্গী দেব। তুই এলে আরো খুসি হব, ··· ··· তোর জন্যে আমার কোণের ঘর সুসজ্জিত হয়ে আছে, কোনো অসুবিধে হবে না। এই বার্ত্তা বহন করে অনিল যাচ্চে দূত হয়ে, মাথা হেঁট করে যদি ফিরিয়ে দিস তবে তার অন্তরে চির বিষাদের সজল ম্যাঘ ঘনীভূত হয়ে থাকবে। ইতি বুধবার

বাবা

দৌহিত্র নীতীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত

[১]

C/o American Express Co
New York.

কল্যাণীয়েষু

নীতু তোর চিঠি পেয়ে খুসি হলুম। খবরের কাগজে এতদিনে পড়েচিস আমার শরীর খুব খারাপ হয়েছিল। এখনো আমাকে বিছানায় ধরে রেখেচে কন্তু ভালো আছি, ভাবনার কোনো কারণ নেই।

জর্ম্মনীতে পৌঁচে অবধি আমি তোর জন্যে চেষ্টা করেছি। সেখানে আমার অনেক বন্ধু আছে⋯সেই বন্ধুদের চেষ্টায় ভালো ব্যবস্থা হতে পেরেচে। প্রথমে তোকে ম্যুনিকে শিখতে হবে তার পরে লাইপ্‌জিকে। লাইপ্‌জিকে শুধু কেবল ছাপানো নয় Book Publishing ও শিখ্‌তে পারবি—তা ছাড়া সেখানে অন্য সবরকম শেখবার আয়োজন আছে।

ইতিমধ্যে যতটা পারিস জর্ম্মন অভ্যাস করে নিস। Tourist Conversation বই একটা কিনে নিয়ে প্রতিদিন খানিকটা করে চোখ বুলিয়ে নিস্। শান্তিনিকেতনে যদি যেতে পারতিস তাহলে সেখানে জর্ম্মান শেখা সহজ হোত। কিন্তু Times of India প্রেসে তোর নিজের ব্যবসা যতদূর সম্ভব অভ্যাস করে নেওয়া ভালো—তাহলে জর্ম্মানিতে তোর কাজ অনেকটা সহজ হবে।

আমি ডিসেম্বরের মাঝামাঝি দেশে ফিরব—কিন্তু বম্বাই দিয়ে নয়—কলম্বো দিয়ে। সুতরাং পথে তোর সঙ্গে দেখা হবে না। যাই হোক জর্মনিতে ওরা যখন তোর স্থির হয়েই গেছে তখন এইবার বর্লিনে আমার বন্ধুকে চিঠি লিখে কথাটা পাকা করে নেব। আমার খাতিরে ওরা তোকে খুব যত্ন করেই শেখাবে।

তোর মাকে এই চিঠি পাঠিয়ে দিস্ বলিস্ কোনো ভাবনা নেই। এর আগে যেমন একবার নীলরতনবাবু আমাকে শুইয়ে রেখেছিলেন এও তেমনি। এই কয়দিন বিশ্রাম করেই বেশ আবার সহজ মনে হচ্চে—কিন্তু সব ঘোরাঘুরি বকাবকি বন্ধ করে দিয়েচি। যখন দেশে ফিরব তখন নিশ্চয় দেখতে পাবি আগেকার চেয়ে শরীর অনেক ভালো হয়েচে। ইতি ২৪ অক্টোবর ১৯৩০

দাদামশায়

এ চিঠির জবাব দেবার সময় পাবিনে

নীতু

মোলারের কাছ থেকে যে টাকা পেয়েছিস তার থেকে ছবির কাগজ পাঠাস। Der Künst টা লাগ্‌ল ভালো। প্যারিস থেকে নানা রঙের কালী এনেছিলুম, ছবি আঁকতে সেগুলো খুব ভালো, তোদের ওখানে যদি তেমন ভালো কালী থাকে এক সেট পাঠাবার চেষ্টা করিস। ছবিগুলো দুশোটাকার ইনস্যোর করে পাঠাস্। বাকি টাকা তোর নিজের হাতে রেখে দিস্, যদি কখনো কিছু দরকার পড়ে ব্যবহার করতে পারিস। বুড়ি দিল্লি থেকে শান্তিনিকেতনে এসেচে। শরীর খুব রোগা দুর্ব্বল হয়ে গেছে। আমি এপ্রেলের গোড়ার দিকে বোধ হয় পারস্যে যাব, Air Mail-এ। আশা করি লাইপ্‌জিকে তোর কাজের একটা কিছু জোগাড় করতে পেরেছিস্। ওখানে তোর কত দিন লাগ্‌বে। ইতি ১৫ ফেব্রুয়ারি[১] ১৯৩৮

দাদামশায়

[১] ১৯৩১ হইবে।

কল্যাণীয়েষু

নীতু, তোর চিঠিতে সব খবর পেলুম। তোর কাজ রীতিমত আরম্ভ হবার আগে তোকে যে আট মাস বসে থাকতে হবে শুনে ভালো লাগ্‌ল না। Anna Selig জর্ম্মনিতে আছে কিনা সেও সন্দেহস্থল। এই আট মাস যাতে ব্যর্থ না যায় সে চেষ্টা করিস্। বর্লিনে Mrs. Mendell বলে আমাদের একটি বন্ধু আছেন তাঁর ঠিকানা হচ্চে

Wannsee
Friedrich-Kart Str, 18, Berlin.

তাঁকে আমি তোর কথা লিখে দিয়েছি—হয়ত তিনি তোকে চিঠি লিখবেন।

২ বৎসর আট মাস তো তোর ম্যুনিকেই কাটবে তার পরে আরো এক বছর লাইপজিকে কাটানো সম্ভব হবেনা—হয়তো প্রয়োজনও হবে না। এই আট মাস তুই কোনো একটা ছাপাখানায় এপ্রেন্টিসি কাজের জোগাড় করতে পারবি নে কি? অবশ্য মাইনে দাবী করলে চলবেনা—বরঞ্চ তোকেই কিছু দিতে হবে। পরিবারের মধ্যে না থেকে ছেলেদের সঙ্গে থাকলে তোর খরচ বোধ হয় অনেক কম হতে পারবে—সে দিকে দৃষ্টি রাখিস। ইতি ৩০ মে ১৯৩১

দাদামশায়

কল্যাণীয়েসু

নীতু তোর চিঠি পেয়ে খুসি হলুম। আশা করি এতদিনে একটা কিছু ভালো ব্যবস্থা হয়ে গেছে। খবরের কাগজ থেকে যতটা আন্দাজ করি তাতে বোধ হচ্চে ব্যাভেরিয়ার ভাবগতিকটা সুবিধামত নয়। দূর থেকে কিছু পরামর্শ দেওয়া শক্ত— ওখানকার অবস্থা বুঝে তুই নিজে যেটা ভালো বোধ করবি তারই অনুসরণ করিস্। লাইপ্‌জিগ্ জায়গাটা ভালো সন্দেহ নেই— জর্ম্মনির একটা খুব বড়ো বিদ্যাকেন্দ্র। তোর ব্যবসা শেখার সঙ্গে সঙ্গে আরো কিছু বেশি শিখে নিতে পারলে তোর অনেক উপকার হবে। ম্যুনিকে আর্টের চর্চ্চা খুব বেশি—সঙ্গীতের এবং শিল্পের। তোর বেহালা শেখার ঝোঁক কি একেবারে কেটে গেছে ? আঁকবার হাত দোরস্ত করতেই বা দোষ কি ?

তোকে বাংলা কাগজ বই প্রভৃতি পাঠাবো। আগে শান্তিনিকেতনে ফিরি তার পরে। জুলাই মাসের গোড়ায় এখান থেকে নামব।

তোর মামা ভাল আছেন কিন্তু মামী কিছুদিন ধরে ইনফ্লুয়েঞ্জায় ভুগচেন। আজ অনেকটা ভালো আছেন। তোর মায়ের খবর নিশ্চয় পাস্।...কে শান্তিনিকেতনে আনবার কথা হয়েছিল

কিন্তু অর্থাভাব অত্যন্ত বিষম। দেশ দুর্ভিক্ষগ্রস্ত। নিয়মিত খরচ চালানোই কঠিন। তিনি দুঃখিত হবেন জানি, কিন্তু একেবারেই উপায় নেই। তিনিও তোর জন্যে বিশেষ কিছু সুবিধে করে দেবেন বলে বোধ হয় না। নিজের পরেই যথাসম্ভব নির্ভর করিস। ইতি ২৮ জুন ১৯৩১

দাদামশায়

কল্যাণীয়েষু

নীতু, তোর চিঠি পেয়ে খুসি হলুম। জর্ম্মানিতে ব্যাভেরিয়ার ভাবগতিক ভালো লাগচে না। যেখানে দারিদ্র্যে মানুষ দুর্ব্বল সেইখানেই যেমন মারী মড়ক জোর পায় তেমনি আজকালকার য়ুরোপে দুর্ভিক্ষ যতই ছড়িয়ে পড়চে ততই ফাসিজ্‌ম এবং বল্‌শেভিজ্‌ম জোর পেয়ে উঠ্‌চে। দুটোই অস্বাস্থ্যের লক্ষণ। মানুষের স্বাধীনবুদ্ধিকে জোর করে মেরে তার উপকার করা যায় এ সব কথা সুস্থচিত্ত লোকে মনে ভাবতেই পারে না। পেটের জ্বালা বাড়লে তখনই যত দুর্ব্বুদ্ধি মানুষকে পেয়ে বসে। বল্‌শেভিজ্‌ম্ ভারতে ছড়াবে বলে আশঙ্কা হয়—কেননা অন্নকষ্ট অত্যন্ত বেড়ে উঠেচে— মরণদশা যখন ঘনিয়ে আসে তখন এরা যমের দূত হয়ে দেখা দেয়। মানুষের পক্ষে মানুষ যে কি ভয়ঙ্কর তা দেখলে শরীর শিউরে ওঠে—মারের প্রতিযোগিতায় কে কাকে ছাড়িয়ে যাবে সেই চেষ্টায় আজ সমস্ত পৃথিবী কোমর বেঁধেচে—মানুষের হাত থেকে বাঁচবার জন্যেই মানুষ কেবলি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠ্‌চে—এর আর শেষ নেই—খুনোখুনির ঘূর্ণিপাক চল্‌ল।

আর যাই করিস্ এই সব মানুষখেগো দলের সঙ্গে খবরদার মিশিস্ নে। য়ুরোপ আজ নিজের মহত্ত্বকে সব দিকেই প্রতিবাদ

করতে বসেচে। আমাদের দেশের লোক—বিশেষ বাঙালী—আর কিছু না পারুক, নকল করতে পারে—তাদের অনেকে আজ য়ুরোপের ব্যামোর নকল করতে লেগেচে। এই নকল মড়কের ছোঁয়াচ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলিস্। নিশ্চয় তোদের ওখানে এই সমস্ত দানোয়-পাওয়া ভারতবাসী অনেক আছে, তাদের কাছে ভিড়িস্ নে, আপনমনে কাজ করে যাস্।

বেহালা শেখা সম্বন্ধে আমারো উৎসাহ নেই। কিন্তু চেলো যন্ত্রটা আমার খুব ভালো লাগে। মনে হয় আমাদের দিশি সুর ওতে জমে ভালো। কিন্তু তুই যা বলেছিস্ সে কথা সত্যি—এ সব যন্ত্র শিখ্‌তে এত সময় দরকার যে অন্য সমস্ত শেখা চাপা পড়ে যায়। এখন এ সব থাক্। কিন্তু ডিজাইনে হাতপাকানো তোর নিজের কাজেই খুব দরকার। এখানে ফিরে এসে ওটাতে হাত দিতে পারবি।

এখানে বর্ষা চল্‌চে। চারদিক সবুজ হয়ে উঠেচে। দার্জ্জিলিঙে কিছুদিন কাটিয়ে এসে এখানে ভালোই লাগ্‌চে। এখানকার খবর নিশ্চয়ই সব পাস্। ইতি ৩১শে জুলাই ১৯৩১

দাদামশায়
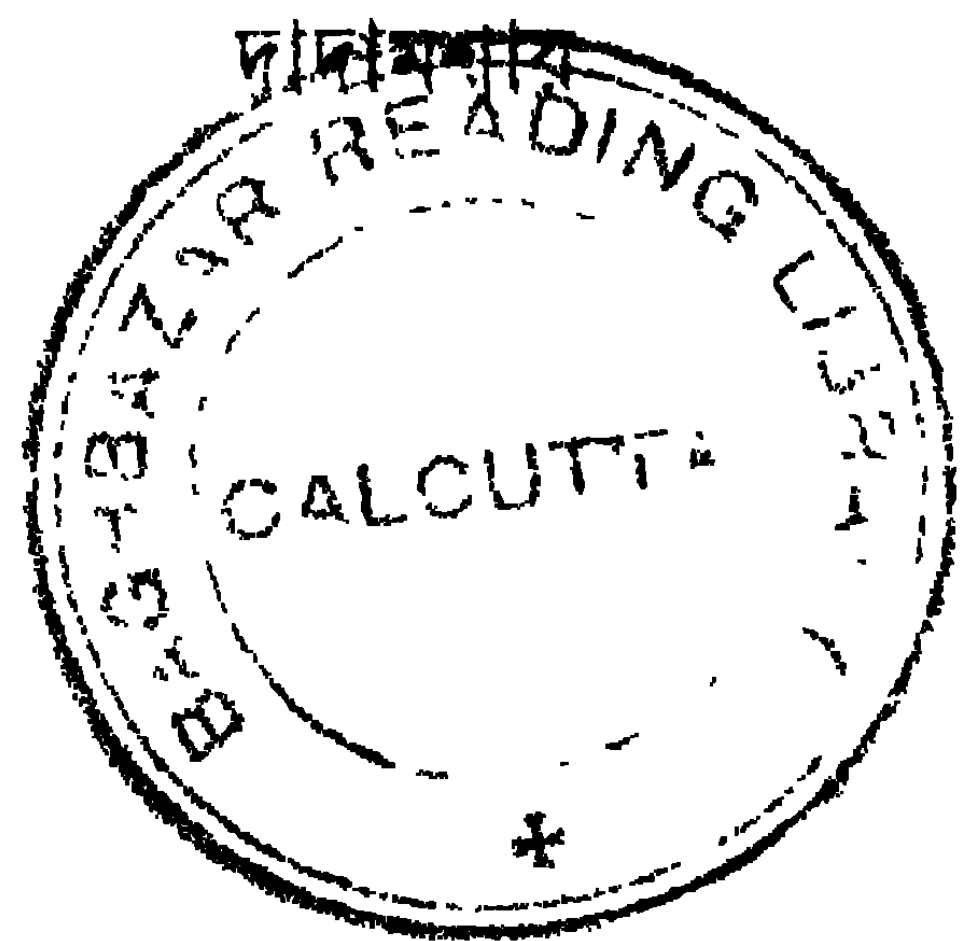
কল্যাণীয়েষু

নীতু, নিজে খোঁজ করে চেষ্টা করে নিজের সুযোগ বের করচিস শুনে খুব খুসি হলুম। ...... ম্যুনিকে তোর ব্যবস্থা করে দেবেন শুনেই আমি তোকে ম্যুনিকের কথা বলেছিলুম এখন বুঝতে পারচি তিনি বিশেষ কিছু জানেন না এবং তাঁর যে কোনো influence আছে তাও নয়। Mainz ছোট সহর বলেই মোটের উপর তোর কাজ শেখার সুবিধা হবে এবং লোকজনদের সঙ্গে আত্মীয়তা হতে পারবে।

পৃথিবীতে আজ সর্ব্বত্রই দুর্ভিক্ষের দশা আমাদের দেশেও তাই, বরঞ্চ বেশি। এই দারিদ্র্য বহুকাল থেকেই আছে, আজ আরো বেড়েচে। উত্তরবঙ্গে পূর্ব্ববঙ্গে বন্যা হয়ে কত শত গ্রাম ভেসে গেছে। তাদের সাহায্যের জন্যে টাকা তুলতে হবে বলে কলকাতায় একটা অভিনয় করবার কথা হচ্চে—তাই নিয়ে ব্যস্ত আছি।......

আমাদের এখানে ভাদ্রমাস, মাঝে মাঝে প্রায়ই বৃষ্টি চল্‌চে— মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন। এই বৃষ্টিটা কেটে গেলেই শরৎকালের চেহারা বেরোবে, শিউলির গন্ধে আকাশ ভরে উঠবে। আমি এইখানেই শরৎকালটা উপভোগ করব স্থির করেচি।

এখানকার সব খবর নিশ্চয়ই তুই মায়ের কাছ থেকে পাস। শ্রীমতী কিছুদিন থেকে তাঁর কাছে আছে বলে বোধ হয় মীরা চিঠিপত্র লিখতে সময় পায় না। কেননা তোর cable থেকে জানলুম মাঝে অনেকদিন চিঠি পাস্‌নি। পোলিটিকাল্‌ সন্দেহ বশত এখানকার ডাকঘরের উপর ভরসা করা যায় না। আমাদের অনেক চিঠিই প্রায় দেরি হয়, এমন কি খোওয়া যায়। চিঠি পেতে দেরি হলে উদ্বিগ্ন হোস্‌নে। ইতি ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩১

দাদামশায়

কল্যাণীয়েষু

নীতু, তোর চিঠি পেয়ে খুব খুসি হলুম। এই সঙ্গে World Goethe Honouring দলকে চিঠি লিখে দিলুম। জর্ম্মানীতে Art magazine যা বেরোয় তারই দুই একটার গ্রাহক হতে চাই কত দাম লাগে জানালে টাকা পাঠিয়ে দেব। কাল এখানকার বিদ্যালয়ের ছুটি আরম্ভ হবে। তোর মামা মামী পুপু সব দার্জ্জিলিঙে।......খুব গরম চলচে। মনে করচি আমিও দার্জ্জিলিং যাব। তোর মা নড়তে চায় না--- যদি রাজি হয় তাকেও নিয়ে যাবো। যারা তোর সহায়তা/করচে তাদের সকলকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাস। ইতি ১২ অক্টোবর ১৩৩৮ [১৯৩১]

দাদামশায়

কল্যাণীয়েষু

নীতু, পারস্যে বেড়াতে গিয়েছিলুম সে কথা নিশ্চয় শুনেছিস। বেশ লাগল। তারপরে এই সেদিন ফিরে এসে খবর পেলুম তোর কাশি হয়েচে। নিশ্চয় শীতের সময় ঠিকমতো শরীরের যত্ন নিস্ নি। এখন অনেকটা ভাল আছিস্ শুনে নিশ্চিন্ত হয়েছি। যদি তুই ইচ্ছে করিস তাহলে আমরা কারো সঙ্গে তোর মাকে তোর কাছে পাঠিয়ে দিতে পারি। লিখে জানাস্।

এখানে মাঝে অসহ্য গরম পড়ে এতদিনে মনসুনের আবির্ভাব হয়েছে। এইবার বৃষ্টির পালা চল্‌বে। চার দিক সবুজ হয়ে উঠেচে। এবার দেশে আম হয়েছে বিস্তর। দেশ যে রকম গরীব হয়ে গেচে তাতে আম খেয়ে মানুষ বাঁচবে।

এখন য়ুরোপে গরমি কাল—অর্থাৎ আমাদের দেশের বসন্তের মতো। পারস্যে ছিলুম এপ্রেল মে দুই মাস। গরম পাই নি। প্রায় আমাদের এখানকার শীতের মতো। তার কারণ ওদের দেশটা সমুদ্রের উপর থেকে চার পাঁচ হাজার ফিট উঁচু, আমাদের দেশের কার্সিয়ঙের মতো।

যা হোক শীঘ্‌ঘির সেরে নিয়ে কিছুদিনের জন্যে বেড়াতে যাস তাহলে শরীরে বল পাবি।

বুড়ি এখানে আছে— ভালোই আছে। ২১ জুন ১৯৩২

দাদামশায়

[৯]　　　　　　　　ঁ　　　　　　　　জোড়াসাঁকো

[কলিকাতা]

কল্যাণীয়েষু

নীতু, এই চিঠি তোর মায়ের হাতে দিচ্চি। তুই অনেকটা ভালো আছিস শোনা গেল— এইবার তোর মায়ের হাতের রান্না খেয়ে দেখতে দেখতে ভালো হয়ে যাবি। হাওয়া বদলের জন্যে কোথায় তোকে নিয়ে যাবে এখনো খবর পাই নি। নিশ্চয় খুব সুন্দর জায়গা হবে, তোর লাইপজিকের চেয়ে অনেক ভালো। আমার যেতে ইচ্ছে করচে কিন্তু কাজকর্ম্ম ফেলে যাবার যো নেই। এর পরে আসচে বছরে কোনো এক সময়ে হয় তো দেখবি গিয়ে উপস্থিত হয়েছি।

আষাঢ় মাস প্রায় শেষ হয়ে এল— কিন্তু বর্ষাকাল এখনো তেমন ভালো করে আসে নি— মেঘ করে কিন্তু বর্ষণ হয় না। যদি সমুদ্রেও বর্ষার উৎপাত না আসে তা হলে তোর মার পক্ষে ভালো। যাই হোক্ যখন এই চিঠি পাবি তখন তো সমুদ্রের পালা শেষ হয়ে গেছে।

আজ সন্ধেবেলায় তোর মা যাচ্চে বোম্বাইয়ে জাহাজ ধরবার জন্যে। আমরা কাল চলে যাব শান্তিনিকেতনে।

আমার দুই একটা বই তোকে পড়বার জন্যে পাঠিয়ে দিলুম। এতদিনে জর্মানের চাপে বাংলা ভাষা যদি না ভুলে গিয়ে থাকিস তাহলে যখন খুসি একটু আধটু করে পড়িস— কিন্তু কবিতা লেখবার চেষ্টা করিস নে। ইতি ১২ জুলাই ১৯৩২

দাদামশায়

দৌহিত্রী শ্রীনন্দিতা দেবীকে লিখিত

[শান্তিনিকেতন
অগ্রহায়ণ-পৌষ, ১৩৪১]

কল্যাণীয়াসু

বুড়ি, তোরা সাতই পৌষে এখানে আসবি এটা নিশ্চিত ধরেই রেখেছিলেম। তখন ক্রিস্টমাসের ছুটি পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে। ছুটিতে মনকে ও দেহকে যে আনন্দ ও বিশ্রাম দেয় সেটা কাজের পক্ষেই অত্যাবশ্যক। যারা ফললোভী তারা মনে করে মনকে নিরবচ্ছিন্ন পীড়া দিয়ে যতই খাটানো যাবে ততই বেশী ফল পাওয়া যাবে। কিন্তু মন তো জাঁতাকল নয় যে তাকে যতই ঘোরানো যাবে ততই তার থেকে আটা বের হবে। মাঝে মাঝে তার বিশ্রাম ও খুসির দরকার। যাই হোক ৭ই পৌষের পর হয়তো ক্রিস্টমাস কিম্বা তার পর দিনে আমি কলকাতায় যাব তখন তোদের সঙ্গে দেখা হবে। ২৬শে তারিখে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্যসম্মিলনীতে আমার কাজ আছে। তুই যদি বাংলায় কবিতা লিখে কিছুদিন প্রবাসীতে ছাপাতিস্ তাহলে তোকে সভাপত্নী করে দিতুম।

তোর জন্যে এক ঝুড়ি কাশীর আমলকি পাঠিয়েছি। পেয়েছিস তো? তোর পক্ষে ও জিনিষটা ভালো। সকালে উঠে গোটা আষ্টেক চিবিয়ে খেয়ে এক গ্লাস জল খাওয়া হচ্চে

বিধি। পরীক্ষা করে দেখিস্। ফল না হলে ফলের সংখ্যা বাড়াস।

শীত রীতিমত জমেচে। পিঠের উপর মোটা কাপড়ের বোঝা বেড়ে উঠচে। ধোবার গাধার যে কি দুঃখ তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্চে। ইতি

দাদামশায়

বৃদ্ধা

কবিতা লেখবার মতো মনের ভাব নেই— সে আশা কোরো না।

এইমাত্র ক্রিম দিয়ে গুলে চা খেয়ে এসে বসেছি। স্নিগ্ধ বাতাস বইচে, ঘরের পর্দ্দা উড়চে, বাগানের গাছে পালায় দোলাদুলি। প্রাতঃকালে বসন্ত ঋতুরাজের মেজাজ ঠাণ্ডা থাকে, ক্রমশই তার মাথা গরম হয়ে ওঠে।

সমুদ্রে তোমার কী রকম অবস্থা হয়েছিল সেটা শোনবার জন্যে কৌতূহল হচ্চে। যা কিছু আহার করেচ তাকে ধারণ করতে পেরেচ কিনা জানতে চাই।— রেল রথ থেকে তোমার শেষ খবর যা জান্‌তে পেরেছি তার থেকে বোঝা গেল তুমি Sugar of Milk খাচ্চ এবং কোনই ফল পাচ্চ না। গীতা বলেচেন কাজ করে যাবে কিন্তু ফলের লোভ করবে না— তুমিও তদনুসারে চলচ, কেবলি খেয়ে চলেচ সুগার অফ মিল্ক, কিন্তু ফলের অপেক্ষা করচ না, শেষ পর্য্যন্ত এই ভাবেই চলল কিনা জানতে উৎসুক আছি।

এখানে নতুন সংবাদ কিছুই নেই— গাছ পালায় নতুন পাতা ধরচে— আমি এসেছি কোণার্ক ত্যাগ করে উদয়নের নতুন

বাসায়, বনমালীর রক্ত আমাশা হয়েছিল, খাবার টেবিলে কিছুদিন তার মুখ দেখতে না পেয়ে উৎকণ্ঠিত ছিলুম। আজ থেকে আবার তার আবির্ভাব হয়েছে, তুই বেশি চিন্তিত হোস নে, আমি চিঠিতে মাঝে মাঝে তার সংবাদ পাঠাব। তোর মা এখনো কলকাতায় আছে। তার কারণ সেখানে ভালোই আছে। ইতি ২৭।৩।৩৫

দাদামশায়

[৩]

* Visva-Bharati
Santiniketan, Bengal

মেম সাহেব

আজ পয়লা বৈশাখে তোর চিঠিতে তোর কুশলসংবাদ শুনে নিরুদ্বিগ্ন হলুম। এখন কেবল পরীক্ষায় তোর ফেল হবার সংবাদের অপেক্ষা করচি— নইলে আমার মতো ইস্কুল-পালানো পরীক্ষা-এড়ানো ছেলে তোর কাছে যে মাথা তুলতে পারবে না। ঠিক এখন কোথায় আছিস জানি নে— হয় তো আন্দ্রেদের বাড়িতে দক্ষিণ ফ্রান্সে। বোধ হয় রথী একলাই যাবে লণ্ডনে।

আজ সন্ধ্যা সাতটার সময় আমবাগানে নববর্ষের নাচ গান হবে। আমি দুই একটা কবিতা আবৃত্তি করব। শুক্লপক্ষের নবমীর চাঁদ উঠবে আকাশে। লোভ হচ্চে না শুনে?

এবার মাঝে মাঝে বৃষ্টিবাদল হয়েছে— মোটের উপর গরম বেশি নেই— হয় তো এখানেই আমার ছুটি কাটবে। যদি জ্যৈষ্ঠ মাসটা অসহ্য হয়ে ওঠে তাহলে তোমার চিত্তবেদনা সত্ত্বেও আমি মৈত্রেয়ীর ওখানে নিশ্চয়ই যাব।

আমার মাটির ঘরের চেহারা দেখলে আশ্চর্য্য হতিস্। দেশে বিদেশে ওর খ্যাতি রটে গেছে। ভেবেছিলেম মাটির ঘরে নিরালায় থাকব— ঠিক তার উল্টো হবে— আমাকে দেখবার

চেয়ে মাটির ঘর দেখবার জন্যে ভিড় জমবে— ফলটা আমার পক্ষে সমানই হবে।

তোর মা এবার তার মামার দেশে ভ্রমণ শেষ করে সেখানকার পানাপুকুরের ধারের আস্‌সেওড়ার বন থেকে সম্প্রতি শান্তিনিকেতনে এসেচে। মামার বাড়ির জন্যে খুব যে বেশি মন কেমন করচে তার কোনো লক্ষণ দেখচি নে।

পূর্ণিমার হাম হয়েছিল। সেরে উঠচে। আমার এখনো হয়নি। আর সব খবর ভালো। নব বর্ষের আশীর্ব্বাদ। ইতি ১ বৈশাখ ১৩৪২

দাদামশায়

মেম সাহেব

একটা সুখবর আছে। ফাঁকি দিয়ে শুনে নিবি, দূর থেকে কিছু প্রতিদান পাবার প্রত্যাশা করতে পারব না। গত কল্য অপরাহ্নে চারু ভট্টাচার্য্যের কাছে থেকে একটা চিরকুট এসে পৌঁছল তাতে দেখা গেল নন্দিতা নামে এক মহিলা ফার্স্ট ডিবিশনে ম্যাট্রিক পাস করে তার মাতামহের লোকবিখ্যাত পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে। তোমার সেই পরীক্ষা খেয়ার কর্ণধার মুদ্রিতচক্ষু মাস্টার মশায়ের জয়জয়কার। এত বড়ো দুঃসাধ্য কাজ করতে পারে যে অধমতারণ, এই রজত জুবিলি উপলক্ষ্যে তার একটা বড়ো পদবী পাওয়া উচিত ছিল। আমি লজ্জায় পড়ে গেছি—মনে করচি তার শরণাগত হব, অন্তত ম্যাট্রিকটাও কোনো মতে যদি তরে যেতে পারি।

জাপানে নাচের দলবল নিয়ে যাবার একটা কথা উঠেছিল কিন্তু তোরা কেউ কোথাও নেই, এবং অত বড়ো অধ্যবসায়ের জন্য প্রস্তুত হবার মতো উপকরণেরও অভাব তাই সুরেন লিখে দিয়েছে এবার সেপ্টেম্বরে না গিয়ে আমরা তার পরবর্তী এপ্রেল মে মাসের জন্যে প্রস্তুত হতে পারি। জানিনে কি রকম জবাব পাওয়া যাবে। ওরা যদি রাজি হয় তাহলে এখন থেকে উপযুক্ত

গাইয়ে বাজিয়ে নাচিয়ে জোগাড় করে অভ্যেস করানো যেতে পারে। কেউ কেউ আমাদের পরামর্শ দিচ্চে য়ুরোপে চেষ্টা করতে। অনেকের বিশ্বাস ফল পাওয়া যাবে, বিশেষত আমি যদি সঙ্গে থাকি। আমি ভীতু মানুষ এ সমস্ত দুঃসাহসিক দায়িত্ব নেবার মতো আমার বুকের পাটা নেই। তোরা এতদিনে নিশ্চয় ডার্টিঙ্‌টন হলে গিয়ে উঠেছিস্। জায়গাটা ভালোই। ওখানে বোধ হয় ওরা তোর নাচ দেখবার ফরমাস করবে— চীনের মেয়েদের চেয়ে ভালো নাচা চাই। কিন্তু বোধ হচ্চে ওদের পুরুষরাই মেয়ে সেজে নাচে সেই জন্যেই ওদের নাচ এত আশ্চর্য্য ভালো হয়। তোমার কর্ম্ম নয় ওদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া।— উঃ ছেলেমেয়েগুলো কী বিষম চেঁচাচ্চে— একটা ভাঙা ঘাট সেইখানে ওরা নাইতে এসেচে— নাওয়া আর শেষ হয় না। এখানে আর সব ভালো, হাওয়া দিচ্চে খুব মিষ্টি— ভাঙা ঘাটের ফাটলের মধ্যে দিয়ে প্রকাণ্ড একটা বট গাছ উঠেছে, বোটটা ঠাণ্ডা থাকে তারি ছায়ায়। ডাঙাটা খুব জঙ্গল, যাতায়াতের পক্ষে সুবিধে নয় কিন্তু দেখতে বেশ ভালো লাগে। ইতি ২২ মে ১৯৩৫

দাদামশায়

বৃদ্ধা

নিশিবাবুর মেয়ের বিয়ের নিমন্ত্রণপত্র যখন এলো তখন আমি বিশেষভাবেই অসুস্থ ছিলুম। সেই অবস্থায় সেই চিঠির কী দশা হোলো মনেই নেই। সেদিন তাঁকে বরবধূকে নিয়ে এখানে আসতে নিমন্ত্রণ করেছি। প্রত্যক্ষ আশীর্ব্বাদ করতে পারব।

অপর্ণার পার্ট অভিনয় করতে তোর ভাবনা কী। যেমন করে করবি তাই ভালো হবে। যদি কেউ নিন্দা করে তুই আমার দোহাই দিয়ে বলিস্ দাদামশায়ের বই আমি যেমন খুসি অভিনয় করব— তোমরা বলবার কে!

এখানে বৃষ্টিতে গুমটে পর্য্যায়ক্রমে দিন চলে যাচ্চে। ভাদ্র মাসে ধরণীকে বাষ্পস্নানে ঘামিয়ে দেওয়া হয় সেই পালা চলচে আমাদেরও সর্ব্বাঙ্গ অশ্রুপ্লাবিত।

এলাহাবাদের Conference-এর সময় আমাদের এখানে ছুটির পূর্ব্বেকার উৎসব চলবে। শারদোৎসবের রিহার্সাল দিচ্চি— ছেড়ে কারো যাবার জো নেই। তা ছাড়া আরো একটা কথা আছে। এখানে বা অন্যত্র আমাদের যে নাচ হয় তার আনুষঙ্গিক আলো ও শোভাশয্যায় তাকে সম্পূর্ণতা দেয়। বেনারসে আমি সঙ্গীত সম্মেলনের যে ব্যাপার দেখেছি সেই

বারোয়ারির হট্টগোলের মধ্যে আমাদের নাচ নিতান্ত অনুজ্জ্বল হয়ে পড়বে। ওতে লোকের ধারণা যথেষ্ট ভালো হবে না। মনে রাখিস মাঝে মাঝে নাচ দেখিয়ে আমাদের অর্থ সংগ্রহ করতে হয়। যেখানে সেখানে যেমন তেমন করে নাচলে এ নাচের মূল্য কমে যাবে। ওখানে দক্ষিণভারত প্রভৃতি জায়গা থেকে পেশাদার নাচিয়ে সব আসবে তাদের মধ্যে এদের নাচিয়ে আনার ব্যাপারে খুবই বিপদের আশঙ্কা এবং লজ্জার কারণ আছে। এ সব জায়গায় শান্তিনিকেতনের মেয়েদের নিজেদের exhibit করানো ভালো নয়। আমাদের এখানকার exclusiveness কে বজায় রাখা খুব দরকার।

তোদের পাড়ায় যে মেয়ে ভুল সুরে হার্মোনিয়ম বাজিয়ে গায়— তাকে সুর শিখিয়ে দিয়ে আসিস্, বেতন দাবী করিস নে। বলিস নিজেরই কানের দুঃখমোচনের জন্যে এই দায়িত্ব নিতে হোলো। ইতি ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫

দাদামশায়

নিশিবাবুর সঙ্গে দেখা হলে বলিস্ আমার শরীরের বর্ত্তমান জীর্ণ অবস্থায় যখন অসুস্থ হয়ে পড়ি তখন কর্ত্তব্যের স্খলন হয়— তিনি যেন ক্ষমা করেন। তাঁর ৭৫ বছর বয়সে যখন তোর বিয়ের নিমন্ত্রণ তাঁর কাছে পাঠাব তখন শয্যাশায়ী অবস্থায় তাঁর যদি উত্তর দিতে ত্রুটি হয় আমিও তাঁকে ক্ষমা করব।

বৃদ্ধা

সেপ্টেম্বরের শেষ পর্য্যন্ত আমাদের এখানে কাজ— তার পূর্ব্বে তো কারো নড়বার জো নেই। সেই কথা তোর দিদিকে টেলিগ্রাফ করে দিয়েছি। তা ছাড়া প্রধান আপত্তি এই এখানকার নাচকে অমন করে publicity দিতে আমরা নারাজ। হয় তো আর কিছুকাল পরেই পশ্চিম অঞ্চলে নাচের দল পাঠাতে হবে। তখন হয় তো বা এলাহাবাদেও এরা যেতে পারে। নূতনত্ব অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। আমাদের দায় খুব বেশি, দেশের লোকের কাছ থেকে সামান্য সাহায্য পেতেও প্রাণ বেরিয়ে যায়— এইজন্যে নিতান্ত বাধ্য হয়ে যে উপায় অবলম্বন করতে হয়েছে তার দাম কমিয়ে দিতে পারি নে। আমার মতো অসহায়ের প্রতি করুণা করে এ কথা সকলের বোঝা উচিত। কোনোমতে দেশের লোকের সাহায্য পাব না, অতএব নিজেদের উপার্জ্জনের পথ প্রশস্ত রাখতে হবে, নইলে চল্‌বে কী করে। ছেলেমানুষের মতো বুদ্ধি নিয়ে এ সব কথা যদি না বুঝিস্ তাহলে তোর বৃদ্ধা উপাধি সার্থক হবে কী করে। ব্যস্ত আছি। শারদোৎসবের উৎসব চলচে— তার উপরে কাল গ্রামের মেয়েদের জন্যে মেয়েরা বশীকরণ করবে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

ইতি ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫

দাদামশায়

কল্যাণীয়াসু

বৃদ্ধা, তোর চেয়েও আমার বয়স বেশী হয়েছে এই কথাটার প্রমাণ প্রতিদিন পাচ্চি। কাজকর্ম্মে মন নেই, কলমও চলতে চায় না। চিঠিপত্র প্রায় ছেড়ে দিয়েছি। কেদারাটা শরীরেই একটা অংশের মতো হয়ে উঠেছে। নিস্তব্ধ হয়ে থাকি শ্যামলীতে দর্শনপ্রার্থীর দল আসা যাওয়া করে— মাটির বাড়ী দেখে, আর দেখে যায় এই মাটির মানুষটিকে। ছুটি চলচে, ছাত্রীরা বেণী দুলিয়ে অটোগ্রাফ নিতে আসে না— বিদেশী ডাক এলে স্ট্যাম্পের কাঙালরাও ভিড় করে না। ইতিমধ্যে দিন কয়েকের জন্যে পারুল আর তার ছোটো বোন এসেছিল— তারা আমার বরানগরবাসিনী নূতন নাৎনী। তারা বুড়ি নয় সেই জন্যে নূতন আগ্রহের সঙ্গে সেবাযত্ন করে। প্রধান খবরের মধ্যে ডাকাতির খবর। এতদিনে সেটা বোধ হয় তোদের কাছে পুরোণো হয়ে গেছে— আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে... এই ব্যাপারে লিপ্ত ছিল প্রমাণ পাওয়াতে তারা থানায় চালান হয়ে গেছে।

সুনীতের অসুখের খবরে মনটা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে আছে। এলোপ্যাথিতে টাইফয়েডের ওষুধ নেই বল্লেই হয়— ওরা গোড়া

থেকে হোমিওপ্যাথি দেখালে কখনো বাড়াবাড়ি হত না বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। সুনীত এখন কেমন আছে খবর দিস্। ঈষৎ শীত পড়তে আরম্ভ করেছে— শিউলি আর মধুমঞ্জরীর গন্ধে ভরে গেছে আমাদের এই পাড়া। ইতি ১৯ অক্টোবর ১৯৩৫

দাদামশায়

বৃদ্ধা

সুরঙ্গমার part তত শক্ত নয়, সেটা তোকে শিখিয়ে নিতে পারব। ভালো করে চোখ বুলিয়ে দেখে নিস। এখানে দুই একটি মেয়ে নিয়ে চেষ্টা করা গেল— যাকে বলে মিজারেব্‌ল ফেলিয়োর। তোকে নিয়ে কিছু দিন উঠে পড়ে লাগলে হয়ে যাবে সন্দেহ নেই। ভালো মুস্কিলে পড়েচি। কতবার ভেবেছি আমি নিজেই সাজব সুরঙ্গমা— এ প্রস্তাবে অন্যেরা রাজি হচ্চে না— সবাই বল্‌চে আমার শরীর ভালো নয় অতটা বাড়াবাড়ি সইবে না, নতুবা খুবই ভালো হোত।

কুইনীর চিঠি পেয়েছি, সে বলচে ডিসেম্বরের গোড়ায় তারা শিলঙ হয়ে সিলিটে ফিরে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি কলকাতায় আসবে। অর্থাৎ যে সময়ে আমাদের অভিনয় সেই সময়ে তারা দর্শকের পার্ট নেবে। ডিসেম্বরের একেবারে গোড়ায় এসে যদি সে ধরা দেয়, তাহলেও সময় পাওয়া শক্ত হবে।

বহুকষ্টে অমিতাকে সুদর্শনার পালায় নামাতে পেরেছি। শেষ পর্য্যন্ত টিঁক্‌লে হয়।

আমার শরীর কী রকম আছে তা নির্ণয় করবার সময়ই পাচ্চিনে। প্রতিদিন সন্ধেবেলায় কটিদেশে নীলিম রশ্মি প্রক্ষেপ

করে থাকি, আশা করি মেরুদণ্ড মজবুৎ হয়ে উঠবে। যখন তুই এখানে আসবি এই রশ্মি তোর মাথায় লাগাব, হয় তো মস্তিষ্কে একটু আলো ঘোর অন্ধকার ভেদ করে প্রবেশ করতেও পারে— নিশ্চয় বলা যায় না। সমস্ত দিন রিহার্সল দেওয়াচ্চি— অসম্ভবকে সম্ভব করবার চেষ্টা চলচে। পরিণামে কী হবে বলা যায় না। ইতি ২৩ নবেম্বর ১৯৩৫

দাদামশায়

[৯]

* Gauripur Lodge

Kalimpong.

বুড়ি

মালঞ্চে আছিস, না, মরুভূমির পথে চলেছিস আন্দাজ করতে পারচিনে। তবু বৃটিশ গবর্মেণ্টের কৃপায় চার পয়সা মজুরি দিয়ে ডাক পেয়াদাকে দৌড় করাব তোদের পিছনে পিছনে আমার জন্মদিনের আশীর্ব্বাদ নিয়ে— তরুতলেই হোক, মরুতলেই হোক ধরবেই তোদের—

'যায় যদি যাক্ সাগরতীরে
পাবেই দেখা পেয়াদাটিরে।'

তোকে চিঠি লিখতে গেলেই জানিনে কেন কোথা থেকে তাতে একটু না একটু কবিতার ছিটে লাগে। সময় থাকলে দুটো লাইনকে আরো লম্বা করতে পারতুম কিন্তু ইংরেজিতে বলে, স্বল্পতাই হচ্চে রসের আত্মা।

একবার লক্ষ্ণৌএ রাষ্ট্রমন্ত্রীদের সঙ্গে পাহাড়ী শান্তিনিকেতনের পরামর্শে যাবার কথা আছে কৃষ্ণ ভোলে নি তো। কাল এখানে লোক ছিল অল্প, জমেছিল বেশি।

রেডিয়োতে আমার আবৃত্তি শুনেছিলি তো?

জায়গাটা মন্দ লাগচে না

তোদের যুগলকে আমার আশীর্বাদ। এই উপলক্ষ্যে চকোলেট কিনে খাস্ দাম পরে দেবো, যদি মনে থাকে। ২৬ বৈশাখ ১৩৪৫

দাদামশায়

কল্যাণীয়াসু,

নকল নাৎনিরা যদি আমাকে ঘিরে দাঁড়ায় সেটাতে তাদেরি রুচি প্রকাশ পায়। তারা নকল হতে পারে কিন্তু খাঁটি জিনিষের আদর তারা বোঝে— আর আসল নাৎনিরা এত বেশি নিশ্চিত স্বত্বের দাবী নিয়ে নিশ্চিন্ত যে উদাসীন বললেই হয়—সেই জন্যেই তো যে সে ঢুকে পড়ে ভাণ্ডারে। এ নিয়ে কথা কাটাকাটি করে লাভ নেই। সাবধান হয় সেই মানুষ যে দামী রত্নের দাম বোঝে।

কাশ্মীরে আছিস শুনে লোভ হচ্চে। দেহটা অচল হয়েছে নইলে একবার দৌড় মেরে তোদের খবর নিয়ে আসতুম। এ জীবনে আপন খুশির পথে চলাফেরা আমার বন্ধ, পরের স্বাধীনতা পদে পদে হরণ করে তবে আমাকে চলতে হয়— এ নিয়ে অসুবিধে ঘটলে পরকে দোষ দিতে লজ্জা করি। আমার সমস্যা হচ্চে এই, এ অবস্থায় তোমার একটি নতুন মাতামহী সংগ্রহের বয়স যদি থাকত তা হলে সংগ্রহের প্রয়োজনই থাকত না। তা ছাড়া এ বয়সে জীর্ণ পাকযন্ত্রে মাতামহী পদার্থটা বদহজমী— সাহস হয় না। সাহস হয় না আরও কারণ আছে সে সব কথা তোর কাছে তুলতে ভয় করি।

মংপুর জীবনযাত্রা কাশ্মীরের তুলনায় সঙ্কীর্ণ, পাহাড়গুলোর আভিজাত্য নেই— মাথায় নেই তুষারকিরীট— যে পাগড়িটা পরে সেটা ঘোলা রঙের মেঘের। চারিদিকটা অত্যন্ত বদ্ধ। আমি ভালোবাসি খোলা আকাশ,— এখানে আকাশে পাহারা বসে গেছে। এতদিনে পালাতুম কিন্তু ওদিকে খবর আসচে সমভূতলে জষ্টিমাসের প্রতাপ অসহ্য। কাল সুধাকান্তর চিঠিতে খবর পাওয়া গেল চিঠি লেখা দুঃসাধ্য কেননা লিখতে গেলে ঘামতে ঘামতে আঙুলগুলো ক্ষয়ে কিছুই বাকি থাকে না। প্রায় তো শেষ হয়ে এলো জষ্টিমাস— মনে মনে ভাবচি আষাঢ় পড়লেই নব বারিধারার সঙ্গে সঙ্গেই নেবে পড়ব নিম্নভূতলে, কোনো বাধা মানব না।

এ চিঠি তোরা পাবি কি না জানি নে নিতান্ত যদি না পাস দেখা হবে সশরীরে মালঞ্চে। তখন আকাশে দেখা দেবে শ্যামল মেঘ, আর নিকুঞ্জগৃহে শ্যামলবরণী— চোখ জুড়িয়ে যাবে।

এখানে আলু আর অনিল আমার সহচর। ওদের পেট ভরে ভোজন এবং পেট ভরে বিশ্রাম। এখানকার মেঘাচ্ছন্ন পাহাড়ের মতো ওরা তন্দ্রাবিষ্ট। কর্মের তাগিদে অনিলকে যেতে হবে বাইশে কিম্বা পঁচিশে— আমাকেও একটা জরুরী কর্মের অছিলা জোগাড় করতে হবে। কারণ আমার "মন বলে যাই যাই যাই গো"। জানিস্ তো বাবু changes his mind। কথা ছিল রথী এসে আমাকে কালিম্পঙে নিয়ে যাবে। সে তো নলকূপের নলকে গভীর থেকে গভীরতরে নিয়ে চলেছে— আর বউমা চড়ে

বসে আছেন কুমায়ুন গিরিশিখরে— আমি নিঃসহায়। চুপচাপ বসে অন্তর্ধানের চিন্তায় আছি। এ সম্বন্ধে একটা কথার আভাস দিলেই হাজারটা কথার উৎপত্তি হবে— ভালমানুষের মত নিঃশব্দে মনের মধ্যে পাঁাচ কষছি।

মৃণালিনী আদর করে আমাকে যে চাদর পাঠিয়েছিল সেটা যথাসময়ে পেয়েছি। সিঙ্গাপুরে ওদের অভ্যর্থনা সভার খবর পেয়েছি— এখনো জাভায় পৌঁছসংবাদ পাই নি। নটরাজ পথিমধ্যে রেঙ্গুনে খুব ধুমধাম করেছে। ভদ্রলোক আস্ত ফিরলে হয়।

এ জায়গায় খবরের খুবই অভাব। সম্প্রতি খুব একটা বড়ো খবরের উদ্ভব হয়েছে—নলিনীরঞ্জনের কাল এখানে আগমন— আজ সকালে এখনি তাঁর তিরোভাব। আমার যাওয়া আসা যদি এ রকম অবাধ হোত তা হলে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিতুম। ওখানে তোরা পলিটিক্‌স্ নিয়ে আলোচনা করিস্ কি? হতভাগা বাংলাদেশে আলোচনার অভাব নেই; সমাধানেরই অভাব। ইতি ১১।৬।৩৯

দাদামশাই

পৌত্রী শ্রীনন্দিনী দেবীকে লিখিত

তৃতীয়া[1]

কাছের থেকে দেয় না ধরা, দূরের থেকে ডাকে
তিন বছরের প্রিয়া আমার, দুঃখ জানাই কা'কে ?
কণ্ঠেতে ওর দিয়ে গেছে দখিন হাওয়ার দান
বসন্ত তার দোয়েল শ্যামার তিন বছরের গান ;
তবু কেন আমারে ওর এতই কৃপণতা,
বারেক ডেকে পালিয়ে সে যায়, কইতে না চায় কথা।
তবু ভাবি, যাই কেন হোক্, অদৃষ্ট মোর ভালো,
অমন সুরে ডাকে আমার মাণিক আমার আলো।
কপাল মন্দ হলে টানে আরো নীচের তলা,
হৃদয়টি ওর হোক্ না কঠোর, মিষ্টি ত ওর গলা ॥

আলো যেমন চম্‌কে বেড়ায় আম্‌লকির ঐ গাছে
তিন বছরের প্রিয়া আমার দূরের থেকে নাচে।
লুকিয়ে এসে বিলিয়ে গেছে বনের হিল্লোল
অঙ্গে উহার বেণুশাখার তিন বছরের দোল।
তবু, ক্ষণিক রঙ্গ-ভরে হৃদয় করি' লুট
নাচের পালা ভঙ্গ করে' কোন্‌খানে দেয় ছুট।

---

১ পূরবীতে প্রকাশিত কবিতার পাঠান্তর। শ্রীমতী নন্দিনী দেবীর উদ্দেশে লেখা।

আমি ভাবি, এইবা কি কম, প্রাণে ত ঢেউ তোলে,
ওর মনেতে যা হয় তা হোক্ আমার ত মন দোলে।
হৃদয় না হয় নাই বা পেলেম, মাধুরী পাই নাচে,
ভাবের অভাব রইল না হয়, ছন্দটা ত আছে॥

বন্দী হ'তে চাই যে কোমল ঐ বাহুবন্ধনে
তিন বছরের প্রিয়ার আমার নাই সে খেয়াল মনে
শরৎ প্রভাত দিয়েছে ওর সর্ব্ব দেহে মেলে'
শিউলি ফুলের তিন বছরের পরশখানি ঢেলে'।
বুঝতে নারি তবু কেন আমার বেলায় ফাঁকি
ভরা নদীর জোয়ার জলে কলস ভরে না কি ?
তবু ভাবি, বিধি আমায় নিতান্ত নয় বাম,
মাঝে মাঝে দেয় সে দেখা, তার ত আছে দাম।
পরশ না পাই, হরষ পাব চোখের চাওয়া চেয়ে,
রূপের ঝোরা বইবে আমার বুকের পাহাড় বেয়ে

কবি বলে' লোকসমাজে আছে আমার ঠাঁই,
তিন বছরের প্রিয়ার কাছে কবির আদর নাই।
যাই হোক মোর কীর্ত্তিকলাপ ওর কাছে নাই মান,
আজ বসেছি তারি দিতে উচিত প্রতিদান।

কেমন যে ওর মনের গতিক জানবে বিশ্বজনে,
এই কবিতা বুঝবে যখন লাগ্‌বে সরম মনে।
ওর আছে এক বাঁদর ছানা, আর আছে এক পুসি,
ঝগ্‌ড়ু বোকার সঙ্গ পেলে হয় কি বিষম খুসি।
যখন দেখি এমন বুদ্ধি, এমন তাহার রুচি,
আমারে ওর পছন্দ নয়, যায় সে লজ্জা ঘুচি' ॥

বয়স হলে ইচ্ছা হবে আকাশ পানে চেয়ে,
আবার হতে কবির প্রিয়া, তিন বছরের মেয়ে।
ইচ্ছা হবে, কালো তাহার তরল চাহনীতে
শ্রাবণ মেঘের তিন বছরের সজল ছায়া নিতে।
ইচ্ছা হবে ছন্দে আমার গড়তে নাচের ছাঁদ,
জলের ঢেউয়ের তালে যেমন দোলায় ছায়ার চাঁদ।
সাঁওতালিনী, নেপালিনী, সঙ্গী তাহার নানা,
ছাগল বাছুর ভোঁদা কুকুর বাঁদর বেড়ালছানা,
ঝগ্‌ড়ু বোকা, বুড়ো মালী, বজায় রইবে সবে,—
কবির বিশ্বে ছোট বড় সবারি ঠাঁই হবে ॥

দাদামশায়

[বুয়েনোস্ এ য়ারিস্
৪ ডিসেম্বর, ১৯২৪]

[১] ওঁ [পোস্টমার্ক

Paris, 3. V. 1930

পুপুমণি

বাবা লিখেচেন তোমাদের ওখানে বৃষ্টি মেঘ অন্ধকার। আমাদের এখানে রোদ্দুর আছে অনেক— যদি লেফাফায় মুড়ে খানিকটা পাঠিয়ে দিতে পারতুম তো বেশ হত। বাবাকে বোলো কাল এখানে আমার ছবি দেখানো হল— লোকে খুসি হয়েচে— সে অনেক কথা— লিখতে গেলে অনেকক্ষণ লাগবে— আঁদ্রে খুব বড়ো করে লিখবে বলেছে।

আজকাল রোজ রোজ খুব লোকজন আসতে আরম্ভ করেচে। সবাই জানতে পেরেচে আমি এখানে এসেচি। পালাতে যদি পারতুম তো খুসি হতুম। তোমার পুতুলের বাক্সর মধ্যে আমাকে লুকিয়ে রাখলে না কেন? তোমাদের ওখানে যে রকম ঠাণ্ডা তাতে বোধ হয় তোমার পুতুলের সর্দ্দি কাশি আরম্ভ হয়েচে— তাই এই রুমালটা পাঠিয়ে দিলুম।

দাদামশায়

* Geneve

7, Rue de l' Universite

পুপুমণি

দাদা মশায়ের অবস্থা খুব খারাপ। টেবিলে কাগজ পত্র ছড়াছড়ি যাচ্চে, রঙীন কালীর দোয়াতগুলো সমস্ত এলোমেলো ---কলম পেন্সিল কোথায় কি আছে তার ঠিকানা নেই। চষমা চোখে থাকে অথচ খুঁজে বেড়ায়। একটা মস্ত ঝোলা কাপড় পরে থাকে, তাতে লাল রং নীল রং হলদে রঙের দাগ। আঙুলে হাতে রঙের দাগ লেগে থাকে, সেই হাত দিয়ে টেবিলে খেতে যায় লোকেরা দেখে মনে মনে হাসে। রোজ রোজ তার সেই এক ঝোলা কাপড়খানা দেখেও তাদের হাসি পায়। ভোর বেলা বিছানা থেকে উঠে বসে থাকে তখন আর কেউ ওঠে না। ক্রমে বেলা ছটা বাজে, সাতটা বাজে, আটটা বাজে— তখন আরিয়াম সাহেব শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করে, কাল রাত্তিরে আপনার ঘুম হয়েছিল তো। দাদামশায় বলে, হাঁ, বেশ ভালো ঘুম হয়েছিল। তার পরে ঢং ঢং ঢং ঘণ্টা বাজে— খবর পায় পাশের ঘরে খাবার এসেচে। গিয়ে দেখতে পায়, একটা ডিম সিদ্ধ, রুটি টোষ্ট, মাখন আর চা। খেয়ে সেই টেবিলে এসে বসে। বসে বসে লেখে।

এণ্ড্রুজ সাহেব মাঝে মাঝে এসে গোলমাল করে যায়। লোক-জন দেখা করতে আসে। বেলা দশটা এগারোটা হয়। তখন হঠাৎ মনে পড়ে এইবার স্নান করতে হবে। স্নান করে এসে কেদারায় বসে বিশ্রাম করে। তার পরে লাঞ্চ্। শাক সবজি আলু টোমাটো রুটিমাখন ইত্যাদি ইত্যাদি। তার পরে কিছু বিশ্রাম, কিছু কাজ, কিছু লোকজনের সঙ্গে কথাবার্ত্তা। এমনি করে দিন চলে যায়। সাড়ে চারটের সময় চা। সেই সঙ্গে পাঁচজনের সঙ্গে বকাবকি। তারপর আটটা বাজলে খাওয়া। সেই রকম শাক সবজি আলু টোমাটো রুটি মাখন। লোক-জনের সঙ্গে আলাপ করতে করতে রাত হয়ে যায়। তার পরে দাদামশায় শুয়ে পড়ে বিছানায়। তার পরে সমস্ত রাত্তির যে কি হয় তা সে জানতেও পারে না। আজ আর সময় নেই। ইতি ২১ অগস্ট ১৯৩০

দাদামশায়

৩১   ওঁ   মস্কৌ

পুপুমণি
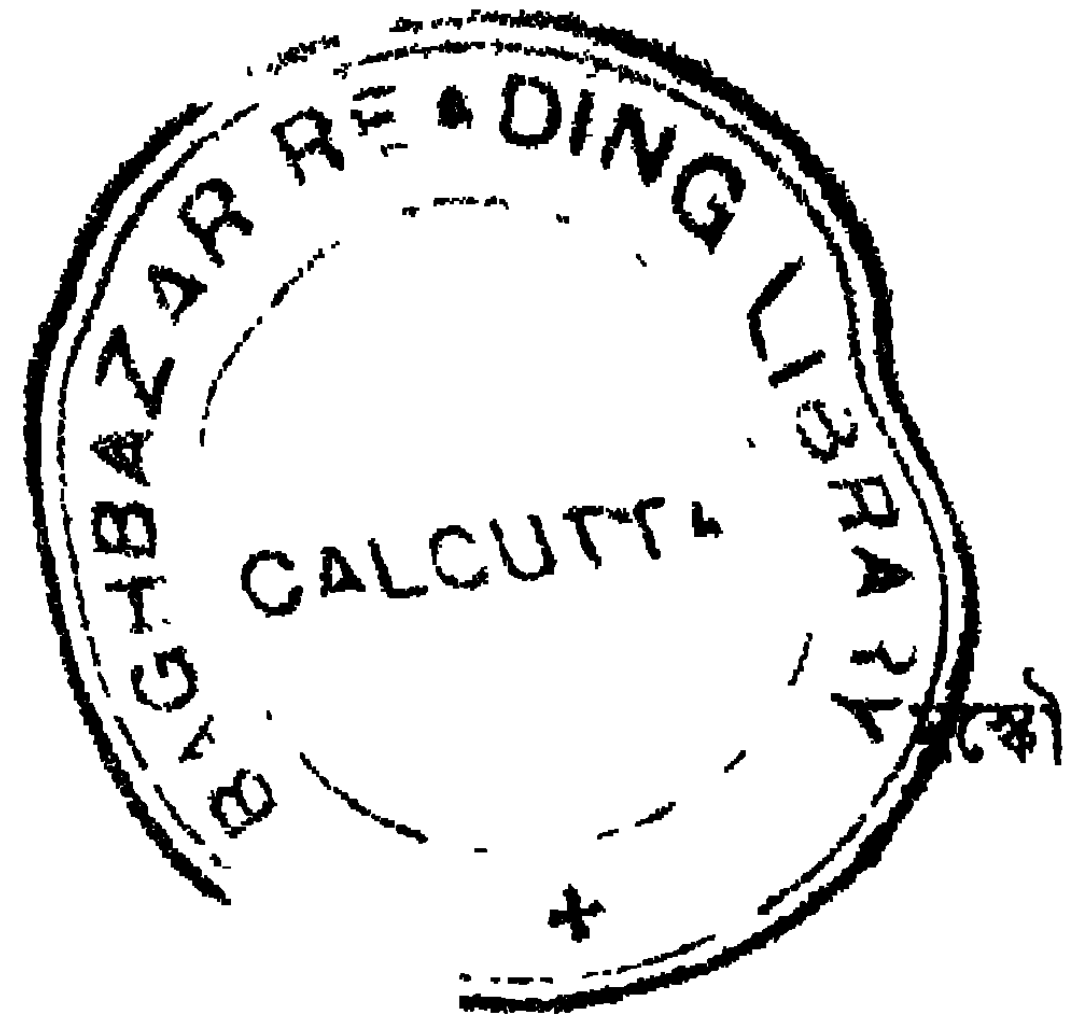
আমি কোথায় সে তুমি মনে করতে পারবে না। একটা মস্ত বাড়ি, চমৎকার বাগান, যত দূর চেয়ে দেখা যায় বড় বড় গাছের বন। আকাশে মেঘ করে আছে, খুব শীত, বাতাসে লম্বা লম্বা গাছের মাথা দুল্‌চে। অমিয় বাবু আছেন মস্কৌ সহরে, আরিয়াম গেছেন আর এক জায়গায়, আমার সঙ্গে আছেন ডাক্তার টিম্বার্স। ঘড়ি কাছে নেই কিন্তু বোধ হয় এখন সকাল আটটা হবে। আমি যখন ঘুম ভেঙে জেগে উঠলুম তখন জানলার বাইরে দেখলুম অন্ধকার, আকাশভরা তারা। চুপ করে শুয়ে পড়ে রইলুম। তার পরে যখন অল্প একটু আলো হল বিছানা থেকে উঠে মুখ ধুয়ে চিঠি লিখ্‌তে বসেছি। প্রথমে বাবাকে একটা বড় চিঠি লিখেচি তার পরে তোমাকে লিখচি। কিন্তু ক্ষিদে পেয়েচে। এখনি হয় তো এখানকার দাসী ডিম রুটি আর চা নিয়ে আসবে। তুমি হয় ত এতক্ষণে জেগেচ, তোমার কোকো খাওয়া হয়ে গেচে। বাইরে বেড়াতে গেচ কি? কিন্তু তোমাদের ওখানে হয় ত মেঘ করে বৃষ্টি হচ্চে। আজ বিকেলে মোটর গাড়ি চড়ে এখান থেকে আবার মস্কৌ সহরে চলে যাব। সেখানে একটা

হোটেলে আমরা থাকি। এখানকার মতো এমন সুন্দর সাজানো বাড়ি নয়, আর সেখানে যে খাবার জিনিষ দেয় সেও ভালো নয়। তাই ইচ্ছে করে শান্তিনিকেতনে চলে যাই। এবারে সেখানে ফিরে গিয়ে আর কিছুতেই নড়ব না। কেবল ছবি আঁকব। আর ভোরের বেলা বনমালী গরম কফি আর রুটি টোস্‌ট্‌ নিয়ে আসবে। তারপরে সেই কাঁকর বিছানো বাগানে বেড়াতে যাব, একটা লম্বা লাঠি হাতে নিয়ে। তার পরে— এখন থাক্। খাবার এসেছে। কি এসেছে বলি। কফি, রুটি, মাখন মাছের ডিম, দু রকমের চিজ্, ক্রিমের দই আর দুটো ডিম সিদ্ধ। তা ছাড়া, আঙুর, পিয়ার, আপেল। খাবার হয়ে গেলে পর গরম জলে স্নান করে এসে আবার লিখতে বসেচি। এখন মেঘ অনেকখানি কেটে গেছে— রোদ্দুর দেখা দিয়েছে— গাছের ডালগুলো বাতাসে নড়চে আর পাতাগুলো ঝিল্‌মিল্‌ করে উঠচে, আর কত রকমের পাখী ডাক্‌চে তাদের চিনিনে। আজকে আর সময় নেই। ইতি ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৩০

দাদামশায়

পুপুমণি,

বেশি দেরী কোরো না। এইবার চলে এসো। কেননা পাণ্ডবদের এবার খুব মুস্কিল। বন থেকে ফিরে এল, তেরো মাস কেটে গেল। কিন্তু দুষ্ট দুর্যোধন বল্‌চে কোনোমতেই রাজ্য ফিরিয়ে দেব না। লড়াই করতে হবে। তাই বলচি তাড়াতাড়ি এসো, নইলে লড়াই বন্ধ হয়ে থাক্‌বে। ভীম তাহলে চট্‌ফট্‌ করে মরবে— তার গদা দেয়ালের কোণে ঠেসান দিয়ে রেখেচে; সে থেকে থেকে লাফ দিয়ে দিয়ে বলে উঠচে দুঃশাসনকে একবার পেলে হয়। অর্জ্জুনের ইচ্ছে, আর একটু দেরি না করে কর্ণের বুকে পিঠে তীর মেরে মেরে তিনশোটা ছেঁদা করে দেয়। তুমি এলেই তখনি লড়াই সুরু হয়ে যাবে। কুরুক্ষেত্রে হাজার হাজার তাঁবু পড়ে গেছে— কত হাতি কত ঘোড়া কত রথ তার ঠিক নেই।— ধীরেন কাকা থেকে থেকে পাল্লারামের পেটে ফাউণ্টেন্ পেনের খোঁচা মারচে, পাল্লারাম চেঁচিয়ে উঠ্‌চে; দিন্ দা থাকলে পাল্লারামের রক্ষা ছিল না। বনমালীর মাথায় সেই টুপিটা নেই, তার বুদ্ধিও অনেকটা কমে গেছে। ২০ আষাঢ় ১৩৩৮

দাদামশায়

পুপুদিদি

তুমি যখন দার্জ্জিলিং যেতে লিখেচ তখন নিশ্চয় যাব। কিন্তু মা যদি গরম কাপড় না দেয় তাহলে শীতে মরে যাব। তোমার ওভারকোট আমার গায়ে হবে না। ওদিকে সে[১] এসে আমার বালাপোষখানা গায়ে দিয়ে চলে গেছে। বৃষ্টিতে তার নিজের ছেঁড়া চাদরখানা ভিজে গিয়েছিল সেইটে ফেলে দিয়ে গেছে। বনমালীকে ঐ চাদরটা দিতে চাইলুম সে নিলে না। ওটাকে সরবৎ ঢাকবার কাজে লাগাব মনে করচি। আমার হলদে রঙের ভালো চটি জোড়াটাও সে নিয়েচে।

ইলিষ মাছ ভাজা দিয়ে ভাত খেয়ে এলুম। ইলিষ মাছের ডিম ভাজা ছিল সে বললে আমি খাব। তাকেই দিলুম। তবু তার ক্ষিদে ভাঙে না। লাউ দিয়ে বড়ি দিয়ে ঘণ্ট তৈরি হয়েছিল সেটাও খেলে। তারপরে পায়েস খেলে দুবাটি. শেষকালে দুটো আতা। বলে গেল, চা খাবার সময় আসবে, তার জন্যে যেন নিমকি তৈরি থাকে। নিমকির সঙ্গে দই দিয়ে শসার চাটনি খাবে এই তার ফরমাস। ইতি ২৩ আশ্বিন ১৩৩৮

দাদামশায়

১ রবীন্দ্রনাথের 'সে' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য

ওঁ

* On Board
Houseboat "Padma"
[চন্দননগর]

পপুদিদি

তুমি ভীষণ গরমে শুকিয়ে যাচ্চ খবর পেয়েই তাড়াতাড়ি এখান থেকে দুই এক পসলা ভালো জাতের বৃষ্টি পাঠিয়ে দিয়েচি —পেয়েচ কিনা খবর দেবে। বোধ হয় মাঝে মাঝে আরো কিছু কিছু পাঠাতে পারব অতএব তোমার হংস পরিবারের জন্যে বেশি ভাবনা কোরো না। আমি এখানে নির্বাসনে আছি, শ্যামলী এখনো আমার আসন প্রস্তুত করে নি— যখন সে তৈরি হয়ে ডাক দেবে আমিও দেরি করবনা। হয় তো আরো দু হপ্তাখানেক দেরি হতে পারে। তোমাদের ঘাস তো সব শুকিয়ে গেল সকাল বেলায় হাঁস চরাবার জায়গা পাও কোথায় ? প্রথম কিছুদিন বোটে ছিলুম— সামনের ঘাটে লোক জমা হয়ে হাঁ করে তাকিয়ে থাকত। লিখচি পড়চি খাচ্চি আঁকচি ঘুমোচ্চি সমস্তই তাদের দৃষ্টির সামনে। বাইরে এসে বসলে তারা নৌকোর পাশে এসে ভিড় করে— লুকিয়ে থাকতে হোত কামরার মধ্যে,— শেষকালে এই খাচার থেকে বেরিয়ে পড়তে হোলো। এখন আছি গঙ্গার ধারে এক বাড়িতে— চারিদিক খোলা, গঙ্গা

একেবারে গা ঘেঁষে চলেছে— আরামে আছি। লোকজনের সমাগম সম্পূর্ণ নেই তা বল্‌তে পারিনে। সদর দরজা বন্ধ করে তাদের কতকটা ঠেকানো যায়। আম এক ঝুড়ি বোধ করি পেয়েছ— কিছু খেয়ো কিছু বিতরণ কোরো। ইলিষ মাছ পাঠাবার চেষ্টায় আছি। ইতি ২০ জুন ১৯৩৫

দাদামশায়

ওঁ

পুপুদিদি

তোমার তিনটে কুকুরের গলা শুনতে না পেয়ে অত্যন্ত ফাঁকা ঠেকচে। শুনলেম তুমি আরো একটা সংগ্রহ করেচ— আরো পশু সংখ্যা যদি বৃদ্ধি করো তাহলে শান্তিনিকেতনে মনুষ্য সংখ্যা কমাতে হবে জায়গা হবে কোথায়— তাছাড়া সকালে আমার রুটি তোসের গুঁড়োও পাওয়া যাবে না। এখানে জায়গাটা ভালো— কিন্তু তোমাকে যে নিমন্ত্রণ করব সে সাহস আমার নেই। সোমবার

দাদামশায়

পুপুদিদি

তুমি ভয় করেছ তোমার হাঁসগুলো আমার জানলার কাছে চেঁচামেচি করে আমার লেখাপড়ার ব্যাঘাত করে। এমন সন্দেহ কোরো না। তুমি ছড়ি হাতে ওদের যে রকম সাবধানে মানুষ করেছ অভদ্রতা করা ওদের পক্ষে অসম্ভব। ওরা আমাকে যথোচিত সম্মান করে যথেষ্ট দূরে থাকে। তা ছাড়া তোমার গাঙুলি মশায়ের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া ওদের কর্ম্ম নয়। তোমার সুনন্দা পিসি পূর্ণিমা পিসি প্রায় তোমার হাঁসেদের মতই ভদ্র,— মাঝে মাঝে দেখা দেয়, কথাবার্ত্তা কয় না। হাঁসেদের চেয়ে এক হিসাবে ভালো— প্রায় কিছু না কিছু মিষ্টি তৈরি করে। খুব চেষ্টা করি খেতে, সব সময়ে পেরে উঠিনে। সেদিন একটা লাড্ডু বানিয়েছিল, ভেবেছিলুম অ্যাবিসিনিয়ায় পাঠিয়ে দেব কামানের গোলা করবার জন্যে। কিন্তু সুধাকান্ত বাহাদুরি করে সেটা খেলে, প্রায় তার চোখ বেরিয়ে গিয়েছিল। একটু ঘিয়ের ময়ান দিলে আমিও সাহস করে মুখে দিতে পারতুম—কিন্তু ও বৌমার খরচ বাঁচাচ্চে— তিনি ফিরে এসে দেখবেন ভাঁড়ারে তাঁর ঘিয়ের কিছু লোকসান হয় নি। তোমার বাবা ব্যস্ত

আছেন প্রতিদিন পিকনিক করতে এবং মাছ ধরতে গিয়ে মাছ না ধরতে। আমি রোজই পিকনিক করি আমার খাবার ঘরটাতে— আর কাউকে যোগ দিতে ডাকি এমন আয়োজন নেই। ইতি ২২।১০।৩৫

দাদামশায়

[২]　　　　ওঁ　　　　দ্বারিকানাথ ঠাকুরের গলি

কলিকাতা

পুপু দিদি,

যে ছিল মোর ছেলেমানুষ হারিয়ে গেল কোথা,
পথের ভুলে পেরিয়েছিল মরা নদীর সোঁতা।
কোন্ বুড়োমির পাঁচিলে তায় রাখল আড়াল করে,
জড়িয়ে তাকে দিল স্বপন-ঘোরে।

হঠাৎ তোমার জন্মদিনের আঘাত লাগ্‌ল দ্বারে
ডাক দিল সে কোন্ সেকালের ক্ষ্যাপা বালকটারে।
সেই যে ছেলে-আমি
ডাক শুনে সে এগিয়ে এসে হঠাৎ গেল থামি।

বল্‌লে, শোনো, ওগো কিশোরিকা,
রবীন্দ্রনাথ কুষ্টিতে যার লিখা
নামটা সত্য, সত্য শুধু তারিখটা মাত্তর,
তাই বলে তো বয়সটা তার নয়কো ছিয়াত্তর।
কাঁচা প্রাণের দৃষ্টি যে তার জগৎটা তার কাঁচা
বাঁধে নি তায় বিষয়লোভের খাঁচা।
পায় যদি সে আশা
তোমার লীলার আঙিনাতে বাঁধবে সে তার বাসা।

এই ভুবনের ভোর বেলাকার গান
পূর্ণ করে রেখেছে তার প্রাণ,
সেই গানেরই সুর
তোমার নবীন জীবনখানি করবে সুমধুর ॥

১৩ অগ্রহায়ণ ১৩৪৩ দাদামশায়

ওঁ

* "Uttarayan"
Santiniketan, Bengal

পুপুদিদি

বাপরে কী গরম। মাঝে মাঝে আকাশ মেঘে ঢাকা, যেন কম্বলঢাকা রুগির মত, আর হাঁপিয়ে ওঠে সমস্ত জগৎটা। পালিয়েছ খুব ভালো করেছ। ইতিপূর্বে কিছুদিন আগে প্রত্যহ ঝড় বৃষ্টি হয়ে আকাশের মেজাজটা ঠাণ্ডা হয়েছিল— এমন কি, গায়ে কাপড় জড়িয়ে বসেছিলুম। ভেবে ছিলুম গরমের দিন ফুরোলো। গরম লুকিয়েছিল কোথায় আকাশের কোণে— লাফ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েচে পৃথিবীর উপরে। হঠাৎ এক বার মেঘ জটলা করচে— আশা হচ্চে আর একবার জুড়িয়ে দেবে হাওয়া। কিন্তু বৃষ্টির দুতিন দিন পরেই আকাশের মেজাজ আরো বিগড়িয়ে যায়। আমাদের এই রকম অবস্থা। দাদামশাই।

দাদা

তোমার হাঁসের জন্যে কোনো ভাবনা নেই। আমি যেখানে বসে লিখচি তার জানলার সামনে রোজ তারা চরতে আসে, গুণে দেখিনি, কিন্তু দলের বহর দেখে বেশ বোঝা যায় তারা সুস্থ শরীরে তোমার জন্যে অপেক্ষা করচে— ডানায় তাদের অতগুলো কুইল্ থাকা সত্ত্বেও তোমাকে তারা চিঠি লিখতে পারে না এই দুঃখ জানিয়ে তারা ক্যাঁ ক্যাঁ করে চেঁচায়— তাই তাদের হয়ে আমাকেই লিখতে হয়। কিন্তু তোমার হাঁসের ডিমগুলোর কোনো সাড়াশব্দ নেই--- তাদের খবর বলতে পারব না, এটুকু জানি রান্নাঘরে তাদের গতি হয় নি। কিন্তু তোমার বন্ধু গাঙ্গুলি মশায় হাঁসের ডিমের মতো নয়— তাঁর গলা এখানকার সব আওয়াজ ছাড়িয়ে শোনা যাচ্চে— তাঁকে ডাকাতে ধরে নি একথা নিশ্চয় জেনো। ইতি ১৭ অক্টোবর ১৩৪৫।[১]

দাদামশাই

১ ইং ১৯৩৮

ওঁ * "Uttarayan"

Santiniketan, Bengal

দিদিমণি

আর দেরি নয়, ধাঁ করে চলে এস। নিতান্তই যদি গরম না যায় তাহলে গরমটাকে পাখার হাওয়া আর আইস্‌ক্রিম দিয়ে মিশোল করে নিয়ে দুজনে মিলে ভাগ করে নেব। একটু যেন তাপ নেমে আসচে, এবার আকাশের জ্বর ছাড়বে বলে আশা করচি। আজ আকাশে মেঘ ঘনিয়ে আসচে বৃষ্টি হওয়ার ভাব দেখা যাচ্চে— বলতে বলতে ভিজে মাটির গন্ধ পাচ্চি— এক পসলা বৃষ্টি নাম্‌ল বুঝি।

এবারে আমাদের দুঃখের দিন গেছে সন্দেহ নেই— মনটা উড়ত কালিম্পঙের দিকে, কিন্তু এখানে নানা দরকার ছিল— ঘেমেছি আর কাজ করেছি। অল্প কয়েকদিন ছবি আঁকতে পেরেছি— ঐ শোনো শিউলি গাছের পাতায় বৃষ্টি জলের পট্‌পট্‌ শব্দ। ইতি ৬ কার্তিক ১৩৪৫

দাদামশায়

পুপুদিদি

পাহাড়ের ডগায় ভালো হোটেলে বাস করচ, চারদিকে বন্ধুবান্ধবের দল, বেশ আছ ভালো। এখানে কোণে বসে বসে আমি তোমাদের ঈর্ষা করি। কিন্তু যে মুহূর্তে সেই বেরিলি স্টেশনের ছবি মনে আসে আর হাত জোড় করে বলি ও মুলুকে আর নয়। এখানে এসে অবধি আমার শরীর ঠিক পূর্বের মতো নেই। কালিম্পঙে ছিলুম ভালো। কিন্তু সেখানে ঘর শূন্য — আমার সহায় কেউ নেই যে আমাকে ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু একটু অত্যুক্তি করচি— এখানে সেবা যত্নের অভাব নেই ঘর দুয়োরগুলোও ভালো— এখানকার নির্জ্জনতাও প্রায়ই আমার মনকে খুব জড়িয়ে ধরে— একেবারে কবির উপযুক্ত। কিন্তু পাহাড়গুলো বড়ো বেঁটে— দরোয়ানদের মতো কেবল আকাশ আটক করে ধরে পাহারা দিচ্চে। আরো বেশ একটু রাজকীয় চালে মাথা তুলে দাঁড়াত যদি তাহলে গিরিরাজের মহিমা তুষারমুকুট পরে সামনে বিরাজ করত— আর তাই যদি না হোলো বেশ অনেকটা মাথা হেঁট করে ধরণী মাতাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে যদি তাঁর দিগন্তকে করত অবারিত তাহলে আমার সমতলবাসী মন খুশি হোত।

জীবনে এমনি প্রচুর খুশি ভোগ করেছি অনেক কাল, যখন ছিলেম শিলাইদহের চরে পদ্মার উদার নির্মল নির্জনতায়। সেই নির্বাক নিস্তব্ধতার বাহুবেষ্টনের জন্যে প্রায়ই মন কেমন করে। কিন্তু কী জানি এখন হয় তো মনেরই বদল হয়ে গেছে— সেই শিলাইদহের সঙ্গে হয় তো আর খাপ খাবে না। এখন বাবু কেবলি changes his mind— কেবলি বাসা বদল করবার মেজাজ তার।— ছুটি ফুরোলে শান্তিনিকেতনে কোথায় গিয়ে মাথা গুঁজব জানিনে, শ্যামলী না ধবলী না আর কোথাও। কিন্তু বৌমা হয় তো তখনো পাহাড়ে থাকবেন— তাঁর শরীরের পক্ষে হয় ত সেই ভালো। এমন অবস্থায় মনে করচি আমি পালাব গঙ্গাতীরে— কালতায়।— খাবার এসেছে— তাগিদ চলচে। ইতি ৭।৬।৩৯

দাদামশাই

[১৪] ওঁ মংপু

[জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৬

পুপুদিদি

তোমার চিঠি পড়ে খুব লোভ হচ্চে, বেশ আছ। আমার ভাগ্য ভালো নয়, মংপুতে এলুম, উন্নতি হোলো প্রায় পাঁচ হাজার ফুট কিন্তু স্বাস্থ্যের উন্নতি একটু হোলো না, বরঞ্চ খারাপ। পালাতে ইচ্ছে করচে— কিন্তু জ্যৈষ্ঠ মাস পাহারা দিচ্চে নিচের ভূতলে, সাহস হচ্চে না। একটা খবর ভালো— এবার কার্বলিক এসিড লাগিয়ে কেন্নুই তাড়ানো গিয়েছে। কেদারা আঁকড়ে আছি, দেখচি মেঘ রৌদ্রের খেলা, কাজকর্মে মন নেই— মনে ভাবচি মোটের উপরে শান্তিনিকেতনটা জায়গা ভালো।

দাদামশাই

কল্যাণীয়াসু

পুপুদিদি পাহাড়ের খবর নিতে চেয়েচ। অবস্থা ভালোই। প্রথম যখন এসেছিলুম তখন মনে হয়েছিল মংপুটাকে ইনফ্লুয়েঞ্জায় ধরেছে। সেটা এখন কেটে গেচে— রোদ্দুর দেখা দিচ্চে— মাঝে মাঝে কুয়াশাও বেরোয়, পকেট থেকে ভিজে রুমালের মতো। বেগ্নি পাহাড়ের কাঁধে সাদা মেঘের উত্তরীয় ঝুলচে— ঘন অরণ্য চলে গিয়েছে ঢালু উপত্যকা বেয়ে, সবুজ রঙের প্লাবনের মতো। আমার দিন প্রায় কাটে, খোলা বারান্দায়, আধো জাগা আধো ঘুমোনো অবস্থায়— কাজের তাগিদ দিলে এখনো শরীরটা বেঁকে দাঁড়ায়। মনে করি কিছু লিখব কিন্তু কলমটাকে জাগিয়ে তুলতে পারিনে।

শান্তিনিকেতনের স্মৃতি এখনো ঝাপসা হয় নি— মনটা সেই দিকেই ঝুঁকে আছে। আমি সমভূমির মানুষ— চোখের সামনে চাই অবারিত আকাশ, আর গায়ের উপরে চাই হাল্কা কাপড়— মোটা কাপড়ে জবড়জঙ্গ হয়ে পাথরের পাহারায় বন্দী হয়ে থাকতে মন যায় না। ইতি ১৯।৯।৩৯

দাদামশাই

ওঁ

"Uttarayan"
Santiniketan, Bengal

কল্যাণীয়াসু

পুপুদিদি তুমি তো দৌড় দিলে বোম্বাই তার পর থেকে একদিনো আমার ছুটি নেই— একটা না একটা কাজের বন্ধন আমাকে বেঁধেছে। সামনে এখনো বাকি আছে অনেকগুলো। মহাত্মাজি এসেছিলেন, কাল চলে গেলেন। অতিথি প্রতিদিনই আসচেন— আজ প্রশান্তর সঙ্গে আসবেন একজন আমেরিকান বিজ্ঞানী— কাল আমাকে যেতে হবে সিউড়ি, সেখানে মেলা উদ্ঘাটন করা চাই— সমস্ত দিন যাবে এই কাজে। তার পরে এক সময় যেতে হবে বাঁকুড়ায়— নিমন্ত্রণ আছে। সেখানে দুটো চারটে দিনরাত্রি যাবে কেটে। এই রকম চলে যাবে মার্চ মাসের শেষ পর্যন্ত। তার পরে খুব সম্ভব গরম পড়লে মংপুতে আমাকে টানবেন মৈত্রেয়ী। এখানে শীত চলচেই— ভালো লাগচে না— দিন রাত মোটা মোটা কাপড়ে বন্দী করে রেখেছে, বাইরে বসে বসন্তকাল ভোগ করবার জন্যে মন উৎসুক হয়ে আছে। ওখানে গিয়ে জ্বরে পড়েছিলে শুনে ভালো লাগল না। ওখানে তো বায়োকেমিক বড়ি জুটবে না— কুইনীন মিকশ্চার তোমার কপালে আছে।— মহাত্মাজিকে চণ্ডালিকা

দেখানো হোলো, খুশি হয়েছেন। তার পরে এখন থেকে চলবে চিত্রাঙ্গদার রিহার্সাল। ভেবেছিলুম ডাকঘর করব কিন্তু এত বেশি ক্লান্ত যে কিছুই করতে ইচ্ছে করে না। চণ্ডালিকায় মা সেজেছিল মমতা— খুব ভালো অভিনয় করেছিল। বুড়ি দিদির অভিনয়ের তো কথাই নেই। আমার সর্বান্তঃকরণের আশীর্বাদ জেনো, অজিতকে জানিয়ো। ইতি ২০।২।৪০

দাদামশাই

কল্যাণীয়াসু

পুপুদিদি তোমাদের বোম্বাইয়ের ডাকঘরের উপর আমার আর বিশ্বাস নেই— বোধ হয় ভালো চিঠির সন্ধান পেলেই সেটা চুরি করে নেয়। পরের চিঠিতে ওদের ঝুলি ভরতি হয়ে আছে— সেগুলো ভালো করে ঝেড়ে ঝুড়ে দেখো তো।

বিষম ব্যস্ত হয়ে আছি। অক্‌স্‌ফোর্ড থেকে ডিগ্রি আসছে, ঘাড়ের উপর চাপিয়ে দেবে। খুব ভারি ভারি নামধারী লোকের সমাগম হবে কোথায় তাদের জায়গা দেওয়া যাবে ভাবনা পড়ে গেছে— তোমার বাবার ঘরে মীটিঙের পর মীটিঙ বসে গেছে— আমি তার কাছ দিয়ে ঘেঁষি নে— আমার দোতলার ঘরে বসে ঘোলের সরবৎ খাচ্ছি।

একটা অন্যায় কাজ হচ্ছে এই যে তোমাদের ওখানে আকাশ অনাবশ্যক বৃষ্টি ঢেলে দিচ্ছে আমাদের এখানে চাষীরা চাষের মাটি ভেজাচ্ছে চোখের জলে। বোম্বাই প্রেসিডেন্সির পক্ষে এটা লজ্জার কথা। এখানে হাওয়াও উঠছে খুব গরম হয়ে— দেবতার উপরে এটা রাগের লক্ষণ— কিন্তু যতই রাগছে গরম ততই আরো বেড়ে উঠছে। তোমাদের তো সমুদ্র আছে

হাওয়াও কম দেয় না, আমাদের সঙ্গে একটু ভাগ করে নিলে দোষ কী।

. . চোখটা ক্রমশই খারাপ হচ্ছে— এর পরে মনে মনে চিঠিপত্র লেখা ছাড়া উপায় থাকবে না। তাতে চোখটাও বাঁচবে ডাকের খরচও বাঁচবে। এর পরের বারের চিঠি তুমি মনে মনে পড়ে নিয়ো। ইতি ২।৮।৪০

দাদামশায়

[১৮] * "Uttarayan"

Santiniketan, Bengal

পুপুদিদি

আসচ শুনে খুশি। কিন্তু কলম আমার সরে না, বেশি লিখতে পারিনে। ভীমরাও শাস্ত্রীজিকে আমার আশীর্ব্বাদ জানিয়ো— বোলো এখানে তাঁর নিমন্ত্রণ রইল। খুব অল্প অল্প ঠাণ্ডা পড়তে আরম্ভ করেচে। যখন আসবে এখানে হীহী করবে শীতে। তোমার শাশুড়ির বোনা পশমের কাপড় পরচি। সবাই বলচে আমাকে দেখাচ্চে ভালো। বুড়ি দিদি মুগ্ধ হয়ে গেছে এক দণ্ড আমার কাছ ছাড়ে না।

আজ এই পর্যন্ত। আশীর্বাদ

৪।১২।৪০ দাদামশাই

[১৯] ওঁ "Uttarayan"

Santiniketan, Bengal

[মে, ১৯৪১]

পুপুদিদি

আঙুল যে চলে না কী করি বলো

তুমি আছ পাহাড়ে ঠাণ্ডায় আর আমাদের পোড়া কপাল কেবলি তেতে উঠচে— তাকিয়ে থাকি আকাশের দিকে মেঘ আসে জল আসে না। যদি আসে জল সে আসে চাষীদের চোখের কোণে।

ভাবতে কষ্ট লিখতেও কষ্ট অতএব এই পর্যন্ত।

আশীর্বাদ

দাদামশায়

পরিচয়

অজিত (পৃ. ১৭, ১৯)—অজিতকুমার চক্রবর্তী

অজিত (পৃ. ২৩৬)—শ্রীঅজিত সিং খাটাও, শ্রীনন্দিনী দেবীর স্বামী

অনিল, সেক্রেটারি—শ্রীঅনিলকুমার চন্দ

অমিতা—শ্রীঅমিতা ঠাকুর, শ্রীঅজিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী

অমিয়—শ্রীঅমিয় চক্রবর্তী

অমিয়া—শ্রীঅমিয়া ঠাকুর

অরবিন্দ (পৃ. ২২)—শ্রীঅরবিন্দ বসু, শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র

অসিত—শ্রীঅসিতকুমার হালদার

আশা—শ্রীআশা অধিকারী

আশু—সার্ আশুতোষ চৌধুরী

আলু—সচ্চিদানন্দ রায়, জগদানন্দ রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র

আঁদ্রে—ফরাসী চিত্রশিল্পী শ্রীমতী আঁদ্রে কার্পেলে

আরিয়াম—শ্রীআর্যনায়কম, শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন অধ্যাপক

অ্যানা সেলিগ—জার্মান মহিলা

উমাচরণ—ভৃত্য

ওকাকুরা—ওকাকুরা কাকুজো, জাপানের সুবিখ্যাত মনীষী

কমল—দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী

কাসাহারা—শ্রীনিকেতনের প্রাক্তন জাপানী কর্মী

কালিমোহন—কালিমোহন ঘোষ

কুইনী—শ্রীঅমলা দত্ত, শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রী

কৃপালানি, কৃষ্ণ—শ্রীকৃষ্ণ কৃপালানি, শ্রীনন্দিতা দেবীর স্বামী

এলা—সৌদামিনী দেবীর দৌহিত্রী

কেদার—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

গগন—গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

গবা—শ্রীব্রতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গাঙ্গুলিমশায়—শান্তিনিকেতনের অতিথিশালার ভূতপূর্বক পরিদর্শক

গুরুদয়াল—শ্রীগুরুদয়াল মল্লিক, শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন অধ্যাপক

গোঁসাই—রাধিকা গোঁসাই, গায়ক

গোপাল—জোড়াসাঁকোর পুরাতন সরকার

গোরা—গৌরগোপাল ঘোষ, শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র ও কর্মী

গৌরী—শ্রীনন্দলাল বসুর কন্যা

চারু ভট্টাচার্য—শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, বিশ্বভারতীর গ্রন্থনাধ্যক্ষ

জগদানন্দ—জগদানন্দ রায়

জগদীশ—আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু

জয়া—শ্রীজয়শ্রী দেবী, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা

জায়জি—শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রীজাহাঙ্গীর ভকিলের কন্যা

জীবন—শ্রীজীবনময় রায়, চিকিৎসক ও শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন অধ্যাপক

জ্ঞান—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভ্রাতা

জ্যোৎস্না—শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রী

ঝগড়ু—ভৃত্য

ঝুনু—শ্রীসাহানা দেবী

টিম্বার্স—মার্কিন ডাক্তার, শ্রীনিকেতনের প্রাক্তন কর্মী

'তোর দিদি'—শ্রীপূর্ণিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, এলাহাবাদ

'তোর মেজমা'—জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের পত্নী

দিনু, 'দিনদা'—দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

দুর্গা—জগদানন্দ রায়ের কন্যা

দেবল—শ্রীকাশীনাথ দেবল, শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র

ধীরেন—শ্রীধীরেন্দ্রমোহন সেন, শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র এবং অধ্যক্ষ

নগেন্দ্র—শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ জামাতা

নবকুমার—মণিপুরের নৃত্যশিক্ষক

নলিনীরঞ্জন—শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার

নিতাই, নীতু, খোকা—নীতীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
নিশিকান্ত—নিশিকান্ত সেন, দিল্লী
নীলমণি, লীলমণি, বনমালী—ভৃত্য
নুটু—রমা কর, সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের ভগিনী, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ করের পত্নী
নেবুকুঞ্জ—শান্তিনিকেতনের একটি বাড়ি
পারুল—শ্রীপারুল দেবী, বরানগর
পি. সি. সেন—রেঙ্গুনের ব্যারিস্টার
পিসিমা—রাজলক্ষ্মী দেবী, যশোরের সম্পর্কে পিসিমা
পূর্ণিমা—রথীন্দ্রনাথের মাতুল-কন্যা
প্রতাপ—প্রতাপ তলাপাত্র, সরকার
প্রভাতকুমার—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শান্তিনিকেতনের গ্রন্থাগারিক
প্রশান্ত—শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ
গ্রেচেন—মিস গ্রীন, শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন কর্মী
বড়দিদি—সৌদামিনী দেবী
বিচিত্রা—রবীন্দ্রনাথের বিচিত্রা-বাসভবনে প্রতিষ্ঠিত সম্মিলনী
বঙ্কিম—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র রায়, শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন অধ্যাপক
বিপিন—ভৃত্য
বিমলা—ব্যারিস্টার সত্যরঞ্জন দাসের পত্নী
বীরেন—শ্রীবীরেন্দ্রমোহন সেন, শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র
বুড়ি, খুকি—শ্রীনন্দিতা দেবী
বুর্ডেট, মিস—মার্কিন মহিলা
ভক্তি—অধ্যাপক শ্রীফণীভূষণ অধিকারীর কনিষ্ঠা কন্যা
ভীমরাও শাস্ত্রী—শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন সংগীত-অধ্যাপক
মঞ্জু—শ্রীমঞ্জুশ্রী দেবী, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা
মণিকা—শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রী
মমতা—জগদানন্দ রায়ের দৌহিত্রী
মরিস—এইচ. পি. মরিস, শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন অধ্যাপক

মালঞ্চ—শ্রীমীরা দেবীর শান্তিনিকেতনের বাড়ি

মায়া—সত্যরঞ্জন দাসের কন্যা, ডাক্তার শ্রীঅজিতমোহন বসুর পত্নী

মুকুল—শ্রীমুকুলচন্দ্র দে

মোলার—অবনীন্দ্রনাথের সুইডিশ বন্ধু

মোবারক—ভৃত্য

মৃণালিনী—শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রী

মেজ বৌঠান—জ্ঞানদানন্দিনী দেবী

মৈত্র, ডাক্তার—ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র

মৈত্রেয়ী—শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী, মংপু

রানী—শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের পত্নী

রামানন্দবাবু—রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

রেখা—সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের ভগিনী, শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্তের পত্নী

রোটেনস্টাইন—সুপরিচিত শিল্পী, রবীন্দ্রনাথের বন্ধু

ললিতা—অরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠা কন্যা

লাবণ্য—অজিতকুমার চক্রবর্তীর পত্নী

লাবণ্যের মেয়েটি—শ্রীঅমিতা ঠাকুর

লাবু—শ্রীমমতা দেবী, শ্রীক্ষিতিমোহন সেনের কন্যা

শমী—শমীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র

শরৎ—শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ জামাতা

শ্রীমতী—শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রী, শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী

শৈল বৌমা—সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের পত্নী

শৈলেশ—শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের ভ্রাতা; একসময়ে রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থপ্রকাশক

সত্য—ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

সন্তোষ—সন্তোষচন্দ্র মজুমদার, শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র ও কর্মী

সাধু—ভৃত্য

সুকেশী বৌমা—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র কৃতীন্দ্রনাথের পত্নী

সুশি বৌমা—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী

সুধাকান্ত—শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরী, শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র ও কর্মী

সুনন্দা—রথীন্দ্রনাথের মাতুল-কন্যা

সুনীত—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ জামাতা

সুরূপা—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠা কন্যা

সুরেন—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর (পৃ. ১১৮, ১৫৭, ১৯৫)

সুরেন (পৃ. ৫১, ৫৫)—সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুপ্রকাশ—সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র

সোমেন্দ্র—সোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা, শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র

সৌম্য—শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

হেমলতা—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথের পত্নী

হৈমন্তী—শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীর পত্নী

ক্ষিতিবাবু—শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

সংশোধন

মাধুরীলতা দেবীকে লিখিত ১ সংখ্যক পত্রের তারিখ,
[চৈত্র ১৩২১] হইবে বলিয়া অনুমান।
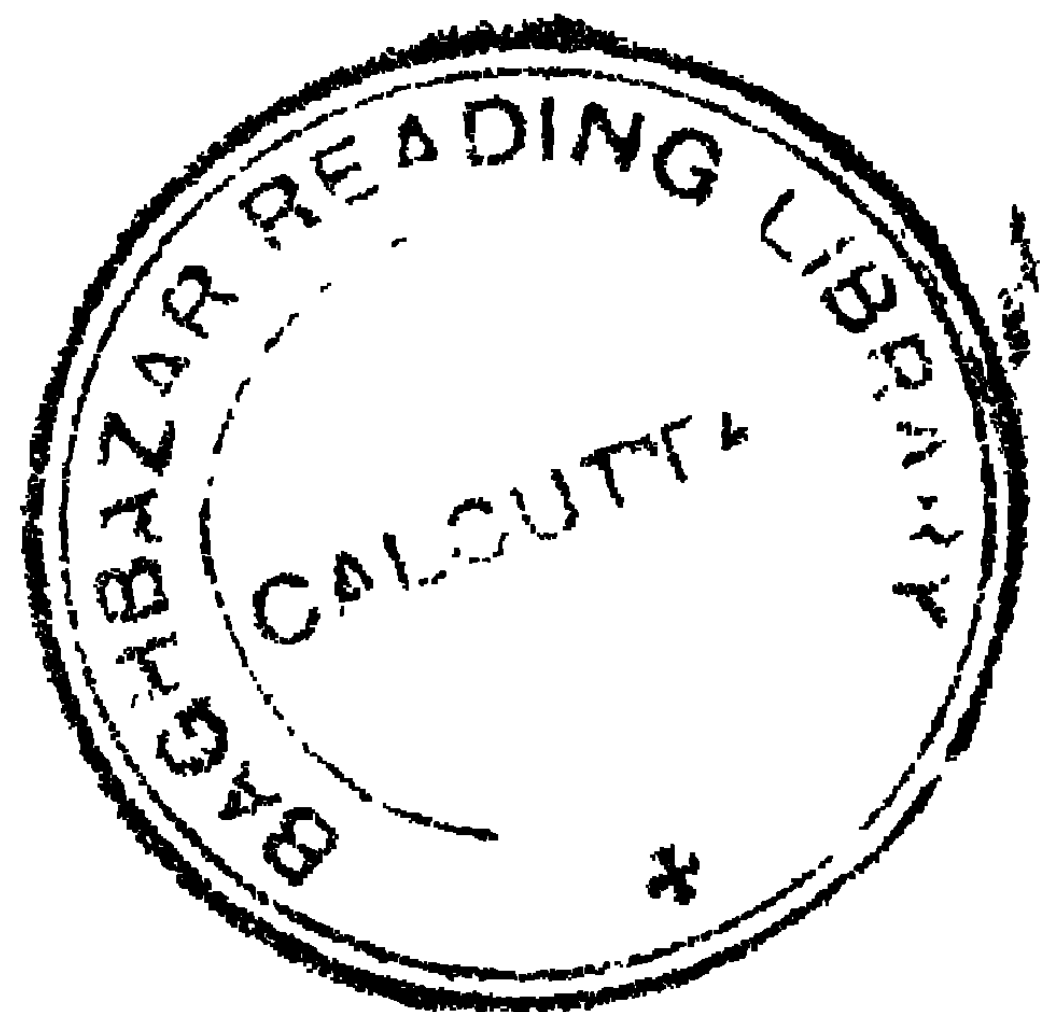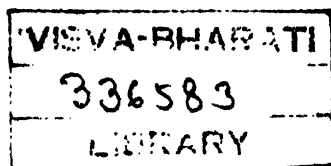
চিঠিপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলিকাতা

চিঠিপত্র

৫

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, তাঁহার সহধর্মিণী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীইন্দিরা দেবী ও শ্রীপ্রমথ চৌধুরীকে লিখিত পত্রাবলী চিঠিপত্র পঞ্চম খণ্ডে সংকলিত হইল। প্রথমোক্ত তিনজনকে লিখিত এই কয়টি চিঠিই আমাদের গোচরে আসিয়াছে। শ্রীইন্দিরা দেবীকে ১৯১৮-১৯৪১ সালে লিখিত চিঠিপত্র এই খণ্ডে প্রকাশিত হইল; ১৮৮৭-১৮৯৫ সালে রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে যে-সকল চিঠি লিখিয়াছেন সেগুলি ছিন্নপত্র গ্রন্থে মুদ্রিত আছে। ঐ সময়ে লিখিত আরও যে-সব চিঠি বর্তমানে বিশ্বভারতী পত্রিকায় মুদ্রিত হইতেছে, সেগুলি ভবিষ্যতে ছিন্নপত্রের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত

৬

পোস্টমার্ক শান্তিনিকেতন
১১ জানুয়ারি ১৯২২

ভাই মেজদাদা

এবার য়ুরোপ থেকে এসে অবধি বিশ্বভারতীর কাজের পাকে এমনি জড়িয়ে পড়েচি যে আমার কোথাও নড়বার জো নেই। বিশেষত এখানে Prof. Sylvain Levy কাজ করচেন তাঁকে ছেড়ে যাওয়া চলেনা। তিনি আমার আহ্বানে এসেচেন এবং আমার আকর্ষণেই এসেচেন— এত বড় পণ্ডিত অথচ এমন সহৃদয় লোক দেখা যায়না। যদি সুবিধা হয় তাঁদের বরঞ্চ একসময়ে রাঁচিতে আপনাদের ওখানে নিয়ে যাব। Gourlayকে জোড়াসাঁকোয় ডেকে এনে তাঁদের এখনকার দণ্ডনীতির বিরুদ্ধে কিছু বলেছিলেম। মেছুয়াবাজারে মসজিদের মধ্যে পুলিস প্রবেশ করে যেসব উৎপাত করেছিল তাতে সর্ব্বসাধারণের মনে ধারণা হয়েচে যে ওরা গায়ে পড়ে খোঁচা দিয়ে N. C. O. পক্ষের অহিংসাব্রত ভাঙবার চেষ্টা করচে। আমি ওকে বলেচি এরকম ঘটতে আরম্ভ হলে আমাদের মত নিরপেক্ষ লোকদেরও দায়ে পড়ে অপরপক্ষের সঙ্গে যোগ দিতে হবে। আপনি কৃষ্ণকুমার মিত্রকে যে message লিখে দিয়েচেন সেটা আমার ভাল লাগ্‌ল; আমিও কতকটা এইভাবেই মাঝে মাঝে দেশের লোককে বলেচি।— বিশ্বভারতীকে কতকটা খাড়া করে তোলা গেছে,— এটাকে এবার সাধারণের হাতে সমর্পণ করা গেল,— তারই একটা Constitution গড়া গেছে, সেটা উকীলের দ্বারা সংশোধন

করিয়ে ছাপা হলে আপনাকে পাঠিয়ে দেব। জিনিষটা আর সবই একরকম গড়ে উঠেচে কেবল অর্থের অনটনে নিয়তই উদ্বেগ ভোগ করতে হচ্চে। সুবীর মঞ্জু এখানে ভর্ত্তি হয়েচে সে কথা জানেন বোধ হয়। আমার ত মনে হচ্চে এখানে ওদের বেশ মন বসে গেচে। লটি মেয়েবিভাগের তত্ত্বাবধান করচেন, আর পিয়র্সনের হাতে সুবীরের ভার আছে। ইতি ২৬ পৌষ ১৩২৮

স্নেহের রবি

জ্ঞানদানন্দিনী দেবীকে লিখিত

ও

বোলপুর

পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

৩ সেপ্টেম্বর, ১৯১১

ভাই মেজ বোঠান—

মীরা ভাল হয়ে গেছে শুনে নিশ্চিন্ত হয়েছি। আমার কিছুতেই মনে হয়না যে মীরার পক্ষে মাংস খাওয়া ভাল। তুমি ওর যে রকম পথ্য ঠিক করে দিয়েছ সেইটেই ওর পক্ষে উপযোগী। রথীদের ওখানে পথ্যটা ভাল নয় সে কথাটা ঠিক —সেইজন্যেই প্রতিমার প্রায়ই শরীর খারাপ হচ্চে…যশোরের রক্তের গুণে মীরা খুব সামাজিক—মেলামেশা গল্প সল্প হাসিতামাসা করতে পারলেই ও সব চেয়ে থাকে ভাল— আস্তে আস্তে তোমাদের বালিগঞ্জ অঞ্চলে ওর একটি সখীমণ্ডলী গড়ে উঠ্‌লেই ও বেশ আনন্দে থাকতে পারবে।

আমার একরকম চলে যাচ্চে ছুটির পরে তারপর আমার শরীর সম্বন্ধে যা হয় একটা কিছু চিন্তা করে দেখা যাবে। আটই আশ্বিন থেকে আমাদের ছুটি আরম্ভ হবে। ইতি রবিবার

তোমার স্নেহের

রবি

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত

ভাই জ্যোতিদাদা

আমরা পূর্ব্বে যে জায়গায় ছিলুম সেখানে খুব একটা বড় রকম ঝড় খেয়েছিলুম। বোটগুলো নিয়ে সামাল সামাল রব পড়ে গিয়েছিল। তীরে শক্ত মাটি ছিল না— বালিতে খোঁটা ও নোঙর তেমন আঁকড়ে বসে না তাই ঝড়ের টানে নোঙর সুদ্ধ বোট খানিক দূর ঠেলে নিয়ে গিয়েছিল। এদিকে ঝড়ের প্রথম ঝাপটায় বালি উড়ে দশদিক অন্ধকার করে দিলে— বাইরে বেরতেই চোখে বালি লেগে অন্ধপ্রায় এবং নিশ্বাস বন্ধ হবার জো হতে থাকে। ছোট ছেলেদের নিয়ে মনের ভাব কিরকম হয়েছিল তা বেশ বুঝতেই পারচেন। সেখান থেকে এবার একটি রীতিমত সঙ্কীর্ণ কোলের মধ্যে বোটগুলো নিয়ে এসেছি। এখানে আর আশঙ্কার কোন কারণ নেই। উত্তর পশ্চিমে উঁচু পাড়— সেদিক থেকে তেমন জোরে বাতাস আসবার সম্ভাবনা নেই— জল অল্প এবং সম্মুখের দিকে বন্ধ। নির্জ্জন জায়গা— মেয়েরা চরের উপর সঞ্চরণ করে বেশ মনের আনন্দে আছেন। শিলাইদহে ফেরবার নামে তাঁরা বিমর্ষ হয়ে যান।

মুদ্রারাক্ষস পড়ছি। মুদ্রারাক্ষসের শ্লোকগুলি ঠিক কবিত্ব-রসপূর্ণ নয় সেইজন্যে আমার বোধ হয়, ওগুলো অমিত্রাক্ষর ছন্দে করলে ওর গাম্ভীর্য্য এবং কঠিনতা বেশ পরিস্ফুট হত। অন্য নাটকের মত এর শ্লোকগুলি বেশ স্বচ্ছ এবং চেষ্টালক্ষণ-

হীন হয়নি। এর গদ্য অংশ বেশ লাগচে। সংস্কৃত মূলটা আনিয়ে নিয়ে অনুবাদের সাহায্যে সেটা পড়ব বলে অপেক্ষা করে আছি। পূর্ব্বে একবার পড়্‌বার চেষ্টা করে খট্‌মটে বলে ছেড়ে দিয়েছিলুম। আপনি ত সংস্কৃত নাটকশ্রেণী প্রায় শেষ করে ফেল্লেন। বড়গুলির মধ্যে কেবল বেণীসংহার বাকি আছে। চণ্ডকৌশিক, অনর্ঘরাঘব, পার্ব্বতী-পরিণয় নাগার্জ্জুন প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত অখ্যাত নাটক আছে— সেগুলো নিঃশেষ করতেও দেরি হবে না।

আমি "নৈবেদ্য" বলে এক শ খানেক কবিতা সমাজ প্রেসে ছাপতে দিয়েছি— হয়ত আগামী নববর্ষের আরম্ভে পেতে পারবেন। রোজ সকালে একটি দুটি করে লিখে লিখে এতগুলো জমে উঠেছে।

কলকাতায় প্লেগ ত খুব জেগে উঠ্‌চে। আপনারা বুঝি স্থানত্যাগ কর্‌তে সম্মত নন্?

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ

ও

508 High Street
Urbana
Illinois. U. S. A.
7 Nov. 1912

ভাই জ্যোতিদাদা

আমরা আমেরিকায় এসে পৌঁচেছি তাই আপনার চিঠি পেতে দেরি হল। আপনি যদি Mr. Rothenstein এর নামে একশো পাউণ্ড অর্থাৎ ১৫০০ টাকা পাঠিয়ে দেন তাহলে তিনি ছবি বেছে ছাপাবার সমস্ত ব্যবস্থা করতে পারবেন। সুরেনের কাছ থেকে ১০০০ টাকা ধার নিয়ে মাসে মাসে একশো টাকা করে শোধ করবার ব্যবস্থা করলে বোধ হয় কোনো বিঘ্ন হবেনা। রোটেনস্টাইন বল্‌ছিলেন এরকম ছবির বই বেশি বিক্রি হবার যেন আশা না করা হয়— বিলাতের মত জায়গাতেও এর গ্রাহক অল্প। কেবল জিনিষটাকে স্থায়ীভাবে রক্ষা করবার জন্যেই ওর থেকে বাছাই করে ছাপার বন্দোবস্ত করা উচিত। উনি নিজে একটা ভূমিকা লিখে দেবেন। রোটেনস্টাইন ইংলণ্ডের একজন খুব বিখ্যাত চিত্রকর— South Kensington Art Collegeএর ভাস্কর্য্য অধ্যাপক একজন নামজাদা ফরাসী গুণী, তিনি বল্‌ছিলেন Rothenstein is not an ordinary artist, he is a personality.। আমি ছবি ছাপানো সম্বন্ধে তাঁকে একটা চিঠি লিখে দেব।

আমরা এখন যে সহরে আছি এটি ছোটখাটো জায়গা— একটি বিশ্ববিদ্যালয়কে বেষ্টন করে প্রধানতঃ অধ্যাপক ও ছাত্ররাই এখানে বাস করেন— সেইজন্যে বেশ নিরিবিলি— আমার ঠিক মনের মত জায়গা। আর একটি মস্ত সুবিধা

এই যে ইংলণ্ডে শীতকালটা যেরকম অন্ধকারে কুয়াশায় আচ্ছন্ন এখানে সেরকম নয়— যথেষ্ট শীত বটে কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর সূর্য্যের আলো— ভারি ভালো লাগে।

আমরা একটা বাড়ি নিয়েছি— বৌমা তার গৃহিণীপনা করেন— অর্থাৎ তাঁকেই রাঁধ্‌তে ঘর সাফ করতে হয়— এদেশে সবাই মনিব; চাকর পাওয়া প্রায় অসম্ভব বল্লেই হয়— অধিকাংশ ভদ্রগৃহস্থ স্ত্রী ও পুরুষ ঘরের প্রায় সমস্ত কাজ নিজের হাতে করেন। আজ দেখে এলুম বিকেলে এখানকার একজন বড় অধ্যাপক নিজের হাতে ঘরের সমস্ত কাপড় কাচচেন। নইলে উপায় নেই। এখানকার গরীব ছাত্ররা বেতন কিম্বা খোরাকির পরিবর্ত্তে বাসনমাজা রাঁধা ঘর ঝাঁট দেওয়া প্রভৃতি ঘরের কাজ সেরে দেয়। আমাদের অনেক ভারতবর্ষীয় ছাত্র একাজে নিযুক্ত আছে। বৌমার এ একটা বেশ শিক্ষা হচ্চে। তাঁকে এখানকার সকলেই ভালবাসে। একজন অধ্যাপকের স্ত্রী তাঁকে ইংরেজি পড়াচ্চেন— খুব আদরযত্নে আছেন। এমনতর একবছর কাটিয়ে যেতে পারলে তাঁর খুব সুবিধা হবে। ইংলণ্ডে ঠিক এমন সুযোগটি পাওয়া যায়না। রথীকে অধ্যাপকরা প্রায় সবাই আন্তরিক ভালবাসেন বলে সকলের কাছ থেকে এমন একটা আত্মীয়তা পাওয়া যাচ্চে।

আপনার স্নেহের

রবি

[৩] ওঁ আমেরিকার ঠিকানা—

C/o Prof. Seymour.

Urbana, Illinois,

U. S. A.

ভাই জ্যোতিদাদা

গত মেলে আপনার চিঠি পেয়েছি কিন্তু ছবির খাতা এসে পৌঁছতে বোধ হয় দু-এক মেল দেরি হতেও পারে। আমরা আবার পর্শু আমেরিকায় যাত্রা করচি। এখানে বলে দিয়ে যাব খাতা এসে পৌঁছলে Rothenstein এর কাছে পাঠিয়ে দিতে। তাঁর সঙ্গে ঠিক করচি আপনার ছবি সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ এখানকার Studio কাগজে এবং আমাদের Modern Reviewতে লিখ্‌তে। তাতে কিছু কিছু উদাহরণ আপনার খাতা থেকে সংগ্রহ করে দিতে পারেন। ছবির বই ছাপতে এত বেশি খরচ যে সে আপনাকে অনুরোধ করতে সাহস করিনে। একটা প্রস্তাব আছে এই যে India Society থেকে আপনার ছবির গোটাকতক Selection যদি ওরা ছাপায় তাহলে অনেকটা প্রচার হতে পারবে। আপনি কিছু খরচ দিলে ওরা বাকি খরচ দেবে। ওরা বছরে দুটো করে বই ছাপিয়ে সভ্যদের দেয়। এ বছরের বই হয়ে গেছে। আর বছরে আপনার এটা যদি ওরা ছাপিয়ে দিতে রাজী হয় তা হলে খুব ভাল হবে। আমি আজ ওদের কাছে সেই প্রস্তাব করব। আপনাকে তাহলে হয়ত ৫০।৬০ পাউণ্ড দিতে হতে পারে— কিন্তু সে এখনি নয়— আস্‌চে বছরে।

আমার বইখানা আর সপ্তাহখানেক পরে বের হবে। দেখে যেতে পারলুম না। এখানে নবেম্বরটা বড় বিশ্রী, তাই তাড়াতাড়ি পালাতে হচ্চে। বই বের হলে আপনারা পাবেন—এইখান থেকেই এরা পাঠিয়ে দেবে। এ বই এদের কেন এত অত্যন্ত ভাল লেগেছে তা ঠিক বোঝা আমাদের পক্ষে শক্ত। বিশেষত তর্জ্জমা আমার নিজের ইংরেজিতে, এবং সেও সরল গদ্যে। যে কবিতাগুলি তর্জ্জমা করেছি সে সমস্তই আমার শেষ বয়সের— তার মধ্যে কবিত্বের কোনো নৈপুণ্য নেই— দেশে তার কোনো আদরও হয়নি— বরঞ্চ লোকে এই কথাই মনে করেছে এই কবিতায় আমার কবিত্বশক্তির ক্ষীণদশাই প্রমাণ করচে।

আপনারা আমার প্রণাম গ্রহণ করবেন। ইতি ১লা কার্ত্তিক ১৩১৯

স্নেহের রবি

[৪] ওঁ

Hotel Earle
New York
13 Feb.1913

ভাই জ্যোতিদাদা

আর্ব্বানায় চুপচাপ ছিলুম বেশ আরামে ছিলুম। সম্প্রতি বেরিয়ে পড়েছি। শিকাগো য়ুনিভর্সিটিতে আমার এক বক্তৃতার নিমন্ত্রণ ছিল। সেখানে বক্তৃতা দিয়ে বষ্টনে হার্ভার্ড য়ুনিভর্সিটিতে বক্তৃতার জন্যে চলেছি। সেখানে আমাকে

চারটে বক্তৃতা দিতে হবে। তারপরে উইস্‌কন্সিন য়ুনিভর্সিটিতে নিমন্ত্রণ আছে সেখানে কাজ সেরে আর্ব্বানায় ফিরে গিয়ে রথীদের ইলিনয় য়ুনিভর্সিটিতে বক্তৃতা পাঠ করবার প্রস্তাব আছে। Michigan, Pardue, এবং Iowa University থেকেও নিমন্ত্রণ পেয়েছি কিন্তু আমার আর পোষাচ্চে না। মনে করচি আগামী এপ্রেল মাসেই ইংলণ্ডে ফিরব। ইতিমধ্যে রচেষ্টারে একটা Religious Liberalsদের এক কন্‌গ্রেস ছিল সেখানে Race Conflicts সম্বন্ধে আমাকে ছোট একটা প্রবন্ধ পড়তে হয়েছিল। শেষকালে আমাকে যে এদেশে এসে ইংরেজিভাষায় বক্তৃতা করে বেড়াতে হবে এ আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

আপনার খাতাগুলো সমস্তই রটেনস্টাইনের হাতে গিয়ে পৌঁচেছে। আমি লণ্ডনে ফিরে গেলে সেগুলো থেকে ছবি নির্বাচন করে কি ভাবে কি করা যেতে পারে তা স্থির করব। ইতিমধ্যে আপনি সেগুলো ছাপাবার খরচ কিছু সংগ্রহ করে রেখে দেবেন।

আমেরিকা সম্বন্ধে কিছু লেখবার সময় এ পর্য্যন্ত পাইনি। হয়ত ইংলণ্ডে ফিরে গিয়ে অবকাশ পাব। এই সমস্ত বক্তৃতা প্রভৃতির হাঙ্গামে আমাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে। সেইজন্যেই মনটা পালাই পালাই করচে। বষ্টনে ওকাকুরার সঙ্গে দেখা হয়েছে। কাল আবার সেখানেই যাচ্চি।

আপনার স্নেহের রবি

[৫] ও বোলপুর

শুক্রবার

ভাই জ্যোতিদাদা

যদি প্রুফগুলি পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে এই মেলেই রোটেনস্টাইনকে সে কথা জানাবেন। আমার ত মনে হয় বিবির দুটো ছবি দেবার দরকার নেই— যেটা মাথার উপরে ঝুঁটি বাঁধা সেটা বাদ দেওয়াই ভাল। রথী বলছিল এবার আমার যে ছবি তুলেছেন সেটা ভাল হয়েছে— রোটেনস্টাইন আপনার হাতে আঁকা আমার একখানা ছবি চান সেটা আপনি তাঁকে পাঠাতে পারেন তাহলে ওটাও বইয়ের মধ্যে নিবিষ্ট করে দিতে পারেন।

জর্ম্মানিতে যাবার গুজব সম্পূর্ণ অমূলক— কেমন করে উঠল জানিনে। বার্লিন থেকে ইতিমধ্যেই আমার নিমন্ত্রণ আসতে আরম্ভ হয়েছে।

আপনার রবি

ইন্দিরা দেবীকে লিখিত

[১]　　　　C/o. Messrs Thomas Cook & Sons.
Ludgate Circus, London.
৬ই মে ১৯১৩

কল্যাণীয়াসু

বিবি, তোর চিঠিখানি পেয়ে খুব খুসি হয়েছি। সমুদ্র পেরিয়ে অবধি আত্মীয়স্বজনদের এরকম আনুপূর্ব্বিক খবর আর পাইনি। তার কারণ, প্রধানভাবে বোলপুর বিদ্যালয়ের সঙ্গেই আমার চিঠির দেনাপাওনা চলে আসচে— তাছাড়া আপনার লোকেরা যারা মাঝে মাঝে লেখে তারা, আমার পক্ষে কোন্ খবরটা যে খবর, তা ভেবেই পায় না। সেইজন্যে আমি আছি এমন ভাবে, যেন দেশে সময়ের ঘড়িতে কেউ দম দেয় নি অথচ এখানে প্রত্যেক সেকেণ্ডটা দোলাদণ্ডের কাঁধে চড়ে টিক্‌টিক্ শব্দে ঘর মাতিয়ে রেখেছে।

গীতাঞ্জলির ইংরেজি তর্জ্জমার কথা লিখেছিস্। ওটা যে কেমন করে লিখ্‌লুম এবং কেমন করে লোকের এত ভাল লেগে গেল, সে কথা আমি আজ পর্য্যন্ত ভেবেই পেলুম না। আমি যে ইংরেজি লিখ্‌তে পারিনে এ কথাটা এমনি সাদা যে এ সম্বন্ধে লজ্জা করবার মত অভিমানটুকুও আমার কোনো-দিন ছিল না। যদি আমাকে কেউ চা খাবার নিমন্ত্রণ করে ইংরেজিতে চিঠি লিখ্‌ত তাহলে তার জবাব দিতে আমার ভরসা হত না। তুই ভাবছিস আজকের বুঝি আমার সে মায়া কেটে গেছে— একেবারেই তা নয়— ইংরেজিতে

লিখেছি এইটেই আমার মায়া বলে মনে হয়। গেলবারে যখন জাহাজে চড়বার দিনে মাথা ঘুরে পড়লুম, বিদায় নেবার বিষম তাড়ায় যাত্রা বন্ধ হয়ে গেল, তখন শিলাইদহে বিশ্রাম করতে গেলুম। কিন্তু মস্তিষ্ক যোলো আনা সবল না থাক্‌লে একেবারে বিশ্রাম করবার মত জোর পাওয়া যায় না, তাই অগত্যা মনটাকে শান্ত রাখবার জন্তে একটা অনাবশ্যক কাজ হাতে নেওয়া গেল। তখন চৈত্রমাসে আমের বোলের গন্ধে আকাশে আর কোথাও ফাঁক ছিল না এবং পাখীর ডাকা-ডাকিতে দিনের বেলাকার সকল ক'টা প্রহর একেবারে মাতিয়ে রেখেছিল। ছোট ছেলে যখন তাজা থাকে তখন মার কথা ভুলেই থাকে যখন কাহিল হয়ে পড়ে তখনি মায়ের কোলটি জুড়ে বস্‌তে চায়— আমার সেই দশা হল। আমি আমার সমস্ত মন দিয়ে আমার সমস্ত ছুটি দিয়ে চৈত্রমাসটিকে যেন জুড়ে বসলুম— তার আলো তার হাওয়া তার গন্ধ তার গান একটুও আমার কাছে বাদ পড়ল না। কিন্তু এমন অবস্থায় চুপ করে থাকা যায় না— হাড়ে যখন হাওয়া লাগে তখন বেজে উঠ্‌তে চায়, ওটা আমার চিরকেলে অভ্যাস, জানিস্ ত। অথচ কোমর বেঁধে কিছু লেখবার মত বল আমার ছিল না। সেই জন্তে ঐ গীতাঞ্জলির কবিতাগুলি নিয়ে একটি একটি করে ইংরেজিতে তর্জ্জমা করতে বসে গেলুম। যদি বলিস্ কাহিল শরীরে এমনতর দুঃসাহসের কথা মনে জন্মায় কেন— কিন্তু আমি বাহাদুরি করবার দুরাশায় এ কাজে লাগি নি। আর একদিন যে ভাবের হাওয়ায় মনের মধ্যে রসের উৎসব জেগে

উঠেছিল সেইটিকে আর একবার আর এক ভাষার ভিতর দিয়ে মনের মধ্যে উদ্ভাবিত করে নেবার জন্যে কেমন একটা তাগিদ এল। একটি ছোট্ট খাতা ভরে এল। এইটি পকেটে করে নিয়ে জাহাজে চড়লুম। পকেটে করে নেবার মানে হচ্চে এই যে, ভাবলুম সমুদ্রের মধ্যে মনটি যখন উস্‌খুস্‌ করে উঠবে তখন ডেক চেয়ারে হেলান দিয়ে আবার একটি দুটি করে তর্জ্জমা করতে বসব। ঘট্‌লও তাই। এক খাতা ছাপিয়ে আর এক খাতায় পৌঁছন গেল। রোটেনস্টাইন আমার কবিযশের আভাস পূর্ব্বেই আর একজন ভারতবর্ষীয়ের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। তিনি যখন কথাপ্রসঙ্গে আমার কবিতার নমুনা পাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, আমি কুণ্ঠিতমনে তাঁর হাতে আমার খাতাটি সমর্পণ করলুম। তিনি যে অভিমত প্রকাশ করলেন সেটা আমি বিশ্বাস করতে পারলুম না। তখন তিনি কবি য়েট্‌সের কাছে আমার খাতা পাঠিয়ে দিলেন — তারপরে কি হল সে ইতিহাস তোদের জানা আছে। আমার কৈফিয়ৎ থেকে এটুকু বুঝতে পারবি আমার কোনো অপরাধ ছিল না— অনেকটা ঘটনাচক্রে হয়ে পড়েছে।

তার পরে যখন আমেরিকায় গেলুম, ভাবলুম কিছুদিন চুপচাপ করে বিশ্রাম করব। কিন্তু চুপ করে থাকবার জায়গা আমেরিকা নয়। ও দেশ মূকং করোতি বাচালং— বিদেশ থেকে যে কেউ গেলেই আমেরিকা তার কাছ থেকে বক্তৃতা দাবী করে বসে। আমি আর্ব্বানা সহরে একটু গুছিয়ে বসবা-মাত্রই বক্তৃতার জন্যে তাগিদ আসতে লাগল। আমি বল্লুম

আমি ইংরেজিভাষা জানিনে, কিন্তু সেটা ইংরেজি ভাষাতেই বল্‌তে হয় বলে কেউ বিশ্বাস করে না, বলে, তুমি ত বেশ খাসা ইংরেজি বলচ। অনুরোধ এড়ানোর বিদ্যাটা আজও আয়ত্ত হয়নি। বলতে পারব না একথা বারবার বলার চেয়ে বক্তৃতা করা আমার পক্ষে সহজ। এমনি করে আমেরিকায় আমার টুঁটি চেপে ধরে বক্তৃতা বের করে নিলে। এসম্বন্ধে সেখানে খ্যাতিও লাভ করেছি—কিন্তু তবু আজ পর্য্যন্ত আমার মনে হয় ওগুলো দৈবাৎ লেখা হয়ে গেছে। ইংরেজি ভাষায় যে অনেকগুলো অত্যন্ত নড়নড়ে জিনিষ আছে— যেমন ওর articleগুলো, ওর prepositionগুলো, ওর shall এবং will— ওগুলো ত সহজজ্ঞান থেকে জোগান দেওয়া যায় না, ওর শিক্ষা থাকা চাই। এখন বুঝতে পারচি আমার মগ্ন চৈতন্য আমার subliminal consciousness এর মধ্যে ওগুলো মাটির তলার গর্ত্তের ভিতরকার কীট সম্প্রদায়ের মত বাসা বেঁধে রয়েছে— যখন হাল ছেড়ে দিয়ে চোখ বুজে লিখ্‌তে বসি তখন অন্ধকারে ওরা সুড়সুড় করে বেরিয়ে এসে অপনাদের কাজ সেরে দিয়ে যায় কিন্তু জাগ্রৎ চৈতন্যের আলো দেখ্‌লেই ওরা অত্যন্ত এলোমেলো হয়ে দৌড় দিতে থাকে— সুতরাং ওদের সম্বন্ধে কোনোমতেই শেষ পর্য্যন্ত মনের মধ্যে ভরসা পাইনে—সুতরাং আজ পর্য্যন্ত একথাটা সত্য রয়ে গেল যে আমি ইংরেজি ভাষা জানিনে। ঠিক জানিনে বল্লে একটু অত্যুক্তি করা হয়, কিন্তু নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ। আমি তোকে সত্য কথাই বলচি, একয়টা ইংরেজি প্রবন্ধ লিখতে পেরেছি

বলে আমার মনে একটা দুশ্চিন্তা জাগ্‌চে এই যে, এই নজিরের উপর বরাবর আমি চলব কি করে? কৃতকার্য্য হবার মত শিক্ষা যাদের নেই, যারা কেবলমাত্র নেহাৎ দৈবক্রমেই কৃতকার্য্য হয়ে ওঠে, তাদের সেই কৃতকার্য্যতাটা একটা বিষম বালাই।

আমরা আমেরিকা থেকে ফেরবার এক সপ্তাহ পূর্ব্বেই সুরেন এখানে এসেছে। আমরা আমাদের একটা পুরাতন পরিচিত বাড়িতে বাসা নিয়েছি। এখানে সুরেনের জন্যে ঘর খালি পাওয়া গেল না। তাই সে রোজ সকালে তার হোটেল থেকে এসে আমাদের সঙ্গেই দিন কাটিয়ে যায়। তার কাজকর্ম্মের জোগাড় একরকম হয়ে উঠেছে, বোধ হয় হপ্তাদুয়েকের মধ্যেই ফেরবার জন্যে প্রস্তুত হতে পারবে। রথী এবং বৌমা হয় ত বা সুরেনের সঙ্গেই ফিরবে, কিন্তু আমার এখন ফেরবার জো নেই। কারণ জুন মাসের প্রায় শেষ পর্য্যন্ত আমি এখানে বক্তৃতার দায়ে আবদ্ধ হয়ে পড়েছি। তারপরে Irish theatreএ আমার ডাকঘরের ইংরেজি তর্জ্জমাটা অভিনয় হবার আয়োজন চল্‌চে —ওটা য়েট্‌স্‌ এবং তাঁর দলের বিশেষ ভাল লেগেছে। তার পরে আমার আরো একটা বড় খাতা বোঝাই তর্জ্জমা সারা হয়েছে—সেগুলোও রোটেনস্টাইন প্রভৃতি আমার বন্ধুদের কাছ থেকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে এবং এগুলি ছাপবার বন্দোবস্ত করতে তাঁরা উৎসুক হয়েছেন। ম্যাকমিলানরা আমার প্রকাশক। গীতাঞ্জলির দ্বিতীয় সংস্করণটা অল্প কালের মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে গেছে, এতে ম্যাকমিলানরা উৎসাহিত হয়েছে।

নতুন লেখাগুলো সম্বন্ধে তাদের সঙ্গে বোঝাপড়ায় প্রবৃত্ত হতে হবে। এই সব কাজে সময় লাগ্‌বে। ওদিকে আমেরিকায় হার্ভার্ড্‌ য়ুনিভর্সিটিতে আমি যে বক্তৃতাগুলি পাঠ করেছিলুম সেগুলি বই আকারে বের করবার জন্যে সেখানকার একজন অধ্যাপক আমাকে অনুরোধ করচেন। বই তাঁরা বিনামূল্যে ছাপিয়ে দেবেন এবং তার সমস্ত মুনফা বোলপুর বিদ্যালয় পেতে পারবে। আমার এ লেখাগুলো এখানকার সমজদারদের কাছে একবার যাচাই না করে ছাপব না বলেই দেরি করচি। ওর মধ্যে একটা প্রবন্ধ Hibbert Journal-এর সম্পাদকের কাছে পাঠিয়েছিলুম তিনি সেটা সমাদর প্রকাশ করে গ্রহণ করেছেন, তাতে বোধ হচ্ছে এগুলো চলতে পারবে।

প্রমথর সনেট পঞ্চাশৎ পড়ে আমি খুব বিস্মিত হয়েছি। আমার মেঘদূতের যক্ষবধূর বর্ণনা মনে পড়ল— এই বইখানির কবিতা তন্বী, আর ওর দশনপংক্তি তীক্ষ্ণশিখরওয়ালা, একটিও ভোঁতা নেই— 'মধ্যে ক্ষামা', ছুটি লাইনের কটিদেশটি খুব আঁট—তার উপরে 'চকিত হরিণী প্রেক্ষণা।' এ যেন চোদ্দনলী হার, একেবারে ঠাস গাঁথুনি আর ভাবটুকু এক একটি নিরেট মাণিকের বিন্দুর মত ঝকঝক করে জ্বল্‌চে। কেবল আমি এই আশা করচি, কবিত্বের এই সুতীক্ষ্ণতা ক্রমে প্রশস্ত হয়ে আস্‌বে, এর ধারালো নবযৌবন পূর্ণযৌবনের রসভারে বিনম্র হয়ে পড়বে, এবং এখন পাঠকের মনকে প্রতিছত্রে ফুটিয়ে দেবার দিকে এর যে ঝোঁক আছে সেটা আপনি ফুটে ওঠবার দিকেই সম্পূর্ণ হবে, তখন কবিতা এমন নির্ম্মমভাবে নিখুঁত

হবে না। বীণাপাণিকে প্রমথ খড়্গপাণি মূর্ত্তিতে সাজাবার আয়োজন করেছেন। ভাষায় ছন্দে ও ভাবের সংযমে এবং নৈপুণ্যে আশ্চর্য্য শক্তি প্রকাশ পেয়েছে।

নদিদি আমাকে তাঁর 'ফুলের মালা'র তর্জ্জমাটা পাঠিয়েছিলেন। এখানকার সাহিত্যের বাজার যদি দেখ্‌তেন তাহলে বুঝতে পারতেন এ সব জিনিষ এখানে কেন কোনোমতেই চল্‌তে পারে না। এরা যাকে reality বলে সে জিনিষটা থাকা চাই। এই জিনিষের সঙ্গে আমাদের কারবার অত্যন্ত কম—সেইজন্যে এটা আমরা চিনিও নে এবং এর অভাবটা কি তা আমরা বুঝিও নে। আমার পক্ষে মুস্কিল এই যে আমি এ সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে লোকে ভুল বুঝবে কেননা আমার রচনাগুলোকে এরা গ্রহণ করেছে। যদি জিজ্ঞাসা করিস্ কেন করেছে তবে তার উত্তর এই যে, এই কবিতাগুলি আমি লিখ্‌ব বলে লিখিনি— এ আমার জীবনের ভিতরের জিনিষ— এ আমার সত্যকার আত্মনিবেদন—এর মধ্যে আমার জীবনের সমস্ত সুখদুঃখ সমস্ত সাধনা বিগলিত হয়ে আপনি আকার ধারণ করেছে। এই জীবনের জিনিষ জীবনের ক্ষেত্রে আদর পায় একথা আমি বেশ বুঝতে পেরেছি কিন্তু একথা বোঝানো শক্ত। কেননা নিজের ফাঁকি মানুষ নিজে দেখ্‌তে পায় না;—কেননা ফাঁকি জিনিষটাতে পরিশ্রম বেশি, চেষ্টা বেশি এবং তার প্রতি মানুষের মমতাও বোধ হয় বেশি হয়ে থাকে। আমাদের দেশের কোনো একজন লেখক তাঁর কোনো বই তর্জ্জমা করে

এখানে কারো কাছে পাঠিয়েছিলেন। এঁরা তাঁকে বল্লেন এটাকে সম্পূর্ণ নূতন করে না লিখ্‌লে চল্‌বে না। তাতে তিনি জবাব দিয়েছিলেন, কেন, রবীন্দ্র ঠাকুরের ভাষা যদি চলে থাকে তাহলে আমার কেন চল্‌বে না। তিনি মস্ত ভুল এই করেছিলেন যে তিনি মনে করেছেন ভাষার উপরেই বুঝি এর নির্ভর। একথা খুবই সত্য ইংরেজি ভাষা নিয়ে অভিমান করতে পারি এমন আয়োজন আমার জীবনে করাই হয়নি—কিন্তু যে কারণেই হোক্ জগৎটাকে আমি যেমন করে উপলব্ধি করেছি সেটা আমার আন্তরিক সত্য জিনিষ—সেই সত্যটুকুকে তার নিজের তাগিদেই আমি প্রকাশ করবার চেষ্টা করে এসেছি—এইজন্যে ইস্কুল মাষ্টারকে ফাঁকি দিয়েও আমি নিজের জীবনটাকে ফাঁকি দিইনি—ইংরেজি ব্যাকরণের কাছে আমার যত অপরাধই থাক্ সাহিত্যের কাছে অপমানিত হবার মত অপকর্ম্ম খুব বেশি করিনি। কিন্তু আমি বেশ দেখ্‌তে পাচ্চি ইংরেজিতে আমাদের দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিদের চেয়ে অনেক কাঁচা থাকা সত্ত্বেও ইংরেজি সাহিত্যে আমি স্থানলাভ করতে পেরেছি এজন্য আমাকে ক্ষমা করা এবং ঘটনাটিকে সরল ও উদার ভাবে গ্রহণ করা অনেকের পক্ষে দুঃখকর হয়ে উঠ্‌বে।

মে মাস পড়েছে, আজ ২২শে বৈশাখ কিন্তু তবু এখানে আকাশ ঝাপসা, আলো ঘোলা এবং সূর্য্যদেবের সোনার ভাণ্ডারের দ্বার একেবারে এঁটে বন্ধ। মাঝে মাঝে মন্দ মন্দ বৃষ্টিও হচ্চে, ভিজে স্যাংসেঁতে হাওয়ায় আজও ঘরে আগুন

জ্বালাতে হচ্চে। ভাল লাগ্‌চে না—কেননা আমি আলোর কাঙাল; আমার সেই বোলপুরের মাঠের উপরে একেবারে আকাশ উপুড় করে ঢালা আলোর জন্যে হৃদয় পিপাসিত হয়ে আছে। কিন্তু যখন ভেবে দেখি দেশে ফিরে গিয়ে চারিদিক থেকে কত ছোট কথাই শুন্‌তে হবে, কত বিরোধ বিদ্বেষ, কত নিন্দাগ্লানি, তখন মনে মনে ভাবি আরো কিছু দিন থাক্, যতদিন পারি এই সমস্ত কাকলী থেকে দূরে থাকি। কিন্তু অপ্রিয়তাকে পাশ কাটিয়ে চলা চলে না, তাকে ঠেলে চলাই হচ্চে প্রকৃষ্ট পন্থা—নদীর ধার দিয়ে দিয়ে গিয়ে নদী পার হওয়া যায় না, একেবারে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে দুহাত দিয়ে ঢেউ কাটিয়ে তবেই পারের ডাঙায় ওঠা সম্ভব— যা ভাল লাগে না তাকে এড়িয়ে এড়িয়ে ডরিয়ে ডরিয়ে চলব না, তাকে সমস্ত বুক দিয়ে ঠেলা দিয়েই চলে যাব— এই প্রতিজ্ঞাটাকেই আঁকড়ে ধরে রাখা ভাল। অতএব বক্তৃতাগুলো হয়ে যাক্ এবং বই ছাপাবার ব্যবস্থাটা সমাধা হোক্ তার পরেই পূর্ব্বমুখে পাড়ি দেওয়া যাবে।

জ্যোৎস্নার সঙ্গে আজও দেখা হয় নি, সে লণ্ডনের বাইরে কোথায় থাকে। আজ মেব্‌ল্ তাদের বাসায় চা খেতে নিমন্ত্রণ করেছিল। আমেরিকা থেকে ফিরে আসার পর এতদিন কেউ খবর পায় নি তাই চুপচাপভাবে চলছিল ক্রমে ভিড় হবার লক্ষণ দেখা দিচ্চে। এই টানাটানিটা কিছুতেই সহ্য করতে পারিনে— নিমন্ত্রণ চিঠি পাবামাত্রই আগেভাগে

আমি ক্লান্ত হতে আরম্ভ করি—অনেক সময় বরঞ্চ সেখানে গিয়ে ক্লান্তি দূর হয়।

রাত হয়ে এল। বর্ষারম্ভের আশীর্ব্বাদ জানিয়ে এইখানে চিঠি শেষ করি।

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[২] ওঁ

* 6 Dwarkanath Tagore Street
Calcutta

কল্যাণীয়াসু

তোর চিঠি পাবার আগেই মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলুম আজ তোদের ওখানে যাব। কিন্তু এই দুদিনের বিষম উপদ্রবে আজ আমার শরীর একেবারে ভেঙে পড়েচে। তাই আজই বিকেলের গাড়িতে পালাতে হচ্চে, নইলে বাঁচব না। দেশে ফিরে এসেই পুনর্মূষিকোভব হবার লক্ষণ দেখা দিচ্ছে।

রবিকাকা

কল্যাণীয়াসু

কাশী থেকে ফিরে এসে শরীর সুস্থ নেই। বোধ হয় ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার খানিকটা ছিন্ন অংশ এখনও শরীর থেকে বেরিয়ে পড়বার সুযোগ পাচ্চে না। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা অনেকটা অভিমন্যুরই মত, ও প্রবেশ করতেই জানে প্রস্থান করতে নয়। যাই হোক্ যতটা পারি চুপচাপ করে শুয়ে শুয়ে কাটাচ্চি। কিন্তু তোদের আর্টিস্টের হাতে ধরা দিতে রাজি নই— ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জাকে নেহাৎ ঠেকাতে পারিনি, আর সে অনুমতি না নিয়েই আক্রমণ করেছিল তাই আমার এই দুর্গতি, তাই বলে ইচ্ছা করে প্রতিদিন দু ঘণ্টা ধরে আর্টিস্টের সচল তুলির শাসনে নিশ্চল হয়ে থাক্‌বার দুর্ভোগ কেন স্বীকার করব— রোজ দুঘণ্টা করে যদি আমাকে ম্যালেরিয়ার কাঁপুনি ধরত তাহলে ত আমাকে ডাক্তার ডাক্‌তে হত— আর এর বেলাতেই কেন বিনা প্রতিকারের চেষ্টায় দুঃখ বহন করতে হবে? যাই হোক্, আজকাল ছবি নেবার উপযুক্ত স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য, সময়, স্বাভাবিকতা একেবারেই নেই। প্রমথকে বলিস্, প্রবন্ধ লেখার ইচ্ছা ছিল কিন্তু flesh is weak. আশা করি তোরা সবাই ভাল আছিস। ইতি ২ বৈশাখ ১৩২৫

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

পোস্টমার্ক
শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

মায়ার খেলার স্বরলিপি বদল করে হাল নিয়মানুগত করে লেখবার জন্যে দিনুর হাতে দিয়েচি। কিন্তু ওর হাত খুব সচল নয়। ওর কাছ থেকে কাজ আদায় করার মজুরি পোষাবে কিনা জানিনে। ও নিজে যে স্বরলিপি লেখে তাতে হাত চালিয়ে কাজ করে বটে কিন্তু এ ক্ষেত্রে ওর বিশেষ উৎসাহের লক্ষণ এখনো দেখ্‌চিনে। আরো তুই একদিন দেখে পরে বিচার করা যাবে।

দিনু এখানকার ছেলেদের "বিশ্ববীণারবে" যে ধাঁচায় গাইতে শিখিয়েচে সেই ধাঁচা অনুসারে স্বরলিপি লিখেচে। ঠিক মূলের অনুবর্ত্তন করা দরকার মনে করেনি। মৈথিলি বিদ্যাপতি বাংলায় এসে যেমন স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করেচে এবং সেই স্বাতন্ত্র্যকে আমরা স্বীকার করেও নিয়েচি এই সমস্ত বিদেশী সুরেরও সেই রকম কিছু রূপ পরিবর্ত্তন হবেই— হলে দোষই বা কি ? এই সব যুক্তি মনে এনে ওকে আমি বেকসুর খালাস দিতে ইচ্ছা করি। আমি জানি এ সম্বন্ধে তোর আইন অত্যন্ত কড়া কিন্তু আমার মনে হয় পরদ্রব্য আত্মসাৎ করা সম্বন্ধে ঢিলেমি সাহিত্যে ললিতকলায় সকল অবস্থায় ফৌজদারী অথবা দেওয়ানী আদালতের বিচার এলেকায় আসে না।

বিলাত যাত্রীর ডায়ারি বলে একদা একখানা বই বের

হয়েছিল সেইটুকুমাত্র খবর আমি রাখি, তার পরে এখনো সেটা বাজারে চলতি আছে কি না তা আমি বলতে পারিনে। আমার দশা অনেকটা কুলীন স্বামীর মত— খাতায় বিবাহের একটা ফর্দ্দ থাক্‌তেও পারে কিন্তু কোন্ স্ত্রী বেঁচে আছে আর কোন্ স্ত্রী মরেচে হলফ করে বলবার রাস্তা নেই।

এবারকার "সবুজপত্র" মোটের উপর উৎকৃষ্ট হয়েচে। প্রায় আগাগোড়া পড়ে ফেলবার যোগ্য। "গলি" বলে একটা কথিকা পাঠিয়েচি, সেটা কি ঠিকমত ঠিক জায়গায় পৌঁচেচে? মেরুদণ্ডের একটা অংশ ছাড়া শরীরের বাকি সমস্তই ভালো। দেহের আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি না হলেও কাজ বেশ চল্‌চে। ইতি ১০ অগ্রহায়ণ ১৩২৬

রবিকাকা

[৫]

ওঁ * Brahmacharya Ashram.
Santiniketan
Birbhum

কল্যাণীয়াসু

হাল আমলের বাঙালী মেয়েদের গৃহধর্ম শিক্ষা দেবার জন্যে আজকাল অনেক ভাল ভাল লোক অনেক ভাল ভাল দৃষ্টান্ত সংগ্রহের চেষ্টা করচেন। তোর চিঠিখানি পেলে ওর একটা হাফটোন ছাপ নিয়ে বইয়ের প্রথম পাতায় তাঁরা বসিয়ে দিতেন। এক-টিকিটে এক-কাগজে এক-লেফাফায় যুগল চিঠি চালিয়ে দেবার জন্যে প্রমথর চিঠি তুই চব্বিশঘণ্টা দাঁড়

করিয়ে রেখেছিস্, এ বুদ্ধি সকলের মাথায় জোগাত না। অভেদ্য দাম্পত্যে দুইকে এক করে দিয়ে চিঠিতে তুই যে অর্দ্ধনারীশ্বরের অক্ষরমূর্তি প্রকাশ করেচিস্ আমি তার তারিফ করচি নে, কিন্তু ডাকটিকিটের হিসাবের খাতায় তুই যে চারকে দুই করে সেরেচিস এই দুর্দ্দিনে সুগৃহিণীমাত্রেরই পক্ষে সেটা দৃষ্টান্তস্থল।

"বিশ্ববীণারবে"র বিকৃতি সম্বন্ধে তোর আপত্তি সমর্থন করে তুই যে একটি অমোঘ যুক্তি সব শেষে নিক্ষেপ করেছিস সে একেবারে শক্তিশেলের মত এসে আমার মন্তব্যটাকে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করেচে। মাসখানেক হল আমার নিজের গান অন্য লোকের মুখে শুনে এসেচি; মনের থেকে তার ব্যথা এখনো মরে নি, এমন সময়ে তুই যখন সেইখানেই দিলি খোঁচা তখন তাতে আমাকে অত্যন্ত দুর্ব্বল করে দিলে। মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দয়ালু লোকের খেলা, কিন্তু আহতের উপর অস্ত্রাঘাত সেটাই হল মারাত্মক।

আসল কথা, একে অজ্ঞতা তার উপরে কুঁড়েমি। ও গানের সুরটা ত জানিই নে—(কোন্ গানেরই বা জানি—নিজেরই হোক পরেরই হোক) তারপরে ব্যবহার করার যখন দরকার হল তখন গোঁজামিলন চালিয়ে দেওয়া গেল। ঐ গোঁজামিলন বিদ্যাটা কুঁড়ে লোকেরই বিদ্যা; অবিদ্যার সঙ্গে ওর দহরম-মহরম যোগ। তারপরে যেটা একবার চলে গেছে সেইটেকেই ভালো বলে চালানো আমাদের দেশে চলিত। ওটা হচ্ছে অবিদ্যার অহঙ্কার। মনে আছে সক্রেটিস

বলেছিলেন আমি জানি যে আমি কিছুই জানিনে। ওকথা বল্‌লেই জানবার জন্যে দায় স্বীকার করতে হয়। আমার মতো ইস্কুল-পালানে ছেলের কাছে তা প্রত্যাশা করা যায় না। সেইজন্যে দিনু যখন ভুল করে 'বিশ্ববীণারবে' শেখালে, আমি বল্লুম বেশ হচ্চে, এই রকম হওয়াই উচিত। বুঝেচিস্ কেন? যদি বলি অন্য রকম হওয়া উচিত তাহলে হাঙ্গামা বাড়ে। তুই হয় ত রেগে মেগে শাপ দিয়ে বসবি, তোমার গান তাহলে সকলে যা-ইচ্ছে-তাই করে গাক্। সে শাপে আমার বেশি লোক্‌সান হবে না—কেননা বিধাতা তোর অনেক আগেই আমার উপরে সেই শাপ জারি করেচেন। রাহু যাকে গ্রাস করবেই, কেতুকে সে ডরিয়ে কি করবে? 'অন্যের প্রতি সেইরকম ব্যবহার কর, অন্যে তোমার প্রতি যেরকম ব্যবহার করলে তুমি খুসি হও।' গান সম্বন্ধে এই নীতিবাক্য আমি গ্রহণ করতে পারলুম না—কেননা গ্রহণ করতে গেলেই অন্যের গান মন দিয়ে শিখ্‌তে হয়। গান শেখা সম্বন্ধে আমার তৎপরতা কি রকম সে তুই জানিস্। যদি বলিস্ দিনু এমন কাজ করলে কেন? তার কারণ 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা'। কুঁড়েমির মহৎ দৃষ্টান্তে অভিভূত করে না, এমন লোক কোটিকে গুটিক মেলে। মানুষকে ক্ষমা করতে গেলে মানুষকে বুঝতে হয়—সেই জন্যে এতক্ষণ ধরে তোকে বোঝাবার চেষ্টা করা গেল—কিন্তু ক্ষমা করবি কিনা আমার সন্দেহ রয়ে গেল। ইতি ২১ অগ্রহায়ণ ১৩২৬

রবিকা

[৬] ওঁ পোস্টমার্ক

নিউ ইয়র্ক

২২ ডিসেম্বর, ১৯২০

কল্যাণীয়াসু

অনেক সমুদ্র পেরিয়ে তোর বিজয়ার প্রণাম এসে পৌঁচেছে। তোর পঞ্জিকার বিজয়া আমার পঞ্জিকার পৌষ মাসে এসে পড়েচে। বুঝতে পারচি কত দূরেই আছি। এক দেশে থেকেও হয় ত ন'মাসে ছ'মাসে দেখা হয় না, কিন্তু ইচ্ছে করলেই দেখা হতে পারে এইটেই দেখা সাক্ষাতের প্রধান অঙ্গ। এখান থেকে দেশে যাব এই কথা কটির পেটের মধ্যে কত জাহাজ, কত রেলপথ কত বাক্সতোরঙ্গের বোঝা, কত পাসপোর্ট আপিসে ঘোরাঘুরি। মনে করলে প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। এদেশে আমার এক মুহূর্ত্তও থাকৃতে ইচ্ছে করে না, তবুও ত আছি— মাসের পর মাস চলে যাচ্চে। যে ইচ্ছা আমাকে এখানে বেঁধে রেখেচে সে ইচ্ছায় কিছুমাত্র সুখ নেই অথচ তারই জয় চল্‌চে, অন্য ইচ্ছার চেয়ে এই ইচ্ছা পালন করা ঢের বেশি কঠিন অথচ এই ইচ্ছাই পালন করচি। তবু মানুষকে বলে বুদ্ধিমান জীব।

মান সম্মান অনেক পাওয়া গেছে, কিন্তু আর ভাল লাগ্‌চে না। ফিরতে ইচ্ছে করে খ্যাতিহীন শান্তির মধ্যে— সেই অতি শস্তা জিনিষ যা কাউকে দাম দিয়ে কিন্‌তে হয় না, কিন্তু যা আমার মত হতভাগ্যের পক্ষে জগতে সব চেয়ে দুর্লভ।

আজ সাতই পৌষ। সকাল থেকে আমার মন এই প্রার্থনা করচে অসতোমা সদ্‌গময়।

রবিকাকা

[৭]

পোস্টমার্ক
জেনীভা
৭ মে, ১৯২১

তোর নববর্ষের প্রণাম ঠিক আমার জন্মদিনে এসে পৌঁচেছে। এখন আছি জেনীভাতে। এবার আমার জন্ম-দিন এখানেই হল। মনে হচ্চে, দেশে একদিন জন্মেছিলুম, সে জন্ম বহুদূরে পড়ে গেছে— তার পরে পঞ্চাশ বছর বয়সে আবার পশ্চিম মহাদেশে জন্মলাভ করেচি। এরা আমাকে আপন করে নিয়েচে। এদের প্রীতি যে কত গভীর, এদেব আত্মীয়তা যে কত সত্য তা মনে করে' আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাই। য়ুরোপের মহাদেশে আমাব ঘর যে এমন করে বাঁধা হয়ে গেচে তা আমি এখানে আসবার আগে কল্পনা করতে পারিনি। আমি বুঝতেই পারিনে এত শ্রদ্ধা ভালবাসা আমি কেন পেলুম। ৬০ বছর আগে একদিন যখন বাংলা দেশে জন্মেছিলুম তখন মর্ত্ত্যজন্মের যে অসীম সম্পদ লাভ করেছিলুম সেও কি হিসাব করে ঠিক বোঝা যায়— এও তেমনি, বিদেশীর কাছ থেকে এই যে অজস্র ভালবাসা পাচ্চি এর কি পুরো দাম কোনোদিন দিয়েছিলুম? দেনার সঙ্গে পাওনার হিসাব আমি ত মেলাতে পারিনে। আমার দ্বিতীয় জন্মের এই যে অজস্র দান পেলুম জননী ধরিত্রীর এই আশীর্ব্বাদ আমি নম্র হয়েই গ্রহণ করচি— এতে আমার কোনো অহঙ্কার নেই। এখনি যাচ্চি লোজানে, তারপরে লুসার্নে।

[৮] ওঁ পোস্টমার্ক

শান্তিনিকেতন

২০ অক্টোবর, ১৯২১

কল্যাণীয়াসু

তোরা আমার বিজয়ার আশীর্ব্বাদ নিস্।

এবার দেশে ফিরে এসে অবধি আমার শান্তি নেই বিশ্রাম নেই। আজকাল তাই কেবলি ইচ্ছে করে চারদিকের বেড়া সমস্ত ভেঙেচুরে ফেলে সেই আমার অল্পবয়সের সাহিত্যের খেলাঘরে পালিয়ে যাই— যখন জীবনে কোনো দায়িত্ব সাধ করে গ্রহণ করিনি— যখন ভাবতুম গল্প লেখা কাব্য লেখাই যথেষ্ট, আর সমস্তই অকিঞ্চিৎকর। তখন কাঁচা ছিলুম বলেই যে ভুল বুঝেছিলুম, আর এখন বুদ্ধি পেকেচে বলেই যে ঠিক বুঝেচি তা নয়। আসলে জগদ্ব্যাপারটা খেলারই মত হাল্কা, গানেরই মত পাখাওয়ালা,— আমরা ওর পরে আমাদের ঘরগড়া চিন্তার বোঝা চাপিয়ে ওকে আমাদের পক্ষে বিষম ভারী করে তুলেচি। বিষ্ণুর যেমন গরুড় এই জগৎটা তেমনিই আমাদের বাহন ছিল, ও আমাদের স্বর্গে মর্ত্ত্যে অবারিত বিচরণ করিয়ে নিয়ে বেড়াতে পারত কিন্তু আমরা অত্যন্ত বুদ্ধিমান হয়ে উঠে ওকে দিয়ে আমাদের মালগাড়ি টানাবার ব্যবস্থা করেচি। তাতে ক'রে মালগাড়ি চল্‌চে সন্দেহ নেই, আর লোকে ভাবচে খুব উন্নতি হচ্চে কিন্তু আকাশ পাতালে আমাদের বিচরণের অধিকার নষ্ট হয়ে গেল। কিন্তু মাল যে আছেই, সেগুলোকে টানাতেও যে

হবেই, অতএব কেবল মুক্তি নিয়ে ত ঘর চল্‌বে না, দায়িত্বও যে মান্‌তে হবে। তা জানি, তাই যারা কলকব্‌জার তত্ত্ব বোঝে, যারা মালগাড়ি ডিপার্টমেণ্টের ভারপ্রাপ্ত, তাদের আমি ভালোই বলি। অথচ এ কথাও ত ভুল্‌লে চল্‌বে না যে, মাল মানুষের, কিন্তু মানুষ নিজে মাল নয়। সেই নিজের জগৎটাকে কেবলি মালের জগৎ করে তুল্‌লে নিজেকে মানুষ চিন্‌বে কেমন করে? আজকাল তাই কেবলি ভাবচি, মাল বোঝাই করবার দায় আমি না নিলেও লোকসান বিশেষ হত না, কিন্তু দায় খোলসা করবার যে অধিকার আমার ছিল সেটাকে নষ্ট করে আমি নিজের ভালো করিনি পরেরও যে বিশেষ উপকার করেচি তা বল্‌তে পারিনে। অর্থাৎ তাদের উপকার করার চেয়েও আরো হয়ত কিছু করবার আছে, সেটা হয়ত বা আমার দ্বারা হতে পারত। নাইবা হতে পারত তাতেই বা কি। মনুষ্যলোকে দুই জাতের প্রাণী আছে,—কেজো আর অকেজো। এরা নিজের নিজের ধর্ম্মরক্ষা করে চল্‌বে এদের প্রতি বিধাতার এই অনুশাসন ছিল। কারণ, স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মোভয়াবহঃ। কিন্তু সংসারে কাজের দাবী এত বেশি যে বেকার লোকে আপন বেকার-ধর্ম্ম পালন করবার সুযোগ পায় না। কেজো লোকেরা সমস্ত পৃথিবীতে আপন কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তার করে ভারি খুসি হয়—তারা জানে না অকাজের স্থান ও অবকাশ মারা গিয়ে তাদের কাজ বিগ্‌ড়ে যাচ্চে। কিন্তু আজ আমার এই সুবুদ্ধি কেবল পরিতাপ জন্মাতেই পারে, আমাকে উদ্ধার করতে পারে না।

আমি আমার ফেরবার পথের মাঝখানে দায়িত্বের দেয়াল তুলেচি, অতএব মাল বোঝাই করবার আপিস থেকে এ জন্মে আমার আর নিষ্কৃতি নেই। আবার, আমার কপাল এমনি যে, এ আপিসে আমার যত মাইনে মেলে জরিমানা তার ডবলেরও বেশি। জরিমানা শুধু বাইরে নয় অন্তরেও— যে-মাটিতে মজুরি করি সেখানে কাঁটা, আর যে-আকাশে আমার ছুটি সেও গেছে মারা। তাই এখন আমার এক ভরসা পরজন্মের উপর। কিন্তু সে জন্মে যদি খবরের কাগজের সম্পাদক হয়ে জন্মাই ?

রবিকাকা

[৯] ওঁ পোস্টমার্ক

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

নববর্ষের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিস। শিলাইদা ঘুরে এলুম— পদ্মা তাকে পরিত্যাগ করেচে— তাই মনে হল বীণা আছে, তা'র তার নেই। তার না থাকুক, তবু অনেককালের অনেক গানের স্মৃতি আছে। ভাল লাগ্‌ল, সেইসঙ্গে মনটা কেমন উদাস হল।

মেজদাদার শরীর ভালর দিকে যাচ্চে শুনে নিরুদ্বিগ্ন হলুম। পুরীতে যাচ্চিস্, কিন্তু সকলেইত বলে পুরীতে

হজমের ব্যাঘাত হয়। দুর্ব্বল শরীরে খাওয়া হজমটা একটা দরকারী জিনিষ।

আমার এখানে Benoit বলে একজন ফরাসী অধ্যাপক এসে আত্মোৎসর্গ করেচেন— লোকটি অত্যন্ত চমৎকার। ইনি এখানে ফরাসীসাহিত্য অধ্যাপনার ভার নেবেন। আপাতত দরকার, এই দারুণ রবিতাপের হাত থেকে তাঁকে আগামী বর্ষা পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখা। পিয়ার্সন তাঁকে সঙ্গে নিয়ে কোটগড় পাহাড়ে যাচ্চেন, সুতরাং এই দুই পাশ্চাত্যের সম্বন্ধে আপাতত নিশ্চিন্ত আছি। এণ্ড্রুজের সম্বন্ধে ভাবনা নেই— কারণ তার সঙ্গে ভারতবর্ষের মধ্যাহ্নরবি পেরে ওঠে না—অগ্নিবাণ রুদ্রবাণ কিছুতে তার কিছু হয় না। Elmhirst নৈনিতালে তার কোন্ আত্মীয়সদনে আশ্রয় নেবে— সেখানে কিছুকালের জন্যে তার হাড় জুড়বে। বাকি রইল মিস্ ক্র্যামরিশ্। গরমে সে বেচারা ছট্‌ফট্ করে বেড়াচ্চে। যদি তোরা পুরীতে একে তোদের সঙ্গিনীরূপে কিছুদিন রাখ্‌তে রাজি হোস্, তাহলে সমস্যার সমাধান হয়। এ'কে তোদের ভালই লাগ্‌বে— কেননা এ কথাবার্ত্তা কইতে জানে এবং লোকটি প্রসন্নস্বভাবের; অল্পেই সন্তুষ্ট— একে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হবার কোন সম্ভাবনা নেই— হয়ত এ'কে মেজ-দাদারও ভাল লাগবে। ভেবে দেখিস্। পুরীতে গেলে সেখানকার আর্ট সম্বন্ধে নিত্য তোর সঙ্গে রাত্রি দেড়টা দুটো পর্য্যন্ত তুমুল তর্ক হতে পারবে— তাতে তোর সময় হুহু করে কাট্‌তে পারবে। লেভি সাহেব এখন নেপালে আনন্দে

আছেন। আমি গ্রীষ্মাবকাশ এইখানেই যাপন করবার সঙ্কল্প করেছি— তার ফলে যেমন একদিকে গ্রীষ্ম পাব, তেমনি অন্যদিকে সান্ত্বনাস্বরূপে অবকাশ পাওয়া যাবে। বিশ্রামের জন্যে সর্ব্বদাই মনের মধ্যে একটা ব্যাকুলতা আছে— তাতে কেবল ফল হয় সেই ব্যাকুলতা অবিশ্রাম-ব্যাকুলতারূপেই থেকে যায়। আমার এই অবস্থা। রীতিমত সুস্থ থাকা ভাল, রীতিমত অসুস্থ হওয়াতেও লাভ আছে কিন্তু দুয়ের মাঝখানে থাকার মত বালাই আর নেই। ২ বৈশাখ ১৩২৯।

রবিকাকা

[১০] ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

আমার জন্মদিন উপলক্ষ্যে তুই যে চিঠিখানি লিখেছিস সেটি পেয়ে আমি খুব খুসি হয়েচি। এবারে শিলাইদহে গিয়ে দেখ্‌লুম পদ্মা অনেক দূরে চলে গেছে— তেমনি দেখ্‌তে পাই তোদের জীবনের ক্ষেত্র থেকে আমার জন্মদিনের ধারা দূরে সরে এসেচে। মাঝে মাঝে সে কথা মনে পড়ে। আমাদের পরিবারের সঙ্গে আমার সম্পর্ক এখন ছায়াময় হয়ে এসেচে— তার একটা কারণ, ছেলেবেলায় যাদের সঙ্গে আমার জীবনের পারিবারিক গ্রন্থি বাঁধা হয়েছিল তারা প্রায় সবাই কোথায় অপসারিত— পরলোকে এবং ইহলোকে; এখন

জোড়াসাঁকোর বাড়িটা নদীর সেই বালুময় পথের মত যাতে নদীর স্রোত আর চলে না। তা ছাড়া তোর সঙ্গে আমার একটা প্রকৃতিগত প্রভেদ আছে, মোটের উপর আমার পারিবারিক আসক্তি তেমন প্রবল নয়, কোন মানুষ আমার পরিবার নামক একটা শ্রেণীর মধ্যে পড়ে গেছে বলেই সে যে অন্য মানুষের চেয়ে আমার কাছে মনোরম তা নয়— অবশ্য, পরিবারের মধ্যে এমন অনেক লোক আছে যাদের আমি বিশেষ ভাল বাসি— কিন্তু সে তারা পরিবারের লোক বলে নয়। নিজের ছেলে মেয়েদের উপর একটা স্বাভাবিক স্নেহ সকলেরই আছে কিন্তু সে জিনিষটাকে পারিবারিক বলা চলে না। সেটা যথার্থ আত্মীয়তা, পারিবারিকতা নয়। দেবতার সঙ্গে অন্তরের বন্ধন, আর তাঁর সঙ্গে সম্প্রদায়ের বন্ধনে যে তফাৎ, এই দুইয়ে সেই তফাৎ। অনেকেরই কাছে নিজের ছেলের একটা মূল্য আছে সে ছেলে বলেই; কিন্তু তার উপরেও সেই ছেলের একটা পারিবারিক মূল্যকে সে বড় করে দেখে। সে কল্পনা করে তার ছেলে পরিবার নামক একটা পদার্থের বিশেষ একজন বাহন। রথীর সম্বন্ধে আমার সে ভাব কিছুমাত্রই নেই। বিশ্বভারতীর জন্যে আমার যা-কিছু সম্বল সমস্তই আমি খরচ করচি, এমন কি, তার চেয়ে বেশিই করচি। যখন দেখি রথী তাতে আপত্তি করে না, বরঞ্চ উৎসাহপূর্ব্বক যোগ দেয়— তাতে আমার ভারি আনন্দ হয়। সে আনন্দ কিসের? মুক্তির। কিসের থেকে মুক্তির? পরিবার নামক একটা abstraction-এর বন্ধন

থেকে। আমার যদি পারিবারিক বোধ প্রবল থাকত, তাহলে সেই পরিবার পদার্থের প্রতিমাটিকে তৈরি করা, সাজানো এবং তারি পূজা করবার জন্যেই আমার উপার্জ্জন ও সঞ্চয়ের অধিকাংশের উপরে টান পড়ত। আমার আনন্দ এই যে, রথী একদিকে আমার ছেলে আর একদিকে সে পরিবার নামক মায়াগণ্ডীর বাহিরের বাস্তব মানুষ—আমার আশ্রমে যে দেশ থেকে যে জাতের যে-কোনো ছেলে আসে রথী তারই রথী-দা',—ওর তরফ থেকে সকলের প্রতি ওর সেই রথী-দা'র দায়িত্ব আছে। তাদের জন্যে ও সর্ব্বদাই খাট্‌চে, ভাব্‌চে, প্লান করচে, খরচ করচে, তাতে ওর সুখ ছাড়া কিছুমাত্র বিরক্তি নেই। কখনো ও মনেও ভাবে না, যে প্রভূত টাকা এ পর্য্যন্ত অর্জ্জন করেচি তাই দিয়ে কেন আমি, বিশেষ ভাবে না হোক্, প্রধানভাবে ওদেরই সংস্থান করে না দিচ্চি। সম্পত্তি জিনিষটাই ত হচ্চে পরিবার-পদার্থের বৃন্ত, তারই স্রোতকে ঘরের দিক থেকে বাইরের দিকে চালিয়ে দিলে পারিবারিক মানুষের পক্ষে সেটা কঠোর হয়ে ওঠে। আমার ঘরে সেই কঠোরতা স্বীকার করে নিতে কারো তেমন বাধ্‌ল না, তার কারণ আমার ঘরে পারিবারিক হাওয়া বয় না। যাই হোক পারিবারিক সত্তা আমার মধ্যে প্রবল নয় বটে, কিন্তু তাই বলে আমার মন যে কেবলমাত্র মানবসাধারণের আম-দরবারেই দিন কাটাতে ভালবাসে তা নয়— বিরাট মানবের মধ্যেই আমার আত্মা কৈবল্য লাভ করেচে তা বল্‌তে

পারিনে— আমার মধ্যে খুবই একটা প্রবল ব্যক্তিগত সত্তা আছে। বিশেষ মানুষ এবং বিশ্বমানুষ দুটোই আমার কাছে সবচেয়ে সত্য— পারিবারিক মানুষ এই দুইয়ের মাঝখানের প্রদোষান্ধকারের একটা জিনিষ—আমার কাছে ও সুস্পষ্ট নয়— এইজন্যে ওর উদ্দেশে আমার ত্যাগের উৎসাহ জাগে না। একদিন সেক্রেটারির পদ পেয়ে আদি ব্রাহ্মসমাজকে আমি বিশ্বের সঙ্গে যোগযুক্ত করে দিতে চেষ্টা করেছিলুম, যেই দেখ্‌লুম সেটা সম্ভবপর নয়, যে হেতুক ওটা আমাদের পারিবারিক জিনিষ, তখনি ওর জন্যে এক মুহূর্ত্ত বা এক পয়সাও খরচ করা আমার পক্ষে অপব্যয় বলে বোধ হল। কিন্তু আমার আশ্রমে ঐ জিনিষটাই— অর্থাৎ দেবতার অর্চ্চনা— বিশ্বমানুষের নয়, পারিবারিক মানুষের নয়, কিন্তু ব্যক্তিগত মানুষের জিনিষ হয়েচে বলেই আমার হৃদয় আকর্ষণ করে নিয়েচে। আমি ছেলেদের ভালবাসি, সেই ভালবাসার সঙ্গে আমার পূজা মিশ্রিত হয়ে আমার কাছে বিশেষ রসের সামগ্রী হয়েচে, তাই এ'কে সময় দিতে সামর্থ্য দিতে আমার কিছুমাত্র বাধে না। যাই হোক্ আমার মধ্যে এই ব্যক্তিগত সত্তা অত্যন্ত সজীব আছে বলেই মাঝে মাঝে কাজের ফাঁকে ফাঁকে তার দাবী জেগে ওঠে। সে বলে, আমি উপবাসী থেকে কাজ করতে আর পারিনে, সে বলে, একলা পথে শেষ পর্য্যন্ত চলে ওঠা বড় কঠিন। এই জন্যেই, এই বাহিরের সংসারে যতদূরেই চলে আসি না কেন, সে যত বৃহৎ অনুষ্ঠান হোক্, তার যত মহৎ গৌরব থাক্ তবু তোদের

সংসার থেকে যখন কোনো সাড়া পাই, তখন দেখি আমার জন্মদিনের সেই তারটিতে মরচে পড়েনি, এখনো তাতে সুর বেজে ওঠে।

তোর চিঠির পুনশ্চ প্রকরণে তুই মস্ত একটা প্রস্তাব করে পাঠিয়েছিস। প্রস্তাবটা ভাল তার সন্দেহ নেই, কিন্তু আমি এখন তিন-কুড়ি বছরের পরপারে, নিরতিশয় দূরঙ্গমিত হয়ে বসে আছি। এখন দেখেচি মনের ভিতরে একটা ক্লান্তি এসেচে, সহজে কোন নূতন দায়িত্ব নিতে ইচ্ছে করে না। কিছুদিন আগে কতকগুলি ছেলেদের কবিতা লিখেছিলুম। লেখবার একমাত্র তাগিদ ছিল বয়স্ক লোকের দায়িত্ববোধের জীবনকে ক্ষণকালের জন্যে মন থেকে সরিয়ে দেবার ইচ্ছায়। খেলার জগতে শিশু হয়ে জন্মেছি এই ঘটনাটির মধ্যে অস্তিত্বের মূলসত্যটি আমাদের জীবনের ভূমিকারূপে লিখিত হয়েচে, এই কথাটি কিছুকাল থেকে বারবার আমি ভাবচি এবং শিশুর কবিতায় এক-রকম করে প্রকাশ করবার চেষ্টা করেচি। দায়িত্ববোধরূপ ব্যাধি মানুষের বয়স্কতাকে কড়া করে পাকা করে তোলে, সে অবস্থায় সে খেলাকে অবজ্ঞা করতে থাকে, এবং খেলার সঙ্গে কাজের চিরবিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিয়ে কর্ত্তব্যসাধন করচে বলে গৌরব বোধ করে। জানে না সে যা বলে তাতে জগৎকর্ত্তার নিন্দা করা হয়, কেন না খেলা ছাড়া তাঁর কোনো কাজ নেই— তাঁর দায় নেই বলেই তিনি আনন্দময়। আজকাল আমার প্রায়ই সেদিনের কথা মনে পড়ে যখন তাঁর সঙ্গে আমার মিল ছিল, যখন আমার কোনো দায় ছিল না। হাসিকান্না

খুব তীব্র ছিল, কিন্তু সে সমস্তই জীবনের লীলার সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। তাতে যে কোনো ফুল ফোটেনি, ফল ফলেনি তা নয়— তার অনেক ফুল এখনো ম্লান হয়নি, তার অনেক ফল এখনো টিঁকে আছে। সেই ফুলে ফলেই পৃথিবীতে আমার পরিচয়। যে কাজ দায়িত্বের সে কাজ ক্ষণকালের— যে কাজ খেলার সৃষ্টি সেই কাজেই চিরকালের ছাপ। আমার ভয় হচ্চে বিশ্বভারতীতে খেলার চেয়ে দায়িত্ব পাছে বড় হয়ে ওঠে। এরকম অনুষ্ঠানের মধ্যে যে অংশটা আইডিয়া সেইটেই বিশুদ্ধ আনন্দ— আর যে অংশটা নিয়ম ও ব্যবস্থা সেইটেই হচ্চে বিষম দায়— সেটা যদি আইডিয়াকে চাপা দিয়ে আটে ঘাটে আষ্টে পৃষ্টে পাকা হয়ে ওঠে তা হলেই পাকা বুদ্ধির লোকে খুসি হয়ে ওঠে, কিন্তু সৃষ্টিকর্ত্তার তাতে বিতৃষ্ণা হয়। মানুষ মুক্তি পেতে চায়, তার মানে সৃষ্টিকর্ত্তার স্বরূপ ও অধিকার পেতে চায়; অর্থাৎ কাজ পরিহার করে মুক্তি নয়, কিন্তু খেলাকেই কাজ করে তুলে তার মুক্তি। বৈষ্ণবের তত্ত্ব হচ্চে যুগল মিলনের তত্ত্ব— কাজের সঙ্গে খেলার একাত্ম মিলনই হচ্চে সেই যুগলমিলন। যাই হোক্ এই সুদীর্ঘ আলোচনা শুনে ভয় পাস নে। তোর মনে হতে পারে যে, যে-হেতু মৌনং সম্মতি লক্ষণং সেই কারণে বক্‌নি অসম্মতি লক্ষণং। তোর অনুরোধ মনে রইল, হঠাৎ হয়ত একসময়ে ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে জ্বলে উঠ্‌বে। ইতি ২৭ বৈশাখ ১৩২৯

রবিকাকা

ওঁ

Srabasti
Colombo

কল্যাণীয়াসু

তোর বিজয়ার প্রণাম সমুদ্র পার হয়ে আজ এখানে এসে পৌঁছল। রথীরা এসে পৌঁছবে কাল সন্ধ্যাবেলায়। আমি ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্চি— হাতে নিয়ে বল্‌লে ঠিক হয় না, কণ্ঠে নিয়ে। এ বিদ্যা আমার অভ্যস্ত নয়, তৃপ্তিকরও নয়। সুতরাং দিনগুলো যে সুখে কাটচে তা নয়। জীবনের পূর্ব্বাহ্ণ সোনার স্বপন নিয়ে অতীত হয়েচে, জীবনের সায়াহ্ন সোনার সন্ধান নিয়ে ভীত হয়ে উঠল। যখন মন শ্রান্ত হয়ে পড়ে তখন বিশ্বভারতীকে মরীচিকা বলে মনে হয়— তখন বুঝতে পারি যখন কবিত্ব রচনা করেচি সেই ছিল আমার বাস্তব কাজ, আর আজ যখন শুভানুষ্ঠানের পাকা ভিত্তি পত্তন করতে বসেচি এই হচ্চে মায়া। এ কি টিঁকবে? আইডিয়া জিনিষটা সজীব, কিন্তু কোনো ইনষ্টিট্যুশনের লোহার সিন্ধুকে ত তাকে বাঁচিয়ে রাখা যায় না— মানুষের চিত্তক্ষেত্রে যদি সে স্থান পায় তবেই সে বর্ত্তে গেল। দেশের চিত্তের দিকে যখন তাকিয়ে দেখি তখন দেখ্‌তে পাই বিপুল কাঁটাবন— সেখানে খোঁচার আইডিয়ার মধ্যে ফসলের আইডিয়া কি জায়গা পাবে? যাই হোক আমাদের শাস্ত্র বলেচেন বপন করতে, ফলের হিসেব করতে নিষেধ করেচেন। অতএব এমনি করেই দিন কাট্‌বে, তার পরে দিন শেষ হয়ে গেলে আমার দায় যাবে চুকে।

গৃহস্বামীর চায়ের টেবিলে ডাক পড়েচে, চল্‌লুম। ইতি
৩০ আশ্বিন ১৩২৯

রবিকাকা

[১২] ওঁ পোস্টমার্ক
শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

এম্পায়ার একজিবিশনের সঙ্গে আমরা সম্বন্ধ রাখতে নারাজ, তার প্রধান কারণ যাঁদের এম্পায়ার তাঁরা আমাদের এম্পায়ারভুক্ত করে রেখেচেন যেহেতু আমরা না হলে তাঁদের তোষাখানা শূন্য হয়, সেটা ঐশ্বর্য্যহানির লক্ষণ। আমি তা নিয়ে নিজেদের অযোগ্যতাকেই দোষ দিই কিন্তু তবুও যথাসম্ভব মান বাঁচিয়ে চলবার খাতিরে, তাঁদের ভোজের পাত পাড়বার বেলায় আমাদের ডাক পড়লে, আমি গা ঢাকা দিয়ে বেড়াই। এম্পায়ার একজিবিশনে শান্তিনিকেতন থেকে ছবি গেলে আমাদের জাত যাবে।

আমি এখানে এসেও ব্যস্ত আছি। মনে মনে ছুটির জন্যে উপরওয়ালার কাছে দরখাস্ত করচি, পথের মধ্যে শনিগ্রহ সে দরখাস্তগুলো গাপ্‌ করে দেয়। বোধ হয় জানিস্‌ আমার কর্ম্মস্থানে শনিগ্রহ— তার স্বভাব হচ্চে এই যে, সে বেদম কাজ করিয়ে নেয় আর দাম চাইলেই দাঁত খিঁচোয়। ঘরে বাইরে সবাই বিশ্বভারতীর নাম শুনলেই বলে, আগে ঘরের কাজ

সারো, তার পরে বাইরের দিকে মন দিয়ো— আপ্‌নি বাঁচলে বাপের নাম। আমি তাদের দোষ দিইনে, এর মধ্যে শনিগ্রহের কণ্ঠস্বর শুন্‌তে পাই। বড় আইডিয়াকে "বড়" বদনাম দিয়েই লোকে গাল দিয়ে থাকে। আগে ছোট পরে বড় একথা যদি সত্য বলে মানি, তাহলে বল্‌তে হয়, আগে চাকা পরে গাড়ি। চাকার মধ্যে গাড়ি নেই, কিন্তু গাড়ির মধ্যে চাকা আছে। সমস্ত গাড়িকে যে মানুষ সত্য করে জানে সে-ই ত চাকাকেও সত্য বলে জানে। এই জন্যেই কথা আছে আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পশ্যতি। আমরা ছোটর সঙ্গেই সত্য ব্যবহার করবার জন্যে বড়কে সত্যরূপে পেতে চাই। সেই লোকই ভাল গৃহী, যে লোক ভাল মানুষ অর্থাৎ মনুষ্যত্বে যে লোক সত্য, গৃহিত্বে সেই লোকই সত্য। মনুষ্যত্বকে বিদ্রূপ করে গৃহিত্বকে সম্মান করা, গুরুর গালে চড় মেরে তার পায়ে তেল দেওয়া।

আজ এই পর্য্যন্ত, যেহেতু বিস্তর চিঠি লেখা বাকি আছে। ইতি ৩১ ভাদ্র ১৩৩০

রবিকাকা

[১৩] ওঁ পোস্টমার্ক

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

এমন একদিন ছিল যখন আমার জন্মদিনের সার্থকতা তোদের কাছে ছাড়া আর কোথাও ছিল না। ক্রমে কখন

এক সময়ে আমার জীবনের ক্ষেত্র বহুবিস্তীর্ণ হয়ে পড়ল। সেটা যেন আমার জন্মান্তরের মত। সেই আমার নব জন্মের জন্মদিন এতদিন চলে এসেচে। যেটাকে আমার জন্মান্তর বললুম তাকে আমার পরলোক বলাও চলে। অর্থাৎ যারা পর ছিল তাদের মধ্যেই একদিন আমার অভ্যর্থনা সুরু হয়েছিল। তোদের লোক থেকে এই লোকান্তরগতকে তোরা হয় ত তেমন স্পষ্ট করে দেখ্‌তে পাস্ নি। যে ঘাট থেকে জীবন যাত্রা প্রথম সুরু করেছিলুম, আমার কাছেও মাঝে মাঝে তা ঝাপ্‌সা হয়ে আস্‌ছিল।— কিন্তু এটা হল মধ্যাহ্ন কালের কথা। এখন অপরাহ্নের মূলতানী সুর হাওয়ায় বেজে উঠেচে। আলো কমে' এল। এখন দেখতে পাচ্চি ভোর বেলা আর গোধূলি বেলার একই গোত্র। অর্থাৎ প্রথম আলোয় যেখান থেকে যাত্রা সুরু হয়, শেষ আলোয় সেইখানেই যাত্রা শেষ হতে চায়। সেইটেই হল প্রাণের টানের জায়গা। সেখানকার অন্নপূর্ণা জীবনের প্রথম ক্ষুধার অন্ন খাইয়ে দিয়ে যাত্রাপথে এগিয়ে দেন— তিনি অপেক্ষা করেই বসে থাকেন ক্ষুধিতকে দিনশেষের ভোজে ডেকে আনবার জন্যে।

এবারে যখন থেকে শরীর অপটু হয়ে পড়ল, তখন থেকেই আমার কারখানা ঘরের দরজা যেন বন্ধ হয়ে আস্‌চে। বেরিয়ে এসেই দেখি যেখানে ভিড় নেই সেখানে আমার বালককাল। সেখানে যে বিশ্বপ্রকৃতি ভোর বেলায় আমাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে লালন করেছিল, সেই প্রকৃতিই সন্ধ্যাযূথীর মালা আমার জন্যে গেঁথে রেখেচে। পেয়েছি তার স্পর্শ, তার

ধূপছায়ারঙের আঁচলে আমার মনটাকে ঘিরেছে। আবার আমি ফেলে দিয়েছি আমার বই, আমার কাজ। আবার আমার মন পলাতক। সমস্ত দিন কিছুই করিনে কেবল সাম্‌নে চেয়ে আছি— দেখি পূর্ণতা সেই শূন্যে। শিলাইদহে একটি বৈষ্ণব গানে শুনেছিলুম, শ্যামের 'নি-কড়িয়া'-বাঁশির কথা, অর্থাৎ অকিঞ্চনের সঙ্গীত। তার দাম নেই, শুধু রস আছে। বালক বয়সে আমরা সত্যের সেই অকিঞ্চনতাকেই সহজে জানি— তখন খেলবার জন্যে সোনারূপোর দরকার হয় না। তখন জানি উপকরণটা লক্ষ্য নয়, খেলাটাই লক্ষ্য। খেলা যখন ভুলি তখনি খেলনার দাম নিয়ে মারামারি বেধে যায়। আজ বাইরে বসে খেলনার চেয়ে খেলার সাথীকেই বেশি করে দেখ্‌তে পাচ্চি। তার মানে বালকটা লোকান্তরগত হয়নি। ৬৫ বছর বয়সের গেটের কাছে যেখানে সানাইয়ে পূরবী বাজ্‌চে সেখানে সেই অকিঞ্চনটা ধূলোয় বসে আছে—সে ভোলা তেম্‌নি ভুলেই রইল তার বুদ্ধি পাক্‌ল না; যাকে প্রবীণেরা মায়া বলে বর্জ্জন করে সেই অনিত্যের খেলাঘরে সে কোন্‌ আশ্চর্য্যকে দেখ্‌তে পেল? যা'কে দেখেছিল পূর্ব্বদিগন্তে উষার প্রদোষ আলোয়, তাকেই দেখ্‌ল পশ্চিম সিংহদ্বারে তারার প্রদীপ জ্বালাতে ব্যস্ত। যেতে যেতে বলে যেতে পারব, দেখেছি।

তোরা থাকলে এবারকার জন্মোৎসবের রস পূর্ণ হত।

শরীরের কথা আজ আমার ভাববার কোনো গরজ নেই— ছুটির সুধায় মন ভরে আছে। সেই ছুটির রসসম্ভোগে গায়ের

জোরের তেমন বেশি দরকার বোধ করচি নে— গায়ের জোরটা হয় ত উৎপাত করতে পারত।

তুই আমাকে বই পাঠিয়েছিস্। অনেকদিন থেকে বই পড়া বন্ধ আছে। বই পড়ার হাত এড়াবার জন্যে ছেলেবেলায় রোগ কামনা করতুম কিন্তু এমনি দুর্জ্জয় স্বাস্থ্য নিয়ে জন্মেছিলুম যে কিছুতেই অসুখ করতে চাইত না। তখন যম-দূতেরাও বালকের বিরুদ্ধ পক্ষে যোগ দিয়েছিল। বালককালের সেই কামনা এতদিন পরে আজ সিদ্ধ হল। শরীরটা জবাব দিয়ে বসেছে— আমার ইস্কুল যাওয়া বন্ধ। চিঠি লিখিনে বই পড়িনে, সভাপতিটা বিদায় হয়ে গেছে। এবারকার জন্মদিনে বই আমার ঠিক উপহার নয়। এবারে ঘাটে-ফেরা নৌকোর পক্ষে তীরের থেকে শুধু উলুধ্বনিই যথেষ্ট হত।

এ চিঠি থেকে হয়ত একটা কথা ভুল বুঝতেও পারিস্। প্রভাতের সঙ্গে সায়াহ্নের যেমন একটা মিল আছে তেমনি একটা স্বাতন্ত্র্যও আছে। প্রভাতের নবীন আলোয় মধ্যাহ্নের বাণী নেই, কিন্তু সায়াহ্নের পূর্ণতা গূঢ়ভাবে মধ্যাহ্নকে নিয়ে। খেলাঘর থেকে খেলাঘরেই ফিরতে হবে কিন্তু মাঝখানের যাত্রাটা মহামূল্য। পড়ে’-পাওয়া খেলার সঙ্গে পূর্ণ পরিচয় যদি চাই তবে তাকে খুঁজে পাওয়া চাই। খুঁজ্‌তে গিয়ে খেলাটা ভুল্‌লেই ক্লান্তি। আশা করি আজ থেকে আমার খোঁজাও চল্‌বে খেলাও চল্‌বে, দুটো এক হয়ে যাবে।

তোদের শরীর সুস্থ হোক্, বর্ষাও নামুক তার পরে দুজনে একবার এখানে এসে দেখাশুনো করে যাস্।

কেউ কেউ প্রস্তাব করচেন জাপানযাত্রীর ডায়ারিটা তর্জ্জমা করবার। কোনোদিনই ও কাজটা আমার প্রিয় নয়, এখন ত মনে করলেও বিভীষিকা লাগে। ভয়ে ভয়ে বলচি যদি তোর হাত খালি থাকে একটু চেষ্টা করে দেখতে পারিস। চরকা কাটার চেয়ে হয়ত রস পেতে পারবি। একবার খাড়া করে দিলে আমি সেটাকে রঙ করে দিয়ে প্রতিমাটাকে সম্পূর্ণ করবার চেষ্টা করতে পারি। বইখানা যদি না থাকে এবং যথেষ্ট অবসর ও শরীরের শক্তি যদি থাকে তবে প্রশান্তকে টেলিফোন্ করে দিলেই সে তৎক্ষণাৎ বই জুগিয়ে দেবে।

আজকাল চিঠি লিখ্‌তে একেবারেই গা লাগে না। সেই বুঝেই এত বড় লম্বা চিঠির মূল্য নিরূপণ করতে পারবি। প্রমথকে দ্বিতীয় চিঠি লিখ্‌লুম না, কারণ যেখানে দুইয়ে-এক সেখানে একে-দুই আপনিই হয়ে যায়। ইতি ২৯ বৈশাখ ১৩৩১

রবিকাকা

[১৪] ওঁ * 10. Cornwallis Street
Calcutta
পোস্টমার্ক
১০ সেপ্টেম্বর, ১৯২৪

কল্যাণীয়াসু

কখন্ লিখ্‌ব বব্‌? আমি সমস্ত দিন এক মুহূর্ত্ত ফাঁক পাইনে। তার উপরে আবার আগামী সোমবারে অরূপ রতন অভিনয় করতে হবে— তার উপরে কলেজের ছাত্ররা টানাটানি

বাধিয়ে দিয়েচে। তবে যদি ইচ্ছে করিস শনিবারে মুখে মুখে অল্প কিছু বল্‌তে পারব। ভালো করে ভেবে বলবারও সময় নেই। তোর ওখানে ক'দিন ধরে যাবার চেষ্টা করচি কিছুতেই হয়ে উঠ্‌চেনা।

রবিকাকা

[১৫] ওঁ পোস্টমার্ক

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

বিবি, নববর্ষের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিস্‌। নাৎনীরা আমার গ্রহ; তা'রা আধুনিক জ্যোতিষের নিয়ম ছাড়িয়ে গেছে— তারাই রবিকে নিজের চারদিকে প্রদক্ষিণ করায়— অর্থাৎ আমার চেয়ে তাদের টানের জোর বেশি। রবিকে যে কলকাতার কক্ষ থেকে বিচলিত করেছে তুই তার হিসাব বের করেছিস্‌;— ঠিক করেছিস এখানে একটি গ্রহ বিরাজমান আছে— শুনেছি এই রকমের একটা হিসাব অনুসরণ করে নেপচুন গ্রহের অস্তিত্ব ধরা পড়েছিল। কিন্তু আমার গতিবিধির হিসাব খুব জটিল। আমার আকাশে একটা বড় নীহারিকামণ্ডল আছে— সে হচ্চে পরিণত ও অপরিণত জ্যোতিষ্কের একটা প্রকাণ্ড ঘূর্ণী— কোনো গ্রহের টান তা'র কাছে লাগে না— তারি আমন্ত্রণের আকর্ষণে এখানে এসেছি— তার আকর্ষণচক্রের পরিধি অতি বিপুল ও তার বেগ অতি

প্রবল। এর হিসাবটাকে তোরা গণ্য করতে চাস্‌নে বলে ভুল করিস্‌। এরই কেন্দ্রের থেকে যে-তলব আস্‌চে সে আমাকে অস্বাস্থ্য বা দুর্ব্বলতা বা অশক্তি কোনো ছুতোতেই নিষ্কৃতি দেবে না। ডাক্তারের নিষেধ এ'কে ঠেকাবে কি করে' ?

যাক্‌গে। মোটের উপর কলকাতার চেয়ে এখানে ভালোই আছি। ১ বৈশাখ ১৩৩২

রবিকাকা

[১৬] ওঁ পোস্টমার্ক

শান্তিনিকেতন

২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯২৫

কল্যাণীয়াসু

তোরা আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিস। এখানে এসে খোলা আকাশের তলায় একটু আরাম পেয়েছি। যদি দেখি মনটা সুস্থ হতে পাচ্চে না তাহলে মনে করচি Waltairএ দৌড় মারব— সেখানে একটা ভালো বাড়ির সন্ধান পেয়েচি। যাবার সময় চল্‌তি গাড়িতে লাফ দিয়ে উঠে পথের থেকে ফিরে আসব না এটুকু আশ্বাস দিতে পারি। প্রমথকে বলিস্‌ তার সম্পাদকীয় চিত্ত যেন উদ্বিগ্ন না হয়। আমি শেষবর্ষণের আর-একটা কপি নিয়ে সংশোধনের কাজ সেরে দিয়েচি— মুটু সেটা নকল করচে, হয়ে গেলেই তোদের পাঠাব— তোরা

দার্জ্জিলিং যাবার আগেই যদি পাস্ তবে নিশ্চিন্ত হব। আগামী সোমবারের আগে পাঠানো সম্ভব নয়, কারণ রেজেস্ট্রি আপিস কাল রবিবারে বন্ধ।

রবিকাকা

[১৭] ওঁ পোস্টমার্ক

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

তোর কেয়ারে কাল সুরেনকে একটা লেখা পাঠিয়েছিলুম সেটা তোর মারফৎ যথাস্থানে পৌঁচেছে ত? এখানে আজ ঘন মেঘ করে বায়ু বহে পূরবৈয়াঁ। বেশ একটু ঠাণ্ডাও পড়েচে— চারদিকে শিউলিফুল বর্ষণ হচ্চে— কৃষ্ণপক্ষের রাত প্রতিদিন চাঁদের অবগুণ্ঠন লম্বা করে দিচ্চে। ১৯ আশ্বিন ১৩৩২

রবিকাকা

[১৮] ওঁ পোস্টমার্ক

কলকাতা

কল্যাণীয়াসু

অসুখ করে কলকাতায় পালিয়ে আসতে হয়েছে সে কথা সত্য। মীরা কিছুদিন হল তার বন্ধু শ্রীমতীর সঙ্গে আমেদাবাদ বেড়াতে গিয়েছে— কথা ছিল বৌমা এসে চার্জ্জ বুঝে নেবেন— ঠিক দিনে চিঠি পাওয়া গেল তিনি প্রশান্তদের

সঙ্গে রাজপুতানায় ভ্রমণ করতে যাত্রা করলেন। যখন মনে মনে বল্‌চি আমি স্বাধীন, আমি আত্মপর্য্যাপ্ত— এমন সময়ে বিধাতা আমার দর্পহরণ করবার জন্যে শরীর দিলেন ভেঙে। জাহাজভাঙা রবিনসন্ ক্রুসোর মত বেদনা-সমুদ্রে ঘেরা নির্জ্জনতার মধ্যে আট্‌কা পড়লুম। সেখানে গুড্ ফ্রাইডের অভাব ছিল না কিন্তু রোগের দিনে তাদের নিয়ে চলে না। এখন আছি তেতালার কোণের ঘরে— কমল হয়েছেন অভিভাবক — সুখে দুঃখে দিন চলে যাচ্চে। এরই মধ্যে রোগশয্যায় স···দূত পাঠিয়েছিল আমাকে ধরবার জন্যে। সে কালীপূজোর নূতন ব্যাখ্যা ক'রে হিন্দুসমাজের চমক লাগাবার আয়োজন করচে, তার ইচ্ছে আমি হই সভাপতি। এখন বুঝতে পারবি বিধির বিধানে রোগ জিনিষটাও নিরবচ্ছিন্ন মন্দ নয়। ডাক্তারের সার্টিফিকেট দেখিয়ে খালাস পেয়েছি। ·· বেচারা কালীর জন্যে তোরা প্রার্থনা করিস্। আমারো প্রার্থনা করবার সময় হল— কারণ দেখা যাচ্চে আমার ফাউণ্টেন পেনের কালী ফুরিয়ে এসেচে। ৩১ আশ্বিন ১৩৩২

রবিকাকা

[১৯] ওঁ পোস্টমার্ক

কলকাতা

কল্যাণীয়াসু

এবার আমার ব্যামোটা একটুও শ্রুতিসুখকর হয়নি। সাধারণত রোগ দুঃখ সম্বন্ধে আমি অনুদ্বিগ্নমনা হবার চেষ্টা

করে থাকি এবারে আমাকে তার উদ্বেগে শান্তিনিকেতন থেকে এখানে খেদিয়ে এনেছে। প্রথম প্রথম আমার পীড়া কর্ণ ধরে যেরকম ঝিঁকে মারছিল এখন আর ততটা বেগ নেই কিন্তু চেপে ধরে আছে। কানে শুন্‌চি খুব কম, ডাক্তার বলচে ভিতরের প্রদাহটা কমে গেলে আবার শুন্‌তে পাব। তুই চিঠিতে আক্ষেপ প্রকাশ করেছিস, যে ডাক্তারের কথা আমি কানে তুলি নে সে কথা সত্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু ডাক্তার আমার কানে কথা প্রয়োগ বন্ধ করে অন্য রকম প্রয়োগবিধি সুরু করেছে— উপদেশের চেয়ে তাতে বেশি ফল পাওয়া যাবে বলে সকলে আশা করচে। আমার সেই তেতালার ঘরে আবদ্ধ হয়ে পড়ে আছি। মনটা উড়ু উড়ু করে কিন্তু কানটা রয়েছে ডাক্তারের হাতে। কতদিনে যে খালাস করে নিতে পারব তার কোনো ঠিকানা নেই। বোলপুর থেকে মরিসকে আনিয়ে নিয়েছি— সে আমার চিঠিপত্র লিখে দেয়, ডাক্তার এলে তার সহকারিতা করে, যথাসময়ে ভোজ্য প্রস্তুত হলে তৎ-সম্বন্ধে আমার কর্ত্তব্য স্মরণ করিয়ে দেয়, অপরাহ্নে বায়ু সেবনের জন্যে মোটর-রথযাত্রা আমার পক্ষে উপাদেয় ব'লে দু'দিন থেকে কানের কাছে মুখ এনে উচ্চস্বরে পরামর্শ দিচ্চে— তার সেই হিতবাণী আমার চেয়ে স্পষ্ট করে শুনতে পাচ্চে ওবাড়ির থেকে গগনরা।

এ রকম পীড়া হলে মন অন্য সমস্ত বিষয় থেকে নিরস্ত হয়ে ঐ একটি বিষয়েই একাগ্র হয়ে ওঠে। আমার চৈতন্য এখন কানময় হয়ে বিশ্বকে বিস্মৃত হয়েছে। যোগশাস্ত্রে

এ'কেই ত সমাধিলাভ বলে। কৈবল্যলাভের আর সবই হয়েছে কেবল পরমানন্দ রসটার উপলব্ধি এখনো যেন বাকি আছে বলে বোধ হচ্চে।

তোদের বোধ হয় অবতরণের সময় হয়ে এল—শৈলবিহার-বিলাসীদের মৈসুম ফুরিয়ে এসেছে বলে সংবাদপত্রে প্রকাশ। এবার যখন জোড়াসাঁকোয় আসবি তারস্বরে গলাটা সেধে আসিস, নইলে তোদের সঙ্গে আমার দেখাশুনোর শেষ অর্দ্ধেক অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ইতি ৯ কার্ত্তিক ১৩৩২

রবিকাকা

[২০] ওঁ পোস্টমার্ক

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

দিনরাত লোকজন, কথাবার্ত্তা, কাজ কর্ম, তার উপরে এক অভিভাষণ কাঁধে চেপেছে। মনটা ভিতরে ভিতরে লেখা সম্বন্ধে হরতাল নেবার পরামর্শ করচে। টাকা ছুঁলেই রামকৃষ্ণ পরমহংসের যেরকম সর্ব্বাঙ্গে আক্ষেপ উপস্থিত হ'ত কলম ছুঁতে গেলেই আমার সেই রকম হয়। শীতের মধ্যাহ্ন রৌদ্রে আকাশের পেয়ালা যখন কানায় কানায় ভরে ওঠে তখন আমার এই খোলা ঘরে দুই চক্ষু দিয়ে তাই পান করি আর কর্ত্তব্যকর্ম্ম টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে স্বপ্নলোকে বিবাগী হয়ে বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছা করে। যখনি একটু সময়

পাই মনটা ছুটে ছুটে যায় সেই আমার খ্যাতিহীন উদ্দেশ্যহীন সাবেক দিনগুলোর ঠিকানা খুঁজে বের করতে। আজ তাদের ছায়ারূপ আর ধরা যায় না। কিন্তু লেখার তাগিদ মনের মধ্যে নেই। সে তাগিদ সম্পাদকদের কাছ থেকে আসে কিন্তু এখানকার সাহিত্যিক রাজ্যের হাওয়ার মধ্যে নেই। নিজের ভিতরকার গরজে লেখবার বয়স ও উৎসাহ চলে গেছে। তাই নানা রকম হিতকর কাজ করেই দিন বৃথা নষ্ট হচ্চে, বেশ রসিয়ে কুঁড়েমি করবারও সুযোগ পাচ্চিনে; অথচ তারি তাগিদ এই খোলা মাঠের মধ্যে এই শীতের বেলায় চারিদিকের মৃদুরৌদ্রতপ্ত বাতাসে। ইতি ২ ডিসেম্বর ১৯২৫

রবিকাকা

[২১]

* Autour du Monde
9. Quai du 4-Septembre,.9
Boulogne-Sur-Seine
পোস্টমার্ক এস. কেনসিংটন
৩১ জুলাই ১৯২৬

কল্যাণীয়াসু

বিবি, কাল আর্য্য এসেছিল, বাড়ি ফেরবার জন্যে ছট্‌ফট্ করচে। আমাকে বারবার করে তোদের জানাতে অনুরোধ করেচে। বল্লে শিবুকে অনুরোধ করে করে চিঠির জবাব পর্য্যন্ত পায় না। বোঝা গেল, শিবুর অবস্থা সম্প্রতি মোহাচ্ছন্ন। দাদা প্রভৃতি অনতি-আবশ্যক মানুষদের প্রতি তার মন নেই।

যাই হোক্ তার একটা গতি করে দিস্। কোনো কাজকর্ম্ম নেই, এমন করে প্যারিসে পড়ে থাকা তার পক্ষে স্বাস্থ্যকর হতেই পারে না।

এদেশে আমার অভিযানের ইতিহাস বহুবিস্তৃত। লেখবার মত তেজ ও উৎসাহ নেই, বরঞ্চ মনে একটু সঙ্কোচ বোধ হয়। প্রশান্তরা বোধ হচ্চে কাগজে ঢাক পিটোচ্চে— তোদের হঠাৎ মনে হতে পারে আমারি ঢাকা ঢাকে ও কেবল কাঠি লাগাচ্চে। কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। এ রকম আত্মপ্রচারে আমি নিরতিশয় লজ্জিত হই। ওরা সেইজন্যে আমাকে গোপন করেই এ কাজ করে। অর্থাৎ এই ব্যাপারের প্রকাশ্যতা কেবলমাত্র আমাকে বাদ দিয়ে।

বড় বড় ডাক্তার আমার দেহকে পরীক্ষা করে বলেচে, যন্ত্রটা সর্ব্বাংশেই মজ্‌বুৎ— কেবল পেট্রোল ফুরিয়েছে। সেইটের জোগান যাতে স্থায়ী হয় অক্টোবরে ভিয়েনায় তারি উদ্যোগ হবে। এদিকে মনটা খাঁচার পাখীর মত দেশের বাসাটার জন্যে ছট্‌ফট্ করে মরচে।

আজ আর খানিক বাদেই লণ্ডনে পাড়ি দেব। সেখানে অগস্টের শেষ সপ্তাহ পর্য্যন্ত মেয়াদ। তার পরে নরোয়ে সুইডেন জর্ম্মানি ইত্যাদি ইত্যাদি— তারপরে বহুদূরে নবেম্বরের উপসংহারে স্বদেশযাত্রার উত্তরকাণ্ড— মনে করলেও মন পুলকিত হয়ে ওঠে— সেই বোম্বাইয়ের তালীবনরাজিনীলা বেলাভূমি।

রবিকাকা

কল্যাণীয়াসু

তোর রাখী পেলুম। কিন্তু বিষম ঘোরে ঘুরে বেড়াচ্চি— কোনো বন্ধন কোথাও ধরে রাখচে না। অথচ এ'কে মুক্তি বলে না— মন নিষ্কৃতি চাচ্চে তবু গোলেমালে ছুটি কিছুতেই মেলে না। আদর অভ্যর্থনার বিরাম নেই— সংসারে তার মূল্য যথেষ্ট আছে, কিন্তু তার চেয়ে মূল্যবান, শান্তিতে স্থির প্রতিষ্ঠা। নিজের মধ্যে এই এক দ্বন্দ্ব— লোভী তারস্বরে বলচে যেটা পাচ্চ সেটা খুব করে নিয়ে নাও, কিন্তু তার উপর-তলায় যে থাকে সে মন্দ্রস্বরে বল্‌চে, ফুটো কল্‌সিতে বারে বারে বৃথা জল ভরবার চেষ্টা না করে পূর্ণতার সমুদ্রে এক ডুবে তলিয়ে যাও। যে চক্র বাইরের পরিধিরেখায় ঘুরচে সে বল্‌চে, "আমার সঙ্গে ঘোরো, সেই হচ্চে মজা।" কিন্তু তার অন্তরের কেন্দ্রস্থলে যে আছে সে বল্‌চে "আমার মধ্যে স্তব্ধ হও তাহলে একই সঙ্গে গতি স্থিতি দুইয়েরই পূর্ণ সামঞ্জস্য পাবে।" বুঝি স্পষ্ট, কিন্তু অবুঝটাকে বাঁধতে পারে কার সাধ্য! কূলের খবর জানি, আজ দিনের শেষে সেইখানেই তরী ভিড়োবার কথা, কিন্তু যখন সব পাখী বাসায় ফিরচে তখনো সূর্যাস্তের ম্লান আলোয় স্রোতের টানে হূহু করে চলেচি— বাতাসে ভূপালীর সুরে একটা ডাক শুন্‌তে পাচ্চি, থাম্‌রে থাম্‌, আয়রে আয়। এই সব উপস্থিত বরমাল্যের লোভ সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়ে চরম জয়মাল্যের জন্যে রাজদরবারে শেষ দাবী জানাবার জন্যে একান্ত ইচ্ছে করে। কিন্তু দুটো ইচ্ছের দ্বৈরাজ্যের উপদ্রবে স্বারাজ্য মেলে না। একটা ইচ্ছের সঙ্গে

রক্তের টান, সে বলে পদে পদে আমি নগদ মজুরি চাই— আর একটা ইচ্ছে বলে, আমি মজুরি চাইনে আমি হুজুরী চাই— কর্ত্তা হ'ব। মেয়ের বিয়েতে পণ নেবার প্রস্তাবে কর্ত্তায় গিন্নিতে মতভেদ হলে যেমন হয় এও তেমনি— কর্ত্তা মাথা উঁচু করে বল্‌চেন আমি এক পয়সা চাইনে— গিন্নি লুকিয়ে কর্ত্তাকে ভাঁড়িয়ে ফর্দ্দ পাঠাচ্চেন। এমন স্থলে প্রায় গিন্নিরই জিৎ হয়। যাই হোক্‌ মনের মধ্যে থেকে থেকে আশা হয় যে, একটা রাস্তা পাব।— কেননা বেদনা যে মরেনি, অসাড় হয়নি মন। সব সময়ে পথ দেখতে পাইনে বটে কিন্তু দূরের আলোটা দেখ্‌তে পাই তো— তাতেই রাত্রের কোনো একটা প্রহরে বাসায় ফেরাবে। এই গেল আমার বর্ত্তমানের মনের কথা। তার পরে সংসারের অনেক কথা আছে, তাতে মনটাকে কম পীড়া দেয়নি।··· র কথা ভেবে কোনো কিনারা পাইনে, কেবল ভিতরে একটা নিরন্তর কান্না থেকে যায়। তার উপরে যে কাজ ঘাড়ে নিয়েচি, তার বোঝা কিছুতেই হাল্কা হতে চায় না— অথচ মন দেহ শ্রান্ত হয়ে পড়েচে— শিথিল ক্লান্তহাতে দাঁড় ধরে গান গাচ্চি—

মাঝি তোর বৈঠা নে রে,
আমি আর বাইতে পারলাম না॥

সবুজপত্রের জন্যে হাল আমলের গোটাকয়েক গান পাঠাই। তোরা উভয়ে আমার আশীর্ব্বাদ নিবি। ইতি
৯ অক্টোবর ১৯২৬

রবিকাকা

[২৩] ॐ 6 Dwarkanath Tagore Street
Calcutta

পোস্টমার্ক
শিলং

কল্যাণীয়াসু

একেবারে উল্টো। কলকাতার চেয়ে এখানে সময় আরো কম। প্রথম দফায় আমার বুকে ব্যথা হয়ে জ্বর গেল। দ্বিতীয় দফায় পুপের জ্বর। তৃতীয় আগন্তুকের সংখ্যা এখানেও কম নয়। চতুর্থ বিচিত্রার জন্যে একটা গল্প লেখা চাই। গল্প বিচিত্রার গরজে ততটা নয় যতটা আমার নিজের গরজে। অর্থাগমের আর কোনো রাস্তা জানিনে, কলমের জোরে যা পারি। গল্প লিখ্‌তে হলে একমনে লেখা দরকার। কলমটাকে নানা খুচরো কাজে খাটালে আসল কাজে সে এলিয়ে পড়ে।

যামিনীকান্ত সেন কলাসরস্বতীর একনিষ্ঠ উপাসক। এত বড় নিষ্ঠা কি নিষ্ফল হতে পারে? তিনি বর পেয়েছেন। সে বর হচ্চে ললিতকলা সম্বন্ধে তাঁর ধারণাশক্তি। মুস্কিল এই যে, সে বর ত অধিকাংশ লোকেই পায়নি, এই কারণেই জনসাধারণের কাছে তাঁর ব্যাখ্যার যথেষ্ট আদর হবার আশা বিরল। অতএব বাহিরে সিদ্ধির আশা না করে অন্তরে উপলব্ধির আনন্দ নিয়ে যদি তিনি খুসি থাক্‌তে পারেন তাহলেই তাঁর আর মার নেই।

তোর চিহ্নিত সবুজপত্রখানা নিশ্চয় জোড়াসাঁকোর কোথাও অজ্ঞাতবাস যাপন করচে।

আমরা চা বাগানে নেই— একটা উচ্চ শিখরে আছি— ঠাণ্ডা তার সন্দেহ কি— তবে কিনা হিমকলেবরের মতো না। ইতি ২০মে ১৯২৭।

রবিকাকা

[২৪]

পোস্টমার্ক
শান্তিনিকেতন
৭ নভেম্বর, ১৯২৭

কল্যাণীয়াসু

ফিরে এসেচি— সন্দেহ নেই। ঘাটে থেকে নেমেই আবার ইচ্ছে করচে একদৌড়ে পালাই। এত মিথ্যে কথা বাজে কথা অন্যায় কথা— মনকে ছোটো করে দেয়— মানব ইতিহাসের পার্সপেক্টিব ধূলোয় আচ্ছন্ন হয়ে যায় বলে, নিজেকেও যেন স্পষ্ট করে প্রশস্ত করে দেখতে পাইনে— একেই বলে কারাবরোধ— নিজেকে বৃহতের মধ্যে পাওয়ার পথ বন্ধ হওয়াই বন্ধন। 'আমার জন্মভূমি'তে সেই বন্ধনটাই তুচ্ছতার জালে চারদিক থেকে জড়িয়ে থাকে। এখানে বাণী নেই, কেবলই খবরের কাগজের কুলোর হাওয়া সাঁ সাঁ করচে— একটুও ভালো লাগে না। প্রমথকে বলিস্ দেখা হলে সব কথা হবে।

রবিকাকা

[২৫] শান্তিনিকেতন
পোস্টমার্ক
৯ জুলাই, ১৯২৮

কল্যাণীয়াসু

এখানে এসে বিশেষ ক্ষতি হয় নি। শরীর হয় ত বা অল্প একটু ভালো হয়েচে, সেটুকু কল্পনা হওয়াও অসম্ভব নয়। কাজকর্ম্মের দাবী স্বীকার করিনে— একমাত্র মহাসনে নিবিষ্ট হয়ে বিরাজ করি, কিছুতে তার থেকে বিচলিত হইনে।— যা উপসর্গ আছে তার উপরে আর বাড়াবার চেষ্টা মাত্র নেই— কিন্তু প্রতিদিনই বয়স এক একদিন বেড়ে চলেচে সেটাকে ঠেকাবার কোনো উপায় দেখ্‌তে পাইনে। বস্তুত জরাটাই হোলো ব্যাধি— সে ব্যাধির অবসান সমস্তর অবসানে— সেটার বিরুদ্ধে যত আয়োজন করি— ওষুধ খাই ডাক্তার ডাকি, তাতে কেবল যমকে হাসানো হয়। তার পরিহাস আমি সইতে পারিনে কারণ আমি তাকে ভয় করিনে। সেমিকোলনের উচিত হয় না দাঁড়িকে স্মরণ করে আঁৎকে ওঠা— সেটাতে কেবল ভীরুতা নয়, মূঢ়তাও বটে। ইতি ৯ জুন, ১৯২৮

রবিকাকা

[২৬] ওঁ [কলকাতা]

কল্যাণীয়াসু

বংশাবলীর নিয়মানুসারে তুইও বলতে ছাড়বিনে আমিও শুনব না— এটা একই স্বভাবের অন্তর্গত।

নীলরতনবাবু আমার সকল রকম পরীক্ষা নিঃশেষ করেচেন। রক্ত বিশ্লেষণের উদ্দেশে অন্তত দুই আউন্স রক্ত দিয়েছি। এটা যদি দেশকে দিতে পারতুম তাহলে বীরপুরুষ বলে খ্যাতি থাকত। যাই হোক্ পরীক্ষার ফল ভালো— একেবারে ফুল মার্কা— নীলরতনবাবু বল্লেন রক্ত ও শরীরযন্ত্র প্রভৃতিতে ৬৭ বৎসরের কোনো দাগ পড়েনি। দেহটা ভিতরে ভিতরে এখনো তরুণ আছে। ক্লান্তির কারণ হচ্চে পূর্ব্বকৃত অতিশ্রম— কিন্তু এর উল্টোটাও ভালো নয় যাকে বলা যায় অশ্রম— অতএব মধ্যপথ হচ্চে আশ্রম— কাল সকালে নটার গাড়িতে সেই পথেই যাচ্চি। বাজে কাজেই মানুষের ক্ষতি করে— আসল কাজে কোনো অনিষ্ট হয় না। চিরদিন কাজ করে এসেচি— হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেলে মনে হয় মরেই গেছি— তার চেয়ে সত্যিকার মরাটা ভালো— কেননা সেটা সত্যি।

রথীর ঠিকানা জান্‌তে চাস :—

C/o. American Express Co.

11 Rue Scribe

Paris

সেই মোটা ফ্রেঞ্চ বই আমার পূর্ব্বগামীরূপে বোলপুরে রওনা হয়ে গেছে। ইতি ভাদ্র তারিখ জানিনে, ১৩৩৫

রবিকাকা

[২৭] ওঁ পোস্টমার্ক

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

নলিনীর কাছ থেকে বিজয়া দশমীর প্রণাম পেয়েছি নবমীর দিনে, তোর কাছ থেকে পেলেম একাদশীতে— গড়পরতা রক্ষা হয়েচে।

মণ্টুকে আমি বেশ ঠাণ্ডা রকম চিঠিই লিখেচি। তার কারণ মণ্টুকে আমি অন্তরের সঙ্গে স্নেহ করি। সব সময়ে ওর বুদ্ধি স্থির থাকে না,...কিন্তু ওর মনটি খুব সরল, এবং ওর মধ্যে যে ভালোটুকু আছে সে খুব অকৃত্রিম। ওকে যারা কথায় কথায় গালমন্দ দিয়ে থাকে ও তাদের চেয়ে অনেক উপরের লোক।

এবার শরতে বর্ষায় বেশ রীতিমত প্রণয় চলচে। কাল ছিল আকাশ নির্ম্মল, জ্যোৎস্না নিরাবিল, দিগন্ত বাষ্পবিরল; আজ সকাল থেকে প্রথমে মেঘের উঁকিঝুঁকি, তারপরে তার আনাগোনা, তার পরে এই খানিকক্ষণ হল সমস্ত আকাশ অধিকার করে নিবিড় ধারায় বৃষ্টি। আমি নিজে আছি নিশ্চল, বসে বসে বাইরের আকাশে ঋতুদূতগুলির চলাফেরা দেখচি। বেশ লাগচে। ইতি শুক্লা একাদশী ১৩৩৫

রবিকাকা

ওঁ

পোস্টমার্ক
শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

বব, তোর সব তর্জ্জমাগুলিই খুব ভালো হয়েচে। আর ভাঙা প্রতিমার উপর যে কবিতা লিখেছিস্ সেও সুন্দর। কবিতার তর্জ্জমাগুলি বিশ্বভারতীর জার্ণালের জন্যে সুরেনকে কপি করে পাঠাবার জন্যে অমিয়কে বলে দিলুম। তুই যদি আর কোথাও প্রকাশ করতে চাস তাও করতে পারিস।

তোরা পদ্মাতীরে গিয়েছিস্ শুনে মনে মনে লোভ হচ্চে। পদ্মার আমন্ত্রণ আমার হৃদয়ের মধ্যে নিয়তই প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। আমাদের বোটের জন্যে উপযুক্ত মাঝি মাল্লা পেলুম না বলে এবারে এখানকার ডাঙার উপর পড়ে পড়েই রোদ পোহাতে হল। কথা ছিল বোটে করে পদ্মার চরে যাব। তোরা যাচ্চিস শুনলে মনটা আরো ছটফট করে উঠত।—...

এইমাত্র তোর তর্জ্জমাগুলি অপূর্ব্বকে দেখালুম—সে বল্‌লে আমার কবিতার এত ভালো তর্জ্জমা সে আগে আর দেখেনি।

শরীর সম্বন্ধে প্রশ্ন যদি না করিস তাহলে মিথ্যে জবাবের দায় থেকে আমাকে নিষ্কৃতি দিবি। এ কথা জোর করে বল্‌তে পারি আমি আমাদের সম্রাটের চেয়েও ভালো আছি।

এতদিন পরে শীতের মতো শীত পড়েচে। বনমালী নিবেদন করে গেল, মধ্যাহ্নভোজন প্রস্তুত। ইতি ৬ জানুয়ারি ১৯২৯

রবিকাকা

ওঁ

Uttarayan
Santiniketan
Bengal

বিজয়া দশমী, ১৩৩৬

কল্যাণীয়াসু

তোরা আমার বিজয়ার আশীর্ব্বাদ নিস্। তোরা ঘর ছেড়ে ছুটির সন্ধান করতে যাস— আমি ঘরে বসে ছুটি বানাবার চেষ্টা করি। কাজের সময় চারদিক থেকে কাজের উপাদান সংগ্রহ করতে হয়— সে উপাদানের অভাব নেই—আবার ছুটির সময় সেগুলি বাদ দিয়ে ছুটির সরঞ্জাম আহরণ করে তারি মাঝখানে আধখানা চোখ বুজে বসতে হয়— সে সরঞ্জামও আছে প্রচুর। এই রকম ছুটিটাই সবচেয়ে সস্তা বলেই বোধ হয় সব চেয়ে দুর্লভ। রথীরা শুনচি শীঘ্র তোদেরই বাসার মধ্যে আশ্রয় নিতে রাঁচি যাবার উদ্যোগ করচে। সবাই দেখেচি আমারই বয়েস আর আমারি শরীরটার প্রতি লক্ষ্য করে উদ্বেগ প্রকাশ করে। অবশ্য বয়েসে পাল্লা দিতে পারব না কিন্তু এই অঙ্গ-যষ্টিটার কথা যদি বলিস এটা অনেক ভর সয়, রথীর চেয়ে বেশি বই কম নয়। দেখতে পাই বিধাতা তাঁর একটা বিশেষ উদ্দেশ্যেই আমাকে মজবুৎ করে বানিয়েচেন কিন্তু সেই উদ্দেশ্যের বাইরে আমি কাহিল— আমি গাণ্ডীব তুলতে পারি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে, কিন্তু ডাকাত তাড়াবার সময় পাহারা-ওয়ালার কাজে নয়।

তপতীর ঝাঁজ মরবার পূর্ব্বেই দাবী আসচে রক্তকরবীকে স্টেজে চড়াবার জন্যে। আমার বিক্রমের আমলের প্রেয়সী

এইখানেই উপস্থিত আছেন বলে মনে ভাবচি আর এক মূর্ত্তিতে তাঁরই সাধনা করবার লীলাটা জাগিয়ে রাখ্‌তে দোষ কী?

কিন্তু একটা বাজে কাজের দায় আমার কাঁধে চেপেচে। বরোদায় গিয়ে একটা বক্তৃতা দিতে হবে এই আদেশ। বাঁধা আছি সেই রাজদ্বারে রূপোর শৃঙ্খলে— বিশ্বভারতীর খাতিরে মাথা বিকিয়ে বসেচি। তাই আজ সেই মাথা ঠুকচি একখানা বক্তৃতা বের করবার জন্যে। একটুও ভালো লাগচে না— এই শরৎ কালে ছুটির হাওয়ায় শিউলি বন বিকশিত হয়ে উঠ্‌ল কিন্তু পূর্ব্বজন্মের কোন পাপে কবিকে লাগতে হোলো কথার ঘানি ঠেলে বক্তৃতার তেল বের করতে, সেই তেল রাজ পদ সেবার জন্যে।— থাকগে দুঃখের কথা— কবে তোরা এখানে এসে জমিয়ে বসবি? আজকাল সঙ্গীর অভাব সব চেয়ে অনুভব করি, যাদের অল্প বয়েস তারা মনে করে আমার বেশি বয়েস হয়ে গেছে, কাজেই বক্তৃতা করতে হয়, আর আধুনিকীদের যেটুকু স্পর্শ আদায় করতে পারি সে কেবল অভিনয়ের ছল করে।

রবিকাকা

তোদের লাইব্রেরি এসে পৌঁচেছে— সেটা বিজয়ার খুব বড়ো নমস্কার

[৩০] ওঁ কলকাতা

কল্যাণীয়াসু

আজ সকালে সুধীর হঠাৎ মৃত্যু হয়েচে। আমরা কেউই জানতে পারিনি যে তার সাংঘাতিক পীড়া হয়েচে। যে ডাক্তার ওকে দেখছিল সে নিশ্চয়ই ঠিক বুঝতে পারেনি। তিনদিন আগে খুব হাঁপানিতে কষ্ট পাচ্ছিল আমার কাছ থেকে ওষুধ খেয়ে সেটা সেরে যায়। তার পরেই আজ হঠাৎ এই বিপদ। নেপু ছেলেমানুষ, সে হতবুদ্ধি হয়ে গেছে।

আমার জ্বর এখন আর নেই। রথীরাও এসে পৌঁচেছে। হারাসানের শরীর অনেকটা ভালো। আজ জ্বর এখনো দেখা দেয়নি। নীলরতনবাবু তাকে কষে কুইনীন খাওয়াচ্চেন।

আমার মনটা শান্তিনিকেতনের রাস্তায়। প্রমথর গল্পটা আমার হাতে পড়েনি। শান্তিনিকেতনে ফিরে গিয়ে দেখতে পাব। চেষ্টা করব যাতে দুতিনদিনের মধ্যে সেখানে ফিরতে পারি। ইতি ৮ নবেম্বর ১৯২৯

রবিকাকা

[৩১] ওঁ পোস্টমার্ক
শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

আমি তো আজই দৌড় দিচ্চি বরোদা অভিমুখে। ফিরব বিলম্বে। ১১ মাঘের ভার কে গ্রহণ করবেন ঠিক ভেবে

উঠ্‌তে পারচিনে। দীনু থাকবে গানের অধিনায়ক— ক্ষিতিমোহন বাবুকে বলে রেখেছি বেদীর কাজ করবেন। রথী তো পঙ্গু হয়ে পড়ে আছে। বাড়িতে আত্মীয়দের মধ্যে এমন কেউ নেই যে অনুষ্ঠানটাকে জমিয়ে তুলতে পারবে।…যে জিনিষে প্রাণশক্তির অভাব, ইঞ্জেক্‌শনের চোটে তাকে খড়্‌ফড়িয়ে তুলে মনে সান্ত্বনা পাইনে। আয়ু শেষ হলেও মানুষ বিদায় দিতে চায় না এইজন্যে বিস্তর প্রয়াস করতে হয় অথচ পরিণামে ব্যর্থতাই ঘটে। মৃতের ভার বহন করতে আমি উৎসাহ পাইনে— অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা রাখা উচিত কিন্তু যেন সে অতীত নয় তার সঙ্গে এমন ব্যবহার করাটা অসঙ্গত। বেলুড়মঠে শুনেছি বিবেকানন্দের ছবির সামনে রোজ অম্বুরি তামাকের ভোগ দেওয়া হয়— এই খরচটা বাঁচালে বিবেকানন্দের অসম্মান হোত না। অত্যন্ত ব্যস্ত। উদ্যোগ পর্ব্বটা বিরাটপর্ব্ব হয়ে উঠেচে— জিনিষপত্র নিয়ে ঘোরতর ঘাঁটাঘাঁটি চলচে। ইতি ১০ জানুয়ারি ১৯৩০

রবিকাকা

[৩২] ওঁ পোস্টমার্ক

প্যারিস

কল্যাণীয়াসু

তোর চিঠিখানি পেয়ে খুসি হলুম। ঘুরে ফিরে প্যারিসে এসেচি। রথীরা স্বাস্থ্য অন্বেষণে গেছে স্যুইজারল্যাণ্ডে। সঙ্গে আছেন ডাক্তার নলিনীরঞ্জন the first। আমার

বাহন আরিয়াম। এখন বৈশাখের মাঝামাঝি। কিন্তু বৈশাখ বলে পদার্থ এখানে কোথাও নেই— এখানে আছে এপ্রিল— তার চেহারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। মেঘ করে আছে, থেকে থেকে টিপ টিপ বৃষ্টি পড়চে, বাতাসকে শীতল বলা যায় কিন্তু সুশীতল বল্‌লে বাঙালী ভদ্রলোক যা বোঝে তার কাছ দিয়েও যায় না— দুঃশীতল বল্‌লে একটু বেশি বলা হয় কিন্তু নিতান্ত অন্যায় হয় না। আর মেঘ-শয্যায় যে সূর্য্যদেব লীনপ্রায় আছেন— তাঁকে মার্ত্তণ্ড বল্‌লে বেমানান শোনায়। এই তো গেল আকাশের খবর। ধরাতলে যে রবিঠাকুর বিগত শতাব্দীর ২৫ বৈশাখে অবতীর্ণ হয়েচেন তাঁর কবিত্ব সম্প্রতি আচ্ছন্ন— তিনি এখন চিত্রকর রূপে প্রকাশমান— তার সম্পূর্ণ বিবরণ যখন পাবি তখন চমক লাগবে, কিন্তু নিজ মুখে এ সম্বন্ধে সত্য কথা বল্‌তে গেলে অহঙ্কার করা হয়। পরম্পরায় যখন শুনবি তখনকার জন্যে নীরবে অপেক্ষা করাই ভালো। ২রা মে তারিখে প্রদর্শনীর দ্বারোদ্মোচন। এইবার আমার চৈতালি— বর্ষশেষের ফসল সমুদ্রপারের ঘাটে সংগ্রহ হল। আমার পরম সৌভাগ্য এই যে আমাদের নিজপারের ঘাট পেরিয়ে এসেচি। আমার এই শেষ কীর্ত্তি এই দেশেই রেখে যাব।

তোর উদ্বোধন পড়ে ভালো লাগল। কেবল একটি খুঁৎ আছে। 'বাধ্যতামূলক' কথাটা আমি সইতে পারিনে। ঐ দুঃশব্দ ব্যবহারে ভদ্রভাষারীতির প্রতি অবাধ্যতা করা হয়। Compulsory হল অবশ্যকৃত্য, voluntary হল স্বেচ্ছাকৃত্য।

কেবল প্রয়োগভেদে 'কৃত্য' শব্দের পরিবর্ত্তন করতে হবে, যথা অবশ্য পাঠ্য, অবশ্য দেয়, অবশ্য পেয়, ইত্যাদি। যদি একটি সাধারণ বিশেষণ দরকার বোধ করিস্ তাহলে আবশ্যিক ও ঐচ্ছিক এই দুটো কথা হাজির আছে। ঐচ্ছিক কথা সংস্কৃত অভিধানে পেয়েছি।

চিঠির ও পৃষ্ঠাটা এখনো খালি রইল— সেটা তোর সদ্দৃষ্টান্তের বিরোধী। কিন্তু বোধ হচ্ছে পত্র— পাত্র সম্পূর্ণ ভরবে না। তার কারণ অবকাশ নামক বিশুদ্ধ স্বদেশী মাল এদেশে পাওয়া যায় না— এখানকার শীতের আকাশের মতোই সেটা ঠাস— বোঝাই— রবি তার মধ্যে ভদ্র রকমের ফাঁক খুঁজে পান না। বিশেষত আগামী চিত্র প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে সর্ব্বদাই মন্ত্রী ও যন্ত্রীবর্গের সমাগম চল্‌চে।

অমিয় এবং অমিয়া ব্রিটিশখাড়ির ওপারে। মনের সুখে আছে। আদর অভ্যর্থনার মধুর উত্তাপে দক্ষিণ সমীরণের অভাব গণ্য করচেনা। আমার বক্তৃতার পালা মে মাসের ১৯শে তারিখ থেকে। জুনের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের মেয়াদ। তার পরবর্ত্তী ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের গোচরবর্ত্তী নয়— কিন্তু তার শেষ সীমায় যেন আটলান্টিকের পশ্চিমপ্রান্তের আভাস পাওয়া যাচ্চে। ভারত সাগরকূলের ছবি চোখে পড়্‌বেনা। পশ্চিমাচল পূর্ব্বাচলকে চাপা দিয়েচে। পাত্র ভরল— নামটা লিখলেই বাস্। ইতি ২৬ এপ্রিল ১৯৩০

রবিকাকা

[৩৩] ওঁ * 15 Rawlinson Road
Oxford

May 27, 1930

কল্যাণীয়াসু

এখানে আমার কীর্ত্তি সম্বন্ধে বেশী কিছু বলব না। কেন না বিশ্বাস করবি নে। ফ্রান্সের মত কড়া হাকিমের দরবারেও শিরোপা মিলেচে— কিছুমাত্র কার্পণ্য করেনি। কিন্তু সে কথা বিস্তারিত করে বলতে সঙ্কোচ বোধ করছি।

অক্সফোর্ডের বক্তৃতা কাল শেষ হয়ে গেল। সে সম্বন্ধেও নিজমুখে কিছু বলা শাস্ত্রবিহিত হবে না। তবে কেন যে লিখচি চিঠি, সে কথা জিজ্ঞাসা করতে পারিস। মণ্টু তোকে আমার চিঠির তর্জ্জমা করতে পাঠিয়েচে। ভালই করেছে। এইটুকু কেবল তোকে সাবধান করতে চাই ওতে এমন কিছু থাকতে পারে যা মফস্বলে চলে, সদরে নয়। জন সমাজে আমার দায়িত্ব আজকাল ব্যাপক হয়ে পড়েচে। সেই বিচার করে চিঠি সম্বন্ধে স্থানে স্থানে হয় তো বর্জ্জন নীতির দরকার হতে পারে— ঠিক মনে পড়চে না। বর্ত্তমানে জগতে অনেক সমস্যা নিরবগুণ্ঠিত হয়েচে একদা যা অন্দর মহলে অসূর্য্যম্পশ্য ছিল— তাদের সম্বন্ধে একেবারে বেপরোয়া হলে চলবে না।

রথীরা ভালোই আছে। সুহৃদ শুনচি শীঘ্র দেশমুখো হবে। অত্যন্ত ব্যস্ত আছি। ইতি

রবিকাকা

কল্যাণীয়াসু

পৃথিবীতে অল্পসংখ্যক দুর্ভাগা আছে যাদের গতিবিধি খবরের কাগজে (কালির ?) কালীর ছাপ দিতে দিতে চলে তাদের নিরালায় অসুস্থ হবারও জো নেই। অতএব তোদের কাছে ছাপা নেই যে আমার শরীর খারাপ। কাছে থাক্‌লে বুঝতে পারতিস্ খারাপ হলেও এমনীই কি খারাপ। অর্থাৎ কিছুদিনের মতো চুপচাপ করে পড়ে থাকবার মতো খারাপ তার বেশি নয়। ধরে নেওয়া যাক্ সপ্তমী তিথির পরিমাণে খারাপ, অমাবস্যা পরিমাণে নৈব নৈবচ, এমন কি একাদশীর কাছ দিয়েও যায় না। অতএব নিঃসংশয়ে জানিস্ হাওড়া ব্রিজ আরো একবার আমাকে পার হতে হবে। হিসাব করে যদি দেখিস্ তো দেখতে পাবি বয়স হোলো প্রায় সত্তর, অর্থাৎ বৈতরণীর ধার ঘেঁষে চলেচি। কিন্তু বোধ হচ্চে ভোগ যেন কিছু বাকি আছে, তাই যদিচ ঘাটে আসন পেতেছি তবু খেয়ায় এখনো জায়গা হোলো না। একটা অত্যন্ত নিশ্চিত সত্য আছে যেটা মানুষ তার সমস্ত জীবনে কেবল একবারমাত্র প্রমাণ করতে পারে— সে হচ্চে মানুষ অমর নয়। কিন্তু নাই বা হোলো— কিছুদিন বেঁচেছি, অত্যন্ত নিবিড় করে জেনেচি আমি হচ্চি আমি— অন্তহীন আমি-নয়-এর মাঝখানে এই একটিমাত্র আমি— অসীম জগতে এই পরমাশ্চর্য্য সত্য অসীম কালের অতি ক্ষুদ্রমাত্রায় আমার মধ্যে দীপ্ত হয়ে উঠেছে এর চেয়ে

আর কী চাই। মৃত্যু কি এর চেয়েও বড়ো যে ভাবনা করতে হবে। সাধকেরা বলেচেন দুঃখ থেকে মুক্তি পাবার জন্যে হওয়াটাকেই সমূলে উপড়ে ফেল্‌তে হবে— কিন্তু আমি বলি হওয়াটাই যদি মিট্‌ল তবে দুঃখটা গেল কি না গেল তাতে কি আসে যায়। রুগী বল্‌চে, কব্‌রেজমশায়, জ্বর ছাড়াও— কবিরাজ নস্য নিয়ে বল্‌লেন দেহ ত্যাগ করলে জ্বরের উৎপাত একেবারে ঘুচবে। রুগীর বক্তব্য এই যে দেহটার জন্যেই জ্বরের অবসান কামনা করা, দেহটারই অবসান যদি একমাত্র উপায় হয় তাহলে জ্বরটা না হয় রইল। আমি আছি এইটে হোল শেষ কথা, এটাকেও শেষ করলে বাকি রইল কি? মৃত্যুতে ওটা শেষ হয় কি না হয় জানিনে, কিন্তু বেঁচে থাকতে থাকতেই যে সব সন্ন্যাসী ওটাকে কেবলি রগ্‌ড়ে মুছে ফেলবার চেষ্টায় লেগে থাকে তাদের সঙ্গে কোনোদিন আমার বনিবনাও হোলো না। জীবনে কঠিন দুঃখ পেয়েছি এবং নিবিড় সুখ। কিন্তু সেই দুঃখে আমার হওয়াটাকেই তীব্র করে প্রমাণ করেচে, অতএব তাকে নিন্দে করব না। বিছানায় পড়ে পড়ে এই সব কথা ভেবেচি।

আরো একটা কথা ভেবেচি। দেশের কাজ করব বলে একদিন কোমর বেঁধে লেগেছিলেম। দেহের দিকে তাকাইনি, তহবিলের দিকে তাকাইনি, আরামের দিকে না, অবকাশের দিকে না— নিজের ঘরকন্নাকে একরকম ছন্ন ছন্ন করেছি সে তোরা জানিস্। যাকে বলে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো। স্বদেশে অতি সব অযোগ্য লোকের দ্বারে দ্বারে ফিরেচি

মাথা হেঁট করে। যদি কিছু পেয়ে থাকি তাতে জাত গিয়েছে পেট ভরেনি। বিধাতার কৃপায় খুব মজ্‌বুৎ শরীর নিয়েই জন্মেছিলেম, তাই "আমার জন্মভূমি" আমাকে যত মার মেরেছে তাতেও টিঁকে আছি। বিশেষত বন্ধুদের হাতের গোপন ও প্রকাশ্য মার। এমন বন্ধুও বাকি আছে যারা মারেও না কিছু করেও না, শুধু কথা কয়; যারা সহায়তাচ্ছলে আমার কাজে হাত দেয় কিন্তু সে হাত শূন্য। এও যাক্‌, একটা দুঃখ মলেও ঘুচবে না, সে হচ্চে এই, বাংলাদেশে আমাকে অপমানিত করা যত নিরাপদ এমন আর কাউকেই না— মহাত্মাজি চিত্তরঞ্জনকে ছেড়েই দেওয়া যাক্‌— বঙ্কিম, শরৎ, হেম বাঁড়ুয্যে নবীন সেন কাউকে আমার মত গাল দিতে কেউ সাহসই করে না। যাদের ব্যবসা গাল দেওয়া তারা জানে আমাকে গাল দিলে তাদের ব্যবসার ক্ষতি হয় না বরঞ্চ তাতে লাভ আছে। অথচ বিদেশে এসে যখন সম্মান পাই তখন ওরা বল্‌তে ছাড়ে না যে, উনি কেবল বিদেশের লোকের কাছেই সম্মান কুড়োতে যান। কুড়োতে হয় না, অজস্র বর্ষণ হতে থাকে। তার প্রধান কারণ, দেশের লোকের মতো এরা আমাকে এত অত্যন্ত বেশি জানে না। তাই হোক্‌, যথালাভ। একথা সত্য সমুদ্রের এপারে ওপারে ঘুরতে ঘুরতে আমার দেহগ্রন্থি শিথিল হয়ে এল— এখানকার সব ডাক্তারই বলে বাতির দুই প্রান্তে আলো জ্বালিয়ে আমি হুহু করে আয়ুক্ষয় করচি— উপায় নেই। ঘরের অন্ন থেকে যদি বঞ্চিত হতেই হয় তবে বনের ফল খুঁজে বেড়াতে হবে— সেটা আরামের নয়

বটে কিন্তু ফল দুর্লভ নয়। অবশেষে আমার শেষ বক্তব্য এই যে আমার মৃত্যুর পরে দেশের লোক আমার স্মৃতি নিয়ে যেন শোকসভাস্মৃষ্টির বিড়ম্বনা না করে। বেঁচে থাকতে থাকতে আমি যার কাছ থেকে যা কিছু পেয়েচি তার জন্যেই আমি কৃতজ্ঞ। একেবারে কিছু পাইনি একথা বলা অন্যায়। কিন্তু যারা দেবার মতো জিনিষ দিয়েচে তারা লোক ডেকে শোকসভা করবে না— যারা কিছুই করেনি, তারা সভা করবে, যারা গাল দিয়েচে তারা হাততালি দেবে— এটা কোনোমতে যাতে না হয় এই আমার একান্ত কামনা। আমার শ্রাদ্ধ যেন ছাতিমগাছের তলায় বিনা আড়ম্বরে বিনা জনতায় হয়— শান্তিনিকেতনের শালবনের মধ্যে আমার স্মরণের সভা মর্ম্মরিত হবে মঞ্জরিত হবে, যেখানে যেখানে আমার ভালোবাসা আছে সেইসেইখানেই আমার নাম থাকবে। ইতি
২৫ অক্টোবর ১৯৩০

রবিকাকা

[৩৫] ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

আজ প্রথম অবগত হলুম যে প্রমথর গ্রন্থাবলী পেয়ে আমি তার প্রাপ্তিস্বীকার করিনি। এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্চে মর্ত্ত্যলোকের সীমানায় এসে পৌচেছি। অর্থাৎ এখন মনে মনে কাজ করি সেটা যেন বিষয়ীকৃত হয়েচে বলেই ধারণা

হয়। তার মানে বিষয়জগৎ থেকে চিত্ত শিথিল হয়ে এসেচে। তাই বাহ্যব্যাপার সম্বন্ধে অত্যন্ত ভুল ঘটে— এমন কি আমার চিরাভ্যস্ত লেখাতে কেবলি স্খলন হতে থাকে। তাছাড়া খুবই সহজ এবং সাধারণ কাজেও ভারি একটা অনবধানতা এসেচে। তার মানে যেখানে আছি সেখানে নেই বল্লেই হয়। যদিও প্রমথর এই লেখাগুলি প্রায় সবই পূর্ব্বপঠিত তবু অনেকটা পড়েচি এবং মনে মনে তারিফ করেছি। লিখব বলে এতই নিশ্চয় স্থির ছিল যে লেখা হয়নি এ খেয়ালই ছিল না।

মেজবোঠান আজ এসে পৌঁছেচেন তাঁর ভালই লাগচে। বোধ হয় কিছুদিন এখানে থাকলে তাঁর শরীর ভালো হতে পারে। ইতিপূর্ব্বে খুব একটানা বাদলা চলেছিল— কাল মাথার খুলি ফাটাবার উপযুক্ত শিল পড়েচে। তাছাড়া বজ্র বিদ্যুৎ বৃষ্টি বাতাসে উদ্দাম তাণ্ডব হয়ে গেল। মেজো-বোঠানের সেই সময়ে আসবার কথা ছিল— এলে অস্থির হয়ে পড়তেন।

আমি এখন আছি গান নিয়ে— কতকটা ক্ষ্যাপার মতো ভাব। আপাতত ছবির নেশাটাকে ঠেকিয়ে রেখেচি— কবিতার তো কথাই নেই। আমার যেন বধূবাহুল্য ঘটেচে— সব কটিকে একসঙ্গে সামলানো অসম্ভব।

চিঠির তর্জ্জমাগুলো আমার কাছে পাঠিয়ে দিস। আমাকে হয় ত কলকাতায় কিছুদিনের মধ্যে যেতে হবে। ইতি
৭ মার্চ্চ ১৯৩১

রবিকাকা

ওঁ

পোস্টমার্ক
শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

তোরা দুজনে আমার নববর্ষের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিস্। সকালে মন্দিরের কাজ সেরে এসে লিখ্তে বসেছি। কলকাতা থেকে নববর্ষ বিদায় নিয়েছে। সেটা তেমন বেশি শোচনীয় নয় যেমন শোচনীয় মৃত পদার্থকে আঁকড়িয়ে পড়ে থাকা। শ্রদ্ধয়া দেয়ং অশ্রদ্ধয়া অদেয়ম্। এ কথাটা অর্ঘ্য দেওয়া সম্বন্ধেও খাটে। অশ্রদ্ধার দানে অশ্রদ্ধাকেই মূল্য দেওয়া হয়। আজ যদি আশ্রমে থাকতিস তাহলে দেখতে পেতিস এখানে এটা বেঁচে আছে। তার মানে এই নববর্ষের দিনের সঙ্গে বাকি ৩৬৪টা দিনের নাড়ীর যোগ আছে। কলকাতার পাঁজিতে সে বৎসরটাই নেই যে-বৎসরের প্রথম দিনকে বিশেষ ভাবে গণ্য করা চলে। আসল কথা, একটা পরিবারের কোমরের সঙ্গে টাকার শৃঙ্খলে বাঁধা আদি ব্রাহ্ম সমাজ একটা প্রকাণ্ড বিড়ম্বনা। আর কিছুকাল পরে স্বয়ং কটিটাই অন্তর্ধান করবে, আর যিনি বন্দী ছিলেন তাঁরও ঠিকানা পাওয়া যাবে না। কেবল শিকলটা ঝম্ঝম্ করবে। প্রথা জিনিষটা যেখানে সত্যকে বিদ্রূপ করে সেখানে সেই প্রথার মতো লজ্জাজনক ব্যাপার আর কিছুই নেই। শান্তিনিকেতনে ১১ই মাঘের উৎসব করতে আমার একটুও সঙ্কোচ বোধ হয় না কিন্তু আমাদের বাড়িতে অর্থহীন অনুষ্ঠানের আড়ম্বর আমাকে বড় লজ্জা দেয়।

বৈশাখের প্রবাসীতে মন্ত্রচিত যে সোভিয়েট-নীতি বেরিয়েচে সেটা তোকে তর্জ্জমা করতে বল্‌তে অত্যন্ত করুণা এবং কুণ্ঠা বোধ করছি। যারা তোকে ভালোমানুষ পেয়ে উপদ্রব করে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে ইচ্ছা করে না। আমি রাগ করি অন্তদের বেলায়— নিজেকে এক্সেপ্‌শন বলে চালিয়ে দিতে তেমন বেশি বাধে না। একেই বলে অহমিকা, এটা ত্যাগ করব বলে পণ করেছি কিন্তু তার আগে নিজের কাজ যতটা পারি গুছিয়ে নিতে চাই। ১ বৈশাখ ১৩৩৮

রবিকাকা

[৩৭] ওঁ পোস্টমার্ক
শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

প্রবাসীতে যে চিঠিটা বেরিয়েচে বিশেষ কারণে তার জরুরিত্ব আছে। আমার আমেরিকান ও জর্ম্মান বন্ধুরা আমার বলশেভিক-পক্ষপাত নিয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেচে। আমার ঠিক মনের ভাবটিকে তাদের অবিলম্বে বোঝানো দরকার। এই চিঠিখানা সেই উদ্দেশ্যেই লিখিত। একবার ভেবেছিলুম ইংরেজিতেই লিখব। কিন্তু অত্যন্ত দায়ে না পড়লে ঐ ভাষায় লিখ্‌তে আমার মন সায় দেয় না।

ঐ ভাষাটা আমার পক্ষে দুর্গম দুঃসাধ্য এই সংস্কার বহু-দীর্ঘকাল মনের মধ্যে বহন করে এসেছি। কোনো বিরুদ্ধ

প্রমাণেও সেই সংস্কার তাড়াতে পারিনে— সেইজন্যে শ্বেত-ভুজার বিলিতী কুঠরিতে ঢোকবার বেলা দরজা ভ্যাজানো দেখলেই মনে করি ওটা কুলুপ বন্ধ। ঠ্যালা মারলে খুলে যায় তাও জানা আছে কিন্তু এই জানাটা আজো মনের মধ্যে পাকা হয়নি। সেইজন্যে তোদের উপর ভর করতে পারলে আরাম পাই। কিন্তু এত লোক ওর উপর ভর দিয়েচে যে আর চাপ বাড়াতে ইচ্ছে হয় না অথচ সুযোগ পেলেও ছাড়িনে। এই আমার অবস্থা। ইতি ৩ বৈশাখ ১৩৩৮

রবিকাকা

[৬৮] ঔ পোস্টমার্ক

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

রবীন্দ্রপরিচয় পদার্থটি কি এবং কোথা থেকে তার উদ্ভব সে রহস্য আমার অগোচর। আন্দাজ করচি আমি উনসত্তর বছর বয়স পার হয়ে যে এক অভাবনীয় জীবনীশক্তির পরিচয় দিয়েছি তাকেই বাহবা দেবার জন্যে নানা দিগ্দেশ থেকে এঁরা নানা আকারে জয়ধ্বনি সংগ্রহ করচেন। তোর এই লেখাটাও তারি অন্যতম। কোথায় এর গতি হবে এবং স্থিতি হবেই বা কি আকারে সে কথা জানিনে— নিরন্তর সঙ্কুচিত হয়ে আছি। মধুর সম্ভাষণের শরশয্যায় শয়ান আছি বল্লেই হয়। সেজন্যে সলজ্জে লোকের কাছে কৈফিয়ৎ দিয়ে বলতে ইচ্ছা করে,

দোহাই তোমাদের, আমি এর জন্যে দায়িক নই তবুও আমি মাপ চাই— ভবিষ্যতে আর কখনো সত্তর বছরে পড়বার দুর্গতি ঘটাব না। তোর লেখাটি অমিয়র হাতে সমর্পণ করলুম— তিনি নিশ্চয়ই এই চক্রান্তের একজন প্রধান ব্যক্তি। ইতি ১৭ বৈশাখ ১৩৩৮

রবিকাকা

[৩৭] ওঁ পোস্টমার্ক

শান্তিনিকেতন

৯ মে, ১৯৩১

কল্যাণীয়াসু

তুই আমার গান সম্বন্ধে লিখেছিস এতে আমার বলবার কথা কিছু কি থাকতে পারে? ছোট্ট একটি কথা বলা চলে— যে যে তালে আমি গান রচনা করেচি তার তালিকা দেব সেটা চিন্তা করে দেখিস :—

রূপক, রূপকড়া, ঝাঁপতাল, ঝম্পক, একতালা, কাওয়ালি, ঠুংরি, আড়াঠেকা, দুই একটা চৌতাল— দাদরা, যৎ, কাশ্মীরি খেমটা, একাদশী, নবমী।

এখানকার অনুষ্ঠান খুব ভালো হয়েছিল। লোকের ভিড় নিয়ে অত্যন্ত দুশ্চিন্তা ছিল। অনেক কষ্টে কোনোমতে চলনসই ব্যবস্থা করা গেছে। বড় শ্রান্ত করেচে।

রবিকাকা

[৪০]　　　　ওঁ　　　　পোস্টমার্ক
কলকাতা
৮ মে, ১৯৩১

কল্যাণীয়াসু

পারস্যে যাচ্ছি। পর্শু রাত্রে বর্দ্ধমান থেকে বম্বাইমুখে যাব তার পরে বোম্বাই থেকে বস্‌রা, বসরা থেকে টেহেরান।

তোরা হয় তো উদ্বিগ্ন হবি। এই সঙ্কটসঙ্কুল সংসারে একজায়গায় চুপ করে বসে থাকলেও উদ্বেগের চরম কারণ ঘটা অসম্ভব নয়। এমন অবস্থায় কর্ত্তব্যের ডাক এলে ভয়ে পিছিয়ে থাকা কিছু নয়।

তর্জ্জমাটা বোধ হচ্চে হয়নি। যখন ফিরব তখন খোঁজ করব। কবে ফিরবো তা জানিনে।

বৃষ্টিবাদল প্রায় চল্‌চে। বাতাসটা জ্যৈষ্ঠমাসোচিত নয়। আজ বড়ো শ্রান্ত এবং ব্যস্ত। ইতি ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮

রবিকাকা

[৪১]　　　　ওঁ　　　　* "Uttarayan"
Santiniketan
Birbhum

কল্যাণীয়াসু

নববর্ষ ও জন্মদিন মিলিয়ে ফরেন মিনিস্টারের জিম্মে করে যে প্রণাম পাঠিয়েছিলি সেটা আজ পাওয়া গেল। বিশ্বকবি আপাতত ভূলোকেই স্থির হয়ে বসল, নিজের নাম সার্থক

করবার জন্যে দ্যুলোকে উধাও হবার সঙ্কল্প তার নেই। তাড়াহুড়ো গোলমালের মধ্যে ক্ষণকালের জন্যে তোকে দেখ্‌লুম— আসর জমিয়ে বসে গল্প করার সুযোগ হোলো না। এখানে যদি আসিস তাহলে রয়ে বসে বাক্যালাপের চেষ্টা করতে পারি। হয় সঙ্গহীনতা নয় সঙ্গাতিশয্য এই দুইয়ের সীমান্তদেশে আমার গতিবিধি। দাদা যাকে বলতেন মিড্‌লকোর্স্‌ সেটা আমার দুরধিগম্য। ইতি ১লা আষাঢ় ১৩৩৮

রবিকাকা

[৪২] ওঁ পোস্টমার্ক
শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

কাল অর্থাৎ বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণে কলকাতায় পৌঁছব— শুক্রবার ভূপালে যাত্রা করব। যদি বৃহস্পতির বারবেলায় জোড়াসাঁকোয় দেখা করিস সকল কথার আলোচনা হবে। ইতি ৩০ আষাঢ় ১৩৩৮

রবিকাকা

[৪৩] ওঁ পোস্টমার্ক
৭ অক্টোবর ১৯৩১

কল্যাণীয়াসু

তোর এই নাটকটি রঙ্গমঞ্চ অধিকার করবার স্বত্বলাভ করেচে। কেবল প্রথম দুইটি দৃশ্যকে দৃষ্টিগোচর না করে

আভাসে রেখে দিলেই ভালো হয়। তৃতীয় দৃশ্যের মধ্যে সব কথাই রয়েচে। হাল আমলের গানগুলি মানাচ্চে না। হিন্দী ও হিন্দুস্থানী গান দিলে আপত্তির কারণ থাকে না। আমাদের গানগুলো বাদশাহী আমলের সঙ্গে কিছুতেই মিশ খায় না।

আশ্বিন সন্ধ্যাদীপের চারদিকে বিবিধ জাতীয় পতঙ্গের মতো আমার উপর খুচরো কাজের বর্ষণ হচ্চে। সামনের দিক থেকে যদিবা তাড়াই জামার পিঠের মধ্যে গিয়ে ঢোকে ঝাড়া দিলেও বেরয় না। প্রার্থনা করচি ক্ষুদে কর্ত্তব্যের হাত থেকে ত্রাহি মাং নিত্যং।

রবিকাকা

[৪৪] ও পোস্টমার্ক
দার্জিলিং
২৩ অক্টোবর ১৯৩১

কল্যাণীয়াসু

তোরা আমার আশীর্ব্বাদ জানিস। এবার দার্জ্জিলিং পর্য্যন্ত আমাকে ঠেলে তুলেচে। সাধারণত আমার এরকম উন্মার্গগামী স্বভাব নয়— সমতটের মানুষ, গিরিরাজের উত্তুঙ্গ দরবারে মন পালাই পালাই করে। শান্তিনিকেতনে মাঠের ধারে আকাশের দিকে তাকিয়ে পড়ে থাকব বলেই পণ করেছিলুম কিন্তু দেখলুম দেহটাকে একবার কোথাও পালটিয়ে না আনলে দিন মুহূর্ত্তগুলোর বোঝা তার পক্ষে দুর্ব্বহ হয়ে উঠচে। তুই তো জানিস শরীরের নালিশ বেওজরে ডিস্‌মিস্ করে দেওয়াই

আমার অভ্যেস। এবারে সে রকম সরাসরি অবিচার আর চল্‌ল না। তাই রথী যখন পাহাড়ে ওঠার প্রস্তাব তুল্‌লে তখন সেটাকে আর অস্বীকার করতে পারলুম না। এখানে সময়টা ভালো। মাঝে মাঝে মেঘগুলো এসে শিখরে শিখরে আড্ডা জমায় কিন্তু অত্যন্ত সাত্ত্বিকশুভ্রভাবে— শাদা জটাধারী পথিক সন্ন্যাসীর মতো।

অমল এখানে আছে, তোর কর্ম্মকুশলতার উপরে তার অসামান্য ভক্তি। অর্থাৎ সে আবিষ্কার করেচে যে, যে খুসি তোকে খাটাতে পারে যা তা নিয়ে, এবং সে খাটুনিতে কোথাও কিছুমাত্র ত্রুটি ঘটবে না। এ রকম শক্তি থাকাটা দৈবের অনুগ্রহ বলে গণ্য করা চলে না। কুঁড়েমির খ্যাতি আত্মরক্ষার প্রধান সহায়। ইতি বিজয়া দ্বাদশী ১৩৩৮

রবিকাকা

[৪৫] ঔঁ "Uttarayan"
Santiniketan
Birbhum

কল্যাণীয়াসু

তোরা দুজনে আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিস। দিনগুলি ম্লানভাবে চলচে, মন্দগমনে। জীবনের আকাশে আলোটা কমে আসচে, তার কারণ দিন অবসান হয়ে এলো। ছুটির জন্যে মনটা কেবলি উৎসুক হয়, কর্ম্মের জাল কোথাও ফাঁক দিতে চায় না। সত্তর পেরিয়ে গেছে এই সহজ কথাটা

আমার অদৃষ্ট অস্বীকার করে— কেবলি কাজের দায় চাপায়, জীর্ণ কাঁধটাকে দয়া করে না। দেহ মনে উদ্যম গেছে কমে, অথচ বাইরে উদ্যোগ আছে ব্যাপক ভাবে। শক্তির সঙ্গে কর্ম্মের এই বিরুদ্ধতায় আছি পীড়িত। ইতি বিজয়া দশমী ১৩৩৯

রবিকাকা

[৪৬] ও * Uttarayan
Santiniketan, Bengal

কল্যাণীয়াসু

বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে আমাকে কলকাতায় যেতে হবে ডিসেম্বর মাসে। ২২ ডিসেম্বর অর্থাৎ ৭ই পৌষের পূর্ব্বে আশ্রমে ফিরতে হবে। তার পরে পুনর্ব্বার কলকাতায় যাওয়া আমার পক্ষে অসাধ্য হবে। যদি কোনো দুর্যোগে কলকাতায় আমাকে টেনে নিয়ে যায় তবে তোমাদের সভায় উপস্থিত থাকব নতুবা নয়।

'বাণীনন্দিনী' ও 'বীণাবাদিনী' উপাধি দুটি সঙ্গত হবে না। বাণী শব্দে গান বোঝায় না। সরস্বতী যে নামে বাণী সেখানে তিনি বাগ্‌বাদিনী। 'গীতকলিতা' উপাধি চলতে পারে। অর্থাৎ গীতকলাবিশিষ্টা। ওতে দাম্ভিকতাও প্রকাশ হবে না। মেয়েটি যদি বীণা না বাজিয়ে সেতার বা এসরাজ বাজায়, তাহলে তাকে বীণাবাদিনী বল্‌লে বেশি গৌরব দেওয়া হয়। বরঞ্চ তন্ত্রীবাদিনী বা তন্ত্রীকুশলা বলা যেতে পারে। তন্ত্রী

বীণার প্রতিশব্দ, কিন্তু যে কোনো তারের বাজনাকে তন্ত্রী বলা চলে। মেয়েটি যদি বাঁশি বাজায় তাহলে বেণুবাদিনী শোনায় ভালো। 'নিক্কণিকা' যদি পছন্দ হয় তো চলতে পারে। ইতি ৫ অগ্রহায়ণ ১৩৩৯

শুভার্থী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৪৭] ওঁ

*Visva-Bharati
Santiniketan
Bengal

কল্যাণীয়াসু বিবি,

তোরা দুজনে আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিস। পৃথিবীটা এখন বাসযোগ্য নয়, অন্য কোনোখানেও বাসার সন্ধান মিলবে না। বেঁধে মার খেতে হবে। এর মধ্যে একটা সান্ত্বনা এই যে বেঁধে মার খানেওয়ালার সংখ্যার অন্ত নেই। দুর্ভাগ্যের উপর দুশ্চিন্তা যোগ করে ফল কি, তাই ভুলে থাকবার চেষ্টা করি— ভাবনা চিন্তার ভিড়ের মধ্যে একটুখানি ফাঁক করে নিয়ে তার মধ্যে দিয়ে কলম চালাই— বোঝা সম্পূর্ণ হালকা করতে পারিনে বলে কলম চলে খিকিয়ে খিকিয়ে। এর উপর আছে বিশ্বভারতীর দায়। এই আমার অবস্থা। নূতন বৎসরের জীবনযাত্রার পথ কোনো নতুন বাঁক নেবে কিনা জানিনে— না যদি নেয় তো মরার বাড়া গাল নেই। সঙ্গীত সম্মিলনী ইত্যাদি কম্পানিকে দূর থেকে নমস্কার। যে ভিক্ষের ঝুলি নিজের জন্যে বানিয়েছিলুম সেটা সুদ্ধ এরা কেড়ে নিতে

চায়— সেটাকে বারবার ব্যবহার করে ফুটো করে দিলে— শেষকালে হাঁড়িও চড়বে না ঝুলিও চলবে না, দশা হবে কি? এরিয়মের গায়ে হলুদের বাঁশি বাজচে, এই যদি মিলনের ভূমিকার ম্যুজিক হয়, তাহলে এর পরে বাঁশী আমদানি করতে হবে মধ্য আফ্রিকা থেকে। বিয়ে করবে অপরে, আমরা কোনো দোষ করিনি, কিন্তু কান ঝালাফালা হোলো যে। যে দেশের দেবতার কানের কাছে কাঁসর বাজানো হয় সেই দেশেই এমনতর দুঃসহ বর্ব্বরতা সম্ভব। এখানকার কালা দেবতার কাছে আপিল করে ফল পাব না। ইতি বৈশাখ ১৩৪০

রবিকাকা

[৪৮] ওঁ [শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু

বিবি, ছুটির অবকাশে অতিথি অভ্যাগতে আশ্রম পরিপূর্ণ। সকাল থেকে রাত পর্য্যন্ত বাক্যালাপ চলচেই। ফাঁকে ফাঁকে জরুরি কাজও চালাতে হচ্চে। অন্ধ্রবিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করতে হবে ডিসেম্বরের গোড়াতেই, এই গোলমাল ও অনবকাশের মধ্যে সেটাকে খাড়া করতে হবে। এই কাজটার বোঝা অত্যন্ত ভারি। কেননা আমি যে ইংরেজি জানি এ বিশ্বাস আজও আমার মনে পাকা হতে পারেনি। এই সম্বন্ধে আত্মঅবিশ্বাসের একটা গাঁঠ শক্ত হয়ে আছে আমার মনে, ছাড়াতে পারিনে। লেখা আরম্ভের গোড়াতে তার

পীড়নটা প্রবল হয়ে ওঠে, লিখতে লিখতে ভুলে যাই। এ ছাড়া আরো বিস্তর দুশ্চিন্তা ও কাজ জমে আছে।

সুবীরের খবর এদিক ওদিক থেকে পাচ্চি— মনটা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন আছে— এক এক সময়ে দৈবদুর্য্যোগকে মানবার দিকে ঝোঁক যায়। হঠাৎ কেন দুঃখ দুর্বিপাক আসে ঝাঁক বেঁধে ?

আমার আশীর্ব্বাদ নিস। ১৩ আশ্বিন ১৩৪০

রবিকাকা

[৪৯] ওঁ পোস্টমার্ক

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

তোকে বিজয়ার আশীর্ব্বাদ জানিয়ে চিঠি লিখেছি কি না মনেও নেই। কিছুকাল থেকে এত বেশি লোকের ভিড় কাজের ভিড় যে মাথার ঠিক থাকে না— তার উপরে, বাহাত্তর বছর বয়সের মাথাটাও নড়বড়ে হয়ে উঠেছে— ভুল হয় বিস্তর— কিন্তু লোকে বিচার করে সাবেক কালের আদর্শে।

সুবীরের জন্যে মনটা উদ্বিগ্ন হয়ে আছে— আশা করচি আরোগ্যের দিকে এগোচ্চে। তোরা সংসারের দুঃখজালে কী রকম জড়িয়ে পড়েছিস তা বেশ বুঝতে পারি— তাতে মনে কেবল দুঃখই পাওয়া যায়, প্রতিকার করবার শক্তি নেই কারো। এতকাল জীবনের দিনগুলো সুখদুঃখের মধ্যে দিয়ে নানা আঘাত পেয়ে চলেছিল, কিন্তু তবু আলো ছিল— এখন

ছায়া নেমেছে। তাই ছুটির জন্যে মন প্রায়ই ব্যাকুল হয়।

এণ্ড্রুজ এসেচে। কয়েকদিন থাকবে।

কাল পর্য্যন্ত বৃষ্টিবাদল চলেছিল, আজ মনে হচ্চে প্রসন্ন হয়েছে শরতের মুখশ্রী। ইতি ১৬ আশ্বিন ১৩৪০

রবিকাকা

[৫০] ওঁ পোস্টমার্ক

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

১৩ই জানুয়ারিতে এখানে এসে সাতদিন থাকবার সঙ্কল্প করেছিস্। সঙ্কল্প যার সাধু তার একমাত্র সহায় বৌমা এমন সংস্কার কী করে তোকে পেয়ে বসল বুঝতে পারিনে। বৌমা কিছুকাল থেকে সংসার ছেড়ে জগন্নাথধাম আশ্রয় করেছেন তবুও তো আমাদের জীবিকা নির্ব্বাহ চলচে। স্পষ্ট দেখা যাচ্চে তোর মন থেকে পৌত্তলিকতা এখনো দূর হয়নি, লক্ষ্মীর অশরীরী আবির্ভাবের 'পরে এখনো তোদের আন্তরিক শ্রদ্ধা নেই। বৌমাকে এমন স্থূলভাবে দেখিস্‌নে— তাঁর সূক্ষ্ম সত্তা উত্তরায়ণের ভাঁড়ার ঘর থেকে শোবার ঘর পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে— তাঁর অভাব তোদের চোখে ঠেকবে কিন্তু অশনে আসনে আরামে বিরামে ঠেকবে না বলে বিশ্বাস করি নইলে তাঁর মাহাত্ম্য কিসের? নইলে এ কয়দিন আমাদেরও

তো ৺পুরীধামে জগন্নাথ দেবের শরণ নিতে হোতো।...ইতি ৭ জানুয়ারি ১৯৩৪।

রবিকাকা

[৫১] ওঁ পোস্টমার্ক

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

বিবি এইমাত্র প্রমথর চিঠি আমাকে চেতিয়ে দিয়ে গেল যে আমার কাছে তোর একটা উত্তর পাওনা বাকি আছে। আর একটা প্রমাণ, আমার বয়স হয়েচে। আমার মনের প্রথম দেউড়িতে বসে বসে দাড়ি পাকায় প্রবীণ কুঁড়েমি। সেটা কোনোমতে পেরিয়ে গেলে দেখা যাবে থানা দিয়ে বসেছে বিস্মৃতি। চিঠি হাতে এলেই কর্ত্তব্যপরায়ণ মন বলে উত্তর দেব, তার পরে বলি কাল দিলেই হবে, সেই কাল-পরম্পরা এগোতে থাকে, অবশেষে সেটা উল্টিয়ে পড়ে বিস্মৃতির অন্ধকূপে।

মিস আঢ্যকে গান শেখানো আমার কর্ম্ম নয়, প্রথম কারণ সময় নেই (সম্পূর্ণ সত্য নয়), দ্বিতীয় কারণ নিজের কোনো গানই আমার জানা নেই। অতএব এ ক্ষেত্রে দিনুই অগতির গতি। দিনু এখন কলকাতায়।

তার পরে এখানকার ছাত্রীবিভাগের অধিনায়িকা। তুই যে আধা-ডাক্তারনীর কথা লিখেছিলি খাপ খাবে কিনা বুঝতে

পারা গেল না— জানা লোকের জানাশোনা মানুষ যদি হোতো বিচার করা যেত— তার পরে বেতনের সমস্যা। অন্নে পেট ভরবে কি না সন্দেহ করি। আপাতত স্থির করেছি, সুধা— প্রভাতকুমারের স্ত্রী— সীতানাথ তত্ত্বভূষণের কন্যা— তাঁকেই ঐ পদে অধিষ্ঠিত করব— রাতের বেলায় মেয়েদের আগলাবার জন্যে কিঞ্চিৎ সস্তা দামে কোনো ভদ্র মেয়েকে সুধার সহকারিণীরূপে রাখব। এই শেষোক্ত মহিলাকে কোনো সেকেণ্ডহ্যাণ্ড বাজারে সন্ধান করতে হবে— অর্থাৎ এমন কোনো বিধবা মানুষ, যিনি সংসারযাত্রা একদফা সেরে এসেছেন। ভদ্রঘরের মেয়ে দুঃখে পড়েচেন, লেখাপড়া জানেন, কাজেকর্ম্মে পটু এই দুর্দ্দিনে নিঃসন্দেহই এমন লোক অনেক আছেন।

কলকাতায় পৌঁছব বুধবারে, তার পরে মোকাবিলায় তোর সঙ্গে কাজের অকাজের সব কথা হবে। প্রমথকে বলিস আমার সেই চিঠি বিচিত্রাতে দিলে দোষ নেই— ওরা ভালোমানুষ লোক।

মধ্যাহ্নভোজনের আয়োজন অদূরবর্ত্তী ঘরে, তার গন্ধ আসচে— তার উপরে আমার নাৎনি এসেছেন তাগিদ করতে— অতএব অর্দ্ধ ভোজনের উপরে আরো কিছু এগিয়েচে— অতএব ইতি ১ এপ্রেল ১৯৩৪

রবিকাকা

[৫২] ওঁ * "Uttarayan"

Santiniketan, Bengal.

পোস্টমার্ক শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

নববর্ষের আশীর্ব্বাদ। এদিক ওদিক থেকে বুবুর খবর পাচ্চি শুনচি এখন তার শরীর ভালোর দিকেই। কাল পুপু টেবিলে বসে খাচ্ছিল— হঠাৎ পাখাটা ঘুরতে ঘুরতে সেই টেবিলে পড়ে গেল, পুপু সময়মতো সরে যেতে পেরেছিল বলে বেঁচে গেছে। আমরা অসংখ্য প্রচ্ছন্ন অপঘাতের একচুল তফাৎ দিয়ে যাতায়াত করি— এক নিমেষের মধ্যেই হাঁ-এর ডাঙা থেকে না-এর গর্ত্তে পড়বার আশঙ্কা অহোরাত্রই আছে। ইতি ৩ বৈশাখ ১৩৩৪

রবিকাকা

[৫৩] ওঁ পোস্টমার্ক

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

বিবি, বর্ষামঙ্গলে হুড়মুড় করে বৃহৎ একদল লোক এসে পড়চে, তার মধ্যে ঠেকাবার মতো মানুষ প্রায় কেউ নেই। তোরা এলে স্থানাভাবের সমস্যা প্রবল হবে, এবং তোরা কষ্ট পাবি। এমনিতেই যাঁরা আসচেন তাঁদের আরামের

ব্যবস্থা দুশ্চিন্তার বিষয় হয়ে উঠেছে। বাইরের লোককে রথীরা সহজে ঘরের মধ্যে ভিড় করতে দেয় না— কিন্তু সে নিয়ম অগত্যা ভাঙতে হয়েচে। কিন্তু তাই বলে এখানে তোদের আসাটা সম্পূর্ণ বাধা পাবে এ কথা মনে করতে একটুও ভালো লাগচে না। বারোই অগস্ট পর্য্যন্ত এখানে গোলমাল। তেরই থেকে শান্তিঃ শান্তিঃ। সেই শান্তিপর্ব্বে যদি আসতে পারিস তাহলে খুব খুসি হবো এবং দেশ ও কালের সঙ্কীর্ণতা নিয়ে তোদেরও ক্লিষ্ট হতে হবে না। সময়টা সুখসেব্য, এখানকার আকাশে প্রান্তরে বর্ষার পরিপূর্ণ সমারোহ— অথচ এ পর্য্যন্ত ধারাবর্ষণে অত্যাচার নেই, মিতাচারই দেখা যাচ্চে। ইতি ৭ অগস্ট ১৯৩৪

রবিকাকা

[৫৪] ওঁ * "Uttarayan"
Santiniketan, Bengal.
পোস্টমার্ক শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

বৌমার শরীর অসুস্থ। হাওয়া বদলের জন্যে পশু´ যাবেন ওয়াল্‌টেয়রে। গৃহনিরীশ্বরী ঘরে আতিথ্যের ত্রুটি হবে। আমি যাত্রা করব ১৯শে তারিখে। ইতিমধ্যে রিহার্সালের তাগিদ প্রবল। ব্যতিব্যস্ত হয়ে আছি। ফিরে

আসি তার পরে দেখা দিস্। মন্দিরাকে জানি। কিন্তু বিলম্ব হয়ে গেছে। অল্প কয়দিনে সে শিখতে পারবে না। কাজ চালাবার মতো লোক এখান থেকেই সংগ্রহ হয়েচে। ইতি সোমবার

রবিকা

[৫৫] ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

মাদ্রাজ যাত্রার উপক্রমণিকা চল্‌চে। তার উপরে নানাবিধ খুচ্‌রো কাজ। চারিদিকেই ছুটি, কেবল পূজোর দালানের পথযাত্রী গলায় দড়িবাঁধা ছাগল এবং রবীন্দ্রনাথের ছুটি নেই। শরতের রৌদ্র দুচারদিনের জন্যে দেখা দিয়ে মন ভুলিয়ে মেঘের নেপথ্যে নিরুদ্দেশ হয়েচে। দুদিন উর্দ্ধশ্বাসে বৃষ্টি বাদল চলল, আজ তারি অবশেষরূপে অবসাদগ্রস্ত বর্ষণ-বিহীন মেঘের ছায়া।

আমি ১৯শে তারিখে এখান থেকে বেরিয়ে পড়ব। বেলা আড়াইটায় পৌঁছব কলিকাতা মহানগরীতে। সেই দিনই গোধূলি লগ্নে যাত্রা করব দক্ষিণাপথে। তারপর অক্টোবর মাসের শেষদিন পর্য্যন্ত এন্‌গেজমেণ্টের আবর্ত্ত। আয়ুর কোঠায় সাতটা দশক পেরিয়েছি কর্ম্মস্থানে তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যাচ্চে না— আমার জন্মের লগ্নাধিপতিকে কর্ম্মের লগ্নাধিপতি স্পর্দ্ধার সঙ্গে প্রতিবাদ করচে। বারবার

মনে মনে সংকল্প করি এইবারে হাতিয়ারগুলোকে বর্জ্জনাগারে তালা-বন্ধ করে হাতটাকে খোলসা করব। কিন্তু কৌতুকপ্রিয় ভাগ্যের ফরমাস আরো যেন বেড়ে ওঠে। হার মেনেছি।

বৌমা ওয়ালটেয়রে— ভালোই আছেন। মাদ্রাজের দলে যোগ দেবেন কিনা নিশ্চিত জানিনে। রথীই বলো বৌমাও বলো এঁরা জীবন্মুক্ত, ইচ্ছাধীন এঁদের কর্ম্ম— আমারই কেবল মুক্তি নেই, তাঁরা অনায়াসেই বল্‌তে পারেন, যাব না, করব না বা মাঝ আসরে উঠে পালাব— আমার তা বলবার জো নেই, আমি বদ্ধ জীব। তোরা আমার আশীর্ব্বাদ জানিস। ইতি ১৭ অক্টো ১৯৩৪

রবিকাকা

[৫৬] ওঁ [শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু

...গান দেখলুম। কিছু বল্‌তে ভরসা হয় না, পাছে আমার বাক্য ওর গানেরই মতো অশ্রাব্য হয়ে ওঠে। ফলের মধ্যে যে শাঁস অংশ থাকে তারই মোরব্বা চলে, আঁঠির মোরব্বা অচল। কঠোর তত্ত্বকথা সুরের রসে পাক করলেই যদি গান হোত তাহলে Kantকে Beethoven তাঁর সিম্ফনিতে গালিয়ে নিতে পারতেন। যাই হোক্ একটা কথা মনে রাখিস, "সর্ব্বং খলু ব্রহ্ম" এ মত আদি বা সাধারণ বা কোনো ব্রাহ্ম-সমাজেরই নয়। এ যদি এগারই মাঘে চালাস্ তাহলে শ্যামা

মাকে ব্রহ্মময়ী সম্বোধন করে রামপ্রসাদের গানও চালাতে পারিস। ব্যক্তিগত দিক থেকে আমার এ সমস্ত কিছুতেই আপত্তি নেই কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের বুকে বসে দাড়ি উৎপাটন অমার্জ্জনীয়। "সর্ব্ব জীবে আছ ব্রহ্ম" বল্লে দোষ খণ্ডন হয়— হয়তো "সর্ব্বগত ব্রহ্ম" ছন্দে মিলতে পারে— মিলুক বা না মিলুক্ সর্ব্বং খলু ব্রহ্ম কোনোমতেই যেন ব্যবহার না করা হয়— মনে রাখিস্ বাবামশায় থাকলে তিনি কিছুতে এ সহ্য করতেন না।

"যদি প্রেম না দিলে প্রাণে" ছোটমেয়েকে দিয়ে গাওয়াতে দোষ নেই। কণ্ঠের যোগ্যতা ছাড়া আন্তরিক যোগ্যতা বিচার করে গান গাওয়াতে গেলে অধিকাংশ গানই অধিকাংশ লোককে দিয়ে গাওয়ানো চলে না।

গানের কাগজে রাগরাগিণীর নাম নির্দ্দেশ না থাকাই ভালো। নামের মধ্যে তর্কের হেতু থাকে, রূপের মধ্যে না। কোন্ রাগিণী গাওয়া হচ্চে বলবার কোনো দরকার নেই, কী গাওয়া হচ্চে সেইটেই মুখ্য কথা, কেননা তার সত্যতা তার নিজের মধ্যেই চরম, নামের সত্যতা দশের মুখে, সেই দশের মধ্যে মতের মিল না থাকৃতে পারে। কলিযুগে শুনেছি নামেই মুক্তি, কিন্তু গান চিরকালই সত্যযুগে। আর কিছু বক্তব্য নেই। ইতি ১৩ জানুয়ারি ১৯৩৫

রবিকাকা

ওঁ

পোস্টমার্ক
শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

আমাদের এখানে একটি সঙ্গীত বিভাগ আছে, বলা-বাহুল্য সেটা নীরব নয়। ভালোই চলচে। সেখান থেকে আমার কাছে আবেদন এসেছে নিম্নলিখিত বইগুলির জন্যে—

স্বরলিপি গীতিমালা।

জ্যোতিদাদার সঙ্কলিত রবীন্দ্রনাথের ৬৮ গানের স্বরলিপি।

আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা।

শতগান।

কাঙালীচরণের ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরিলিপি।

পাই যদি তবে যথোচিত ব্যবহারে লাগবে। বইগুলি তোর অধিকারভুক্ত অথবা আয়ত্তগম্য কিনা জানিনে। পাই যদি খুসি হব, নইলে এ সম্বন্ধে কিছু গবেষণা করে জানাস।

মাঝে আমার গ্রহ আমাকে একবার ঘুরপাক খাইয়ে এনেছে। মাঝে মাঝে দুটো একটা শরীরযন্ত্র বেঁকে দাঁড়িয়েছিল। তাদের অপরাধ নেই। যদি তাদের জেদ শেষ পর্য্যন্ত বহাল থাকত তাহলে অস্বাস্থ্যের দোহাই দিয়ে ছুটি দাবী করতে পারতুম। ছুটির জন্যে মনটাও উৎসুক আছে। কিন্তু মুস্কিল এই যে আমার শরীর যতই বিগড়ে যাক্ অনতিবিলম্বে সেরে উঠতেও ত্রুটি করে না। এতে করে অস্বাস্থ্য সম্বন্ধে আমি লোকের শ্রদ্ধা এবং সহানুভূতি সম্পূর্ণ হারিয়েছি। ইস্কুল-পালানে আমার ধাত,— ছেলে বেলায়

ক্লাস ফাঁকি দেবার চেষ্টায় শরীরকে যোগ দেবার জন্যে অনেক সাধনা করেছি, কিছুতে তাকে রাজি করতে পারিনি। এখন মাঝে মাঝে রোগের লক্ষণ দেখা দেয় কিন্তু আরোগ্যের শক্তির কাছে তারা টেঁকে না। অথচ আত্মীয় স্বজনের মধ্যে বেশ উচ্চ শ্রেণীয় honest রকমের ব্যামো সর্ব্বদাই দেখতে পাচ্চি। এর থেকে বেশ বুঝতে পারচি আমাকে খাটিয়ে মারবে শেষদিন পর্য্যন্ত, ব্যামোয় মারার চেয়ে সেটা কম কিসের ?

তোদের অনেক দিন দেখিনি। দেখতে ইচ্ছে করে। তার কারণ, জীবন আকাশের আলো ম্লান হয়ে এসেচে— এখন মনের সব বিক্ষিপ্ত ভাবনাগুলো যেন গোষ্ঠে ফেরবার মুখে— বাইরের দিকটা অবরুদ্ধ হয়ে আসচে। এই অবস্থায় নিজেকে একলা মনে হয়। এ জন্মের যাত্রাপথের যারা সঙ্গী ছিল তারা অনেকেই নেই— নতুন যারা কাছে এসেছে জীবনের শেষপ্রান্তের সঙ্গে তাদের যোগ— এই প্রান্তটি সঙ্কীর্ণ এবং ক্রমেই ক্ষীণতর হয়ে আসচে। চেষ্টা করচি অন্তরের দিকে নতুন পালা আরম্ভ করতে— সেটা উত্তর অয়ন পেরিয়ে উত্তরতর অয়ন।

নব বর্ষ আসন্ন। রথী বৌমারা সমুদ্র পারে। একটি নাবালক অভিভাবক আমার আছে— পুপে। পশু´ মীরাও এসেচে।

খুব গরম পড়ে আসচে তাই তোদের আসতে বলতে সঙ্কোচ বোধ করচি। আমি নিজে গরম সম্বন্ধে অসহিষ্ণু নই। পঁচিশে বৈশাখের নিমন্ত্রণে এসেছি জগতে।

একটা মাটির ঘর বানাতে লেগেছি। জন্মদিনের মধ্যে সেটা শেষ হবে বলে কথা আছে। সেই সময়ে ঐ ঘরে প্রবেশ করব, তার পরে শেষ পর্য্যন্ত আর বাসা বদল করব না এই আমার অভিপ্রায়। ইতি ৭ এপ্রেল ১৯৩৫

রবিকাকা

[৫৮] ওঁ [শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু

কাল ভোরের গাড়িতে কলকাতায় যাচ্চি। তাই আর বেশি কিছু লিখব না— শরীর ক্লান্তিতে অবসন্ন।

গানের বই ও পত্রিকাগুলি পেয়ে খুব খুসি হয়েছি— কাজে লাগবে।

ধুমধাম হয়ে গেল এক চোট। জনসাধারণের মাঝে মাঝে খেলা করবার সখ মেটাবার জন্মে জ্যান্ত পুতুলের দরকার করে এই সখের জোগান দিয়েছি আমি— কিন্তু বড়ো ক্লান্তিকর। ইতি ২৭ বৈশাখ ১৩৪২

রবিকাকা

বিবি,

রাগিণী দেবীকে যদি সাহায্য করতে পারিস তো ভালো হয়। গোপীনাথের নাচ দেখে মুগ্ধ হয়েছি। তুই একজন

বাঙালী মেয়েকে যদি এঁদের কাছে তৈরি করতে দিস তাদের খুবই উপকার হবে। এঁরা তাদের দেশে বিদেশে নিয়ে যেতে পারবেন। এঁরা ভদ্র।

রবিকাকা

[৫৭] ওঁ "Uttarayan"
Santiniketan, Bengal
পোস্টমার্ক
শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

পূজার ছুটিতে কোথাও নড়িনি যেহেতু নড়বার শক্তি অজস্র নয়। বাগানে বেড়াবার ইচ্ছে আছে কিন্তু কটিদেশ হয় বিমুখ। দেহের সেই মধ্যবিভাগে আজকাল অতিনীলিম রশ্মিপাত করে থাকি— কিছু ফল পেয়েছি। পত্রযোগে শরীর সম্বন্ধে আলোচনা করিনে বলে আক্ষেপ করেছিস। বুলেটিন বের করতুম, যদি তার দুঃখাণি চ সুখানি চ চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে হোত। ওর পতন চলেছে পরিণত বয়সের ঋজুরেখা ধরে, অত্যন্ত একঘেয়ে ভাবে। উদ্বেগের মধ্যেও উপাদেয়তা থাকে যদি সংবাদের মধ্যে উঁচুনিচুর বৈচিত্র্য মেলে। তোর পা-ফোলার খবর পেয়ে নিজের পায়ের কথা মনে পড়ে। প্রায়ই তো হোত— ওটা ছিল ক্লান্তির সহচর— রক্তপ্রবাহের ক্ষীণতায় ওর উদ্ভব। আজকাল প্রায়ই আরামকেদারায় উত্তানভাবে কাল কাটাই, পা দুখানার অধোগতি যথাসম্ভব বন্ধ আছে। সেটাতে কাজকর্ম্মেরও বহর কমে পায়েরও।

বৌমা চলে গেলে দিনগুলো শ্রীহীন হয়ে পড়ে, ভালো লাগেনা। তিনি থাকলেও দেখাশুনো বেশি হয় না, তবু তাঁর প্রভাবটা থাকে হাওয়ায়। স্টীমার যোগে গঙ্গা বেয়ে পশ্চিমে গেলে কেমন হয়? মনটা সেই পথে যাব যাব করছে— কিন্তু পথটা তো ধ্যানের পথ নয়— অতিক্রম করতে আয়োজন দরকার। অতএব—

শুক্ল দ্বাদশী আশ্বিন ১৩৪২

রবিকাকা

[৬০] ওঁ

"Uttarayan"
Santiniketan, Bengal.
পোস্টমার্ক শান্তিনিকেতন
২ জুন ১৯৩৬

কল্যাণীয়াসু

দিনুর সাম্বৎসরিক উপলক্ষ্যে গীতসূচি সম্বন্ধে আমার পরামর্শ চেয়েছিস। অক্ষম আমি। বাছাই করা যাচাই করা কাজে আমার বুদ্ধি খোলে না। আজকাল সকল বিষয়েই বুদ্ধিটা চাপাই আছে। তুই যে সূচি বানিয়েছিস সেইটে সম্পূর্ণ সমর্থন করাই আমার পক্ষে সম্পূর্ণ আরামের। খুকু আছে অনাদি আছে তাদের মন্ত্রণা আমার পরামর্শের চেয়ে অনেক বেশি কাজের হবে। নিজের গান সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা সব চেয়ে কম এ কথাটা জগদ্বিখ্যাত। এই নিয়ে আমার মুখের সামনেই সুকুমারমতি বালক বালিকারা হাস্য সম্বরণ করতে পারে না। আমার গানের

প্রসঙ্গ উঠলে আমি সঙ্কুচিত হয়ে থাকি। তাই তোর চিঠি পড়ে গর্ব্ব অনুভব করেছি। দেখতে পাচ্চি আমার পরে এখনো তোর শ্রদ্ধা আছে— তার কারণ আমার উত্তরকাণ্ডে তোর পরিচয় অল্পই— তুই জানিস্‌নে আমার মাথা থেকে গীতরূপিণী সীতা গেছেন বনবাসে।— আমার আধুনিক গানে রাগ তালের উল্লেখ না থাকাতে আক্ষেপ করেছিস। সাবধানের বিনাশ নেই। ওস্তাদরা জানেন আমার গানে রূপের দোষ আছে, তারপরে যদি নামেরও ভুল হয় তাহলে দাঁড়াব কোথায়? ধূর্জ্জটিকে দিয়ে নামকরণ করিয়ে নিস।

ঝড় বৃষ্টি চলচে। জ্যৈষ্ঠমাসটা ঠাণ্ডা মেজাজেই আছে— ভাগ্যে শিলঙে যাইনি— কথা উঠেছিল। ইতি বোধ হয় ২০ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩

রবিকাকা

[৬১] ঁ পোস্টমার্ক

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

গাইয়ে একজন না হলে লজ্জা রক্ষাও হয় না, কর্ত্তব্যপালনও বন্ধ। যখন বিপন্ন হয়ে তোর শরণাপন্ন হলুম তখন বড়ো আশা ছিল একটা কিনারা হবেই। কারণ দেখে আসচি যার যা কিছু প্রয়োজন তার উদ্ধার করবার ভার তোর উপরেই পড়ে, আর তুইও একটা গতি না করে ছাড়িস্‌নে। আমাদের

বেলাতেই তোর সঙ্কটতারিণী নামে যেন কলঙ্ক না পড়ে। একবার গোঁপেশ্বরকে নাড়া দিয়ে দেখলে কেমন হয়?

খুব উঁচুদরের লোক চাইনে। তারা হজমের যোগ্য নয়। সাধারণ জাতের মানুষ পেলেই আমাদের মতো অভাজনদের চলে যাবে। অর্থাৎ যে ব্যক্তির শ্রবণেন্দ্রিয়ের অভাব নেই। মা এবং ধা-এর প্রভেদ ধরতে পারে, রামকেলীর সঙ্গে খাম্বাজের পার্থক্য কী বুঝতে কষ্ট হয় না। এবং কণ্ঠস্বরটা ফৌজদারী মামলার বিষয় হয়ে না ওঠে— তা ছাড়া সঙ্গীতের মধ্যেই যে স্বাভাবিক মদিরতা আছে তার বাইরে আর কোনো-রকম মাদকতার প্রয়োজন যার নেই। চলনসই লোক পেলেই আমরা খুসি হব। দোহাই তোর, একবার চারদিকে হাৎড়ে দেখিস্— দিন চলে যাচ্চে বৃথা।

বর্ষামঙ্গলের আয়োজনে ব্যস্ত আছি। যথাসময়ে পরিচয় পাবি। ইতি ৪ ভাদ্র ১৩৪৩

রবিকাকা

[৬২] ওঁ "Uttarayan"
Santiniketan, Bengal.
পোস্টমার্ক শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

তোর অন্তঃশীলার বিচার লেখাটি পড়ে খুব ভালো লাগল। ইংরেজি ভাষায় এই রকম লেখাকেই বলে সমুজ্জ্বল। এই

সংখ্যার চিত্রালিতেই কোনো তত্ত্বজ্ঞানী কোনো নভেলের যে সমালোচনা করেচেন, সেই লেখার আবিলতার সঙ্গে তোর রচনার দীপ্তির তুলনা করলে সেই পণ্ডিতের প্রতি কৃপা জেগে ওঠে মনে।

কল্যাণ এখানে এসেছিল। বৌমা ছিলেন না রথী ছিলেন না— আমি গৃহধর্ম্মপালনে অপটু, অন্যমনস্ক— ভাণ্ডার এবং পাকশালার রহস্যে আমার প্রবেশাধিকার নেই— জানিনে তোর কাছে কিরকম রিপোর্ট গিয়েছে। যত্ন করিনি এমন অপবাদ দিতে পারবে না— কিন্তু যত্ন করা এক, আর পরিতৃপ্তি সাধনা করা আর— শেষোক্তটার জন্যে নৈপুণ্যের প্রয়োজন করে, আমার সেটাতে অভাব আছে, এজন্যে আমি ক্ষমার্হ। ইতি ৮ আশ্বিন ১৩৪৩

রবিকাকা

[৬৩] ঙ

Visva-Bharati
Santiniketan, Bengal.
পোস্টমার্ক শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

বিজয়ার আশীর্ব্বাদ। বৌমা পুরীতে, রথী কলকাতায় বোটে, আমি শান্তিনিকেতনে। ছাত্র ছাত্রীরা যে যার আপন আপন বাড়িতে। কেবল এখানকার গাছপালাগুলি ছুটি নিয়ে হাওয়া বদলাতে যায়নি— দীর্ঘকাল ধারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল,

এখন হেমন্তের সূর্য্যকিরণে রোদ পোহাচ্চে। ওরা যে সৌন্দর্য্য বিকাশ করেছে তার জন্যে অভিমত দাবী করে না—ওদের পত্রগুলি foreword লেখবার জন্যে অনুরোধ পাঠায় না, ওদের মর্ম্মরধ্বনির প্রত্যুত্তর প্রত্যাশা নেই কোনোখানে। ওরা ছুটির আয়োজন চারদিকেই সাজিয়ে রেখেছে, কাজেই গাড়ি ভাড়া দিয়ে রাঁচিতে যাবার জরুর বোধ করচিনে।
বিজয়া দশমী ১৩৪৩

রবিকাকা

[৬৪] ওঁ * "Uttarayan"
Santiniketan, Bengal.
পোস্টমার্ক শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

ভয় করিসনে। গোপাল মারা গেছে ১১ই মাঘ সহমরণে যায়নি। তোরা ওখানে সবাই মিলে গান ঠিক করে নিস্। ক্ষিতিবাবুকে পাঠিয়ে দেব বেদী অধিকার করবার জন্যে। নেপথ্য থেকে যা করবার রথী করবে। আমার এখানে ১১ই মাঘ উৎসব আছে, এখানকার অনুষ্ঠান আমাকেই সম্পন্ন করতে হয়। ইতি ৮।১।৩৭

রবিকা

[৬৫] ওঁ * "Uttarayan"
Santiniketan, Bengal.
পোস্টমার্ক শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

আমার নববর্ষের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। কিছুদিন থেকে আমার শরীর ভালো ছিল না। কিন্তু সেটা ঘোষণা করবার মতো সংবাদ নয় বিশেষত বয়সটা যখন আশির দিকে ভাঁটিয়ে চলেছে। যে কথাটা জানাবার সে হচ্চে এই যে নববর্ষের দিন নানাদিক থেকে সুসম্পন্ন হয়েছে— ভাগ্যক্রমে অনুষ্ঠানের জন্যে শরীরে শক্তি ছিল। তোরা আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিস, নলিনীকেও আশীর্ব্বাদ জানাস্। ইতি ৩ বৈশাখ ১৩৪৪

রবিকাকা

[৬৬] ওঁ * "Uttarayan"
Santiniketan, Bengal.
পোস্টমার্ক আলমোরা

কল্যাণীয়াসু

দুঃখকর পথে জীবনীশক্তির অনেকখানিরই অপব্যয় হয়েছিল। এখানে আসার পর ক্ষতিপূরণ হয়েও কিছু উদ্বৃত্ত জমা হয়েছে বলে বোধ হচ্চে। আমার সঙ্গে

ঋতুরঙ্গনাথের একটা যেন ঠাট্টার সম্পর্ক আছে। এখন শুকনোর সময়, তারই উপর বিশ্বাস রেখেছিলুম। শীতের সঙ্গে অল্প একটু গরম মিশোল থাকলে সেটা হয় আরামের—যেন উমার সঙ্গে মিলনে শিবের তপস্যার অবসান। আমি আসার পরেই বর্ষা নামলো অসময়ে—বর্ষামঙ্গলের উল্টো পালা গাইতে ইচ্ছে হচ্চে। আর যাই হোক সকলের শরীর আছে ভালো। বাড়িটা বড়ো, জায়গাটা নির্জ্জন, অভিনন্দনের বালাই নেই। জন্মদিনে রথীরা দিশি বিদেশী স্থানীয় লোকদের চা-পান সভায় মিষ্টান্ন ভোজে নিমন্ত্রণ করেছিল। আমার ইংরেজি কবিতা কিছু আবৃত্তি করতে হোলো। জন্মদিনের ফাঁড়া অল্পের উপর দিয়েই কেটে গেছে। খবর বিশেষ কিছুই নেই সেইটেই ভালো খবর। ইতি ২৮ বৈশাখ ১৩৪৪

রবিকাকা

[৬৭] ওঁ "St. Marks"
Almora, U. P.

কল্যাণীয়াসু

এখানে আমি যে শুধু বিশ্রাম করচি তা নয়। বস্তুত বিশ্রামের অংশটাই সব চেয়ে কম। নানাবিধ কাজ চেপে বসে যখন পাওয়া যায় অবসর, হাওয়া হাল্কা হলেই চারদিক থেকে ধেয়ে আসে ঝড়। বিদেশী গল্পের ভূমিকায় গীতিনাট্য লিখব সে রকম তাগিদ নেই মনের মধ্যে। লেখবার ফরমাস

অনেকগুলো আছে। সবগুলিই রয়েছে শিকেয় তোলা। অথচ লেখা চলচে পুরো দমে। এই কর্ত্তিকাগুলো জমিয়ে কেবল তুই জমা করবার প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দিচ্চিস্— কাজে কি লাগবে। দিন চলচে ভালোই, মাঝে গিয়েছিল ঝড়বৃষ্টি, গেছে কেটে, আজ মুহূর্ত্তের জন্যে ভূমিকম্প অনুভব করেচি। ইতি
৩০ মে ১৯৩৭

রবিকাকা

[৬৮] ওঁ পোস্টমার্ক

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

স্বয়ং প্রোৎসাহক উৎসাহপ্রার্থী। গানগুলি সবই নতুন, এখানকার ছেলেরা মেয়েরা শিখেছে। ভাবনার কারণ হচ্চে এই যে, ছায়ার প্রেক্ষাশালা খুব বড়ো। পাছে যথেষ্ট বলবান কণ্ঠের অভাবে না জমে এই ভয় কেউ কেউ প্রকাশ করচেন— সেইজন্যে গলা খুঁজচি। শুধু গলা হলেই হবে না, শেখা চাই। নতুন গান খুব সহজ নয়— মেধা এবং অধ্যবসায়ের একত্র সম্মিলন হলে সবই সম্ভব। খুব বেশি লোক হলে শিখিয়ে তোলা শক্ত হবে। গানের হট্টগোল শ্রোতার কাছে সুখশ্রাব্য হবে না সে কথা বলা বাহুল্য। চার পাঁচটি বাছাবাছা গলা পেলেই সাম্প্রতিক অভাব মোচন হবে। বেবি একটি খুব সুকণ্ঠিনীর কথা বলেছে তাকে পাওয়া যাবে, তাকে দিয়ে একক গান চল্‌বে।

সেই শ্রেণীর আরো দুটি একটিকে পাওয়া যেতে পারে। আমি যাচ্চি পর্শু অর্থাৎ ২৬শে তারিখে প্রাতের গাড়িতে। পৌঁছব অপরাহ্ণে। সেইদিনই তোর সঙ্গে পরামর্শ করে দেশকালপাত্র পাকা করা যাবে। সময় এত অল্প যে হাৎড়ে বেড়াবার মতো মার্জ্জিন পাওয়া যাবে না। শেখবার স্থান জোড়াসাঁকো, সময় তোদের বিচার্য্য, পাত্র অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন সময়েরও ব্যবস্থা হয়ত করতে হবে— বিশেষত একক-কণ্ঠীদের স্বতন্ত্র সময় দেওয়াই চাই। যানবাহনের জোগান দেব। উৎসবের দিন স্থির হয়েছে ৪ঠা এবং ৫ই। ছায়া প্রেক্ষাগৃহ তোর বোধ হয় জানা আছে, এবারে রবির সম্মিলনে সেটা হবে রবিচ্ছায়া। লোকের মুখে তোর সহায়তা কামনা করেছিলুম তার প্রধান কারণ বয়োধর্ম্মসুলভ জড়তা। দিনে দিনে সেটা সুগভীর হয়ে উঠেছে। এই চিঠি লিখ্‌তে বসার পূর্বে অনেকক্ষণ বারান্দায় বসে পা দুলিয়েছি। ২৬ শে পৌঁছব কলকাতায়, দিনান্তে চলে যাব প্রশান্ত নিকেতনে, তৎপূর্বে তোর সঙ্গে মন্ত্রণা আবশ্যক, এবং তার পরদিন থেকেই কাজ। ইতি ২৪।৮।৩৭

রবিকাকা

২৭ শে যাওয়াই স্থির ২৬ শে নয়। ইতিমধ্যে তুই খোঁজখবর নিয়ে প্রস্তুত থাকতে পারিস।

[৬৯] ওঁ * "Uttarayan"
Santiniketan, Bengal.
[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু

আমার উপরে বিশ্বাস স্থাপন করলে নিরাশ হবি না। ছায়ায় চণ্ডালিকা অভিনয়স্থলে আমি উপস্থিত থাকব না প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। কিন্তু সমস্ত কলকাতা তো ছায়ারঙ্গভূমির অন্তর্ভুক্ত নয়। রবির উপর ছায়াপাতকে বলে সূর্যগ্রহণ— আমার এবারকার পঞ্জিকায় সে লগ্ন নেই। আমি অক্ষুণ্ণ আয়ু নিয়েই স্বক্ষেত্রে বিরাজ করতে পারব।— প্রমথর অভিভাষণ প'ড়ে দেখেছি— ভালোই লেগেছে— ওর দুর্বল কণ্ঠের বাহন ওর প্রবল লেখনী— তাই ধ্বনির অবস্থা যেমনি হোক্— ওর বাণীর দৌড়ে বেগ কম হয়নি। গেল ১১ই মাঘের অন্তে…দুটি গানের মধ্যে একটি প'ড়ে নীলরতন ডাক্তারকে খবর দেবার দশা হয়েছিল।

রবিকাকা

[৭০] ওঁ * "Uttarayan"
Santiniketan, Bengal.
পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

আমার কলকাতায় যাওয়ার বিরুদ্ধে তোদের আগ্রহ দেখে সে সঙ্কল্প ত্যাগ করলুম। কিন্তু তার পরিবর্তে তোর কাছে আমার এই প্রস্তাব পাঠাচ্ছি যে তোরা কয়েকদিন এখানে কাটিয়ে যাবি। অনেকদিন তোদের কাছে পাইনি। এখানকার

হাওয়ার মেজাজ সম্প্রতি অত্যন্ত প্রতিকূল নয়। দোলের দিনে আমাদের বসন্ত উৎসব। ইতি

রবিকাকা

[৭১] ওঁ [শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু

কী হোলো বুঝতে পারা গেল না। বিশুদ্ধ পঞ্জিকা মতে গত কাল গেছে মঙ্গলবার। সকালে উঠে ভাবলুম প্রতিশ্রুত পত্র যখন আগমন সংবাদ আনল না তখন হয়তো টেলিগ্রাম আসতে পারে, বার্ত্তাহীন নিঃশব্দতায় মঙ্গলবারের অবসান হোলো। যথানিয়মে আজ এল বুধবার— সকালে ডাক এল, অনাগমনের জন্যে কোনো কৈফিয়তী লিপি পাওয়া গেল না। আজ দোলপূর্ণিমা, ছাত্রছাত্রীরা পায়ে আবির দিয়ে প্রণাম করে গেল। আজ শুক্ল সন্ধ্যায় বসন্ত উৎসব হবে, তারি মন্ত্রণা এবং আয়োজন চলচে। আমাদের অভিনয়ের দল কাল চলে যাবে রঙ্গশালার অভিমুখে, আমার পথ রোধ করেছে ডাক্তারের দল, যে কারণ দেখিয়ে সেটা সম্পূর্ণ আজগবি। অজ্ঞতার অন্ধকার গর্ভ থেকে কাল্পনিক আশঙ্কার জন্ম, পুরাযুগে এই জন্যেই ডাইনি অপবাদ দিয়ে মানুষ হত্যাকাণ্ড করত— সেটা ছিল তখনকার ডাক্তারির একটা প্রথা, আমার পক্ষে এখনকার ডাক্তারির ডাইনী হচ্চে ছায়া নাট্যশালা। আসল কথা তারা কিছুই জানে না কি জন্যে আমার অকস্মাৎ এই ব্যাধির উপসর্গ— চিকিৎসা বিদ্যার মানরক্ষার জন্যে যা তা

এমন একটা হেতু খাড়া করে দিলে যার স্বপক্ষে বিপক্ষে কোনো প্রমাণই নেই— একমাত্র প্রমাণ নামজাদা ডাক্তারদের নাম। পূর্বযুগে পীড়িতের দল ডাইনীর প্রভাব মেনে যেতে বাধ্য হয়েছিল— আমিও দশচক্রে মেনে গেছি, কিন্তু মূঢ়ের মতো বিশ্বাস করতে পারি নি। মোট কথা, কলকাতায় যাব না। যাব এখান থেকে সুরুলে, শ্রীনিকেতনের প্রাচীন দালান বাড়িতে। ইতিমধ্যে চিন্তা করচি তুই যে মঙ্গলবারের উল্লেখ করেছিস সেটা কি কোনো একটা আগামী সপ্তাহের অন্তর্গত? ইতি দোলপূর্ণিমা ১৩৪৪

রবিকাকা

[৭২] ওঁ * Gouripur Lodge
Kalimpong
পোস্টমার্ক, কালিম্পং

কল্যাণীয়াসু

কাল আমার জন্মদিন ছিল সেটা দশে মিলে তারস্বরে আমাকে বুঝিয়ে ছেড়েছে। চারদিক থেকে স্তুতির স্বরবর্ষণ হয়েছিল— ভীষ্মের মতো মৃতকল্প হইনি কিন্তু লজ্জিত হয়েছিলুম। প্রশংসা বুক ফুলিয়ে নেবার মতো তাকদ্ আজো আমার হয়নি। নিজের গুণ সম্বন্ধে আমি যে একেবারে অচেতন এত বড়ো বোকা আমি নই, কিন্তু তার জয়পত্রকে চিবিয়ে জীর্ণ করার মতো পাকযন্ত্র আমার নেই। সেইজন্যে অভিনন্দনের ভিড়কে কোনোমতে পাশ কাটাতে পারলেই আমি বাঁচি—

কিন্তু খোঁড়ার পা খানায় পড়ে— ঐ ভিড় ঠেলেই চলতে হয়েছে সমুদ্রের এক তীর থেকে অন্য তীর পর্যন্ত। যদিও এসে পড়লুম শেষ ঘাটে, তবু ঢাকীর দলের ঢাকপিটুনি আরো যেন মেতে উঠচে। তার আওয়াজটা অহঙ্কারের কোঠায় একেবারে পৌঁছয় না, তা বলতে পারি নে, কিন্তু কেমন যেন আরাম পাইনে, মনটা পালাই পালাই করে। ছেলেবেলায় নতুন বোঠান যথোচিত উৎসাহের সঙ্গে তাঁর দেওরের অভিমান খর্ব করে এসেছেন, সেটা আমি স্বাস্থ্য বরাদ্দের মতোই মাথা পেতে নিতে অভ্যস্ত হয়েছিলুম, কখনো ভাবতে পারতুম না বিহারী চক্রবর্তীর গৌরবের সীমা আমি কোনো দিন পেরোতে পারব। তিনি তাঁকে নিজের হাতে পশমের আসন বুনে দিয়েছিলেন, আমি নিশ্চয় জানতুম আমার আসন মাটিতে— আদরের এই উপবাস এমন অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে আজ তার প্রাচুর্য আমার পাওনার বেশি মনে না করলেও তাতে অস্বস্তি বোধ করি। জন্মদিনের ডাকের চিঠিগুলো দেখলে বিষম কুণ্ঠা বোধ হয়, ভালো করে পড়িই নে— এই তো আমার অবস্থা, অথচ— যাক্‌গে।

প্রমথ আমার প্রস্তাবটা নিয়ে কোমর বেঁধে বসেছে শুনে অত্যন্ত আশ্বস্ত হয়েছি, সম্পূর্ণতার জন্যে পথ চেয়ে রইলুম। বিষয়কে সহজ করা, উপাদেয় করা অথচ পুষ্টিকর অংশে কৃপণতা না করা, এ প্রমথ ছাড়া আর কারো দ্বারা হতে পারে না।

তোর তর্জমাও আমাদের কাজে লাগবে। একটু সময়

দিস্ কর্তব্য-বিশেষের একাগ্রতায়। পাঁচভূতের টানাটানিতে সর্বদাই সময়টাকে পাঁচমেশোলী করিস্‌নে। সৌখীন কুঁড়ে মানুষ অবকাশের যে অপব্যয় করে, হয়তো তার মূল্য কিছু ফিরে পায়, কিন্তু তোর মত শ্রমশীলা যখন অপব্যয় করে তখন সেটা নিছক লোকসানে দাঁড়ায়। ইতি ২৬ বৈশাখ ১৩৪৫

রবিকাকা

[৭৩] ঔ

"Uttarayan"
Santiniketan, Bengal.
পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

তোর কবিতার যে পুনঃসংস্কার করেছিস সে ভালোই হয়েছে। কেবল cruel eyes-কে যেখানে brave হতে অনুরোধ করেছিস সেটা সংগত হয়নি— সুবিবেচক হওয়ার সঙ্গে সাহসিক হওয়ার যোগ নেই। করুণ হতে বল্‌লেই ভালো হয়। পূর্বে যেখানে কবিতাটি থেমেছিল তার পরে আর তাকে টেনে নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না।

রথী দুচারদিনের মধ্যে কলকাতা হয়ে কালিম্পং যাবে। আমি দৌড় দেব ছুটির পরে। তোদের লেখা শেষ হয়ে গেলে আনিয়ে নেবার ব্যবস্থা করব। পশু হবে বর্ষা মঙ্গল— সেজন্যে বর্ষা বিশেষ চিন্তিত নয়, বিনা কারণে যখন তখন বর্ষণ করচে। ইতি ১ অগস্ট ১৯৩৮

রবিকাকা

[৭৪] ওঁ * "Uttarayan"
Santiniketan, Bengal.
পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

তোরা আসবি বৈ কি— যখন তোদের খুশি। বৌমা নেই তাতে ক্ষতি হবে না— গিন্নিপনার ভার পুপুর উপরে। যদি কোথাও কোনো ত্রুটি ঘটে নিজে পূরণ করে নিতে পারবি। জলে স্থলে আকাশে এবার শ্রাবণের দরবার খুব জমে উঠেছে। ইতি ৫।৮।৩৮

রবিকাকা

[৭৫] ওঁ "Uttarayan"
Santiniketan, Bengal.
পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

বিবি, এখানে লোকজনের গতিবিধি লেগেই রয়েছে কেবল তোদেরই আসা হোলো না। ৩রা সেপ্টেম্বর নাগাদ এখানে বর্ষামঙ্গল হবে— ততদিনে তোরা আসতে পারবি আশা করচি। তার পরে আমি কালিম্পং চলে যাব স্থির হয়েছে। শরীরটা খুব ভালো চলচে বলতে পারচিনে— মাঝে কয়দিন জ্বর হয়েছিল। ইতিমধ্যে বাংলা ভাষা সম্বন্ধে একখানা বই মৃদুমন্দগতিতে লিখে চলেছি— আগেকার মতো কলমের দ্রুত চাল আর নেই। তোদের দোঁহাকার দুই লেখার জন্যে প্রতীক্ষা করে আছি।— বর্ষণ চলচে— এবারকার ভাদ্রমাসের

মেজাজ অনেকটা ভদ্র। প্রায় হাওয়া দিচ্ছে, গরমটা কালোচিত নয়।

আমাদের সাংসারিক অবস্থা জলমগ্ন, তহবিল ডুবচে নিঃস্বতার তলায়, উদ্ধার করবার জন্যে কোর্ট্ অফ্ ওয়ার্ডস্ নেই। ২৪-৮-৩৮

রবিকাকা

[৭৬] ঔ * "Uttarayan"
Santiniketan, Bengal.
পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন
২৯ অগস্ট, ১৯৩৮

কল্যাণীয়াসু

বিবি তোর ইংরেজি কবিতাটি ভালো লাগল। কেবল সন্দেহ হয় আধুনিক কালে ভিক্টোরীয় যুগের ভাষার রীতি তরুণদের পছন্দ হবে কিনা যেমন

"Of lissome limbs and faces *debonair*"

"Of beauty's gifts and love's lavish riches wealth" চলে কি?

"What hidden meaning" ইত্যাদি lineটা বাহুল্য আর alone with pain লাইনটা "its faltering" lineএর চেয়ে ভালো।

তোদের এখানে আসার সম্বন্ধে চিঠিতে ঔৎসুক্য প্রকাশ করেছিলুম কিন্তু ভেবে দেখলুম, হর্ণিয়া নিয়ে কলকাতার

বাইরে আসা নিরাপদ নয়। রথীও সেই আশঙ্কা প্রকাশ করলে। কিন্তু তোদের লেখা পাঠিয়ে দিস।

রবিকাকা

[৭৭] ওঁ পোস্টমার্ক

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

বিষম ব্যস্ত ছিলাম। ছুটি আরম্ভ হোলো। ভাব্‌চি এখন কোণে বসে ছবি আঁকায় মন দেব। কলম চালাতে ভালো লাগে না। কী যে ভালো লাগে বুঝতে পারিনে— কোনো দায়িত্বের ভার সহ্য হয় না। হিংসে হয় পাখীগুলোকে দেখে। বাড়ি এখন শূন্য— উদয়নবাসীরা সবাই এখন শৈল-বিহারে।— তোর সেই ফরাসী বইয়ের তর্জমার পাণ্ডুলিপি দেখে মাথা ঘুরে গিয়েছিল— খানিকটা কপি করিয়ে নিয়ে সেই কাটাকুটির জঙ্গলের মধ্যে রাস্তা পাওয়া গেল। যেটুকু পড়লুম খুব ভালো লাগ্‌ল— বাকিটুকু কপি হয়ে গেলে সবটাকে নিয়ে পড়ব। মনে ভাবছি বৃহত্তর ভারতকেও ছাড়া কিছু নয়। জিনিষটা উপাদেয় হবে সন্দেহ নেই। ইতি ২৩।৯।৩৮

রবিকাকা

[৭৮]

* "Uttarayan"
Santiniketan, Bengal.

কল্যাণীয়াসু

আশা করেছিলুম যেহেতু আশা দিয়েছিলি যে কাল তোরা আসবি কিন্তু এলিনে— আজ সকালেও অপেক্ষা করেছি— বোধ হয় [আসা] ঘটবে না— পর্শু চলে যাব— অতএব তোদের সঙ্গে কাজের কথা চুকিয়ে দিতে হলে ইতিমধ্যে দেখা হওয়া চাই। তোদের ওখানে টেলিফোন নেই— তাই ডাকঘরের শরণ নিতে হোলো। আধমরা হয়ে আছি— একটুও সময় পাইনি— ঠাসা ভিড়— দেহতরী ক্লান্তিতে বোঝাই করা। ইতি

রবিকাকা

[৭৯]

ওঁ

* "Uttarayan"
Santiniketan, Bengal.
পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন
৪ অক্টোবর, ১৯৩৮

কল্যাণীয়াসু

যুগল করপুটে বিজয়ার আশীর্বাদ গ্রহণ কর।

তোর সেই তর্জমাটার নকল এখনো শেষ হয়নি। নকলকর্তা ছুটিতে বাড়ি গেছে। ফিরে এসে হাত দেবে। ভুল আছে যথেষ্ট— জিনিষটা বেচারীর বুদ্ধিবিদ্যার অনেকদূর তফাতে। এটাকে মেজে ঘষে তুলতে দেরি হবে। তারপরে

প্রতিশব্দের গ্রন্থিমোচন কাজটি সহজ হবে না। প্রমথর লেখাটি স্পষ্ট— কোনো কষ্ট দেবে না। ছাপাখানা বন্ধ, ছুটি অন্তে মুদ্রাযন্ত্রে চড়িয়ে দেব। নাম কি ভারতের ইতিহাস, না ভারতীয় সংস্কৃতি। ইতি বিজয়া দশমী

রবিকাকা

[৮০] ওঁ মংপু

কল্যাণীয়াসু

তোদের বিজয়ার প্রণাম না পেলে মনে হয় পাঁজির ভুল হয়েছে, এবারে তাই সন্দেহ হচ্ছিল এমন সময়ে তিথির পরিচয় নিয়ে জিনিষটা পৌঁছল আমার হাতে।

পাহাড়ের শুশ্রূষায় ভালো থাকবারই কথা এবারে ছিলুম না। এখানকার জল হাওয়ায় উপদ্রব ঘটেছিল, যাকে বলে হিটলারের ছোঁয়াচ। সময় হোলো বিদায় নেবার, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে অক্ষম। ৫ই নবেম্বরে অবতরণ করব নিম্ন-ভূমিতে। দুচারদিন কলকাতায় যখন থাকব দেখা হবে। রথীর শরীর এখানে এসে ভালো হয়েছে। বৌমা পুপুসহ বোম্বাইয়ে। আশা করি যখন ফিরব তিনি আমার ভার গ্রহণ করতে আসবেন।

প্রমথর বই ছাপা চলচে। তোর লেখাটা পরিচয়ের হাত থেকে উদ্ধার করে ছাপতে দেব।

জয়ার তিন সন্ততির নাম দিতে পারিস মঞ্জরী, গুঞ্জরী আর রঞ্জন।

আমার কোটরে ফিরে গিয়ে বেদগানে স্থর দেবার চেষ্টা করব। ইতি ২৫।১০।৩৯

রবিকাকা

এ সংখ্যার অলকাটা ভালো লাগল।

[৮১] ও পোস্টমার্ক
শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

বিবি, সুরেনের জন্যে মন যে কী রকম উদ্বিগ্ন হয়ে আছে তা বলে উঠতে পারিনে। রথীকে বলে রেখেছি তার খবর নিয়ে আমাকে জানাতে। আমার নিজের শরীর একটুও ভালো নেই— প্রায়ই জ্বর হয়। আর অহোরাত্র থাকে সেই জ্বরের দুর্বলতা। কাজ করবার শক্তি কমেছে রুচিও নেই, অথচ এত কাজের আক্রমণ এর আগে আর কখনো মনে পড়ে না। বয়স যতই বাড়ছে মন যতই ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ছে জরায়, নিরবকাশ ততই নীরন্ধ্র হয়ে উঠচে। আমার কাজের সঙ্গে এত লোকের দায়িত্ব জড়িত যে অস্বাস্থ্যের দোহাই দিয়ে তাকে সরিয়ে রাখতে পারিনে।

কিন্তু আমারো তো যাবার সময় হয়ে এসেছে— কোনো কিছুর জন্যে পরিতাপ করবার সময় নেই জানি, তেমনি আর সময় নেই কর্তব্য থেকে নিষ্কৃতি নেবার। ব্যক্তিগত জীবনের

সুখদুঃখ লাভ ক্ষতি ঘটতে ঘটতেই চলেছে বিলুপ্তির দিকে। তাকে উপেক্ষা করতে না পারলে সার্থকতার যে স্বল্পমাত্র অবকাশ আছে তাকে হারাতে হবে। এইজন্যে দুর্বল স্বাস্থ্যের কুহেলিকাচ্ছন্ন দিনের অস্বচ্ছ আলোয় ঝুঁকে পড়ে কাজ করে চলেছি। যারা প্রতিদিনের আগন্তুক, তাদের অভ্যর্থনায় শক্তির ব্যয় কম হয় না। সেই অপব্যয়ের পরিমাণ আমার বিরামের পক্ষে যতই বেশি হোক তাদের সন্তুষ্টির পক্ষে কিছুতেই যথেষ্ট হতে চায় না। কিন্তু কী হবে নালিশ করে আর কতদিনকারই বা মেয়াদ। এতদিন পরে সুরেনকে যদি হারাতেই হয় তাহলে আমার পক্ষে সান্ত্বনা এই থাকবে যে তার বিচ্ছেদ বেশি জায়গা পাবে না নিজেকে বিস্তীর্ণ করবার জন্যে। ইতি বর্ষশেষ চৈত্র ১৩৪৬

রবিকাকা

[৮২] ওঁ

Visva-Bharati
Santiniketan
Bengal, India

কল্যাণীয়াসু

বিবি, কাল সুরেনকে দেখে অবধি মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে রইল। কিছু করবার নেই— ভালই হোক মন্দই হোক প্রতীক্ষা করে থাকতে হবে।

৫০০ টাকা পাঠাচ্ছি— সুরেনের বইয়ের আগাম প্রাপ্যরূপে গ্রহণ করিস। আজ চল্লুম। আমার ঠিকানা—

Mungpoo Darjeeling
C/o. Dr. M. Sen

রবিকাকা

[৮৩] মংপু

বিবি

তোরা বোধ হয় জানিস আমার নিজের ছেলেদের চেয়ে সুরেনকে আমি ভালোবেসে ছিলুম। নানা উপলক্ষ্যে তাকে আমার কাছে টানবার ইচ্ছা করেছি বারবার, বিরুদ্ধ ভাগ্য নানা আকারে কিছুতেই সম্মতি দেয় নি। এইবার মৃত্যুর ভিতর দিয়ে বোধ হয় কাছে আসব, সেইদিন নিকটে এসেছে। ইতি ৬।৪।৪০

রবিকাকা

[৮৪] ওঁ * "Uttarayan"
Santiniketan, Bengal.
[১৩ মে, ১৯৪১]

বিবি আমার জন্মদিনে তুই যে মূর্তিটা পাঠিয়েছিস সে আমার খুব সান্ত্বনাজনক। শেষ দশায় অর্জুন গাণ্ডীব তুলতে পারেননি আমার সেই অবস্থা। আমার চিরদিনের কলম আজ পরের ঘাড়েই চাপাতে হচ্ছে কিন্তু বকলমে তোকে লিখতে ভাল লাগল না— ঘোঁড়া কলমকে চাবুক লাগিয়ে কোনো মতে ক লাইন লিখিয়েছি— এখন সে ফিরে চলল পিঁজরাপোলে। আশীর্বাদ

রবিকাকা

প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত

[১]   ওঁ   শান্তিনিকেতন

বোলপুর।

২১ মে, ১৮৯০

প্রমথ

আমি কিছু দিন থেকে তোমাকে লিখ্‌ব লিখ্‌ব করছিলুম। তুমি চুয়োডাঙ্গায় যাবার পর থেকেই তোমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা ভারি হঠাৎ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। দেনার দায়ে একদিন সকাল বেলা হঠাৎ বাড়ির গ্যাস্‌-পাইপ্‌ এবং জলের পাইপ কেটে দিয়ে গেলে যেমন দশা হয় কতকটা সেই রকম। পৃথিবীতে বড় বড় মহাত্মাদের কল্যাণে অনেক বড় বড় সরোবর আছে এবং সেখানে স্নান করে পান করে ভাবের তৃষা সম্পূর্ণ নিবারণ করা যায়, কিন্তু একেবারে ঘরের ভিতরে হাতের কাছে কথোপকথনের নলের ভিতর দিয়ে যে জলের সঞ্চার হয় তার মধ্যে যদিও সাঁতার দেওয়া, ডুব দেওয়া বা আত্মহত্যা করা যায় না কিন্তু দৈনিক সহস্র সুবিধের পক্ষে সেটি বড় আবশ্যকীয় জিনিষ। কেবল কথোপকথন নয়, খবরের কাগজ, সংক্ষিপ্ত সমালোচনা প্রভৃতি ক্ষণিক সাহিত্য এই রকম জলের কলের কাজ করে; তারা পূর্ব্বোক্ত ভাবসরোবর থেকে জল আকর্ষণ ক'রে অল্পমূল্যে ঘরে ঘরে দ্বারে দ্বারে বিতরণ করে— এইজন্যে বোধ করি অনেক আধুনিক পাঠক সন্তরণ এবং নিমজ্জনসুখ একেবারে বিস্মৃত হয়েছে— কারণ নলের মধ্যে আর সব পাওয়া যায় কিন্তু সরোবরের উদারতা এবং অতলতা তার মধ্যে প্রবেশ করেনা। উপস্থিত প্রসঙ্গে এত কথা বলবার

কোন আবশ্যক ছিল না— কিন্তু উপমাটা নাকি এল সেইজন্যে সেটিকে নিঃশেষ করে চুকিয়ে দেওয়া গেল— অপ্রাসঙ্গিক হলেও "যো আপ্‌সে আতা উস্‌কো আনে দেও।"

তোমার সম্বন্ধে যা' বলবার অলঙ্কার না দিয়ে ঠিক সেইটুকু বল্‌তে গেলে আধখানি পাতও পোরে না;— সংক্ষেপে— তোমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বেশ চল্‌ছিল ভাল হঠাৎ বন্ধ হয়ে একটু যেন বিপদে পড়েছিলুম। তোমার চিঠি পেয়ে আবার কলে জল এল। খানিকটা যা' তা' বকাবকি করে বাঁচা যাবে। কিন্তু মুখোমুখি বসে আকার ইঙ্গিত এবং কণ্ঠস্বর-যোগে অবিচ্ছিন্ন আলোচনার মধ্যে যে একটি উত্তাপ আছে চিঠিতে সেটি পাওয়া যায় না, সেই উত্তাপে দেখ্‌তে দেখ্‌তে মনের মধ্যে অনেক ভাবের অঙ্কুর বেরিয়ে পড়ে; অবিশ্যি, সেগুলো সব যে টিঁকে যায় তা নয়— অধিকাংশ দ্রুত প্রকাশের স্বভাবই হচ্চে দ্রুত বিনাশ। কিন্তু এতে মানসিক জীবনের যে একটা চর্চ্চা হয় সেটা ভারি আনন্দের এবং কাজেরও। অতএব দিনকতকের জন্যে যদি বোলপুরে আস্‌তে পার তাহলে মাঝে মাঝে নানা কথা বলা কওয়ার অবসর ঘট্‌তে পারবে। এখানে বই বহুবিধ আছে; এখানকার একটা ছোটখাট লাইব্রেরি আছে, তা ছাড়া আমিও কিছু বই সঙ্গে এনেছি। এখেনে গদি দেওয়া চৌকি, নরম কৌচ, চিৎ হয়ে শোবার এবং ঠেসান দিয়ে বস্‌বার বিবিধ সরঞ্জাম আছে। অতএব এখেনে শারীরিক এবং মানসিক স্বাধীনতার কোন-রকম ব্যাঘাত ঘট্‌বেনা। তুমি চুয়োডাঙ্গার যে রকম বর্ণনা

করেছ তার সঙ্গে বোলপুরের "প্রাকৃতিক ভূগোলে"র অনেক সাদৃশ্য আছে। চারদিকে মাঠ ধূধূ করচে— মাঝে মাঝে এক-একটা বাঁধ, এবং তার উঁচু পাড়ের উপর শ্রেণীবদ্ধ তালবন— মাঠের পূর্ব্বপ্রান্তে আকাশ একেবারে অনাবৃত ভূমিতলকে স্পর্শ করে রয়েছে— মাঠের পশ্চিম প্রান্তে ঘনবনের রেখা দেখা যায়। মধ্যেকার এই মরুক্ষেত্র অনশনশীর্ণ পাণ্ডুবর্ণ তৃণে আচ্ছন্ন, মাঝে মাঝে একএকটা নিতান্ত খর্ব্বাকার খেজুরের ঝোপ— মাঝে মাঝে মাটি দগ্ধ হয়ে কালো হয়ে কঠিন হয়ে পৃথিবীর কঙ্কালের মতো বেরিয়ে রয়েছে। উত্তরদিকের মাঠ বর্ষার জলস্রোতে নানা ভাগে বিভক্ত হয়ে লিলিপট্‌দেশীয় ক্ষুদ্রকায় গিরিশ্রেণীর আকার ধারণ করেছে— সেই ছোট ছোট রক্তবর্ণ কঠিন মৃত্তিকার স্তূপ নানা রকম পাথরের টুক্‌রো ও কাঁকরে আবৃত— তাতে ছোট ছোট বুনো জাম; বেঁটে খেজুর এবং অখ্যাতনামা দুই এক রকমের গুল্ম অত্যন্ত বিরলভাবে শোভা পাচ্চে— তারি মধ্যে মধ্যে ঝরণা এবং জলস্রোতের শুষ্ক রেখা দেখা যায়— শরৎকালে সেইগুলো পূর্ণ হয়ে ওঠে এবং ছোট ছোট মাছ তাতে খেলা করে। এই মরুভূমির মাঝখানে আমাদের বাগানটি গাছে ছায়ায় ফলে ফুলে আচ্ছন্ন হয়ে, পাখীর গানে মুখরিত হয়ে, তরুপল্লবের অন্তরাল হতে দৃশ্যাগ্রশিখর প্রাসাদের দ্বারা মুকুটিত হয়ে নিভৃতমহিমায় বিরাজ করচে। এই বোলপুরের বাগান আমাদের ভারি ভাল লাগে। ছেলেবেলায় আরো ভাল লাগ্‌ত। বোধ হয় এখনকার ভাললাগার মধ্যে তারি সেই "রেশ্‌" রয়ে গেছে।

আমার "ছবি ও গান" আমি যে কি মাতাল হয়ে লিখে-ছিলুম তোমার চিঠি পড়ে বোঝা গেল তুমি সেটি সম্পূর্ণ বুঝ্‌তে পেরেছ এবং মনের মধ্যে হয়ত অনুভবও করচ। আমি তখন দিনরাত পাগল হয়ে ছিলুম। আমার সমস্ত বাহ্যলক্ষণে এমন সকল মনোবিকার প্রকাশ পেত যে তখন যদি তোমরা আমাকে প্রথম দেখ্‌তে ত মনে করতে এ ব্যক্তি কবিত্বের ক্ষ্যাপামি দেখিয়ে বেড়াচ্চে। আমার সমস্ত শরীরে মনে নবযৌবন যেন একেবারে হঠাৎ বন্যার মতো এসে পড়েছিল। আমি জান্‌তুম না আমি কোথায় যাচ্চি 'আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্চে। একটা বাতাসের হিল্লোলে একরাত্রির মধ্যে কতকগুলো ফুল মায়ামন্ত্রবলে ফুটে উঠেছিল তার মধ্যে ফলের লক্ষণ কিছু ছিলনা। কেবলি একটা সৌন্দর্য্যের পুলক, তার মধ্যে পরিণাম কিছুই ছিল না। তোমাদেরও বোধ হয় এ রকম অবস্থা হয়।

"উড়িতেছে কেশ উড়িতেছে বেশ,
উদাস পরাণ কোথা নিরুদ্দেশ,
হাতে লয়ে বাঁশি মুখে লয়ে হাসি
ভ্রমিতেছি আনমনে—
চারিদিকে মোর বসন্ত হসিত,
যৌবন মুকুল প্রাণে বিকশিত,
সৌরভ তাহার বাহিরে আসিয়া
রটিতেছে বনে বনে।"

সত্যি কথা বল্‌তে কি, সেই নবযৌবনের নেশা এখনো

আমার হৃদয়ের মধ্যে লেগে রয়েছে। "ছবি ও গান" পড়তে পড়তে আমার মন যেমন চঞ্চল হয়ে ওঠে এমন আমার কোন পুরোণো লেখায় হয় না। তার থেকে বুঝ্‌তে পারি সে নেশা এখনো একজায়গায় আছে— তবে কি না, সে নেশা

Hath been cooled a long age
In the deep delved heart

আমি সত্যি সত্যি বুঝ্‌তে পারিনে আমার মনে সুখদুঃখ বিরহমিলনপূর্ণ ভালবাসা প্রবল, না সৌন্দর্য্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা প্রবল। আমার বোধ হয় সৌন্দর্য্যের আকাঙ্ক্ষা আধ্যাত্মিকজাতীয়, উদাসীন গৃহত্যাগী; নিরাকারের অভিমুখী। আর ভালবাসাটা লৌকিকজাতীয় সাকারে জড়িত। একটা হচ্চে Shelleyর Skylark আর একটা হচ্চে Wordsworth-এর Skylark। একজন অনন্তসুধা প্রার্থনা করচে, আর একজন অনন্তসুধা দান করচে। সুতরাং স্বভাবতই একজন সম্পূর্ণতার এবং আর একজন অসম্পূর্ণতার অভিমুখী। যে ভালবাসে সে অভাবদুঃখপীড়িত অসম্পূর্ণ মানুষকে ভালবাসে সুতরাং তার অগাধ ক্ষমা সহিষ্ণুতা প্রেমের আবশ্যক— আর যে সৌন্দর্য্যব্যাকুল, সে পরিপূর্ণতার প্রয়াসী, তার অনন্ত তৃষ্ণা। মানুষের মধ্যে দুই অংশই আছে, অপূর্ণ এবং পূর্ণ— যে যেটা অধিক ক'রে অনুভব করে। আমার বোধ হয় মেয়েরা আপনার পূর্ণতা অধিক অনুভব করে (এইজন্যে তারা যা'কে তা'কে ভালবেসে সন্তুষ্ট থাক্‌তে পারে) পুরুষরা আপনার অপূর্ণতা অধিক অনুভব করে এইজন্যে জ্ঞান বল, প্রেম বল কিছুতেই

তাদের আর অসন্তোষ ঘোচেনা। কবিত্বের মধ্যে মানুষের এই উভয় অংশ পাশাপাশি সংলগ্ন হয়ে থাক্‌লেই ভাল হয় কিন্তু তেমন সামঞ্জস্য দুর্লভ। না, ঠিক দুর্লভ বলা যায় না— ভাল কবিমাত্রেরই মধ্যে সেই সামঞ্জস্য আছে— নইলে ঠিক কবিতাই হয় না। অসম্পূর্ণ Real এবং পরিপূর্ণ Idealএর মিলনই কবিতার সৌন্দর্য্য। কল্পনার Centrifugal force Idealএর দিকে Realকে নিয়ে যায় এবং অনুরাগের Centripetal force Realএর দিকে Idealকে আকর্ষণ করে— কাব্যসৃষ্টি নিতান্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে বাষ্প হয়ে যায় না এবং নিতান্ত সংক্ষিপ্ত হয়ে কঠিন সংকীর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। তুমি ঠিক বলেছ— "আর্ত্তস্বর" এবং "রাহুর প্রেম" "ছবি ও গানের" মধ্যে অসঙ্গত হয়েছে, এদের মধ্যে যে একটা তীব্রতা আছে অন্যান্য গানের মধুরতার সঙ্গে তার অনৈক্য হয়েছে। আরেকটা কবিতা আছে সেটা আর এক রকমে অসঙ্গত— যথা "পোড়ো বাড়ি।"

সময় এবং স্থান সংক্ষেপ হয়ে আস্‌চে। আজ এইখানেই ইতি করা যাক্‌। আজকাল একটু আধ্‌টু লিখ্‌তে আরম্ভ করেছি— কাছে থাকলে টাট্‌কা টাট্‌কা শোনাতুম।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[২] ওঁ পোস্টমার্ক, শিলাইদা

৩ জুন, ১৮৯০

প্রমথ

তোমার চিঠিতে সুরেন বিবির পাশের খবর পেয়ে খুব খুসি হওয়া গেল। মন্মথ পাশ হয়েছে কি না কিছু লেখনি কেন? অবিশ্যি পাশ হয়েছে। কোন্ ডিবিজনে হল?

তোমার সঙ্গে যোগিনীর মিট্‌মাট্ হয়ে যাওয়া খুব আশ্চর্য্য বল্‌তে হবে। বাস্তবিক হয়েচে কিনা আগামী সাহিত্য-সমিতিতে তার পরীক্ষা হবে। জয়দেব সম্বন্ধে কি করচ? কিছু লিখ্‌লে কি? জয়দেবকে কি ভাবে আলোচনা করবে আমি বুঝ্‌তে পারচি নে। তার কবিতা সম্বন্ধে কি বলতে চাও?

আমি বোধ হচ্চে এখেনে কিছু কাল থেকে যাব। একটা কিছু লিখ্‌তে চেষ্টা করা যাবে। আপাততঃ কাজকর্ম্মের ভিড়ে তেমন অবসর পাচ্চিনে। মাঝে মাঝে একটু আধ্‌টু পড়তে চেষ্টা করি— কিন্তু এখানকার জলবায়ুর গুণেই হোক কিম্বা কি কারণে বলতে পারিনে, পড়তে চেষ্টা করলেই ঘুমিয়ে পড়তে হয়। জর্ম্মান Faust অল্প অল্প করে পড়তে চেষ্টা করচি। তুমি থাক্‌লে তোমাকে আমার সহপাঠী করা যেত। এ রকম পড়া দুজনে মিলে লাগ্‌লেই তবে এগোয়। পড়ার মাঝে মাঝে মৌলবীর বক্তৃতা নায়েবের কৈফিয়ৎ প্রজাদের দরখাস্ত এসে পড়লে জর্ম্মান্ ভাষা বুঝে ওঠা কি রকম ব্যাপার হয় তা তুমি সহজেই অনুমান করতে পারবে।— বোটটা যত

গরম হবে মনে করেছিলুম তা হয় নি— দিনে প্রায় মেঘ করে থাকে এবং রাত্রে অতি চমৎকার জ্যোৎস্না হয়। অতএব এ পর্য্যন্ত এখানকার প্রকৃতি জমিদারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাচরণ করে নি। অরু চলে গেলে খুব এক্‌লা হবে— কিন্তু আমার সেটা নেহাৎ অসহ্য বোধ হয় না। তোমাদের কারো যদি এখানে আসবার ইচ্ছে হয় তাহলে কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে স্বাগত সম্ভাষণ পূর্ব্বক সাদরে অভ্যর্থনা করে নেব— আতিথ্যের কোনপ্রকার ত্রুটি হবে না। ইতি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৩] ঔ পোস্টমার্ক, শিলাইদা

২১ জুন, ১৮৯০

প্রমথ

আমার মস্তিষ্ক যে অবস্থায় আছে সে আর কি বল্‌ব। বর্ষাকালে যে কাঁচা রাস্তায় কেবল গরুর গাড়ি এবং মোষের পাল যাতায়াত করে তার যে রকম আকারপ্রকারহীন শোচনীয় দশা উপস্থিত হয় আমার বুদ্ধিবৃত্তির সেই রকম দুরবস্থা ঘটেচে। এরই মাঝে মাঝে পাঁচ ছ মিনিট সময় চুরি করে একটা লেখা আরম্ভ করেছিলুম— সেটা ভাল হচ্চে কি মন্দ হচ্চে একটু স্থির হয়ে বোঝবারও সময় পাচ্চিনে— ক্ষণিক অবসরে একরকম শ্রান্ত মুহ্যমান মস্তিষ্কে বিছানায় পড়ে পড়ে নিতান্ত অলসভাবে লিখে যাই— লিখ্‌তে লিখ্‌তে

মাঝে মাঝে নিদ্রাকর্ষণও হয়— মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক ভাবে জলের ঢেউ বা তীরের ঝাউবনের দিকে তাকিয়ে থাকি, এবং কখন্ অলক্ষিতভাবে মনের মধ্যে এমন্ সকল প্রসঙ্গ প্রবেশ লাভ করে যার সঙ্গে সরস্বতীদেবীর কোন সুদূর সম্পর্কও নেই। যেটা লিখ্‌চি আগে থাক্‌তেই তার নাম দিয়ে রেখেচি অনঙ্গ আশ্রম। নামটা অনেকের মনোরঞ্জক হবে বোধ হয়— কারণ উনবিংশ শতাব্দীর কলিতে বহুবিধ ফিলজাফির দৌরাত্ম্যে আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মগজ থেকে আর সমস্ত দেবতাই দৌড় দিয়েচেন "কেবল অনঙ্গদেব রয়েছেন বাকি।" "রয়েছেন বাকি" বল্লে ঠিক বলা হয় না— উক্ত Non-Regulation Province-এর একাধিপত্য পেয়ে তিনি ক্রমশঃ দিব্যি হৃষ্টপুষ্ট হয়ে উঠ্‌চেন— যদিও আজকাল তাঁর নিজনামে তাঁকে ডাক্‌লে রুচি-ব্যভিচার দোষে দণ্ডনীয় হতে হয়। হায় হায়, পূর্ব্বে দেবতাদের কাছে যে নামে তাঁর পরিচয় ছিল, এখন মানবসমাজে সে নাম তিনি লজ্জায় গোপন করতে চান— আমরা এত শিক্ষিত এত উন্নত হয়ে উঠেছি। বোধ হয় সভ্যতার উন্নতিসহকারে "প্রেম" শব্দটাও ক্রমে শ্রুতিলজ্জাজনক হয়ে উঠ্‌বে— তখনকার যুবকেরা আমাদের বইগুলো বালিষের নিচে লুকিয়ে রেখে গোপনে পড়বে, সেইজন্যে বোধ হয় এখনকার চেয়ে ঢের বেশি ভাল লাগ্‌বে। আবার তখন যদি সাধারণ ব্রাহ্ম থাকে তবে তারা না জানি কি রকম প্রচণ্ড পবিত্রতা প্রচার করবে। সে কথা মনে করলে আমাদের মত কবিদের হৃৎকম্প উপস্থিত

হয়।— এখানে নিতান্ত সময়াভাব এবং অতি শীঘ্র দেখা হবে সেই জন্যে বেশি লিখ্‌লুম না। তোমার জয়দেব প্রবন্ধটা পড়বার প্রত্যাশায় রইলুম। কুমুদকে আশ্বস্ত করে এক চিঠি লিখলুম। ইতি

শ্রীরবীন্দ্রনাথঠাকুর

[৪]

প্রমথ

অনেকগুলি অপরিচিতাক্ষর পাতলা চিঠির মধ্যে চুয়োডাঙ্গা মুদ্রাঙ্কিত একখানি বেশ মোটা মজ্‌বুৎ ভারি গোছের চিঠি পেয়ে লাগ্‌ল ভাল। কাল সকালবেলায় একটা লেখা এবং রাত্তিরে একটা বই শেষ করে আজ প্রাতঃকালে নিতান্ত অকর্ম্মণ্যভাবে বসে ছিলুম— ঠিক সময়ে চিঠি পাওয়া গেল— এখন শরীর মন আবার একটু সচেতন হয়ে উঠেছে।

এখানে আজকাল খুব ঝড়বৃষ্টি বাদলের প্রাদুর্ভাব হয়েছে। এজায়গাটা ঠিক ঝড়বৃষ্টিরই উপযুক্ত। সমস্ত আকাশময় মেঘ করে, অর্থাৎ সমস্ত আকাশটা দেখ্‌তে পাওয়া যায়, ঝড় সমস্ত মাঠটাকে আপনার হাতে পায়— বৃষ্টি মাঠের উপর দিয়ে চলে চলে আসে, দূরে থেকে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখা যায়। বর্ষার অন্ধকার ছায়াটাকে আপনার চতুর্দ্দিকে প্রকাণ্ড ভাবে বিস্তৃত দেখ্‌তে পাওয়া যায়। খুব দূর থেকে হুহুঃশব্দ করতে করতে, ধূলো, শুক্‌নো পাতা এবং ছিন্নবিচ্ছিন্ন স্তূপাকার মেঘ

উড়িয়ে নিয়ে অকস্মাৎ আমাদের এই বাগানের উপর মস্ত একটা ঝড় এসে পড়ে— তার পরে, বড় বড় গাছগুলোর ঝুঁটি ধরে যে নাড়া দিতে থাকে সে এক আশ্চর্য্য দৃশ্য। ফলে পরিপূর্ণ আমগাছ তার সমস্ত ডালপালা নিয়ে ভূমিতে লুটিয়ে লুটিয়ে পড়ে— কেবল শালগাছগুলো বরাবর খাড়া দাঁড়িয়ে আগাগোড়া থর্ থর্ করে কাঁপতে থাকে। মাঠের মাঝখানে আমাদের বাড়ি— সুতরাং চতুর্দ্দিকের ঝড় এরি উপরে এসে পড়ে ঘুরপাক খেতে থাকে; সেদিন ত একটা দরজা টুক্‌রো টুক্‌রো করে ভেঙ্গে আমাদের ঘরের মধ্যে এসে উপস্থিত— যে কাণ্ডটা করলেন তার থেকে স্পষ্টই বোঝা গেল অরণ্যই এঁর উপযুক্ত স্থান— ভদ্রলোকের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করবার মত সহবৎ শিক্ষা হয় নি; অবিশ্যি, কার্ড পাঠিয়ে ঢোকা প্রভৃতি নব্য রীতি এঁর কাছ থেকে প্রত্যাশা করাই যেতে পারেনা, কিন্তু ভিজে পায়ে ঢুকে গৃহস্থ ঘরের জিনিষপত্র সমস্ত লণ্ডভণ্ড করে দেওয়াই কি সনাতন প্রথা? কিন্তু এরকম অশিষ্টাচরণ সত্ত্বেও লেগেছিল ভাল। বহুকাল এরকম রীতিমত ঝড় দেখিনি। এখানকার লাইব্রেরিতে একখানা মেঘদূত আছে, ঝড়বৃষ্টিদুর্য্যোগে, রুদ্ধদ্বার গৃহপ্রান্তে তাকিয়া আশ্রয় করে দীর্ঘ অপরাহ্ণে সেইটি সুর করে করে পড়া গেছে— কেবল পড়া নয়— সেটার উপরে ইনিয়ে বিনিয়ে বর্ষার উপযোগী একটা কবিতা লিখেও ফেলেছি। মেঘদূত পড়ে কি মনে হচ্ছিল জান? বইটা বিরহীদের জন্যেই লেখা বটে— কিন্তু এর মধ্যে আসলে বিরহের বিলাপ খুব অল্পই আছে— অথচ সমস্ত

ব্যাপারটা ভিতরে ভিতরে বিরহীর আকাঙ্ক্ষায় পরিপূর্ণ। বিরহাবস্থার মধ্যে একটা বন্দীভাব আছে কিনা— এই জন্যে বাধাহীন আকাশের মধ্যে মেঘের স্বাধীন গতি দেখে অভিশাপগ্রস্ত যক্ষ আপনার দুরন্ত আকাঙ্ক্ষাকে তারি উপরে আরোপণ করে বিচিত্র নদী পর্ব্বত বন গ্রাম নগরীর উপর দিয়ে আপনার অপার স্বাধীনতার সুখ উপভোগ কর্ত্তে কর্ত্তে ভেসে চলেছে। মেঘদূত কাব্যটা সেই বন্দীহৃদয়ের বিশ্বভ্রমণ। অবশ্য, নিরুদ্দেশ্য ভ্রমণ নয়— সমস্ত ভ্রমণের শেষে বহুদূরে একটি আকাঙ্ক্ষার ধন আছে— সেইখানে চরম বিশ্রাম— সেই একটি নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য দূরে না থাকলে এই লক্ষ্যহীন ভ্রমণ অত্যন্ত শ্রান্তি ও ঔদাস্যের কারণ হত। কিন্তু সেখানে যাবার তাড়াতাড়ি নেই— রয়ে বসে আপনার স্বাধীনতাসুখ সম্পূর্ণ উপভোগ করে, পথিমধ্যস্থিত বিচিত্র সৌন্দর্য্যের কোনটিকেই অনাদরে উল্লঙ্ঘন না করে রীতিমত Oriental রাজমাহাত্ম্যে যাওয়া যাচ্চে। যক্ষের দিক থেকে দেখ্‌তে গেলে সেটা হয়ত ঠিক "ড্রামাটিক" হয় না— একটা দক্ষিণে' ঝড় উঠিয়ে একেবারে হুস্‌ করে সেখানে গিয়ে পড়লেই বোধ হয় তার পক্ষে ঠিক হত কিন্তু তাহলে পাঠকদের অবস্থা কি হত বল দেখি? আমরা এই বর্ষার দিনে ঘরে বদ্ধ হয়ে আছি— মনটা উদাস হয়ে আছে, আমাদের একবার মেঘের মত মহাস্বাধীনতা না দিলে অলকাপুরীর অতুল ঐশ্বর্য্যের বর্ণনা কি তেমন ভাল লাগ্‌ত। আজ বর্ষার দিনে মনে হচ্ছে পৃথিবীর কাজকর্ম্ম সমস্ত রহিত

হয়ে গেছে, কালের মস্ত ঘড়িটা বন্ধ, বেলা চল্‌চে না— তবুও আমি বন্ধ হয়ে আছি ছুটি পাচ্চি নে। আজ এই কর্ম্মহীন আষাঢ়ের দীর্ঘদিনে পৃথিবীর সমস্ত অজ্ঞাত অপরিচিত দেশের মধ্যে বেরিয়ে পড়্‌লে বেশ হয়— আজ ত আর কোন দায়িত্বের কাজ কিছুই নেই— সংসারের সহস্র ছোটখাট কর্ত্তব্য আজকের এই মহাদুর্য্যোগে স্থানচ্যুত হয়ে অদৃশ্য হয়েছে— আজ তেমন সুযোগ থাক্‌লে কে ধরে রাখ্‌তে পারত? যে সকল নদীগিরি নগরীর সুন্দর বহুপ্রাচীন নাম বহুকাল থেকে শোনা যায় মেঘের উপরে বসে সেগুলো দেখে আস্‌তুম। বাস্তবিক কি সুন্দর নাম! নাম শুন্‌লেই টের পাওয়া যায় কত ভালবেসে এই নামগুলি রাখা হয়েছিল এবং এই নামগুলির মধ্যে কেমন একটি শ্রী ও গাম্ভীর্য্য আছে! রেবা, শিপ্রা, বেত্রবতী, গম্ভীরা, নির্ব্বিন্ধ্যা;— চিত্রকূট, আম্রকূট, বিন্ধ্য; দশার্ণ, বিদিশা, অবন্তী, উজ্জয়িনী; এদেরই সকলের উপরে নববর্ষার মেঘ উঠেছে, এদেরই যূথীবনে বৃষ্টি পড়চে এবং জনপদবধূরা কৃষিফলের প্রত্যাশায় স্নিগ্ধনেত্রে মেঘের দিকে চাচ্চে। এদের জম্বুকুঞ্জে ফল পেকে আকাশের মেঘের মত কালো হয়ে উঠেছে— দশার্ণ গ্রামের চতুর্দ্দিকে কেয়াগাছের বেড়াগুলিতে ফুল ধরেছে— সেই ফুলগুলির মুখ সবে একটুখানি খুল্‌তে আরম্ভ করেছে। মেঘাচ্ছন্ন রাত্রে উজ্জয়িনীর গৃহস্থ ঘরের ছাদের নীচে পায়রাগুলি সমস্ত ঘুমিয়ে রয়েছে— রাজপথের অন্ধকার এম্‌নি প্রগাঢ় যে সূচি দিয়ে ভেদ করা যায়। কবির প্রসাদে আজকের দিনে যদি মেঘের রথ পাওয়াই গেল তাহলে এসব দেশ না দেখে কি

যাওয়া যায়? যক্ষের যদি এতই তাড়া ছিল তাহলে ঝোড়ো বাতাসকে কিম্বা বিদ্যুৎকে দূত করলেই ঠিক হত— যক্ষ যদি ঊনবিংশ শতাব্দীর হয় তাহলে টেলিগ্রাফের উল্লেখ করা যেতে পারে। সেকালের দিনে যদি এখনকার মত তীক্ষ্নদর্শী ক্রিটিকসম্প্রদায় থাকৃত তাহলে কালিদাসকে মহা জবাবদিহিতে পড়তে হত— তাহলে এই ক্ষুদ্র সোনার তরীটি লিরিক্, ড্রামাটিক্, ডেস্‌ক্রিপ্টিভ্, প্যাষ্টোরাল প্রভৃতি ক্রিটিক-দের কোন্ পাহাড়ে ঠেকে ডুবি হত বলা যায় না। আমি এই কথা বলি যক্ষের পক্ষে কবির আচরণ যেমনি হোক্ আমার পক্ষে ভারি সুবিধে হয়েছে— ক্রিটিকের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হয়ে বলচি, dramatic হয়নি, কিন্তু আমার বেশ লাগ্‌চে। আমার আর একটা কথা মনে পড়চে— যে সময়ে কালিদাস লিখেছিল সে সময়ে কাব্যে লিখিত দেশদেশান্তরের নানা লোক প্রবাসী হয়ে উজ্জয়িনী রাজধানীতে বাস করত তাদেরও ত বিরহব্যথা ছিল— এইজন্যে অলকা যদিও মেঘের Terminus, তথাপি বিবিধ মধ্যবর্তী স্টেশনে এই সকল বিরহী হৃদয়দের নাবিয়ে দিয়ে দিয়ে যেতে হয়েছিল। সে সময়কার নানা বিরহকে নানাদেশবিদেশে পাঠাতে হয়েছিল, তাই জন্যে অলকায় পৌঁছতে একটু দেরি হয়েছিল— এজন্যে হতভাগ্য যক্ষের এবং তদপেক্ষা হতভাগ্য ক্রিটিকের নিকট কবির সমুচিত apology করা হয়নি— কিন্তু সেটাকে তাঁরা যদি public grievance বলে ধরেন তাহলে ভারি ভুল করা হয়। আমি ত বলতে পারি এতে খুসি আছি। বর্ষাকালে সকল লোকেরই

কিছু না কিছু বিরহের দশা উপস্থিত হয়— এমন কি প্রণয়িণী কাছে থাক্‌লেও হয়— কবি নিজেই লিখেছেন—

"মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তিচেতঃ
কণ্ঠাশ্লেষে প্রণয়িনিজনে, কিংপুনর্দূরসংস্থে।"

অর্থাৎ মেঘ্‌লা দিনে প্রণয়িনী গলায় লেগে থাক্‌লেও সুখী লোকের মন উদাসীন হয়ে যায় দূরে থাক্‌লে ত কথাই নেই! অতএব কবিকে বর্ষার দিনে এই জগদ্ব্যাপী বিরহীমণ্ডলীকে সান্ত্বনা দিতে হবে কেবল ক্রিটিক্‌কে না। এই বর্ষার অপরাহ্নে ক্ষুদ্র আত্মকোটরের মধ্যে অবরুদ্ধ বন্দীদিগকে সৌন্দর্য্যের স্বাধীনতাক্ষেত্রে মুক্তি দিতে হবে— আজকের সমস্ত সংসার দুর্য্যোগের মধ্যে রুদ্ধ হয়ে অন্ধকার হয়ে বিষণ্ণ হয়ে বসে আছে!

মেঘদূত পড়তে পড়তে আর একটা চিন্তা মনে উদয় হয়। সেকালেই বাস্তবিক বিরহী বিরহিণী ছিল এখন আর নেই। পথিকবধূদের কথা কাব্যে পড়া যায় কিন্তু তাদের প্রকৃত অবস্থা আমরা ঠিক অনুভব কর্ত্তে পারিনে। পোষ্টঅফিস্‌ এবং রেলগাড়ি এসে দেশ থেকে বিরহ তাড়িয়েছে। এখন ত আর প্রবাস বলে কিছু নেই— তাইজন্যে বিরহিণীরা আর কেশ এলিয়ে আর্দ্রতন্ত্রীবীণা কোলে করে ভূমিতলে পড়ে থাকে-না। ডেস্কের সাম্‌নে বসে চিঠি লিখে মুড়ে টিকিট লাগিয়ে ডাকঘরে পাঠিয়ে দেয় তার পরে নিশ্চিন্তমনে স্নানাহার করে। এমন কি ইংরাজ রাজত্বেও কিছুদিন পূর্ব্বে যখন ভালরূপ

রাস্তাঘাট যানবাহনাদি ও পুলিষের বন্দোবস্ত হয়নি তখনো প্রবাস বলে একটা সত্যিকার জিনিষ ছিল— তাই

"প্রবাসে যখন যায় গো সে
তারে বলি বলি আর বলা হলনা!"

কবিদের এ সকল গানের মধ্যে এতটা করুণা প্রবেশ করেছিল। তুমি মনে কোরো না আমি এতদূর নির্লজ্জ কৃতঘ্ন যে চিঠির মধ্যেই পোষ্ট্ অফিসের বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ করচি! আমি পোষ্ট্ অফিসের বিশেষ পক্ষপাতী কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও স্বীকার করচি যে যখন মেঘদূত বা কোনো প্রাচীন কাব্যে বিরহিণীর কথা পড়ি— তখন মনের মধ্যে ইচ্ছে করে ঐরকম সত্যিকার বিরহিণী আমার জন্যে যদি কোন প্রবাসে বিরহ শয়ানে বিলীন হয়ে থাকে এবং আমি যদি জড় অথবা চেতন কোন দূতের সাহায্যে অথবা কল্পনার প্রভাবে সেটা জান্‌তে পারি তাহলে বেশ হয়! স্বদেশেই থাক্ বিদেশেই থাক্ এবং ভালবাসা যেমনই থাক্ সকলেই বেশ comfortably কালযাপন করচে এটা কি রকম গদ্যোপযোগী শোনায়!— বাইরে খুব বৃষ্টি হচ্চে— বাতাস বচ্চে এবং সন্ধের অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে আস্‌চে। বহুকষ্টে আমার অক্ষর দেখ্‌তে পাচ্চি— দিনের আলো সম্পূর্ণ নির্ব্বাপিত হবার পূর্ব্বেই চিঠিটা শেষ করে ফেলবার জন্যে একেবারে হুহু করে লিখে চলেছি— চিন্তাশক্তি মাঝে মাঝে বিশ্রাম করবার কিম্বা নূতন steam সঞ্চয় করবার অবসর পাচ্চে না— কিন্তু আজ বোধ হয় শেষ হল না— কাল সকালে শেষ করা যাবে।—

ভরসা করি এ চিঠিটা যখন তোমার হাতে গিয়ে পৌঁছবে তখন চুয়োডাঙ্গার আকাশ অন্ধকার করে মেঘ করেছে এবং সমস্ত প্রান্তর ব্যাপ্ত করে ঝুপ্‌ঝুপ্‌ শব্দে বৃষ্টি হচ্চে। নইলে রোদ্দুরে যদি চারদিক ধূধূ করতে থাকে, ঘাসগুলি যদি সমস্ত শুকিয়ে হল্‌দে হয়ে এসে থাকে, এবং আকাশের কোন প্রান্তভাগে যদি মেঘের আশ্বাসমাত্র না থাকে, তাহলে এই বর্ষাজীবী চিঠিটা নিতান্ত অকালমৃত্যুর হাতে গিয়ে পড়বে। বর্ষাকালটা কিনা প্রকৃতির সাধারণ অবস্থার একটা ব্যতিক্রম-দশা। সূর্য্যনক্ষত্র প্রভৃতি প্রকৃতির সর্ব্বাপেক্ষা নিত্যলক্ষণগুলি বিলুপ্ত, তার স্থানে ক্ষণিক মেঘের ক্ষণিক রাজত্ব,— প্রকৃতির দৈনন্দিন জগতের বিচিত্র জীবনকলরব মৌন— তারি স্থানে অবিশ্রাম একতান বৃষ্টির ঝর্‌ঝর্‌ শব্দ— সবসুদ্ধ এই রকম ক্ষণস্থায়ী একটা বিপর্য্যয় ভাব। সুতরাং প্রকৃতি প্রকৃতিস্থ হবামাত্রই একটু রোদ্‌ উঠলেই বর্ষার কথা সমস্ত ভুলে যেতে হয়। বর্ষার সম্পূর্ণ ভাবটি আর মনের মধ্যে আনা যায় না— তাই আশঙ্কা হচ্চে পাছে চিঠিটা জ্যৈষ্ঠমাসের মধ্যাহ্নতাপের সময় তোমার হাতে গিয়ে পৌঁছয়। চিঠির একটা মস্ত অভাব হচ্চে ঐ— বৃষ্টির চিঠি রৌদ্রের সময় গিয়ে পৌঁছয়, সন্ধের চিঠি সকালে উপস্থিত হয়— উভয়পক্ষের মধ্যে পরিপূর্ণ সমবেদনা থাকে না। ঘনীভূত অন্ধকার সায়াহ্নে বাতি জ্বেলে একলা বসে যে চিঠিটা লেখা হয় সেটা যদি তুমি প্রাতঃকালে মুখপ্রক্ষালনপূর্ব্বক সপরিবারে চা-রুটি সেবন করতে করতে পাঠ কর তাহলে কি রকম পাপানুষ্ঠান হয় ভেবে দেখ দেখি—

চুরি করে লোকের ডায়ারি পড়লে যে পাপ হয় এটা তার চেয়ে কিছু কম নয়।

তোমার এবারকার চিঠিতেও “ছবি ও গানে”র কথা আছে— বিষয়টা আমার পক্ষে খুব মনোরম সন্দেহ নেই। আজকাল যে সকল কবিতা লিখ্‌চি তা' ছবি ও গান থেকে এত তফাৎ যে, আমি ভাবি, আমার লেখার আর কোথাও পরিণতি হচ্চে না, ক্রমাগতই পরিবর্ত্তন চলেছে। আমি বেশ অনুভব করতে পারচি আমি যেন আর একটা পরিবর্ত্তনের সন্ধিস্থলে আসন্ন অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছি। এরকম আর কতকাল চল্‌বে তাই ভাবি। অবশেষে একটা জায়গা ত পাব যেটা বিশেষ-রূপে আমারি জায়গা। অবিশ্রাম পরিবর্ত্তন দেখ্‌লে ভয় যে, এতকাল ধরে এতগুলো যে লিখলুম সেগুলো কিছুই হয়ত টিঁক্‌বে না— আমার নিজের যেটা যথার্থ চরম অভিব্যক্তি সেটা যতক্ষণ না আসে ততক্ষণ এগুলো কেবল Tentative ভাবে আছে। বাস্তবিক, কোন্‌টা সত্যি, কোন্‌টা মিথ্যে কবে যে ধরা পড়বে তার ঠিক নেই। কিন্তু আমি দেখেছি, যদিও এক এক সময়ে সন্দেহের অন্ধকারে মন আচ্ছন্ন হয়ে যায়, এবং আমার পুরাতন সমস্ত লেখার উপরেই অবিশ্বাস জন্মে তবু মোটের উপরে মন থেকে এই আত্মবিশ্বাসটুকু যায় না যে, যদি যথেষ্টকাল বেঁচে থাকি তাহলে এমন একটা দৃঢ় প্রতিষ্ঠাভূমিতে গিয়ে পৌঁছব যেখেন থেকে কেউ আমাকে স্থানচ্যুত করতে পারবে না। কিন্তু এরকম আত্মবিশ্বাস আরো সহস্র সহস্র লোকের ছিল এবং আছে— এবং তাদের

ভ্রান্ত জীবন নিষ্ফল হয়েছে এবং হবে— অতএব এরকম আত্মবিশ্বাস কোন বিষয়ের প্রমাণ বলে ধ'রে লওয়া যায় না। এই দেখ, খুব এক চোট অহমিকার অবতারণা করা গেল— কিন্তু চারটে চিঠির কাগজ পোরাতে গেলে অবশেষে "অহং" বই আর গতি নেই— এতটি জায়গা জোড়া আর কারো সাধ্য নেই। আর সকল খবর সকল আলোচনাই ফুরিয়ে যায়— এর কথা আর শেষ হয় না— অতএব দীর্ঘ চিঠির প্রত্যাশা কর যদি, ত সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ এই অহম্পুরুষকে বহুল পরিমাণে সহ্য করতে হবে।

কলকাতার খবর জান? শুনচি "রাজা ও রাণী" আগামী শনিবারে অভিনয় হবে— যদি সুবিধে হয় ত একবার দেখ্‌তে যাব।—সাহিত্যসমিতিতে যে অধিবেশনে রৈবতক সমালোচনা হয় সেবারে তুমি ছিলে না— সেজন্যে তোমার আপ্‌শোষ করবার কারণ কিছুই নেই। যে রকম মনে করেছিলুম সে রকম লোক তোমাদের সমিতিতে নেই— অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের দম্ভটুকু আছে। ... অতখানি একটা সমালোচনা পড়ে গেলেন তার মধ্যে না আছে রচনাচাতুর্য্য, না আছে ভাব-প্রাচুর্য্য।... তত্ত্বজ্ঞ হতে পারেন কিন্তু রসজ্ঞ কিছুমাত্র নন। অন্য যাঁরা বসে শুন্‌ছিলেন তাঁরাও কেউ বুদ্ধিলক্ষণযুক্ত দুটো কথা যুটিয়ে বল্‌তে পারলেন না।...... মস্তিষ্কগহ্বর নিতান্ত কুহেলিকাচ্ছন্ন— অন্যান্য সভ্যদের এখনো ভালরূপ পরিচয় পাইনি— কিন্তু অনাথনাথ বাবুর বেশ একটি ভদ্র শোভনভাব আছে এবং তিনি মনে করেন না যে তিনি পৃথিবীতে এসে একটি প্রতিভার অগ্নিকাণ্ড করবেন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৫] ওঁ Dariapur Katchari
Shazadpur
১৪ মাঘ [১২৯৭]

ভাই প্রমথ

এতদিন আমার ঠিকানার স্থিরতা ছিল না বলে তোমাকে লিখতে পারিনি। কালিগ্রামে ছিলুম কিন্তু কখন্ সেখান থেকে ছাড়তে হবে ঠিক জানতুম না। এখন সাহাজাদপুরে এসে পৌঁচেছি— এখানে নিদেন দিন দশেক থাক্‌তেই হবে। তোমরা কি এখন হরিপুরে আছ— যদি রেলপথে আস্‌তুম তাহলে নাটোর দিয়ে তোমাদের ওখানে একবার উঁকি মেরে যাবার ইচ্ছে ছিল— কিন্তু আত্রাই থেকে সাহাজাদপুর রেলে আসা এমনি অসুবিধে যে অবশেষে বোটে করেই এলুম। তোমরা কি বিরাহিমপুরে আমার সঙ্গ নিতে পারবে? তা হলে বেশ মজা হয়। একা একা কেবল রাজ্যশাসন করে আর পারা যায় না— জমিজমা এবং বাকিবকেয়া ব্যতীত বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আর পাঁচ রকমের সদালাপ করবার ইচ্ছে হচ্চে। সঙ্গে দুটি চারটি বই আছে তাই বেঁচে আছি— তা ছাড়া একটু আধটু লেখাও চল্‌ছে— নিতান্ত ব্যাকুল হয়ে পড়বার বড় একটা সময় নেই। মানসী জন্মাবার পরে আমার ঘরে আর একটি শারীরী জন্মগ্রহণ করেচে সে খবর বোধ হয় এতদিনে পেয়েছ— অতএব আমাকে যথানিয়মে congratulate করতে বিলম্ব করবে না। নবদম্পতির খবর কি? মেনা কি এখন পতিগৃহ অবলম্বন করেচেন? তোমাদের সেই

বিবাহরাত্রের গোলযোগ সমস্ত মিটে গেছে ত? ডাকের সময় অনেকটা নিকটবর্ত্তী হয়ে এল— অতএব এইখানেই ইতি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৬] ওঁ পোস্টমার্ক, শাজাদপুর

ভাই প্রমথ

এই খানিকক্ষণ হল তোমার চিঠি পেলুম। সেদিন কলকাতার চিঠিতে তোমার কন্‌ভোকেশনে উপস্থিতির খবর পেয়ে আমি ঠাওরেছিলুম তবে বুঝি তুমি এখনো কলকাতায় আছ এবং আমার পত্রখণ্ড তোমাদের হরিপুরের মাঠে মারা গেল। কিন্তু তোমার চিঠিতে জানা গেল, আমার চিঠি রক্ষে পেয়েছে এবং তৎপরিবর্ত্তে সেখানকার মাঠে বাঘ বরাহ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগুলো মারা পড়চে। আমি এখানে আমার সাম্‌নের এই সব কটা জান্‌লা খুলে দিয়ে এখানকার দুপুরের রৌদ্রে বড়বড়গাছওয়ালা কাঁচা রাস্তার উপর দিয়ে পাড়াগাঁয়ের অনতিব্যস্ত লোকচলাচলের প্রতি অনিমেষ নেত্র নিহিত রেখে এমনি অন্যমনস্ক উড়ো উড়ো ভাবে থাকি যে একটু মনঃসংযোগ করে একটা ভদ্ররকম প্রমাণসই চিঠি যে লিখ্‌ব তার সামর্থ্য নেই। এই ক্ষুদ্রায়তন কাগজে দুটো চারটে অসংলগ্ন কথা লিখে কোনমতে সাঙ্গ করে দিতে হয়। এখানকার বাতাসে এবং বাহ্যদৃশ্যে এমন একটা আলস্য, ঔদাস্য, বৈরাগ্য অথচ

এমন একটা মাধুর্য্য আছে যে আমার মন কিছুতে নিবিষ্ট হয়ে আছে কি বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে কিছু বুঝ্‌তে পারচি নে। মানসী সম্বন্ধে যে লিখেছ, যে তারমধ্যে একটা Despair এবং Resignationএর ভাব প্রবল, সেই কথাটা আমি ভাব্‌ছিলুম। প্রতিদিনই আমি দেখ্‌তে পাচ্চি নিজের রচনা এবং নিজের মন সম্বন্ধে সমালোচনা করা ভারি কঠিন। আমি বের করতে চেষ্টা করছিলুম এই Despair এবং Resignationএর মূলটা কোন্‌খানে। আমার চরিত্রের কোন্‌খানে সেই কেন্দ্রস্থল আছে যেখানে গিয়ে আমার সমস্তটার একটা পরিষ্কার মানে পাওয়া যায়। কড়ি ও কোমলের সমালোচনায় আশু যখন বলেছিলেন জীবনের প্রতি দৃঢ় আশক্তিই আমার কবিত্বের মূলমন্ত্র, তখন হঠাৎ একবার মনে হয়েছিল হতেও পারে, আমার অনেকগুলো লেখা তাতে করে পরিস্ফুট হয় বটে। কিন্তু এখন আর তা মনে হয় না। এখন একএকবার মনে হয় আমার মধ্যে দুটো বিপরীত শক্তির দ্বন্দ্ব চল্‌চে। একটা আমাকে সর্ব্বদা বিশ্রাম এবং পরিসমাপ্তির দিকে আহ্বান করচে, আর একটা আমাকে কিছুতে বিশ্রাম করতে দিচ্চে না। আমার ভারতবর্ষীয় শান্তপ্রকৃতিকে য়ুরোপের চাঞ্চল্য সর্ব্বদা আঘাত করচে— সেইজন্যে একদিকে বেদনা আর একদিকে বৈরাগ্য। এক দিকে কবিতা আর একদিকে ফিলজাফি। একদিকে দেশের প্রতি ভালবাসা আরএকদিকে দেশহিতৈষিতার প্রতি উপহাস। একদিকে কর্ম্মের প্রতি আসক্তি আরএকদিকে

চিন্তার প্রতি আকর্ষণ। এইজন্যে সবসুদ্ধ জড়িয়ে একটা নিষ্ফলতা এবং ঔদাস্য। এটা তোমার কি রকম মনে হয়? তুমি কিভাবে দেখ সেটা আমাকে একটু পরিষ্কার করে লিখো— তোমাদের দ্বারা আমার নিজেকে objectively দেখ্‌তে ইচ্ছে করে। নিজের মধ্যে নিজেকে দেখ্‌তে চেষ্টা করা দুরাশা— কারণ আমার প্রতিমুহূর্ত্তই আমার নিজের কাছে এমনি জীবন্ত এবং বলবান যে, মোটের উপরে আমি যে কী তা দেখতে পাইনে। কখনো আশা কখনো নৈরাশ্য কখনো গর্ব্ব কখনো গ্লানি অনুভব করি কিন্তু নিজের ঠিক পরিমাণটা পাইনে। আমি যখন আমার কাব্য সমালোচনা করতে চেষ্টা করি তখন বর্ত্তমান মুহূর্ত্তটাই ক্রিটিক হয়ে বসেন কিন্তু তার কথা কিছুমাত্র বিশ্বাসযোগ্য নয়;— তোমরা যখন সমালোচনা কর তখন আমার পূর্ব্বের সঙ্গে পর এবং একটার সঙ্গে আরেকটা মিলিয়ে দেখ্‌তে পার। Bashkirtsiff-এর Journal আমিও পড়ছি— মন্দ লাগ্‌চেনা কিন্তু মোটের উপরে কষ্টকর ঠেক্‌চে। এর থেকে মাঝে মাঝে অনেকগুলো কথা মনে আসে— কিন্তু যেটুকু স্থান অবশিষ্ট আছে তার মধ্যে আর সে সকল উত্থাপন করা যেতে পারে না— অতএব আজ বিদায়—

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৭ মাঘ ১৮৯১

ভাই প্রমথ

হঠাৎ আজ প্রাতঃকালে আমার দক্ষিণ কাঁধে বাতের মত হয়েছে— মাথা এবং হাত নাড়া দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে— এবং পৃষ্ঠদেশ— যাকে সর্ব্বদাই পশ্চাতে ফেলে রেখেছি— যাকে চক্ষেও দেখিনে— বহুপরিশ্রমের পর চৌকিতে ঠেসান দেবার সময় ব্যতীত যার অস্তিত্ব কখনো অনুভব করা যায় না সেই সর্ব্বপশ্চাদ্বর্ত্তী পৃষ্ঠদেশই আপনাকে চেতনারাজ্যের একাধিপতি করে রেখেছে। তোমাকে এই যে ক'লাইন চিঠি লিখ্‌লুম এর মধ্যে অনেক মুখভঙ্গী এবং আর্ত্তনাদ অব্যক্তভাবে প্রচ্ছন্ন আছে। বর্ত্তমান এই ব্যাধিটার তুলনায় মানসীর সমস্ত ঔদাস্য এবং নৈরাশ্য অত্যন্ত মিথ্যা এবং নিতান্ত সৌখীন বলে মনে হচ্চে। পিঠ এবং কাঁধকে হৃদয় এবং আত্মার চেয়ে অনেক বেশি মনে হচ্চে। অতএব আজ মানসী সম্বন্ধে ঠিক সমালোচনাটা আমার কাছ থেকে প্রত্যাশা করা যেতে পারে না। ভাল করে ভেবে দেখ্‌তে গেলে মানসীর ভালবাসার অংশটুকুই কাব্যকথা— বড় রকমের সুন্দর রকমের খেলা মাত্র— ওর আসল সত্যিকথাটুকু হচ্চে এই যে, মানুষ কি চায় তা কিচ্ছু জানে না— এক ঘটি জল চায়, কি আধখানা বেল চায়, জিজ্ঞাসা করলে বল্‌তে পারেনা, আমি এমন অবস্থায় মনের সঙ্গে আপষে বোঝাপড়া করে কল্পনার কল্পবৃক্ষের মায়াফল পাড়বার চেষ্টা করচি।

যখন জানি, সত্য একে নিতান্ত অসন্তোষজনক, তার উপরে আবার রূঢ়ভাবে মানবমনের মুখের উপর সর্ব্বদা জবাব করে— তাই ধ্যানভরে কল্পনা-সিদ্ধ হবার চেষ্টা করা যাচ্ছে— কল্পনার কাছ থেকেও পুরো ফল [পাওয়া] যায় না— কিন্তু সত্যের চেয়ে সে ঢের বেশি আজ্ঞাবহ। তাই জন্যেই "সাধ যায় সত্য যদি হত কল্পনা"— আমি দুটো যদি এক করতে পারতুম। অর্থাৎ আমি যদি ঈশ্বর হতে পারতুম! মানুষের মনে ঈশ্বরের মত অসীম আকাঙ্ক্ষা আছে, কিন্তু ঈশ্বরের মত অসীম ক্ষমতা নেই— কেউবা বল্‌চে, আছে— বলে বহির্জ্জগতে চেষ্টা করে বেড়াচ্ছে— কেউবা জানে, নেই— তাই আকাঙ্ক্ষারাজ্যে বসেই অর্দ্ধ-নিরাশ্বাসভাবে কল্পনাপুত্তলী গড়িয়ে তাকে পূজো করচে। একেই বল ভালবাসা? আমার ভালবাসবার লোক কই? আমি ভালবাসি অনেককে— কিন্তু মানসীতে যাকে খাড়া করেচি সে মানসেই আছে— সে Artist-এর হাতে রচিত ঈশ্বরের প্রথম অসম্পূর্ণ প্রতিমা। ক্রমে সম্পূর্ণ হবে কি?

রবিকা

[৮] [শিলাইদা]
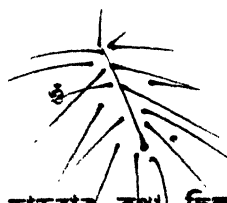
ভাই প্রমথ

যেদিন সাহাজাদপুর ছাড়বার কথা ছিল তার পরদিন ছাড়া গেল। মনে করেছিলুম আরো কিছুদিন দেরী হয়ে যেতে পারে কিন্তু তা আর হল না। এখন আমি শিলাইদহ

বোটে। এখানে এসে আমার শরীরের সমস্ত ব্যাধি একদিনে দূর হয়ে গেছে। জায়গাটা ভারি ভাল। এখন তুমি যখন আস্‌তে চাও আমাকে হাজির পাবে। কেবল একবার সময় থাকৃতে জানালে যথাকালে বোট নিয়ে বাজিদ্‌পুর ঘাটে তোমাকে সাদর অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসবার জন্য অগ্রসর হয়ে থাকৃতে পারি। অতএব সংবাদ দিতে শৈথিল্য করবে না। এখানে এসে আমার কাজ বিস্তর বেড়ে গেছে। লেখাটা আর বড় এগোচ্চে না। মৌলবী সর্ব্বদাই সঙ্গে সঙ্গে লেগে আছে। ক্রমাগত বক্‌চে— আমাকে ত পাগল করে তুল্লে। সাজাদপুরে বাত যেমন আমার কাঁধে চেপেছিল, এখানে মৌলবী তার চেয়ে কিছু কম নয়। সে মনে করে কালহরণের জন্যে অক্রুর পক্ষে সে যে রকম অত্যাবশ্যক ছিল আমার পক্ষেও বুঝি তাই— তাই নিতান্ত সাধু উদ্দেশ্য এবং প্রবল পরহিতৈষা থেকে সে ক্রমাগত দেশবিদেশের সম্ভব অসম্ভব গল্প জুড়ে দিয়েচে। আজ সকালবেলায় সে উপস্থিত নেই তাই ভারি আরাম বোধ হচ্চে। তোমরা এখানে এসে যদি বাঘ শিকার কর্ত্তে গিয়ে এ'কে দৈবক্রমে শিকার করে আনতে পার তা হলে এ মুল্লুকে আমার কিছুকাল নির্ব্বিঘ্নে বাস করা সম্ভব হয়। অলমতি বিস্তরেণ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভাই প্রমথ

তুচ্ছ ঘাড়টার কথা লিখ্‌তে ইচ্ছে করে না— কিন্তু তাকে যতই তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করি না কেন, আজকাল আমার সমস্ত মনুষ্যত্বের মধ্যে ঐটেই সর্ব্বপ্রধান হয়ে উঠেছে ;— আমার মানসী যদি মূর্ত্তিমতী হয়ে, আমার কল্পনা যদি সত্য হয়ে এখনি আমার বামপাশে এসে দাঁড়ায় তা হলে মাথাটা ফিরিয়ে যে তার দিকে চেয়ে দেখ্‌ব এমন সম্ভাবনা নেই— কিম্বা তার সঙ্গে যে দুদণ্ড "জীবনমরণব্যাপী সুগম্ভীর কথা" ক'ব তাও হয়ে' ওঠে না— বোধ হয় তাকে বলি "ভাই, আমার ঘাড়ে একটু Rhus Tox Liniment মালিশ করে দাও না!" সে যদি প্রীতির উচ্ছ্বাস ভরে গলা জড়িয়ে ধরে' আমাকে আলিঙ্গন করতে আসে তাহলে কাকুতি-মিনতি করে তাকে ক্ষান্ত করতে হয়। একবার ভেবে দেখ দেখি, অমর জীবাত্মার ঘাড়ে বাত হয়েছে ; এর চেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার আর কিছু আছে! মাঝে মাঝে আবার কোমরটার কাছেও কামড়াচ্চে— মনে কিছু ভয় হয়েচে। যদি ষোলো আনা বাতের মত দেখা দেয় তা হলেই মরেচি আর কি। আগামী রবিবার রাত্রে আমি কোনমতে এখান থেকে প্রস্থান করব। সোমবার শিলাইদহ গিয়ে পেঁছব। তুমি হরিপুরে যেতে লিখেছ এখন আমার যেতে সাহস হচ্চে না— এবং যাবার অনেক বৈষয়িক বিঘ্ন আছে। কিন্তু তুমি আমাকে ফাঁকি দিয়ো না। তুমি কবে এবং কখন পাবনা পৌঁছতে পারবে আমাকে লিখো। কেননা আমি বোট নিয়ে

পাবনার নিকটবর্ত্তী বাজিদ্‌পুরের ঘাটে আগে থাকতে প্রস্তুত থাক্‌তে পারব। নইলে তুমি মুস্কিলে পড়বে। শিলাইদহ এলে তুমি দুই একটি অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ লাভ করতে পারবে। যা হোক, খুব বেশি বিলম্ব কোরোনা— কারণ আমার অধিকদিন থাকবার ইচ্ছে নয়। অধিক লেখবার ক্ষমতা নেই— আজ তবে ইতি

রবিকা

[১০] ওঁ

ভাই প্রমথ

আমি মধ্যে দিন তিনেকের জন্যে পাবনা গিয়েছিলুম— আজ সকালে ফিরে এসে দেখ্‌লুম তোমার চিঠি অপেক্ষা করচে।

খবরের কাগজের সমস্ত প্রসঙ্গ যখন তুমি বাদ দিতে লিখেচ তখন চিঠি লেখাই একরকম অসম্ভব। ঘি বাদ দিয়ে লুচি ভাজ্‌তে বল্‌লে হয় লুচি ভাজা বন্ধ করতে হয় নয় অনুরোধটা একটু পরিবর্ত্তন করতে হয়। বিশেষতঃ তোমার দৃষ্টান্ত এবং উপদেশের কোন ঐক্য হয় নি। তোমার চিঠিতে কেবল কলকাতা প্রত্যাবর্ত্তনের খবর দিয়েচ।— আমার চিঠিরও প্রধান খবর এই যে, দিনকতক আমরা জলন্ত বাষ্পরাশির মত অনির্দিষ্টভাবে ঘুরে পুনর্ব্বার সংহত পিণ্ডের আকারে আপনার নির্জ্জন কক্ষপথে ছিট্‌কে পড়েছি। এখন

তিনজনের মধ্যে আমরা কে কি অবস্থায় তা বল্‌তে পারিনে। আমি ত সুশীতল এবং কঠিন হয়ে আমার নিত্যজীবনের প্রদক্ষিণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছি— লোকেনও বোধ হয় তথৈবচ। তুমি বোধ হয় বৃহস্পতি গ্রহের মত এখনও যথেষ্ট উত্তপ্ত এবং বাষ্পীয় অবস্থায় আছ। আজকাল তোমার স্পেসিফিক্ গ্র্যাভিটি কত আমাকে জানাবে। আমি কতক জমিদারীর কাজ দেখ্‌চি, কতক সাধনার জন্যে লিখ্‌চি এবং চেষ্টা করচি এরই মধ্যে একটুখানি অবসর করে নিয়ে লিখ্‌তে। কিন্তু হয়ে উঠ্‌চে না। কেননা কবিতা অন্যান্য ললনার মত একাধিপত্য প্রয়াসিনী। "আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি, তুমি অবসরমত বাসিয়ো" এ ঠিক তার সেণ্টিমেণ্ট নয়। এইজন্যে আমি কিছু মনের অসুখে আছি। বাস্তবিক এ জীবনে কবিতাই আমার সব প্রথম প্রেয়সী—তার সঙ্গে বেশিদিন বিচ্ছেদ আমার সহ্য হয় না। সুরেনের চিঠিতে দেখ্‌লুম কলকাতায় তোমরা খুব প্রমারা জমিয়েচ—শুনে খুসি হবে কালিগ্রামে একত্র নৌকাবাসকালীন্ লোকেনের কাছে আমিও দুই একটা lesson নিয়েছি— কিন্তু সম্পূর্ণ মনে আছে কিনা সন্দেহ। তিন চৌকির শাসন থেকে মুক্ত হয়ে আজকাল আমি নিয়মিত স্নানাহার করবার চেষ্টা করি— দন্তরোগে আহার করতে অক্ষম কিন্তু স্নানটা করি— স্নানের জল প্রস্তুত হয়েচে অতএব আজ উঠি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথঠাকুর

[১১] ওঁ পোস্টমার্ক, শিলাইদা

১৫ ডিসেম্বর, ১৮৯২

ভাই প্রমথ

তুমি বোধ হয় আজ এতক্ষণে আমার চিঠি পেয়ে সমস্ত অবগত হয়েচ। তোমার পাগল চাকরেরও কোন দোষ নেই এবং তার মনিবেরও কোন অপরাধ হয় নি। সমস্তই অদৃষ্টের কুচক্র। তুমি কেন আশঙ্কা করেচ যে তোমার ক্ষুদ্র পত্রের মধ্যে তুমি এমন কোন গলদ করে থাকবে যাতে আমার রাগ করবার সম্ভাবনা থাক্‌তে পারে। প্রথমতঃ আমার রাগী স্বভাব নয়— দ্বিতীয়তঃ গলদ্ আমিও ঢের করে থাকি এবং আশা রাখি আমার আত্মীয় বন্ধুরা সে রকম দুঃসময়ে আমাকে মার্জ্জনা করবেন। কবিত্বের অনবসর সম্বন্ধে দুঃখ করে কাল তোমাকে এক চিঠি লিখেচি— লিখে ভাবলুম বসে বসে দুঃখ করার চেয়ে দুঃখ মোচনের চেষ্টা করা ভাল। অমনি আমার বোটের শয্যাতল আশ্রয় করে একখানি শ্লেট হাতে করে বসে গেলুম। বেশ যখন একটু জমিয়ে নিয়েচি এমন সময় কাজ এসে পড়ল। সাধনার লেখা এখনকার মত একরকম চুকিয়েছি— এখন সেই ভাঙ্গা কবিতাটা নিয়ে এ ক'টা দিন কাটিয়ে দেব মনে করচি। আজ প্রবোধের চিঠিতে একটা খবর পেলুম তার কোন অর্থ বুঝতে পারলুম না— সে লিখেচে "তোমাকে গালি দিবার জন্য রাজসাহীতে যে ছাত্রসমিতির অধিবেশন হইয়াছিল তাহা এখানে Indian Daily News পত্রে পাঠ করিয়া বড়ই সুখী হইয়াছি।" ব্যাপারটা কি বল

দেখি? এটা কি বন্ধুত্বের পরিহাস? বন্ধুরা অনেক সময় এমনতর পরিহাস করেন বটে যার ভিতরে হাস্যরস কিম্বা অর্থ খুঁজে পাওয়া কঠিন। আজ তবে ইতি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুঃ প্রিয়রা কি আসচে?

[১২] ওঁ পোস্টমার্ক, শিলাইদা
১৯ ডিসেম্বর, ১৮৯২

ভাই প্রমথ

আমি কাল তোমার চিঠি পেয়েছি— কিন্তু একটা কবিতা নিয়ে পড়েছিলুম বলে কাল আর উত্তর দিতে পারিনি। রীতিমত ভাল চিঠি লেখা খুব একটা দুরূহ কাজ। প্রবন্ধ লেখা সহজ— একটা মোটা বিষয় নিয়ে অনর্গল কলম ছুটিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু চিঠিতে এমন সকল আভাস ইঙ্গিত নিয়ে ফলাতে হয়— কেবল ভাবের চিকিমিকিগুলি মাত্র— যে, সে প্রায় কবিতা লেখার সামিল বল্লেই হয়। কিন্তু সে রকম চিঠি লেখবার দিন কি আর আছে? এক সময় ছিল যখন চিঠি লেখাতেই একটা আনন্দ পেতুম এবং বোধ হয় চিঠি লিখে আনন্দ দিতেও পারতুম কিন্তু মনের সে কৈশোর অবসরটুকু চলে গেছে। এখন সমস্তই তাড়াতাড়ি সেরে নিতে হয়— বিস্তর জিনিষ মনের মধ্যে ভিড় করে রয়েছে; এমন সময় দৈবাৎ আসে যখন সমস্ত ভারমুক্ত হয়ে মনটা বেশ

হাল্‌কা ফুরফুরে হয়ে আছে, যখন বসে বসে সাবানের বুদ্‌বুদের মত রঙীন্ চিঠিগুলো উড়োনো যায়। সমস্ত দিন পৃথিবীর মোটা মোটা মজুরির কাজ করে' আঙুল এমন ভোঁতা হয়ে যায় যে কোনরকম সূক্ষ্ম শিল্পের কাজ নিতান্ত অবহেলাভরে করে উঠ্‌তে পারিনে— বেশ একটু সময় নিতে হয়। কবিতা লেখাটা নিতান্ত আমার আজন্মকালের নেশা— মাঝে মাঝে যখন মৌতাতের সময় আসে তখন না লিখ্‌তে পারলে সমস্ত মনটা যেন বিকল হয়ে যায় এবং জীবনটা দুর্ভর বোধ হয় কিন্তু তাই লিখ্‌তে সময় পাইনে। মনে করি তাড়াতাড়ি অনেকগুলি কাজ একদমে চুকিয়ে ফেলে তার পরে বেশ আরামে নিশ্চিন্ত এবং নিরিবিলি আমার কবিতা নিয়ে পড়ব— কিন্তু প্রতিদিন এবং প্রতিমাস আপনার নতুন নতুন কাজ নিয়ে এসে হাজির হয়— কেউ নেই, যে আমাকে দয়া করে' একটু সাহায্য করে— কাজেই হুহুঃ শব্দে সমস্ত কাজ সেরে যেতে হয়— বেশ একটু রসিয়ে রসিয়ে জিরিয়ে জিরিয়ে বেশ ধীরে ধীরে আস্বাদ করে যে সমস্ত কাজ করতে হয়— ঠিক কাজ নয়, মনের যে সমস্ত সখ মেটাবার ইচ্ছে হয় সে সমস্তই অনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যতের জন্যে একপাশে ঠেলে রেখে দিতে হয়। কত কর্ত্তব্য কাজই হয়ে ওঠে না— আত্মীয়দের কত অভিমান সহ্য করতে হয় এবং নিজের মনের মধ্যেও প্রতিদিন কত অতৃপ্তি বহন করতে হয়। কিন্তু আমার জীবনের আইডিয়াল হচ্চে, যখন যে কর্ত্তব্যটা স্কন্ধে এসে পড়ে তাকে ফেলে না দিয়ে সহিষ্ণুভাবে বহন করা। যে অবস্থা-দ্বারা পরিবৃত হওয়া

যায় সেই অবস্থার মধ্যে যে সমস্ত উপস্থিত কর্ত্তব্য সেগুলো পালন করা। তাই আমি প্রতিমাসে নতশিরে সাধনার লেখা লিখে যাচ্ছি এবং প্রতিদিন জমিদারীর সমস্ত খুচ্‌রো কাজ মনোযোগপূর্ব্বক করচি। তুমি কি মনে কর এতে আমি কোন সুখ পাই? আজকাল আমি চিঠিও যা লিখি সেও আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেক সময় কষ্ট বোধ হয়— কিন্তু আমার মনে হয় মোটের উপর আমার পক্ষে এই সবচেয়ে ভাল। কল্পনা নামক পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে বেড়ানো আমার মনের পক্ষে ভাল এক্সেসাইস্ নয়।

রবিকা

[১৩] ওঁ পোস্টমার্ক, সেপ্টেম্বর ১৮৯৩

ভাই প্রমথ

তুমি তাহলে ইতিমধ্যে শৈলশৃঙ্গ থেকে নেবে এসেছ। আমি ত দেশ দেশান্তরে ঘুরচি। বক্তৃতার খবরটা পেয়েচ দেখচি। চৈতন্য লাইব্রেরির সম্পাদকের অবিশ্রাম উত্তেজনায় এই অসমসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছিলুম, নইলে পাব্লিকের কাছে ঘেঁষতে আমার আর বড় ইচ্ছে করে না। তীর একবার ধনুক থেকে বেরিয়ে গেলে আর তূণের মধ্যে প্রবেশ করা তার পক্ষে অসাধ্য— আমি সেইরকম দুরদৃষ্টক্রমে পাব্লিকের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছি, এখন আর আমার কোথাও শান্তি নেই। আমার খুব ইচ্ছা ছিল বক্তৃতাটা তোমাদের একবার শুনিয়ে নিয়ে রঙ্গস্থলে প্রবেশ করতে। কিন্তু সে সময় কলকাতায় তোমরা কেউ উপস্থিত ছিলে না। লোকেন তখন সমুদ্রপারে,

তুমি তখন শৈলশিখরে। আমি অসহায়ভাবে একলা বসে বসে ঐ লেখাটাকে নিয়ে অনেক চিন্তা তর্ক পরিবর্ত্তন সংশোধন করেছিলুম— এবং শেষ পর্য্যন্ত ঐ লেখাটার ভালমন্দ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ ছিলুম না। একবার কেবল বঙ্কিমবাবুকে শোনাতে হয়েছিল— তাঁর প্রশংসাবাক্যে অনেকটা নিরুদ্বিগ্ন হয়েছিলুম। তুমি যদি অক্টোবর মাসে দেশ ছেড়ে বেরও আমি তার বহুপূর্ব্বেই কলকাতায় ফিরব। বোধ হয় আর পাঁচ ছ দিনের বেশি দেরি হবে না। আগামী সোম মঙ্গল বারের মধ্যেই রাজধানীতে গিয়ে পৌঁছবার সম্ভাবনা। পেসিমিজ্‌ম্ অপ্টিমিজ্‌ম সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে নেগেটিভ্ এবং পজিটিভ্ পোলের মত প্রায় প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই একসঙ্গে ঐ দুটো অংশ থাকে। কেউবা আচারে ব্যবহারে পেসিমিষ্ট্ লেখায় অপ্টিমিষ্ট্ কেউবা তার উল্টো। একেবারে দুই পোল্ জুড়ে আস্ত অপ্টিমিষ্ট্ বা পেসিমিষ্ট্ বোধ হয় পৃথিবীতে দুর্লভ। আমার প্রকৃতিতে আমি যে অংশে চিন্তা করি সে অংশটা বোধ হয় পেসিমিষ্ট্, যে অংশে কাজ করি সেটা বোধ হয় অপ্টিমিষ্ট্। তোমার মধ্যেও ডুব দিয়ে দেখ্‌লে বোধ হয় দুটো জিনিষই পাওয়া যায়।— প্রিয়দের ইতিমধ্যে আসবার কথা ছিল তারা কি এসে পৌঁচেছে? বিশ্রী ঝড় বৃষ্টিবাদ্‌লার প্রাদুর্ভাব হয়েচে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কর্ম্মাটার

মঙ্গলবার

[১৪] ওঁ শনিবার

১৬ জুন ১৮৯৪

পোস্টমার্ক, কলকাতা

ভাই প্রমথ

বহুকাল পরে তোমার চিঠি পেয়ে খুসী হলুম। ইতিমধ্যে এদিক ওদিক থেকে তোমার খবরাখবর পাচ্ছিলুম। চিত্তরঞ্জনের কাছে শুন্‌লুম তুমি রীতিমত 'Varsity man হয়ে গেছ। ভার্সিটি ম্যানের কি কি লক্ষণ জানিনে কিন্তু শব্দটা শুন্‌লেই আমাদের মত বিশ্ববিদ্যালয়বিমুখ লোকের মনে একটা আতঙ্ক উপস্থিত হয়। তুমি কি সেখানে বক্তৃতা দিচ্চ, বক্তৃতা শুন্‌চ, দাঁড় টান্‌চ এবং বিচিত্র বেশ পরিধান করে কালেজের চত্বরে পদচারণা করচ? কি রকম ভাবে দিনযাপন করচ এবং সেখানকার জগৎসংসার তোমার কাছে কি রকম লাগ্‌চে ঠিক অনুমান করতে পারচি নে। আমার বিলাতের অভিজ্ঞতার মধ্যে য়ুনিবর্সিটি কালেজের কোন চিত্র নেই। অথচ যারা সেখানে অধ্যয়ন করে এসেচে তারা সকলেই খুব মুগ্ধভাব প্রকাশ করে। যাহোক্ এখন তোমার মনের ভাবটা কি রকম তার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আভাস পাবার ইচ্ছে আছে। কিন্তু বর্ত্তমান মনের ভাবের চিত্র দেওয়া সহজ ব্যাপার নয়। কোন কথাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলে বোধ হয় না। তবু তুমি ত নূতন দৃশ্য এবং নূতন জীবনের মধ্যে গিয়ে পড়েছ, আমাদের যেমনটি রেখে গিয়েছিলে দেখে গিয়েছিলে ঠিক সেই রকমই আছি। হয় ত ঠিক সেই রকমই নেই কিন্তু অল্পে অল্পে ছোট ছোট

পরিবর্ত্তনগুলো মনে থাকে না এবং তার ফর্দ্দ দেওয়াও সহজ নয়। ভিতরে ভিতরে অনুভব করচি যেন অনেকগুলো জিনিষ বদলের দিকে যাচ্চে, কিন্তু সম্পূর্ণ দিক্ নির্ণয় করতে পারচিনে। মোটের উপর বলা যেতে পারে যে যতই সময় যাচ্চে ততই বয়স বাড়চে।— ভারতবর্ষের বর্ত্তমান প্রধান খবর হচ্চে, গতকল্য আষাঢ়স্য প্রথম দিবস গেছে। তার আগের দিন থেকেই রীতিমত ঘনঘটা করে বজ্রবিদ্যুৎ সহকারে নববর্ষার আবির্ভাব হয়েছে। প্রাতঃকালে খিচুড়ি এবং অপরাহ্নে সাঁৎলা ভাজা প্রচলিত হয়েছে। দিনটা খুব সুদীর্ঘ এবং মেঘস্নিগ্ধ— সন্ধ্যাবেলাটি ঘন অন্ধকার এবং রিমঝিম্ বর্ষণে বেশ জমাট্। প্রায় সে সময়টা বহুবিধ আত্মীয়-বন্ধুমণ্ডলী-পরিবৃত হয়ে পঞ্চাশ নম্বর পার্কষ্ট্রীটেই যাপন করা যায়। ঠিক গাড়িতে উঠ্‌বার সময়সময় মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হয়, অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বৃষ্টিশান্তির অপেক্ষা করতে হয়—তদবসরে সেই তাকিয়া-পরিবৃত নীচের বিছানায় তাসের মজ্‌লিষ জমে যায়— এবং গোল টেবিলটার কাছে আমাদের মত একদল অনভিজ্ঞ লোকের সভা বসে। গত দুদিন ধরে শারাড্ অভিনয় চল্‌চে, তাতেও আমাদের বর্ষার সভা খুব সরগরম হচ্চে। এর থেকেই কতকটা বুঝ্‌তে পারবে পঞ্চাশ নম্বরে উনপঞ্চাশ পবন পূর্ব্ববৎ প্রবল প্রতাপে প্রবহমান।

(অভাববশতঃ কাগজের আয়তন বদ্‌লে গেল।)—

গত সন্ধ্যাবেলার জনসংখ্যার একটা তালিকা দিলেই বুঝ্‌তে পারবে পঞ্চাশ নম্বরের সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি বই হ্রাস হয়নি।

কুমুদ, লোকেন, সতু, তারকবাবু, লিল্‌, সত্য, অরু, নরু, আমি, ছোট বউ, আমার সব কটি সন্তান (শেষটিকে তুমি দেখনি), বড়দিদি, বলু, সরলা, এবং এবাড়ির স্থায়ী অধিবাসীবর্গ। আজকাল দুই একটি করে ইংরাজেরও সমাগম হচ্চে। তন্মধ্যে, বাঁড়ুয্যের পুত্রবধূ, Miss Valentine নাম্নী একটি কুমারী, এবং Miss Forbes নাম্নী অপর একটি ইংরাজকুমারী প্রধানরূপে উল্লেখযোগ্য। তোমার ভায়া কুমুদের সঙ্গে এঁদের ক'জনেরই দিব্য জমে গেছে— তিনি এঁদের পক্ষ অবলম্বন করে টেনিস্‌ খেলচেন এবং সামাজিক প্রথা উল্লঙ্ঘন করে রাত্রি দশটার সময় একাকিনী কুমারীকে ডগ্‌ কার্টে আপন বামপার্শ্বে আসীন করে তাঁদের বাড়ি পৌঁছিয়ে দিচ্চেন— ইত্যাদি কারণে বিলাতবাসী তোমাদের প্রতি তাঁর কোন ঈর্ষার কারণ নেই।— লোকেন মাঝে মাঝে অকস্মাৎ মফস্বল থেকে ছিট্‌কে এসে রাজধানী সরগরম করে দিয়ে যান। সতুও যে তাঁর অনুকরণ করবেন এমন সকল লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। লোকেন আজকাল রাজসাহীর জজ্‌পদে আসীন হয়েছে সে খবর শুনেছ বোধ হয়।—আমাদের বাড়িতে একটি নূতন লোকের সমাগম হয়েছে সেও সম্ভবতঃ তোমার অবিদিত নেই। সুধী দিনকতক সাহিত্যের সাধনা ছেড়ে দিয়ে অন্যবিধ সাধনায় নিযুক্ত হয়েছিলেন, এবং সিদ্ধও হয়েছেন। এখন আর সাহিত্যের প্রতি তাঁর তেমন অনুরাগ এবং মনোযোগ দেখা যাচ্চে না।— তোমাকে আমার ছোট গল্প প্রথম খণ্ড, রাজা ও রাণীর দ্বিতীয় সংস্করণ এবং সাধনা পাঠান যাচ্চে। রাজা

ও রাণী দ্বিতীয় সংস্করণে বিস্তর পরিবর্ত্তিত হয়ে গেছে, একবার চোখ বুললেই দেখ্‌তে পাবে। যা ছিল, আয়তনে তার অর্দ্ধেক হয়ে গেছে। ছোট গল্পগুলো সব হিতবাদী এবং সাধনায় বেরিয়েছিল, এগুলো বোধ হয় তোমার তেমন ভাল লাগেনি— কিন্তু দূরবিদেশে হয় ত কতকটা ভাল লাগ্‌তে পারে। বঙ্কিমের মৃত্যু উপলক্ষে যে প্রবন্ধ পাঠ করেছিলুম সেটা সাধনার মধ্যে দেখ্‌তে পাবে।—

আমি অবিলম্বে শিলাইদহ অভিমুখে যাত্রা করচি। সেখানে বর্ষাটা বোটের মধ্যে একাকী যাপন করতে হবে। অনেকগুলি কেতাব এবং গুটিকতক খালি খাতা সঙ্গে যাবে। কড়ি ও কোমলের একটা দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপাখানায় আছে, তারও মূর্ত্তি অনেকটা বদল হয়ে যাবে।— আজ বৃষ্টিটা খুব জমে এসেছে—মেঘে অন্ধকার করেছে—কাছারির ঘরে মধ্যাহ্নে বসে তোমাকে লিখ্‌চি— যথেষ্ট আলো পাচ্চিনে। মনে করচি চিঠিটা শেষ করে একখানা গাড়ি আনিয়ে বেরিয়ে পড়ি।

ভারতবর্ষে Tree daubing বলে একটা ব্যাপার চল্‌চে সে খবরটা নিশ্চয় পেয়েছ। সাহেবরা বেশ একটু ত্রস্তভাবে আছে। একটা কিছু ঘটে ওঠা নেহাৎ অসম্ভব বলে বোধ হয় [না]। ইংরাজগুলো যে রকম অসহ্য অহঙ্কারী এবং উদ্ধত হয়ে উঠেছে তাতে একটা কিছু হওয়া নিতান্ত উচিত—চুপচাপ করে পায়ের তলায় পড়ে পড়ে মার খাওয়াটা নিতান্তই অন্যায়।—আজ তবে এইখানেই ইতি করি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮ শ্রাবণ [১৮৯৩]

ভাই প্রমথ

আমি বন্ধুবান্ধবদের থেকে ক্রমশই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্চি। কেন বলতে পারিনে। নিশ্চয় আমারই দোষ। স্বভাবটা বোধ হয় ক্রমশই কুণো এবং আত্মস্তর হয়ে আসচে— ক্রমেই বিশ্বাস হচ্চে অন্যের সহৃদয়তা এবং সহানুভূতির উপর নির্ভর করে সর্ব্বদা দোদুল্যমান হওয়ার চেয়ে নিজের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে নিভৃত হয়ে থাকায় সুখ না হোক্ স্বস্তি আছে। তবু হাজার হোক্, মানুষ ত আর কাজ করবার যন্ত্র নয়, মানুষের হৃদয়টাই তার কাছে সব চেয়ে প্রার্থনীয়, সেই অন্য হৃদয়ের সংসর্গ উত্তাপের অভাবে আমি যে কাজে নিযুক্ত আছি তারও উৎসাহ অনেক কমে এসেছে। পৃথিবীর ছেঁড়া কাঁথা তালি দেবার ভার নিজের স্কন্ধে নিয়ে বেশি দিন চালানো ভারি কঠিন, বিশেষতঃ যদি একা একা বসে ঐ কাজটা করতে হয়— আবার এই বেগারের কাজে অদৃষ্টে পুরস্কারের চেয়ে তিরস্কারটাই বেশি মেলে। সত্য কথা স্বীকার করাই ভাল, আমার গণ্ডারের চামড়া নয়— নিন্দা এবং নিরুৎসাহ আমার বোধ হয় গড়পরতা লোকের চেয়ে বেশি বাজে— হাস্যমুখ, মিষ্টবাক্য এবং কিঞ্চিৎ বাহবামিশ্রিত আশ্বাসবচন আমার মনের পক্ষে অত্যাবশ্যক বলদায়ক খাদ্যের কাজ করে। বোধ হয় সেইজন্যেই আজকাল ভিক্ষার আশা ত্যাগ করে কুত্তার হস্ত থেকে পরিত্রাণের ইচ্ছেয় কিছু আগ্রহান্বিত হয়ে পড়েছি। গায়ে পড়ে পৃথিবীর উন্নতি সাধন কার্য্যে শর্ম্মা বোধহয় শীঘ্রই অবসর নেবেন। পাব্লিক নামক অকৃতজ্ঞ জীবের চরণতলে যে তৈল যোগান যেত সেইটে নিজের নাসারন্ধ্রে প্রয়োগ করে কিছুকাল নিদ্রা দেবার জন্যে অত্যন্ত ইচ্ছা করচে। তার পর জেগে উঠে আবার বোধ হয় সেই পাদপদ্মের জন্যে লালায়িত

হয়ে উঠব।—এইত সমস্ত কথা একরকম খোলসা করে বল্লুম—কৃতকার্য্য হব মনে করেই বেরিয়েছিলুম, হইনি সে বিষয়ে সন্দেহ নেই এবং হবার যোগ্যতাও নেই— অতএব হার মানলুম। কিন্তু তুমি এই রঙ্গভূমি থেকে এতদূরে আছ যে আমার এই জয় পরাজয় আশা নৈরাশ্য তোমার কাছে অত্যন্ত লঘুভাবে গিয়ে পৌঁছবে— চাই কি, তুমি ঈষৎ কৌতুক অনুভব করতেও পার। তোমরা তাহলে এখন গিরিবাসী। তোমাদের আতিথ্য গ্রহণ করতে আমার এক একবার ইচ্ছা করচে— কিন্তু তার গুটি দুয়েক বাধা আছে প্রথম, মাস খানেক বিদেশে থেকে এরি মধ্যে আত্মীয় পরিজনবর্গের জন্যে মনটা কিছু চঞ্চল হয়ে পড়েছে— এমন অবস্থায় কালিগ্রাম থেকে দক্ষিণাভিমুখী না হয়ে একেবারে উত্তরাভিমুখী হওয়া আমার পক্ষে কিছু দুঃসাধ্য হবে। দিনকতক বাড়ি গিয়ে তার পরে যাত্রা করা অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু আজকাল আর্থিক অবস্থা এতই খারাপ যে দার্জিলিং যাতায়াতের যে সামান্য ব্যয়ভার তাও আমার পক্ষে দুর্ব্বহ।

লোকেন ত আর দুই এক সপ্তাহের মধ্যে পাড়ি দেবে শুনচি। তুমি তাহলে এখনো আর কিছুদিন স্থায়ী। কিন্তু পর্ব্বত থেকে নাবেবে কবে?

হাঁ— গৃহ অর্থে "কক্ষ" শব্দের ব্যবহার আমি কাদম্বরীতে অনেক জায়গায় পেয়েছি এবং আরো দুই একটা সংস্কৃত বইয়ে পাওয়া গেছে। কাদম্বরী অল্প অল্প করে এগচ্চে। শ দুয়েক পাতা হয়েচে— আরো ততগুলো পাত বাকি আছে। অনেক রাত হয়ে এল এবং বকাবকিও বিস্তর করা গেছে এখন তবে বিদায়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

† এই পত্রটি ১৩ নং পত্রের পূর্বে বসিবে

[১৫] ওঁ লণ্ডন

কল্যাণীয়েষু

প্রমথ, তোমার সনেট পঞ্চাশৎ পড়ে আমি খুব খুসি হয়েছি। বাংলায় এ জাতের কবিতা আমি ত দেখি নি। এর কোনো লাইনটি ব্যর্থ নয়, কোথাও ফাঁকি নেই— এ যেন ইস্পাতের ছুরি, হাতির দাঁতের বাঁটগুলি জহরির নিপুণ হাতের কাজ করা, ফলাগুলি ওস্তাদের হাতের তৈরি— তীক্ষ্ণধার হাস্যে ঝকঝক করচে, কোথাও অশ্রুর বাষ্পে ঝাপ্‌সা হয় নি— কেবল কোথাও যেন কিছু কিছু রক্তের দাগ লেগেছে। বাংলায় সরস্বতীর বীণায় এ যেন তুমি ইস্পাতের তার চড়িয়ে দিয়েছ। ইতি ২২শে এপ্রেল ১৯১৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১৬] ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

প্রমথ, দার্জ্জিলিংকে তুমি যে রকম নিভৃত এবং নিরাপদ বলে বর্ণনা করেছ তাতে আমার খুবই লোভ হচ্চে। কিন্তু অনেকদিন চাপা থেকে হঠাৎ এখানে এসেই মনের আনন্দে আমার মধ্যে গানের উৎসটি খুলে গেছে— সেইজন্যে কিছুতেই নড়াচড়া করতে ভরসা হচ্চে না। গুজব শুনচি ছুটির পরে আমাকে নিয়ে একটা উৎপাত করবার ষড়যন্ত্র হচ্চে— তাহলে আমাকে তার আগেই লণ্ডনের নবেম্বর-আকাশের রবির মত

একেবারে অদৃশ্য হতে হবে, সেই সময়ে কোথাও পালাব— কিন্তু ততদিন তোমরা বোধ হয় দার্জ্জিলিঙে থাকবে না। দেখি, যদি আমার আপনাআপনি গান বন্ধ হয়ে যায় তাহলে একবার ছুট দেব। যতদিন পর্য্যন্ত সুরের নেশা আমার মগজে আছে ততদিন বোলপুরই কি আর অন্য কোনো জায়গাই কি, সমস্তই আমার পক্ষে সুরলোক, এখন আমার এই সুরসভার আসন ত্যাগ করে ওঠবার হুকুম নেই। ইতি ৩০শে আশ্বিন ১৩২০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Autobiographyটা তোমাকে পাঠাবার জন্যে রথীকে লিখে দিচ্চি

[১৭] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন
২৬ অক্টোবর, ১৮৯৩

কল্যাণীয়েষু

বোলপুরে আমার আসনটি এমন জমে গেছে যে এখান থেকে নড়তে আমার সাহস হয় না। এখানকার আকাশ আলো মাঠ এখানকার শালতরুশ্রেণী এবং আমলকীবনের সঙ্গে নানাসূত্রে আমার সমস্ত মনের একটা সংযোগ ঘটে গেছে— এইজন্যে এখানে থাকাটা আমার পক্ষে অত্যন্ত সহজ, কোথাও কিছুমাত্র বাধে না এবং সব জায়গাতেই আরাম পাই। এখানে আমার চারিদিকের দৃশ্যটি আমার কাছে

অত্যন্ত পরিচিত বলেই আমার কাছে প্রত্যহ নূতন বলে ঠেকে —যেমন চিরাভ্যাসের আরামটি পাই তেমনি নিয়ত বিস্ময়ের একটি আনন্দ আমার মনকে সর্ব্বদা জাগিয়ে রেখে দেয় এমন আর কোথাও পাবনা মনে হয়। এখানকার প্রকৃতির সঙ্গে কেবল আমার চোখের দেখার সম্বন্ধ নয়, একে আমার জীবনের সাধনা দিয়ে পেয়েছি— সেইজন্যে এইখানে আমি সকল তীর্থের ফললাভ করি—সেইজন্যে এইখানেই পড়ে থাকি এবং পড়ে থেকেই আমার ভ্রমণের কাজ হয়। এখানে আমার অনেক ব্যাঘাত, অভাব এবং অসুবিধাও আছে, সে সমস্তই শিরোধার্য্য করে নিয়েছি।

তোমার গদ্যপ্রবন্ধ সবগুলিই পড়েছি। তোমার কবিতার যে গুণ তোমার গদ্যেও তাই দেখি— কোথাও ফাঁক নেই এবং শৈথিল্য নেই, একেবারে ঠাসবুনানি। এ গুণটি কিন্তু প্রাচ্য নয়। আমাদের বেশে ভূষায় বাক্যে এবং চিন্তাতেও অনেকটা বাহুল্য থাকে— গরম দেশে অত্যন্ত নিরেটভাবে মনঃসংযোগ করাটা দুঃখকর। কেননা এখানে কাজের তুলনায় অবকাশটা একটু প্রচুর না হলে আমরা বাঁচিনে। অতএব যখন সময়ের টানাটানি নেই তখন ভাব ও বাক্যসমাবেশের ঠাসাঠাসিটা আমাদের পক্ষে অনাবশ্যক। ওতে লেখকেরও সংযমের দরকার করে পাঠকেরও তাই— তাড়া থাকলে সেটা করা যায় কিন্তু যেখানে তাগিদ নেই সেখানে গয়ংগচ্ছ চালটাই মানুষ স্বভাবত পছন্দ করে। এই সকল কারণেই, তোমার গদ্য রচনারীতির মধ্যে যে নৈপুণ্য আছে আমাদের দেশের

পাঠকেরা তার পূরো দাম দিতে প্রস্তুত নয়। গদ্যলেখাও যে একটা রচনা সেটা আমরা এখনো স্বীকার করতে শিখিনি। যখন আমাদের পণ্ডিতমশায়রা কাদম্বরীর রীতিতে বাংলা গদ্য লিখ্‌তেন তখন তাঁরা আর যাই হোক্ এটা জান্‌তেন যে লেখাটা একটা চাষের ফসল, ওটা আগাছা নয়। কিন্তু সম্প্রতি আমাদের গদ্যলেখা নিতান্তই খবরের কাগজি ছাঁদের হয়েছে। আমাদের দেশে যে একটা হঠাৎ-ডিমক্রাসির প্রাদুর্ভাব হয়েছে এখনো তার চালচলনে পাক ধরে নি—গদ্যসাহিত্যে তার প্রকাশটা অত্যন্ত শস্তাদামের শৈথিল্য প্রাচুর্য্যের দ্বারাই নিজের পরিচয় দিচ্চে। পদ্যের একটা সুবিধা এই যে, যেমন করেই হোক তাকে একটা বাঁধন মানতেই হয়। আমার ত মনে হয় এইজন্যেই সাহিত্যের কাঁচাবয়সে পদ্য অপেক্ষাকৃত নিরাপদ, প্রবীণ বয়সেই গদ্যের অধিকার পাকা হয়। আমার ত দেখেশুনে মনে হচ্চে বাংলা সাহিত্যে তোমার একটা দিন আসচে এবং তোমার একটা কাজ আছে। এইবার সাহিত্য-সিংহাসনে তুমি রাজদণ্ড গ্রহণ করে শাসনভার নেবে এ আমি স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্চি।

ব্রজেন্দ্রবাবুর ইংরেজি কবিতা ইংলণ্ডে যাঁরা দেখেছেন তাঁদের সঙ্গে আমার আলোচনা হয়েছে দেখা হলে সে সব কথা হবে।

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১৮]　　　　　ওঁ

কল্যাণীয়েষু

প্রমথ, দুই একটি কথা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্তে এই চিঠিখানি।...ফরাসী গীতাঞ্জলিটা বোধ হচ্চে তোমার কাছে আছে কারণ আমার কাছে নাই।

সেই কাগজটার কথা চিন্তা কোরো। যদি সেটা বের করাই স্থির হয় তাহলে সুধু চিন্তা করলে হবেনা—কিছু লিখ্‌তে সুরু কোরো। কাগজটার নাম যদি "কনিষ্ঠ" হয় ত কি রকম হয়। আকারে ছোট—বয়সেও। শুধু কালের হিসাবে ছোট বয়স নয়, ভাবের হিসাবে।

বেশ আছি। যতই মনে করচি আবার অনতিকাল পরে রাজসাহি যাবার হাঙ্গাম করতে হবে ততই ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌চি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১৯]　　　　　ওঁ　　　　　বোলপুর

পোস্টমার্ক, ৫ মার্চ, ১৯১৪

কল্যাণীয়েষু

সবুজপত্র উদ্গমের সময় হয়েছে— বসন্তের হাওয়ায় সে কথা ছাপা রইল না— অতএব সংবাদটা ছাপিয়ে দিতে দোষ নেই। আমি একটু ফাঁক পেলেই কিছু লেখবার চেষ্টা করব। বিবিকে সুরেনকেও তাড়া দিয়ো।

বসুমতী হিতবাদীর কথাটা ভুলোনা। Indian Publishing Houseদের জন্যে যে একটা এগ্রিমেণ্টের আদর্শ খাড়া করতে চেয়েছিলে সেটার প্রয়োজন আছে।

নাটোর মানসীর জন্যে অত্যন্ত তাগিদ করচেন। জীবনের বাজে উপদ্রবের মধ্যে এই আর একটি উপসর্গ বাড়ল।... নাটোরকে তাঁর এই ব্যাধি থেকে মুক্ত করবার কি কোনো রাস্তা আছে? আমার আশঙ্কা আছে মানসীতে যদি মহারাজকে পেয়ে থাকে তাহলে হয়ত একদিন সবুজপত্রের সবুজে তাঁর চোখ না জুড়তেও পারে— সেটা আমাদের পক্ষে অসুখের কারণ হবে। অতএব এখন থেকে যদি পার তার প্রতিকার কোরো।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[২০] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

১০ মার্চ, ১৯১৪

কল্যাণীয়েষু

মাথাটা বেশ তাজা নেই। তাই চুপচাপ পড়ে আছি।

বসুমতী হিতবাদী সম্বন্ধে রথী ত কিছুই জানে না। বসুমতী শৈলেশের দ্বারায় সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়েছিল— সে ছাড়া আর কেউ ওর কোনো তথ্য জানে না।

আমি আর কিছুদিন মাথাটাকে সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা রেখে তার পরে ওটাকে আবার পূর্ব্ববৎ ব্যবহার করবার চেষ্টা করব—

এখন যদি বেশি টানাটানি করি তাহলে সইবে না। এখন টলমল করচে, ঠেলাঠেলি করলেই কাৎ হয়ে পড়বে।

সত্যকুমারের স্ত্রীকে কিছু সাহায্য করবেনা? বেচারা বড় নিরুপায় হয়ে পড়েছে। সুরেনকে ওদের চিঠি পাঠিয়ে দিলুম।

একটা খবর পেলুম বার্লিনে আমি যাচ্চি— আমার বক্তৃতার জন্যে একটা প্রকাণ্ড হল ঠিক হয়ে গেছে। সেখানকার একজন মেয়ে এই উপলক্ষ্যে আমাকে নিমন্ত্রণ করে পাঠিয়েছে। এ সংবাদের সত্যতা সম্বন্ধে তোমরা কিছু জান কি?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[২১] ঙ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

২৩ মার্চ, ১৯১৪

কল্যাণীয়েষু

আচ্ছা, রাজি আছি। ১৫ই বৈশাখেই বের কর। ইতিমধ্যে দুই একটা লেখা দিতে পারব। চারিদিকের নানাবিধ তাড়নায় মাথার মগজের মধ্যে একটা আবর্ত্তের সৃষ্টি হয়েছিল— ক্ষণে ক্ষণে ঘুরপাক খেলত। এখন একটু ভাল আছি কিন্তু বুদ্ধির যন্ত্রটাকে বেশি খাটাতে সাহসও হয় না ইচ্ছাও হয় না— একটা মৌরসী ছুটির জন্যে মনটা মাঝে মাঝে দরখাস্ত লিখ্‌তে বসে। গাল পাড়বার বেলায় বৈরাগ্যকে রেয়াৎ করিনে কিন্তু হাড়ে হাড়ে সে যেন বাঁশি বাজাতে থাকে— একেবারে ভিতরের দিক থেকে সে আমাকে উদাস

করে তোলে। যদি শুষ্ক বৈরাগ্য হত তাহলে এ'কে কাছে আস্‌তে দিতুম না কিন্তু এ যে বসন্তী রঙে রঙানো— আমের বোলের গন্ধে ভরা। "Deep-delved earth" এর মধ্যে যে মদে বহুবৎসরের পাক ধরেছে সেই মদের মত এ যেন আমার প্রকৃতির ভিতরে ভিতরে আপনার মাদকতাকে প্রবীণ করে তুলেছে। এই বৈরাগ্যের হাওয়াটা যখন হুহু করে বইতে থাকে তখন মাসিক পত্রটত্রগুলো মন থেকে কোথায় উড়ে চলে যায় তার ঠিকানা নেই, তখন দেশের হিতের দিকে খেয়ালও থাকেনা। যাই হোক্ lucid intervals একেবারে আস্‌বে না এমন হতে পারে না অতএব আশা আছে।

কিন্তু নাটোরের মহারাজের ভাল মন্ত্রীর দরকার।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[২২] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

৪ এপ্রিল, ১৯১৪

কল্যাণীয়েষু

গল্প লেখার আয়োজন অনেকদিন ত মনের মধ্যে নেই— বেশ একটু বৈঠক-জমানো রকমের অবকাশ না পেলে গল্প লেখার সুবিধা হয় না। তবু চেষ্টা দেখা যাবে। তুমি নাটোরে গেছ কল্পনা করে তোমার কাছে না পাঠিয়ে মণিলালকে প্রবন্ধ পাঠিয়েছিলুম সেটা কি এখনো সম্পাদকী ডেস্কের উপরে দাখিল হয়নি? তোমরা ১৫ই বৈশাখে কাগজ

ত বের করচ কিন্তু হাতে দুতিন মাসের সম্বল ত জমাও নি—Think not of tomorrowটা কি সদুপদেশ?

বৈশাখের আরম্ভ থেকেই সুবোধ কাজে নিশ্চয় যোগ দেবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[২৩] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন
১৬ এপ্রিল, ১৯১৪

কল্যাণীয়েষু

আচ্ছা বেশ। আর দুই একদিন পরেই গল্পটাতে হাত দেব— দেরি হবেনা। ভারতী পাইনি, পেলে তোমার লেখা পড়ব। মানসী এইমাত্র পেলুম— এখনো পড়িনি।

সুবোধ জয়পুরের মহারাজের কাছ থেকে ছুটি পেলেন না। কালিগ্রামে কোনো রকম পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বে একবার নগেন্দ্রকে লিখো সে যেন বিভাগস্থাপনের পূর্ব্ব ও পরের ইসমনবিশি ও আয়ব্যয় তুলনা করে একটা রিপোর্ট পাঠায়। নূতন ব্যবস্থায় খরচপত্র বাড়বে কি কম্‌বে এবং কি পরিমাণে বাড়বে কমবে সেটা বেশ পরিষ্কার জানা ভাল। আমার বোধ হয় আপাতত যদি ব্যাঙ্কের কাজের উপরে নগেন্দ্রকে পতিসর বিভাগের চার্জ্জ দেওয়া হয় তাহলে কাজ চলে যেতে পারে।

…আর সেই গানের বইয়ের কি করলে?

অচলায়তনের রিহার্সাল চলচে— তারি কোলাহলে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে আছি, কি যে লিখচি তা বুঝতে পারচিনে।

নাটোর মানসীর জন্যে তাগিদ লাগিয়েছেন। আমি নানা কাগজে আমার চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করতে পারিনে— আমার শক্তির এত প্রাচুর্য্য আর নেই। ইতি ৩রা বৈশাখ ১৩১৫

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[২৪] ওঁ পোস্টমার্ক

৬ জুলাই, ১৯১৪

কল্যাণীয়েষু

তোমার কবিতাটি আমার খুব ভাল লাগল। রসও যেমন, নৈপুণ্যও তেমনি, আর ভাষাটি সম্পূর্ণ তোমার নিজের। কেবল একটা লাইন আমার মনে হল যে একটু বদলালে ভাল হয়। সম্ভবত "পারদ" শব্দটার কোনো একটা বিশেষ অর্থ আছে— যদি তা থাকেও তবু সেটা সর্ব্বজনগম্য নয়— আর যদি তুমি থর্ম্মমিটরের পারার প্রতি লক্ষ্য করে থাক সেটা বেশ লাগসই হচ্চে না— কারণ পারা কোনো কিছুকে আক্রমণ করলে সেটা কেবল মারাত্মক হতে পারে মানুষের শরীর সম্বন্ধে— স্বর্গের দেয়ালের পরে তার ক্রিয়াটা অনুভব-গোচর না হবার কথা। যদি এই রকম কর ত কেমন হয়—

শিকল ছিঁড়িয়া সুর ভাঙিয়া পারদ
শূন্যে ছুটি আক্রমিল স্বর্গের দেয়াল ইত্যাদি।

তোমার চিঠি পাবার পূর্ব্বেই আমি "আষাঢ়" বলে একটা উড়ো রকমের প্রবন্ধ পাঠিয়েছি নিশ্চয় পেয়েছ। তুমি তাতে

প্রাচীন ভারতের যে ধরণের মেঘলা ছবি চেয়েছ তা হয়নি কিন্তু ওর মধ্যে পূবে হাওয়াটা আছে।

আমার মুস্কিল হয়েছে মনকে আর আমি কলম চালনার কাজে লাগাতে পারচিনে— এখন চতুর্থ আশ্রমের আয়োজনটাই তার কাছে একান্ত হয়ে উঠ্‌চে। কিন্তু তোমরা এখন সুরার নেশায় সুরের খেয়াল দেখ্‌চ তোমরা আমার দরদ বুঝবেনা।

অন্যান্য মাসিকে যে সমস্ত আলোচ্য প্রবন্ধ বেরয় তার সম্বন্ধে সম্পাদকের বক্তব্য বের হলে উপকার হবে। প্রথমত যারা উৎসাহের যোগ্য সেইসব লেখকেরা পুরস্কৃত হবে দ্বিতীয়ত অন্যের লেখা সম্মুখে রেখে, বলবার কথাটাকে পরিষ্কার করে বলবার সুবিধা হয়। তা ছাড়া আধুনিক সাহিত্যের মাঝিগিরি করতে হলে সমালোচনার হাল ধরা চাই। প্রতিমাসে সমালোচনার যোগ্য বই পাবে না কিন্তু মাসিক পত্রের লেখাগুলোর প্রতি লক্ষ্য করে কিছু না কিছু বলবার জিনিস পাবে। বিরুদ্ধ কথাও যথোচিত শিষ্টতা রক্ষা করে কি ভাবে বলা উচিত তার একটা আদর্শ দেখাবার সময় এসেছে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয়েষু

"যৌবনে দাও রাজটীকা" লেখাটি আমার খুব ভাল লাগ্‌ল। খুব উজ্জ্বল এবং শাণিত। অবনের ভ্রমণকাহিনীটাও খুব সুন্দর হয়েছে। আমার তো বোধ হচ্চে তোমার কাগজ এইরকমভাবে যদি বছরখানেক চলে তাহলে বাংলাসাহিত্যকে নতুন শক্তি, গতি, এবং রস দিতে পারবে। সবুজপত্রের উচিত হবে খুব একচোট গাল খাওয়া। সেইটেই একটা লক্ষণ যে ওর কথাগুলো মর্ম্মস্থানে গিয়ে লাগ্‌চে। মিথ্যার গায়ে হাত বুলিয়ে তাকে বাপুবাছা সম্বোধন করে আর চল্‌বে না। আমাদের বর্ত্তমান সাহিত্য মানুষকে গাল দেয় কারণ তাতে পৌরুষ নেই— বরঞ্চ সেটা কাপুরুষেরই কাজ— কিন্তু যেখানে যথার্থ বীর্য্যের দরকার— যেখানে সয়তানের সঙ্গে লড়াই, যে সয়তানের হাজার কণ্ঠ এবং হাজার বাহু, সেখানে দেখ্‌তে পাই বড় বড় সব সাহিত্যিক গুণ্ডারা কেবল পোষা কুকুরের মত ল্যাজ নাড়চে আর সেই বৃদ্ধ পাপের পঙ্কিল পা আদর করে চেটে দিচ্চে। তোমাদের এইসব লেখা পড়ে আমার উৎসাহ হয় কিন্তু দেখ সাহিত্যের এলাকায় আমার কাজের দিন ফুরিয়ে গেছে— সত্য মিথ্যা বিস্তর কথা জমিয়ে তুলেছি— সেগুলো এখন কালের ছাঁকুনির ভিতর দিয়ে ছাঁকা হতে থাক্, আর নতুন জঞ্জাল বাড়াতে ইচ্ছা হয় না— এখন নিজের জীবনটাকে কি করে সম্পূর্ণ সত্য করতে পারব এই বেদনায় আমাকে দিনরাত্রি জাগিয়ে রেখেছে। এর কাছে

আমার খ্যাতি কীর্ত্তি সমস্তই এত ছোট হয়ে গেছে লোকালয়ের তাগিদ আমার হৃদয়ের মধ্যে এসে পৌঁচচ্ছে না। যাক এসব কথা আলোচনার বিষয় নয়— যে কথাটি বলবার জন্যে চিঠি লিখ্‌তে বসেছি সেটি খুব দীর্ঘ কিছু নয়— সেটি হচ্চে— বাহবা, সাবাস্‌, সোভান আল্লা! ইতি ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[২৬] ঔ শান্তিনিকেতন

বোলপুর

কল্যাণীয়েষু

ক্ষিতিমোহনবাবু কিছুদিন থেকে জ্বরে পড়েছেন তাই তোমার চিঠির উত্তর দিতে পারেন নি। তাঁর কাছ থেকে লেখা আদায় করতে পারব বলে আশা করচি। শরীরটা তাঁর সুস্থ হয়ে উঠুক্।

আজ কিছুকাল থেকে মণিলালকে তাগিদ দিচ্চি এখানে রথী ও নগেনকে সবুজপত্র পাঠিয়ে দিতে। তারা স্কুলে থাকে এবং অজিত প্রভৃতির কাছ থেকে চেয়ে চিন্তে নিয়ে পড়বার জন্যে তাদের ঘুরে বেড়াতে হয়। আজ পর্য্যন্ত তাগিদ দিয়ে কোনো ফল পাইনি। তুমি একটু সম্পাদকী ঠেলা দিয়ে যদি তাকে বিচলিত করতে পার ত ভাল হয়।

গল্প লিখ্‌তে বসেছি কিন্তু লেখার এত ব্যাঘাত যে কি লিখেছি ও কি লিখ্‌তে হবে সেটা বারবার করে ভোলবার

জো হয়েছে। গল্প এমনতর খাব্‌লা খাব্‌লা করে লিখ্‌লে তার জোড় মেলানো শক্ত হয় এবং তার ফাটলগুলো দিয়ে রস বেরিয়ে যায়। যাই হোক্ আমার এই লেখাগুলি গল্পপিপাসু পাঠকদের বেশ ঢক্ ঢক্ করে খাবার মত হচ্চে না— এগুলো গল্প না বল্লেই হয়। তুমি একবার এ লাইনে চেষ্টা করে দেখ। যদি হাত খুলে যায় তাহলে কিছুদিন চল্‌বে বেশ। বড় উপন্যাস লিখ্‌তে বসতে ভয় হয়— একেবারে মনের এপার ওপার জুড়ে সাহিত্যের বেড়-জাল ফেলবার মত উৎসাহ আমার আর নেই—এখন ডাঙার কাছে দাঁড়িয়ে ক্ষেপনা জাল ফেলি—ছুটো একটা যা ওঠে সেই যথেষ্ট। আমেরিকার বিবরণ পত্র আকারে লেখবার চেষ্টা করা যাবে— কিন্তু এ জায়গাটা লেখবার পক্ষে অনুকূল নয়। ইতি ৮ই জুলাই ১৩২১

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[২৭] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

২৮ জুলাই, ১৯১৪

কল্যাণীয়েষু

শিলাইদহে যাবার কথা ত মনে ভাবি নি— বিশেষত কাজের প্রসঙ্গে। সেখানে গেলে কাজ হয় সেকথা সত্য— কিন্তু সেটি সরস্বতীর তরফের কাজ। অন্য কাজ এখন আমার আর চল্‌বে না। আমি কাছারিতে বসে জমাবন্দী করতে লেগে গেছি এ কথা মনে করলে হাসি পায়। আশ্বিনের

আরম্ভে এবার ছুটি— সেই সময়ে ভাবচি ওখানে গিয়ে কিছুদিন চুপচাপ করে থাকব। অমনি সেই অবকাশে সবুজ পত্রের ঠোঙা ভরবার মত কিছু রচনা করা যেতে পারে।

সবুজপত্রে কেবলমাত্র সম্পাদক এবং একটিমাত্র লেখক যদি সব লেখা লেখে তবে লোকে বল্‌বে কি? এক ত সেটা দেমাকের লক্ষণ মনে করে ক্রমশই উত্তপ্ত হয়ে উঠ্‌তে থাকবে— তারপরে হয় ত বৈচিত্র্যের অভাবেও দুঃখ বোধ করতে পারে। অনিলা দেবীর খবর কি? ব-র সে কবিতাটি নেড়ে চেড়ে বিশেষ কিছু শ্রীবৃদ্ধিসাধন করতে পারিনি। ওর আর যদি কিছু থাকে পাঠিয়ে দিয়ো— হয়ত একটা লেগে যেতে পারে। কিন্তু কবিতা রচনায় ও যে যশস্বী হবে এমন আশ্বাস দিতে পারিনে— কিন্তু সেজন্যে খেদ করা উচিত নয়— কারণ কোনো দিন দলের লোকের অভাব হবে না। ইতি সোমবার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[২৮] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

৩১ জুলাই, ১৯১৪

কল্যাণীয়েষু

এইমাত্র সবুজ পত্র পেয়েই তোমার পত্রটি পড়লুম। খুব চমৎকার লাগল— একেবারে আগাগোড়া ঝকঝক্ করচে। তোমার এরকম সব লেখা লোকে যে সত্যই পছন্দ করচে না এ আমি বিশ্বাস করতে পারিনে। একরকম জাতের ভালো লেখা আছে যা পড়তে পড়তে পদে পদে এই কথাটা মনে

আসে যে এ আমি ভাবিনি, এ আমার মাথায় আসত না, এ আমার কলমে আসা সম্ভব নয়— সেইরকম ঐশ্বর্য্যশালী লেখাকে পাঠক অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অস্বীকার করতে চেষ্টা করে— এইরকম লেখার কাছে পাঠকদের মন পরাভব মান্‌তে কষ্ট এবং লজ্জা বোধ করে। আমি বেশ দেখতে পাচ্চি তোমার লেখাগুলিতে একটা ঈর্ষ্যা জাগিয়ে তুলেছে— সেটা প্রশংসাফলেরই কাঁচা এবং টোকো অবস্থা— ঐটে নিশ্চয়ই ক্রমে আলোয় বাতাসে পাক্‌বে এবং মিষ্টতায় ভরে উঠ্‌বে।

অ···র লেখা প্রায় আগাগোড়াই তোমার হয়ে উঠেছে— ভালই হয়েছে— ওর হাতে কিছুতেই এরকম বাঁধুনি হত না। এবং সেই বাঁধুনির অভাবে ভিতরকার সার কথাটা কোনো জায়গাতেই মালুম দিত না।

আমি "আমার জগৎ" নামক একটা লেখা লিখে ভয়ে ভয়ে মণিলালের কাছে পাঠিয়েছি। ভয়ের কারণ এই, এরকম তত্ত্ব আলোচনা আমার অধিকারের মধ্যে নয়। পাছে আমার নামের জোরে তোমরা ওটাকে তরিয়ে দিতে চাও সেইজন্যে মণিলালকে পাঠিয়ে দিয়ে বলেছি যদি সেটা পড়বার সময় তোমার মুখে কোনোপ্রকার সম্পাদকী বিকার দেখা দেয় তা হলে ওটাকে ফস্ করে সরিয়ে নিতে। ওটা যদি শিশির বিন্দুর মত তোমাদের সবুজপত্রের উপর থেকে গড়িয়ে মাটিতে পড়ে যায় তাহলে রবির তাপ তাতে বিশেষ বৃদ্ধি হবে না একথা আমি তোমাকে নিশ্চয়ই বল্‌তে পারি। ভেবেছিলুম

কথাটা তোমার কাছে ফাঁস করব না— কিন্তু সম্পাদকের সঙ্গে লেখকের কোনোরকম লুকোচুরি না থাকাই ভাল।

নগেনের কাছে শোনা গেল এখানকার পাকশালা ও ভাণ্ডার থেকে বিশৃঙ্খলতা দৈত্যকে খেদিয়ে দেবার জন্যে তুমি মহেন্দ্রকে পাঠাতে রাজি হয়েছ। তা হলে বড় ভাল হয়। ঐ ব্যাপারে এখানকার সকলেই আনাড়ি— অথচ সুখাদ্যে রুচি এবং ক্ষুধা এদের সকলেরই অসামান্য। ইতি ১৫ই শ্রাবণ ১৩২১

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[২৯] ॐ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন
২ অগস্ট, ১৯১৪

কল্যাণীয়েষু

প্রমথ, সবুজপত্র পেয়ে তোমাকে যে চিঠি লিখেছি সে বোধ হয় পেয়েছ। বি··· এবং বি···র পালকবর্গ যে তোমার সবুজ পত্রের মাথা মুড়িয়ে খাবার চেষ্টা করবেন সে আমি জানতুম। আবার মজা হয়েছে এই যে, একটা সম্পূর্ণ মিথ্যা জনরব এই রটেছে যে, আমি বিশেষ চেষ্টা করে সন্তোষকে বলে বঙ্গদর্শনকে বি···র হাত থেকে উদ্ধার করবার জন্যে কাগজটাকে উঠিয়ে দিয়েছি। বলা বাহুল্য এ সম্বন্ধে আমি চিন্তাও করি নি, চেষ্টাও করি নি। তোমার মুস্কিল এই যে এক্ষেত্রে আমার পোড়াকপালের আঁচ

তোমাকে লেগেছে। সঙ্গদোষেই তুমি বিপদে পড়েছ নইলে তোমাকে এত দুঃখ পেতে হত না। যাই হোক্ আমি নিশ্চয় বলে দিচ্চি তোমার কাছে এদের হার মানতেই হবে। অনেকদিন পর্য্যন্ত এরা বিনা বাধায় আমাদের দেশের যুবকদের বুদ্ধিকে পঙ্কিল করে তুল্‌ছিল— বিধাতা বরাবর তা সইবেন কেন? দেশের কোনো জায়গা থেকেই কি এরা ধাক্কা পাবেনা? সরল মূঢ়তাকে সওয়া যায় কিন্তু বাঁকা বুদ্ধিকে প্রশ্রয় দেওয়া কিছু নয়। রণক্ষেত্রে যখন দাঁড়িয়েছ তখন যদি একা লড়তে হয় তাও লড়তে হবে, পিছু হটলে চল্‌বে না।

বিবির লেখাটা কাল সোমবারে রেজেষ্ট্রি করে পাঠিয়ে দেব।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৩০] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

১ সেপ্টেম্বর, ১৯১৪

কল্যাণীয়েষু

প্রমথ, সুরেনকে ভোলবার সময় দিয়ো না— আমাদের ব্যাঙ্কের একটা পাকা ভিত হওয়া ভারি দরকার। ছুটির আগেই ওটা পরিষ্কার করে ফেলো।

মহেন্দ্রকে পাঠিয়ে দিয়ো— যদি তার মন টেঁকে এবং তাকে যদি মনে ধরে তবে তাকে রেখে দেবো। পূজার পরে মহেন্দ্রাণীকেও আশ্রয় দেবার একটা উপায় করা যাবে—

সেটা খুব সম্ভব বৌমার কাছে সুরুলেই হবে— কারণ শান্তিনিকেতনের শান্তির ব্যাঘাত করতে ইচ্ছে করিনে। মহেন্দ্রকে মাইনে কত দিতে হবে লিখো।

আজ ত ১৫ই। কাল বোধ হয় সবুজপত্র পাওয়া যাবে। যুদ্ধ সম্বন্ধে তোমার লেখাটা পড়বার জন্যে উৎসুক আছি। ক'দিন ভরপুর গানের নেশায় আছি— তাই সমস্তদিন গুনগুন্ করা ছাড়া আর বিশেষ কিছু করতে পারিনি।

আশ্বিনের জন্যে একটা গল্প শীঘ্র লিখে দেব— তাহলেই আশ্বিনের ছুটিটা পুরো পরিমাণ ভোগ করবার অবকাশ পাওয়া যাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় কার্ত্তিক মাসটা আশ্বিনের ঠিক পরেই পড়ে। কিন্তু তোমরা ত আশ্বিন কার্ত্তিকের যুগল সংখ্যা বের করবে? বড় লেখাগুলোকে পাস্ করবার জন্যে একটা বড় ফাঁক করার দরকার আছে ত?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৩১] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

৫ সেপ্টেম্বর, ১৯১৪

কল্যাণীয়েষু

যুদ্ধের সম্বন্ধে তুমি যে প্রবন্ধটি লিখেছ সেটিতে কোনো কলাকৌশল না থাকাই উচিত। এ সব জিনিষ খুব স্বচ্ছ এবং সরল হওয়া উচিত— এ লেখাও তাই হয়েছে— বরঞ্চ দুই এক জায়গায় যেখানে একটুখানি ভাষাচাতুর্য্য এসে পড়েছে সেটা না থাকলে ভাল হত। বিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা যাঁরা পড়েছেন

তাঁরা এর প্রশংসাই করেছেন— এ রকম একটা লেখার প্রয়োজন ছিল।

মহেন্দ্র এলে আমি মনে করচি তাকে প্রধানত আমারই খাষ কাজে লাগাব। আমি অধিকাংশ সময়েই আমার ঘর থেকে দূরে থাকি— তাই আমার অশন বসন আরাম বিরাম সকল বিষয়েই আমার ভৃত্য উমাচরণের উপরেই আমার নির্ভর। একরকম চলে যাচ্চে। তবু এক এক সময়ে সেবার অভাব অনুভব করি। যত বয়স বেড়ে যাচ্ছে ততই একলা হয়ে পড়চি অথচ সহায়তার প্রয়োজন বাড়চে, তাই কিছুকাল থেকে এমন একটি অনুচর খুঁজচি যে কতক পরিমাণে আমার ভার নিতে পারবে— নিজের চিন্তা ভাববার ঝঞ্ঝাট থেকে যে আমাকে বাঁচাতে পারবে। মহেন্দ্র যদি তদুপযুক্ত লোক হয় তাহলে আমার একটা মস্ত অভাব দূর হবে। মহেন্দ্রাণীকে স্কুলে রাখার কোনো অসুবিধাই হবেনা। হিঁদুয়ানির সম্বন্ধে তার বাছবিচার কি রকম? জান ত আমরা কি রকম ম্লেচ্ছ— অবশ্য, তোমরাও কম নও— কিন্তু কলকাতায় তোমাদের মত লোকের ঘরের এক প্রান্তে ভগবান মনুর অনুশাসন মেনে চলবার বন্দোবস্ত করা তেমন কঠিন নয়। এ সম্বন্ধে বিবির পরামর্শ কি আমাকে জানিয়ো।

বেল্‌জিয়ামের কীর্ত্তি মনে খুব লেগেছে— সেদিন ছেলেদের এই নিয়ে কিছু বলেও ছিলুম— হয় ত দেখবে কবিতাও একটা বেরিয়ে যেতে পারে। এবার কি তোমাদের আশ্বিন কার্ত্তিকের যমজ সংখ্যা বের করবার ব্যবস্থা হয়েছে?

ব্যাঙ্কের লেখাপড়াটা করে ফেল— সুরেনকে কষে তাড়া লাগাও।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৩২] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯১৪

কল্যাণীয়েষু

এ মাসের সবুজপত্র পেয়েছি। র…র লেখাটি যাকে বলে "সারবান"। নিন্দা করাও শক্ত, হজম করাও তাই। এ সব লেখা ভোগ করবার যোগ্য নয় অথচ জমিয়ে রাখবার যোগ্য। পত্রপুটে ফুল রাখা চলে, মিষ্টান্ন রাখাও চলে, কিন্তু খনিজপদার্থের ভার ত তার উপরে সয় না— সবুজপত্রপুটের পক্ষে এই প্রত্নতত্ত্ব রত্নবিশেষ হলেও বেশি গুরুতর হয়েছে।

ম…কুমার লোকটি কে তার ত ঠিকানা পাওয়া গেল না। লেখাটি সম্পূর্ণ মাঝারি রকমের। তাপও নেই শৈত্যও নেই। ভাষার বেগ নেই, ভাবের প্রভাব নেই— অথচ একটা গতি আছে— এই পর্য্যন্ত।

আসল কথাটা হচ্চে সবুজপত্রে তোমার লেখার অভাব অনুভব করা গেল। ডাকে যার চিঠির জন্যে অপেক্ষা করা যাচ্চে যদি একদিন তার হাতের শিরোনামা-লেখা লেফাফা পাওয়া যায় এবং খুলে দেখা যায় যে চিঠিটা অন্য লোকের, তাহলে যে রকম মনের ভাব হয় এবারকার সবুজপত্র খুলে সেই রকম ভাবোদয় হল।

মোটের উপর আমি ভাল ছিলুমনা— ঠিক কবিতা লেখবার মত মনটা তাজা ছিলনা তাই কিছু লেখা হয় নি। এখন ভাবের স্রোত ভঁাটার মুখে আছে— আবার যদি স্রোত ফেরে ত দেখা যাবে। ইতিমধ্যে একটা গল্প লেখায় হাত দিয়েছি। একটা করে গল্প যে চাইই মণিলালের কড়া তাগিদ। তুমি এই ছুটিতে একটা গল্প লেখার চেষ্টা কোরো— কেবলি এক হাতের গল্প হওয়া ভাল নয়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৩৩] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

৮ অক্টোবর, ১৯১৪

কল্যাণীয়েষু

চারুর কাছে শুনেছিলুম ··· বাবু আমার লেখার প্রতিবাদ করে একটা কি লিখেছেন আমি মণিলালকে লিখ্‌তে যাচ্ছিলুম সেটা যেন ছাপানো হয়। ভালো হোক্‌ বা না হোক্‌ এটা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। তাহলে এই উপলক্ষ্যে আমারও নিজের কথা আর একবার স্পষ্ট করে বুঝিয়ে বলবার সুযোগ পাওয়া যাবে।

যে পর্য্যন্ত না লেখক দুটি একটি তৈরি হয়ে ওঠে সে পর্য্যন্ত সবুজ পত্র তোমার লেখা দিয়েই ভরতে হবে। আমি মনে মনে সেইটেই ইচ্ছা করি। আমি ত এই দীর্ঘকাল লিখে আস্‌চি— আমার বলবার কথা নানারকম করে বলা হয়ে গেছে— এখন যা বল্‌তে যাব তাতে কেবল পূর্ব্বকথিত কথাকে পুরোনো করে

তোলা হবে। এখন তুমি তোমার নিজের কক্ষে তোমার জ্যোতিষ্কটিকে চালিয়ে দাও, বাংলা দেশের বর্তমান যুগকে একবার সে তার আলোক দেখিয়ে প্রদক্ষিণ করে আসুক্। মানুষের চিত্তকে একজন লোক বরাবর জাগিয়ে রাখতে পারে না— সেই জাগিয়ে রাখাটাই আসল কথা, কোনো কিছু দান করার মূল্য তেমন বেশি নয়। নূতন শক্তির অভিঘাতে মানুষ জাগে— পুরাতনের বাণী অতি অভ্যাসে আর মনকে ঠেলা দেয় না। তা ছাড়া আমারও সাহিত্যলীলা শেষ হয়ে এসেছে— এখন আমার গাণ্ডীব তোলবার শক্তি নেই। সেইজন্য তোমাকে আমি একটি নবীন লেখকমণ্ডলীর কেন্দ্র ও অধিনায়কের আসনে অধিষ্ঠিত দেখ্‌তে ইচ্ছা করি। এইজন্যই সবুজপত্রের প্রতি আমার যা-কিছু ঔৎসুক্য— আর তাই দেহমনের বিমুখতাসত্ত্বেও যতটুকু পারি লিখচি। কিন্তু তোমার জায়গা তুমি সম্পূর্ণ জুড়ে বস— আমার যাবার সময় হল।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ইংরেজি কবিতাটি পাঠিয়ে দিয়েছি। "Crossing"টা আমাকে ফেরৎ দিয়ো— তার কোনো খসড়া খুঁজে পাচ্চি নে।

[৩৪] ওঁ 41 George Town
Allahabad

পোস্টমার্ক, এলাহাবাদ
১১ ডিসেম্বর ১৯১৪

কল্যাণীয়েষু

কাল রাত্রে সবুজপত্র পাওয়া গেল। পেতে যে দেরি হল তার মূল কারণ আমি অতএব ওসম্বন্ধে বেশি কিছু আলোচনা করবনা। কেবলি ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি— বের্গসঁর

ফিলজফির লাইনে— স্থিতি নেই বল্লেই হয়— যাকে বলে গড়ানে পাথর, রোলিং ষ্টোন্, সবুজ সামগ্রী কিছুই জমা করবার মত অবকাশ ঘটেনি। কোনোমতে টুক্‌রো সময়গুলোকে জোড়া দিয়ে দিয়ে ফকিরের কাঁথার মত করে আমার এবারকার গল্পটা সেরেছি। সম্পূর্ণ ফাঁকি দিইনি সেজন্যে আমি সম্পাদকের আন্তরিক ধন্যবাদ দাবি করতে পারি। পাঠকদের কাছে আমার বিশেষ কিছু দাবি নেই। তারা বিনা দাবিতেই অযাচিত আমাকে যে দক্ষিণা দেবে সে আমার এত জমা হয়েছে যে এখন তার থেকে আমি বিনামূল্যে বিনা মাশুলে তাদের কিছু কিছু ফিরিয়ে দিতে পারি। যুদ্ধের সম্বন্ধে তোমার লেখাটি আমার খুব ভালো লাগ্‌ল— ও সম্বন্ধে আমার মনে যে সমস্ত কথা এসেছে হয় ত ছোটখাটো আকারে লিপিবদ্ধ করে তোমার সম্পাদকী দপ্তরে রওনা করে দিতে পারি। এবারকার সবুজপত্রে আমদানি নেই রপ্তানিই সমস্ত— অর্থাৎ বাইরে থেকে কিছুই জমা হয়নি দেখ্‌তে পাচ্চি।

একটা কাজের কথা মনে করিয়ে দিই— সেটা তোমাদের ভুল্‌লে কোনোমতেই চল্‌বে না। সেই কালিগ্রামের ব্যাঙ্কটাকে বিধিবদ্ধ করে তোলা। আর দেরি কোরো না। সুরেন যে সময় পাবে এমন আমি আশা করিনে— তাকে একবার জানিয়ে তুমি কোনো এটর্ণিকে দিয়ে লিখিয়ে নিতে পার। মুস্কিল এই যে এটর্ণি যে সুরেনের চেয়ে কোনো অংশে ভালো তা নয়। কালোহ্যয়ং নিরবধিঃ বটে তাই বলে মানুষের

জীবিত কাল ত নিরবধি নয়— আমাদের এটর্ণিদের অমরাবতীর এটর্ণি হওয়া উচিত ছিল, তারা কোনোমতেই মর্ত্ত্যলোকের যোগ্য নয়। যে করে পার ও যত শীঘ্র পার এই কাজটা সেরে দিয়ো। ··এসকল বিষয়ে mobilisationএর সত্বরতাই হচ্চে ব্রহ্মাস্ত্র।

কোথায় কখন আছি তার কিছুই স্থিরতা নেই তবু যদি কিছু বলবার থাকে এলাহাবাদে সত্যর কেয়ারে চিঠি পাঠালে আমার কাছে কোনো রকম করে পৌঁছবে।

বাল্মীকিপ্রতিভা কি রকম হল ?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৩৫] ওঁ পোস্টমার্ক, এলাহাবাদ

২০ ডিসেম্বর, ১৯১৪

কল্যাণীয়েষু

একদিন প্রাতঃকালে এলাহাবাদ থেকে দিল্লিতে যাবার বিষম ব্যস্ততার মধ্যে সেই লেখাটা তাড়াতাড়ি লিখে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলুম। তার পরে এ কথা আমার মনে হয়েছে যে ওটার মধ্যে দু চার জায়গায় একটু নরম তুলি বুলিয়ে কড়া রংগুলোকে কিছু কিছু ফিকে করে দিলে আর কোনো গোল থাকে না। তোমারও যখন সেই মত তখন এক কাজ কোরো লেখাটার যে যে অংশে কাঁটাখোঁচা আছে একটু চিহ্নিত করে শান্তিনিকেতন ঠিকানায় পাঠিয়ে দিয়ো— আমি কিছু বাড়িয়ে কমিয়ে তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব—

তার পরেও যেটুকু অধিকমাত্রায় বেমোলায়েম ঠেকবে তার উপরে দুই এক দফা তোমার সম্পাদকী র্‍যাদা চালিয়ে দিয়ো।

সোমবার প্রাতে আমি বোলপুর পৌঁছব। ইতি শনিবার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"চঞ্চলা" নামক এক কবিতা মণিলালকে পাঠিয়েছি— যদি সেটা অচলা হয় তাহলে তাকে ঝেড়ে ফেল্‌তে কিছুমাত্র দ্বিধা কোরো না।

সুরেনকে ব্যাঙ্কের কথা মনে করিয়ে দিয়ো।

[৩৬] ঁ

কল্যাণীয়েষু

তোমার এবারকার দুটো লেখাই আমার খুব ভাল লাগ্‌ল। আমার ভয় হয় পাছে সমালোচকদের ধাক্কায় তোমাকে বিচলিত করে। এতদিনে এটুকু তোমার বোঝা উচিত ছিল যে এদেশে সম্ভবত সাহিত্যরসজ্ঞ অনেক আছে কিন্তু তারা প্রায়ই কেউ "সাহিত্যিক" নয়— যেমন ময়রার মুখে সন্দেশ রোচে না তেমনি আমাদের সাহিত্যিকরা সাহিত্যের কারবার করে কিন্তু সাহিত্য ভালবাসে না— সে শক্তি তাদের নেই। আমি তাই ওদিকে একেবারেই কান দিইনে— কর্ণটা যদি ঢেউকে খাতির করে তাহলে ত নৌকাডুবি। সাহিত্যে তোমার প্রতিষ্ঠা যতই দৃঢ় হতে থাকবে ততই তোমার উপর ধাক্কা বেশি পড়বে— যারা মাঝারি মানুষ তাদের সুবিধা এই

যে তাদের মাথার অনেক উপর দিয়ে তুফান চলে যায়। আমি দেখেছি যত রাজ্যের বাজে লোকের কথায় তোমাকে উত্তেজিত করে— তুমি বাজে লোককে কিছু বেশি নাই দিয়েও থাক— তার একটা কারণ তুমি তাদের মধুর বচনের মায়া এখনো ছাড়াতে পারনি এবং তাদের দুর্ব্বাক্যকে এখনো ভয় কর। অথচ তোমার নিজের মধ্যে প্রভূত শক্তি আছে— সাহিত্যের যে সিংহাসন তুমি নিজের জোরে দখল করে নিয়েছ তাতে তোমার সরিক কেউ নেই এবং সংশয়মাত্র নেই বিধাতা তোমাকে আধিপত্যের অধিকার দিয়েছেন—যে কেউ তোমাকে গাল দিক আর উপহাস করুক সে আপনাকেই উপহসিত করচে।

তোমার আষাঢ়ের সুর আমার আষাঢ়ের সঙ্গে মেলে নি সে ত ভালই— ওতে ত কারো কোনো লাভ লোকসান নেই। এইটুকু হলেই হল যে ওতে রসের কম্‌তি না হয়;— তা হয়ও নি; আমি ত পড়ে খুসিই হয়েছিলুম। তোমার ভারতের ঐক্য প্রবন্ধের মধ্যে খুব নূতনতা ও গভীরতা এবং সেই সঙ্গে রচনারস আছে। এই রকম জিনিষ যদি বরাবর চলে তবে সবুজপত্র চিরসবুজ হয়ে অমর হয়ে থাকবে।

ছন্দতত্ত্ব পাঠালুম।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৩৭] ওঁ পোস্টমার্ক, কলকাতা

১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯১৫

কল্যাণীয়েষু

প্রমথ তুমি যে এটর্ণিটিকে আমাদের বিদ্যালয়ের দেহে যোজনা করেছ সেটাতে কি কোনো উপকারের প্রত্যাশা করা যায়? বিদ্যালয়ের রক্ত অল্প; এরকম এটর্ণির পেট ভরাবার মত রস তার নেই। আমার ক্রমেই এই বিশ্বাস হচ্চে মকদ্দমায় জয়লাভের চেয়ে এটর্ণির হাত থেকে মুক্তিলাভ ঢের বেশি লাভজনক। আমার ভিক্ষায় কাজ নেই এখন কুত্তাটা একটু সরলে বাঁচি। খগেন বেচারার ক্ষুধা অল্প, তার দরদ বেশি এবং তার তৎপরতা যেমনি হোক্ এ পক্ষের চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়। এখন এই সঙ্কট থেকে মার্নে মানে উদ্ধারের কি কোনো উপায় আছে? আমি খগেনকে আমার তরফের আইন-সচিব নিযুক্ত করলে অনেক বেশি নিশ্চিন্ত হতে পারব— অন্তত রক্তপাত ঢের কম হবে। আমি তাকে মাসিক বেতন দিয়ে বিদ্যালয়ে এবং ব্যাঙ্কে আমার যে বিষয়-ব্যবস্থা আছে আমার তরফে তার পরিদর্শক ও কার্য্যকর্ত্তা নিযুক্ত যদি করি তবে আমার মত অকর্ম্মণ্য ও নির্ব্বোধ কিঞ্চিৎ পরিমাণে নিরাপদে থাক্‌তে পারে। যতদূর দেখা গেল সর্ব্বাধিকারীর অধিকার আমার পক্ষে একটু বেশি দুর্ম্মূল্য অথচ তার ফলও অনিশ্চিত। এ সম্বন্ধে আমাকে সৎপরামর্শ দিয়ো।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৩৮] ওঁ

কল্যাণীয়েষু

·· তোমার লেখাটা কলকাতায় ফেলে এসেছি। আমার একটা চামড়ার Mss. বাক্স আছে রথী সেটা ঘাঁট্‌লে তার থেকে উদ্ধার করতে পারবে। আমি কারমাইকেলের হাঙ্গাম চুকে গেলেই তার একটু ছোট ভূমিকা পাঠিয়ে দেব। আমি রাজ-অভ্যর্থনার ব্যাপারে ব্যস্ত হয়ে আছি।

Sylvain Levi আমার ছন্দতত্ত্ব সম্বন্ধে কি বলেছে দেখেছ? রথীকে তার Extract পাঠিয়েছি— সে বোধ হয় তোমাকে দেখিয়ে থাক্‌বে। ওর মত পড়ে ও লেখাটা শেষ করে ফেলবার জন্যে আবার উৎসাহ হচ্চে। দেখি যদি সময় পাই।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৩৯] ওঁ পোস্টমার্ক

২৩ এপ্রিল, ১৯১৫

কল্যাণীয়েষু

কোনো ভদ্রলেখকের পক্ষে বারো মাসে বারোটা করে গল্প লেখা কি সম্ভব, না উচিত? এ'তে একরকম স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয় যে তুমি চুরি করে ব্যবসা চালাও— কিন্তু ঐ বিদ্যাটা লেখকদের জোয়ান বয়সে কতকটা মানায়, শেষ বয়সে না। এ রকম নিয়ত রচনা করে যাওয়া প্রকৃতির নিয়মবিরুদ্ধ— ফুল ফোটার এবং ফল ধরার ঋতু আছে— প্রকৃতির সবুজপত্রে বারোমেসে লিপিকর ক'টা আছে? যাই হোক্‌, মণিলালের

সঙ্গে তক্‌রার করে পেরে উঠবনা। একটা গল্প লিখ্‌তে লাগব।

কালিঘাটের হরিদাস হালদারকে জান? লোকটি লিখতে পারে সন্দেহ নেই। আমাকে তাঁর রচিত "গোবর গণেশের গবেষণা" বলে একখানা বই পাঠিয়েচেন— আমার ত পড়ে ভাল লাগ্‌ল। মনে হল অনেকটা সবুজপত্রের কায়দার লেখা— অর্থাৎ খুব হাল্কা এবং উজ্জ্বল— লোকটার সাহসও আছে। তোমরা এঁকে যদি পাকড়া কর ত মন্দ হয় না।

তুমি একবার কোমর বেঁধে গল্পে লাগলে আমি ত খুসি হই। আমার বিশ্বাস তুমি পারবে— অবশ্য, সম্পূর্ণ তোমার নিজের ধাঁচার একটা জিনিষ হবে— অর্থাৎ ইস্পাতে গড়া মূর্ত্তি হবে— ঝক্‌ঝক্ করবে অথচ কঠিন হবে— কড়া আগুনে গালাই করা ঢালাই করা জিনিষ।

তোমার সেই কাঠের পুতুলটাতে একবার হাত দিলে কেমন হয়?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৪০] ওঁ বোলপুর

পোস্টমার্ক, ১৮ অগস্ট, ১৯১৫

কল্যাণীয়েষু

নলিনী সদরে কোনো আবেদনপত্র না পাঠিয়ে একেবারে আমার কাছে পাঠিয়েছিল। তোমাদের সেরেস্তায় সেটা না পাঠিয়ে আর দুই একটা বাজে চিঠি ভুলক্রমে পাঠিয়েছিলুম।

অথচ এইজন্তে কালোয়া বিভাগ পত্তনের সময় পিছিয়ে যাচ্চে। জমিদারী বৎসরের প্রথম হতেই কাজ আরম্ভ হলে সুব্যবস্থা হয়। তাই আজই আমি শিলাইদহের ম্যানেজারকে এ সম্বন্ধে তাড়া দিয়েছি। তোমরাও কালোয়ায় নলিনীকে নিযুক্ত করবার অনুমতি তাকে পাঠিয়ে দিতে দেরি কোরো না। আমিও শীঘ্রই আর একবার শিলাইদা ও পতিসরে গিয়ে বিভাগের কাজকর্ম পরিদর্শন ও আলোচনা করবার সংকল্প করেচি। বিভাগটাকে সচল ও সফল করবার দিকে আমার একটু বিশেষ ঝোঁক আছে।

এখানে এসে গল্পটা আর একটু এগিয়ে নিয়ে যাব ভেবেছিলুম— সে হলনা। এখানে এলেই কাজের আবর্তের মধ্যে পড়ে যাই— লেখায় মন দিতে পারি নে। গল্পটাকে ওর অন্ত্যেষ্টিসংকার পর্য্যন্ত যতক্ষণ না পৌঁছে দিতে পারি ততক্ষণ মনটা ভিতরে ভিতরে উদ্বিগ্ন হয়ে থাকে। সংসারে বাস্তবের অভাব নেই তার উপরে আবার এই সব অবাস্তবের বোঝা।

এবারকার সবুজপত্রে আমি ত টীকাটিপ্পনি আরম্ভ করিয়ে দিয়েচি। এবার থেকে ওটাকে বরাবর চালিয়ে নিয়ে যেয়ো।

আমি খুব সম্ভব কাল কলকাতায় যাব। ইতি বুধবার।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয়েষু

কালিগ্রাম ও বিরাহিমপুরে যাতে বিভাগের কাজে কোনো ত্রুটির সম্ভাবনা না থাকে আমি সেইজন্যে বিশেষভাবে লেগেছি। এ পর্য্যন্ত যে সব অনিয়ম ও নিষ্ফলতা ঘটেচে সে কেবল যোগ্য লোকের অভাবে। আমি কিছুতেই আর সে রকম ঘট্‌তে দেব না। বর্ত্তমানে যে দুটো জায়গা কাঁচা আছে সে হচ্চে রাতোয়াল আর কুমারখালি। আমি এবার কালিগ্রামে প্রত্যেক বিভাগে ঘুরেচি—রাতোয়ালের ম্যানেজার নিতান্তই অযোগ্য— তার কিছুমাত্র দায়িত্ববোধ নেই সমস্ত কাজ জমানবিশ করে। ওখানে আমি ওর বদলে এখানকার জমার পেস্কার মুনীন্দ্রকে রাখ্‌তে চাই আর মুনীন্দ্রর জায়গায় শাস্ত্রীমশায়ের জামাই যোগেশ সরস্বতীকে রাখব। এতে কোনো পক্ষের কোনো আপত্তি নেই। শিলাইদহের ম্যানেজার অক্ষয়ও সরস্বতীর প্রতি খুব প্রসন্ন।

কুমারখালির অ... ও অচল। জমিদারীর কাজ সে ত বোঝেই না— সেইজন্যে ভালো জমানবিশ খোঁজ করচে— অর্থাৎ তাহলে ওখানকার কাজকর্ম্ম যা-কিছু সব জমানবিশই চালাবে নিজে কেবল উপরে উপরে কর্ত্তৃত্ব করে বেড়াবে।

কুমারখালি অঞ্চলে যদি অমৃত রায়কে পাওয়া যায় তাহলে কোনো ভাবনাই থাক্‌বেনা। ওখানকার কাজ সবরকমে শক্ত অথচ ওখানকার লোকটি যোগ্য নয়। এ সম্বন্ধে

যা কিছু ব্যবস্থা ছুটির পূর্ব্বেই করা কর্ত্তব্য যাতে ছুটির পর থেকেই পুরোদমে কাজ আরম্ভ হতে পারে।

ছুটির মুখেই রাতোয়ালের এবং কুমারখালির বর্ত্তমান ম্যানেজারদ্বয়কে যদি নোটিস্ দাও তাহলে ছুটির মাসটা ওরা কাজের চেষ্টা দেখ্‌তে পারে। সেই মাসে বেতন ছাড়াও ওরা পার্ব্বনি পাবে—যদি ইচ্ছা কর আরো একমাসের বেতন যোগ করে দিতে পার।

কালিগ্রামে সাধারণবৃত্তি বৎসরে এগারো হাজার টাকা ওঠে। এ পর্য্যন্ত এতবড় মোটা টাকা ন দেবায় ন ধর্ম্মায় নষ্ট হচ্ছিল—বিভাগে এর যে রকম হিসাব রাখা চলছিল সে দেখে আমি ভারি বিরক্ত হয়ে এসেচি। তার আমি পাকা নিয়ম করে দিয়েছি। এই সাধারণ বৃত্তির অন্তর্গত সমস্ত কাজ ও হিসাব যাতে রীতিমত সদরে যায় তার বন্দোবস্ত করেচি। তোমার সঙ্গে দেখা হলে সব বলব।

ভাদ্র কিস্তির "ঘরে বাইরে" রেজিস্ট্রি ডাকযোগে কাল মণিলালের কাছে পাঠিয়েচি। তুমি এবার কিছু লিখচ? আমি এ যাত্রায় এখানে এসে কিছুমাত্র ছুটি পাইনি—দিনরাত টোঁটোঁ এবং বক্‌বক্ করতে হয়েচে।

বোধ হয় শনিবার যখন সন্ধ্যায় জোড়াসাঁকোয় আস্‌বে মোলাকাৎ হবে।

এবছর দুই পরগণাতেই ফসল খুবই ভালো—কিন্তু শাস্ত্রে বলে, শস্যঞ্চ গৃহমাগতং। ইতি বুধবার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৪২] ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

পতিসরের একজাইনবিশ যোগেশ সরস্বতীকে শিলাইদহের জমার পেস্কার করে পাঠাচ্চ, যোগেশের জায়গায় হরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়কে নিযুক্ত করার প্রস্তাব আমি করচি। জমিদারীর জমা ও সুমার বিভাগে তার অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা আছে। নূতন লোককে নিযুক্ত করার চেয়ে এর দ্বারা কাজ ভাল পাবে।

এখানে এসে অবধি এণ্ড্রুজের হাতে পড়েচি কাল সে চলে যাবে তার পরে একটু লেখবার ছুটি পাওয়া যাবে। দেখি যদি কিছু মাথায় আসে। তোমার সেই টীকাটিপ্পনি ছাড়া আর কিছু কি হয়নি? সবুজপত্রের দু মাসের মত পেট ভরাবার জোগাড় হয়েছে কি? ইতি ৩০শে ভাদ্র ১৩২২

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৪৩] ওঁ পোস্টমার্ক

২৪ অক্টোবর, ১৯১৫

কল্যাণীয়েষু

অশোকগুচ্ছ ঘেঁটে ঘেঁটে দুটো কবিতা তর্জ্জমার মত পাওয়া গেল। দ্বিজুরায়ের মন্দ্রের কবিতা ইংরেজিতে তর্জ্জমা করবার মত শক্তি আমার নেই। অর্থাৎ ওতে যে রকম ইংরেজির দরকার আমার বিদ্যেয় তা কুলবে না। একটা একটু সুরু করেছিলুম কিন্তু এমন ঠেকে গেল যে ঠেলে তুলতে

পারলুম না। তাই দ্বিজুরায়ের "আলেখ্য" থেকে একটা কবিতা তর্জ্জমা করলুম, আরো অন্তত একটা করতে পারলে খুসি হতুম কিন্তু শক্তি নেই। আর দু চারজন আধুনিক কবির কাব্য পাঠালে না কেন? অন্তত আমার উচিত হবে তাদের কিছু তর্জ্জমা করা— নইলে তারা পীড়া বোধ করবে। কাশ্মীর দেশটা শুনেছি খুব সুন্দর কিন্তু এখনো তার পরিচয় পাওয়া গেল না।

যুবতীর হাসি। (অশোকগুচ্ছ ২৭ পৃ:)

Methinks, my love, in the dim daybreak of life, before you came to this shore, you had stood by some river-source of impetuous dreams, filling your blood with its liquid notes.

Or, perhaps, your path was through the shade of the garden of the gods, where the merry multitude of jasmines, lilies and white oleanders fell in your arms in heaps and entering your heart became boisterous.

Your laughter is a song whose words are drowned in the tune, an odour of flowers unseen.

It is like moonlight rushing through your lips' window when the midnight moon is high up in your heart.

I ask for no reason, I forget the cause, I only

know that your laughter is the tumult of insurgent life.

—•—

My ,offence (সোহাগিনী ইথে তোর এত অভিমান—অশোকগুচ্ছ ৭০ পৃ:)

When you smilingly held up to me, my sweet, your child of six months, and I said, "keep him in your arms," why did a sudden cloud pass over your face, a cloud of pent-up rain and hidden lightning?

Was my offence so great?

When the rose-bud, nestling in its branch, smiles to the bent face of the morning, is there any cause for anger if I refuse to steal it from its Cradle of leaves?

Or when the cuckoo fills the heart of the happy hours of the spring with love dreams, am I to blame if I cannot conspire to imprison it in a cage?

—•—

Dwijendralall Roy (নূতন মাতা, আলেখ্য ১১ পৃ)

"Come, moon, come down, kiss my darling in the forehead," cries the mother as she holds her baby girl in her lap while the autumn moon floats in the pale blue of the evening sky.

From the garden comes stealing in the dark the vague perfume of flowers into the room.

The boys laugh and shout in the street in loud merriment.

In the mango grove near by one solitary *papia* sings his heart out in an untiring tune, and from some distant peasant's hut come the shrill notes of a flute, soaring in the starry sky, spreading in the still air and then bursting down upon the earth like a shower of firework, while the young mother, sitting in the balcony, baby in her lap, croons sweetly, "Come, moon, come down, kiss my darling in the forehead."

Once she looks up at the moon in the sky and then down at the sweet loveliness in her arms, and I wonder that the moon could be deaf to her call and smile on in placid silence.

The baby laughs and repeats her mother's call, "Come, moon, come down."

The mother smiles and smiles the moon-lit night, and I, the poet, the husband of the baby's mother, saw this picture from behind unseen.

—o—

দ্বিজুরায়ের কবিতা তুমি নিজে তর্জ্জমা করবার চেষ্টা কোরো— তোমার কলমে হয়ত আস্‌তে পারে। এখানে চিঠির জবাব দিয়ো না— শীঘ্রই বেরতে হবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কলিকাতা

পোস্টমার্ক, ৭ নভেম্বর, ১৯১৫

কল্যাণীয়েষু

ফিরে এসেচি। কাশ্মীরে খুব যে আরামে ছিলুম তা নয়। একেবারে পেট ভরে ক্লান্ত হয়ে ফিরেচি। এক লাইন লিখ্‌তে পারিনি, অথচ আজ হল ২০ কার্ত্তিক। দুই এক দিনের মধ্যেই শিলাইদহে যাবার ইচ্ছা আছে— নইলে লেখাও হবেনা, শ্রান্তিও শরীর মনে জড়িয়ে থাক্‌বে।

তোমাকে গোটাকয়েক ইংরেজি তর্জ্জমা পাঠিয়েচি। তোমার কাজে লাগ্‌বে কি না জানিনে। আমার নিজের লেখার manuscripts যা তোমার কাছে আছে তার উপরে চোখ বুলিয়ে আমাকে ফিরে পাঠিয়ে দিয়ো (কলকাতার ঠিকানায়)। যদি আর কোনো কবির কোন কবিতা তর্জ্জমা করাতে চাও তাহলে ফর্‌মাস কোরো। আমার যেটুকু পুঁজি তার দ্বারা সকল রকমের তর্জ্জমা আমার হাতে আসে না। যেগুলো Lyrical সেইগুলোই কতকটা পারি— কিন্তু জিনিষটা যথার্থ ভালো হলেই তর্জ্জমাও ভালো হয় সে কথা বলা বাহুল্য— নইলে অনেক মস্‌লা মেশাতে হয়। তুমি নিজে কতকগুলো তর্জ্জমা করবার চেষ্টা করে দেখো।

কার্ত্তিকের সবুজপত্র কি বেরবে? সম্পাদক পলাতক, প্রকাশক গরহাজির, যে দুটিমাত্র লেখক নিয়ে তার কারবার তার মধ্যে একটি লেখকের অবস্থা আমি অন্তরঙ্গভাবে জানি, তার থলি শূন্য, তার মগজও প্রায় তথৈবচ,— অন্য

লেখকটির সম্বন্ধে আমার যতটা জানা আছে তাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস তিনি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়েই বসে আছেন। এক্ষণে উপায়? আমার মুস্কিল, আমি এক গল্প ফেঁদে বসে আছি, তাকে খামকা মাঝখানে ফেলে দিয়ে দৌড় মারবার জো নেই। ওর অন্ত্যেষ্টিসংকার পর্য্যন্ত খাট বইতে হবে।

তোমার ইংরেজি লেখাটা কতদূর? শুন্‌চি এবার তোমাদের রাঁচি সরগরম, অনেক অতিথি অভ্যাগতের ভিড় হয়েচে। তাই আমার আশঙ্কা হচ্চে তোমার রসনা যত চল্‌চে তোমার কলম সে পরিমাণে চল্‌চেনা। কবে তোমরা ফিরচ? বিবির শরীর ভালো আছে ত?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৪৫] ঁ

কল্যাণীয়েষু

প্রমথ, কুষ্টিয়ার মোক্তার শৈলেন্দ্র মারা গেছে। অম্বাচরণের ভাই অঘোর সেই পদের প্রার্থী। তার সম্বন্ধে তোমাকে এক লাইন লিখে দেবার জন্যে অম্বাচরণ আমাকে ধরেছে। আমার এই লেখা কেবলমাত্র লেখা— আমি জানিনে সে মানুষ কি রকম, জানিনে তোমাদের প্রয়োজন আছে কি না। কিন্তু লিখ্‌বনা বলার চেয়ে লেখা সহজ— কম সময় লাগে এবং মানুষ খুসি হয়।

কাল হঠাৎ এণ্ড্রুজ এসে উপস্থিত— আজ তাকে বিদায় করেছি কিন্তু সে আমার সমস্ত সূত্র ছিন্ন করে দিয়েছে। তার

উপরে ঘন মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন, তাকে বিদায় করবার ক্ষমতা আমার নেই। আমার রচনা বিকশিত হবার জন্যে যথেষ্ট পরিমাণে আলোর অপেক্ষা রাখে। আমি আমার আকাশের মিতা সূর্য্যদেবের সহযোগেই লিখে থাকি— আমার সেই দোহার্কির অভাব ঘটাতে আসর জম্‌চে না— অপেক্ষা করচি এই মেঘটা কখন কেটে যায়। কিন্তু শীতের মেঘ জমতেও দেরি করে আর বিদায় নিতেও দেরি করে।

আমাদের মাসহারার পরিমাণটা ১২০০ টাকায় এসে ঠেকেছে— ঠিক যেন সমে এসে পৌঁছয় নি। ওটাকে ১৫০০ করে দিলে শুন্‌তেও ভাল হয় তা ছাড়া অন্য সুবিধাও আছে। ধার করে শেষকালে সেটা জমাখরচ করবার উৎপাত করার চেয়ে বেশ সরল অন্তঃকরণে মাসহারা বাড়িয়ে নিলে কাজ সহজ হয় মনটাও সুস্থির থাকে। অবশ্য ১৫০০ অঙ্কটা যদি পছন্দসই না হয় ওটাকে ২০০০ করলে কারো কোনো আপত্তির কারণ থাকে না। ভেবে দেখো।

আমার এটর্ণি যে বিলম্বের ফাঁদ পেতে খরচার অঙ্ক বাড়িয়ে চলেছে তার থেকে উদ্ধারের উপায় কি ?...শরীরটা এখানে অনেকটা ভালো হয়েছে। দেবতা প্রসন্ন হলে গল্প অন্তত একটা লিখে নিয়ে যাব— কিন্তু রোদ্দ্‌র চাই।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঔ

পোস্টমার্ক, শিলাইদা
৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯১৬

কল্যাণীয়েষু

অত্যন্ত শ্রান্ত ছিলুম বলে পতিসরে না গিয়ে শিলাইদহে এসে পড়েচি। কয়েকদিন জিরিয়ে নিয়ে পতিসরে যাওয়া যাবে।

এখানে চুঁয়োপাড়ার প্রজারা বিষম কান্নাকাটি করচে। দূরে থাক্‌লে প্রজাদের দুঃখ আমাদের কাছে গিয়ে পৌঁছয় না— যেটা পৌঁছয় সে হচ্চে খাজনা। দূরে থাকার অন্যায় হচ্চে এই। যাই হোক ১৪৫ ধারায় এদের চাষের জমি, এদের ফসল প্রভৃতি আবদ্ধ হয়ে এরা যে কষ্টে পড়েচে তার কি উপায় হতে পারে ভেবে দেখো। অ···র মুস্কিল এই যে, সে লোক খাঁটি কিন্তু ডেপুটি প্রভৃতির সঙ্গে কিছুমাত্র সামাজিকতা করতে পারেনা— এইজন্যে যে চাকা অল্প একটু তেল পেলেই বেশ সহজে সরত সে ভয়ঙ্কর ক্যাঁচকোঁচ করে। চুঁয়োপাড়ার প্রজাদের নিয়ে আমার মনটা বড়ই ক্লিষ্ট হয়ে আছে। ডেপুটির এজলাসে যদি কোনো ভাল উকিল কৌঁসুলি পাঠিয়ে ফল পাবার সম্ভাবনা থাকে তাহলে সে চেষ্টা দেখা উচিত। তুমি ত সরস্বতী পূজোয় আস্‌চই সেই সময়ে এইসব ব্যাপার যথাসম্ভব যদি নিষ্পত্তি করে যেতে পার ত ভাল হয়।

আমি ক্লান্তদেহে কেবলি ঘুমোচ্চি। তুমি কখন আসবে শীঘ্র খবর দিয়ো। সব চেয়ে সুবিধের যাত্রা হচ্চে রাত্রের গাড়িতে এসে ষ্টীমারে করে পাবনায় যাওয়া— সেখান থেকে

মোটর বোটে সকালেই শিলাইদহে এসে পৌঁছন যায়। কুষ্টিয়ার সামনে নদী প্রায় শুকিয়ে গিয়ে পাল্কী যাতায়াত বড় অসুবিধের হয়েচে— দেরিও কম হয় না— আর এসে পৌঁছতে বেলা হয়ে গরম হয়ে ওঠে। শুক্রবার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৪৭] ওঁ পোস্টমার্ক, পতিসর

ফেব্রুয়ারি, ১৯১৬

কল্যাণীয়েষু

সবুজপত্রেই তোমার গল্পটি এক সংখ্যাতেই কেন বের হবেনা? আমার "ঘরে বাইরে" ফাল্গুনেই শেষ করে দিয়েছি। গত বছর চৈত্রে যেমন ফাল্গুনী বের হয়েছিল এবারে তেমনি কেবলমাত্র তোমার গল্প বের হোক্। আমার প্রস্তাব হচ্চে এই :— ফাল্গুনের সবুজপত্র বের করতে আর বেশি দেরি কোরোনা— তারপর চৈত্রের প্রথম সপ্তাহেই তোমার গল্পটি বেরিয়ে যাক্। তাহলে বেশি দেরি হবেনা। এ মাসের সবুজপত্রের কপি কি সব তৈরি হয়নি? ঘরে বাইরে ত দিয়েছি— সেটা ফর্ম্মা চারেক হবে। তোমারও কিছু কিছু লেখা নিশ্চয় আছে— যদি প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তীর কিছু থাকে দিয়ে দিয়ো। তারপরেই তোমার গল্পটি ছাপা হতে থাক্। তাহলে ১লা চৈত্রেই বেরতে পারবে।

বিবিকে বোলো এবারে আমার শরীর অত্যন্ত বেশি অবসন্ন ছিল। অন্যান্য বারে যেমন শিলাইদহে আসবামাত্র

আমার লেখার বাঁধ আপনি ভেঙে যায় এবারে তা হয়নি। অনেক ধীরে ধীরে কোনোমতে ঘরে বাইরে লিখে তার পরে জড়তার ভারে নির্জ্জীব হয়ে পড়ে আছি। এবার আমার সাহিত্যের শাখায় ভালো করে বসন্তের মুকুল ধরল না। ফিরে গিয়ে বোলপুরে বসে নিশ্চয় তার সঙ্গীতের বক্তৃতা লিখ্‌ব— সেজন্যে সে কিছুমাত্র যেন উদ্বিগ্ন না হয়। এখনি বোলপুরেই ফিরতুম কিন্তু পতিসরের সেই পল্লীসংস্কারের কাজটা আমাকে ভূতের মত পেয়ে বসেচে অন্তত তাকে একটা পিণ্ডি না দিয়ে ফিরতে পারচিনে। পিয়ার্স ন সাহেব আমার সঙ্গে এসে জুটেচেন নইলে আরো শীঘ্র কাজ সারতে পারতুম। খুব সম্ভব আগামী সপ্তাহের গোড়াতেই কলকাতায় গিয়ে পড়ব। ইতিমধ্যে তোমার গল্পটি মেজে ঘষে বাগিয়ে রেখে দিয়ো। তুমি যখন প্রথম গণ্ডী পেরিয়েছ তখন আর গল্প লেখায় তোমাকে ঠেকিয়ে রাখা যাবেনা— এখন থেকে তোমার এই এক বন্ধু হবার পথে চল্‌ল। কিন্তু তুমি সবাইকে শুনিয়ে বেড়াচ্চ কেন? ওটা আচম্‌কা বের করতে পারলেই ভালো হত। ইতি বুধবার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন
মার্চ, ১৯১৬

কল্যাণীয়েষু

আমি কিছুদিন থেকে লক্ষ্য করচি সাহিত্য-সতরঞ্চের বোড়ের দল তোমার কিস্তি মাৎ করবার জন্য ভারি চঞ্চল হয়ে উঠেচে। আমাদের দেশের মুস্কিল ঐ। যার যা ক্ষমতা আছে সেটাকে আমরা অভ্যর্থনা করে নিতে জানিনে— যেখানেই শক্তির প্রকাশ দেখি সেখানেই শক্তিশেল হানবার জন্যে আমাদের হাত নিস্‌পিস্ করে। এই বিরুদ্ধতায় বিশেষ ক্ষতি হত না যদি অনুকূলতাও সমাজের মধ্যে থাক্‌ত। সেটা কোথাও নেই— লেখককে নিতান্তই নিজের তাগিদে কিম্বা সম্পাদকের তাড়ায় লিখ্‌তে হয়— অর্থাৎ ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে হয়— তার উপরে মোষের গুঁতোটা উপরি-পাওনা।

এখন মনে হচ্চে তোমার গল্পগুলো উল্টো দিক দিয়ে সুরু হলে ভালো হত। তোমার শেষ গল্পটা সব চেয়ে human। গল্পের প্রথম পরিচয়ে সেইটে সহজে লোকের হৃদয়কে টান্‌ত— তার পরে অন্য গল্পে মনস্তত্ত্ব এবং আর্টের বৈচিত্র্য তারা মেনে নিত। এবারকার দুটি নায়িকাই ফাঁকি— একটি পাগল, আর একটি চোর। কিন্তু নায়িকার প্রতি, অন্তত পুরুষ পাঠকের যে একটা স্বাভাবিক মনের টান আছে, সেটাকে এমনতর বিদ্রূপ করলে নিষ্ঠুরতা করা হয়। সব পাঠকের সঙ্গেই ত তোমার ঠাট্টার সম্পর্ক নয়— এইজন্যে তারা চটে

ওঠে। তাদের পেট ভরাবার মত কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন দিলেও ইতরে জনাঃ খুসি থাকত। তুমি করালে কি না "ঘ্রাণেন অর্দ্ধভোজনং"— কিন্তু কথাটা একেবারেই সত্য নয়— বস্তুত, ঘ্রাণেন দ্বিগুণ উপবাস। মানুষ যখন ঠকে তখন সহজে এ কথা বল্‌তে পারেনা যে, ঠকেচি বটে কিন্তু চমৎকার!

ছাত্রশাসনটা ইংরেজি করা হয়েচে— Modern Reviewতে যাবে। Lord Carmichaelকে পাঠিয়েছিলুম— তাতে কিছু ফল হয়েচে বলে খবর পেয়েচি। কিন্তু শুনচি আ··· বিশেষ কারণে বিরুদ্ধপক্ষ নিয়েচেন— তা যদি সত্য হয় তাহলে শিশুপালবধ হবে, কেউ ঠেকাতে পারবেনা— দ্বাপরযুগে কৃষ্ণভক্তিতে সেটা ঘটেছিল কলিযুগে ঘট্‌বে গোরার ভক্তিতে। দুঃখ করে কি করব? মরে তারাই যাদের মরণদশা। দেবা দুর্ব্বলঘাতকাঃ।

তোমার যে সব প্রবন্ধ ছাপতে চাও একবার চোখ বুলিয়ে দেখা যাবে।— প্রশ্নপত্রের বাংলা নমুনার টুক্‌রোটি কার আমি তাই ভাবছিলুম। অনেক চিন্তা করে শেষকালে ভাবলুম হয়ত বা "ছিন্নপত্রের" কোনো চিঠির মধ্যে ঐ কটা লাইন লিখেও বা থাক্‌ব। এত লিখেচি যে নিজের লেখার হিসেব রাখা শক্ত হয়ে উঠেচে।

মানসীতে তোমার লেখার বিরুদ্ধে যদি কিছু বেরিয়ে থাকে তার কারণ বোধ হয় তোমার ভাষাটার সঙ্গে নাটোরের ঝগড়া মিট্‌চে না। বৈশাখের মানসীতে কিছু লেখা দেবার জন্যে প্রভাতকুমার আমাকে বিষম পীড়াপীড়ি লাগিয়েচে।

তুমি বৈশাখে একটা কিছু শীতলভোগ দিলে হয়ত যুগল সম্পাদক প্রসন্ন হতে পারেন। পূর্ব্বে যখন ভোগ জোগাতে তখন ত তোমার দিন ভালই চলছিল!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৪১] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন
১২ এপ্রিল, ১৯১৬

কল্যাণীয়েষু

ডাক্তার দ্বিজেন্দ্র মৈত্র কিছুদিন পূর্ব্বে প্রভাস মিত্রের জন্যে আমার কাছ থেকে ভোটের প্রতিশ্রুতি আদায় করেচেন— অন্য কোনো candidateএর কথা আমি জানতুম না প্রভাস বাবুর প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে বলে আমি কোনো দ্বিধা করিনি। অতএব এবারকার মত আমার ভোট বাক্‌দত্ত।

আমি সমুদ্রপারের আয়োজন করচি। কিছুদিন থেকে মনটা একদিকে ক্লান্ত অন্যদিকে চঞ্চল— বোধ হয় একবার পারাপার করে এলে আবার কিছুকাল স্থির হয়ে বসতে পারব।

ইতিমধ্যে সবুজপত্রটাকে তোমরা তাজা রেখে দাও। যত পার নতুন লেখক টেনে নাও— লিখতে লিখতে তারা তৈরি হয়ে নেবে। কাগজের আদর্শের সম্বন্ধে অত্যন্ত বেশি কড়া হলে নিষ্ফল হতে হবে। দেশে যে আসবাব আছে তাকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করলে বৈরাগী হওয়া ছাড়া গতি নেই—

এই নিয়েই যথাসম্ভব ভদ্রতা রক্ষা করে ঘর করতে হবে— সাময়িক সাহিত্য অত্যন্ত বেশি যদি খুঁৎখুতে হয় তাহলে তাকে বিলেতের old maidএর মত যৌবন ব্যর্থ করে নিঃসন্তান শুকিয়ে মরতে হবে। চির সাময়িক সাহিত্যই অত্যন্ত সতর্ক হয়ে যাচাই ও বাছাই করে— সাময়িক সাহিত্যের আমদরবার; খাষ দরবার নয়। এই ত আমার বিশ্বাস।

২রা বৈশাখ যাচ্চি— মোকাবিলায় পরামর্শ হবে। এখন উড়ুক্ষু অবস্থায় আছি এই জন্যে মনের গ্রন্থি ঢিলে হয়ে গেছে কিছুতে আঁটতে পারচিনে।

বিবিকে আমার নববর্ষের আশীর্ব্বাদ দিয়ো। ৩০ চৈত্র

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৫০] ঔঁ

কল্যাণীয়েষু

কাল harbour master-এর [হাত] দিয়ে একটুখানি লেখা পাঠিয়েছি— আজ পাইলটের হাত দিয়ে বাকিটুকু পাঠাচ্চি। এই দুটোয় মিলে তোমার বৈশাখের খোরাক চলে যাবে। রেঙ্গুনে গিয়ে পরের মাসের কিস্তি পাঠাতে পারব।

আমার এ লেখা ধারাবাহিক চিঠিও না প্রবন্ধও না। যা যখন মনে আসচে লিখে যাচ্চি একবার revise করবারও চেষ্টা করিনি। এর মধ্যে আমাদের যাত্রার ছবি কখন

কতখানি পড়বে বল্‌তে পারিনে— কতকগুলি খাপছাড়া প্যারাগ্রাফের মত হবে। তাতে কি ক্ষতি আছে।

এখনো মা গঙ্গার আঁচল ছাড়াতে পারিনি। আজ নদীর মোহানার কাছে Sandheadএ গিয়ে নোঙর করে রাত্রিযাপন করব।

আজ সন্ধ্যার দিকে একটা ঝড় পাওয়া যাবে বলে কাপ্তেন আশঙ্কা করচেন। সমুদ্রের রঙ্গভূমিতে ঝড়ের প্রবেশ, এবং রুদ্রতালে তাণ্ডবনৃত্য— এতে সন্ধ্যার আসরটা বোধ হয় জম্‌বে ভাল। দর্শকদের সুদ্ধ এই রঙ্গের মধ্যে না টান্‌লেই আমাদের নালিশ থাকবে না।

এ চিঠি যখন পাবে তখন অকূলে ভাসচি— তার পূর্ব্বে তোমাদের সকলের কাছে বিদায় গ্রহণ করি। বিবিকে বোলো যদি সুবিধা পায় এবং অবকাশ থাকে তাহলে আমার গানের ইংরেজি notation কিছু-কিছু যেন পাঠায়। দিনু এখন কলকাতায় আছে তার কাছে ওর গান শেখবার সুবিধা হবে। ইতি ২১শে বৈশাখ ১৩২৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৫১]   ঙ   পোস্টমার্ক, য়োকোহামা

২০ জুলাই, ১৯১৬

কল্যাণীয়েষু

প্রমথ, এখানে এসে অবধি লেখবার সময় পাইনি। প্রথমত এখানকার জন্যে গোটা তিনেক লেকচার লিখ্‌তে হয়েচে— তার পরে আমেরিকার জন্যে লেকচার লিখতে বসেচি। আসচে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি আমেরিকার লেকচার সুরু হবে তার আগে যতগুলো পারি লিখে ফেলতে হবে। পশ্চিমের দিকে মুখ ফিরিয়েচি এখন পূবের দিকে মন দেওয়া আমার পক্ষে শক্ত হয়েচে। আমার উদয়কাল আমি পূবকে দিয়েচি, আমার অস্তকালটা পশ্চিমকে দেওয়া যাক্। জাপানে একরকম আসর জমেচে মন্দ নয়। এদের সঙ্গে ব্যবহারে মনে একটা খুব আনন্দ হয় যে এরা অন্তরের সঙ্গে আমার কাছে আসে। এদের সত্যি দরকার আছে বলে এরা চায় সেইজন্যে আমার যা কিছু সত্যি আছে সেটা এদের সামনে এনে দেওয়া আমার পক্ষে খুব সহজ হয়। য়ুরোপেও তাই। আইডিয়া তাদের জীবনের খোরাক। তারা গভীর প্রয়োজন থেকে আইডিয়াকে চায় এইজন্যে গভীর উৎস থেকে আইডিয়া তাদের জন্যে উৎসারিত হয়। আমাদের অজীর্ণের দেশ, আইডিয়ার ক্ষুধা নেই— এইজন্যেই আইডিয়াকে খাদ্যরূপে চাইনে, চাট্‌নিরূপে চাই। কিন্তু চাট্‌নির ব্যবসা আর ভাল লাগে না। তোমরা আমার আশীর্ব্বাদ জেনো।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৫২] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

১৩ এপ্রিল, ১৯১৭

কল্যাণীয়েষু

প্রমথ, অর্জ্জুনের একটা সময় এসেছিল যখন সে নিজের গাণ্ডীব নিজে আর তুল্‌তে পারেনি। আমার কি গাণ্ডীবের কারবার ছেড়ে দেবার দিন আস্‌বে না, মনে করচ? মাঝে মাঝে নোটিস্‌ পাই, বুঝতে পারি মানে মানে আসর ছেড়ে দেওয়াই সুবুদ্ধির কাজ। কিছুদিন থেকে আমার কানের মধ্যে কি একটা উৎপাত হয়েচে তাতে যে কেবল শোনা কমেচে তা নয় মগজের মধ্যে জড়তা এসেচে— কিছুতে লিখ্‌তে পড়তে গা লাগ্‌চে না। এই ত গেল প্রথম দফা। দ্বিতীয় হচ্চে এই যে, এতদিন যখন কলম সতেজ ছিল তখন অন্য সকল কাজ অবহেলা করে তার পিছনেই দিন কাটিয়েচি। এখন কলমের চঞ্চলতা আপনিই কমে গেছে বলে বিদ্যালয়ের কাজে সমস্ত মন ঝুঁকেচে। আমি যে-বয়সে এসে পৌঁচেছি, সে-বয়সের ভয়ানক একটা সঙ্গহীনতা আছে। এই মরুভূমির মাঝখানে স্থাণু হয়ে বসে থাকা, না সুখকর, না স্বাস্থ্যকর। তবু যতদিন লেখার আবেগ প্রবল ছিল ততদিন নিজের রচনালোকের মধ্যে ঘুরে ঘুরে বেড়ানো যেত। এখন বুঝতে পারচি সেই লেখার উপর নিয়ত ভর করবার মত জোর তার নেই। তাই, নিতান্ত পথে বেরিয়ে না-পড়ে' আমার জীবনের একটা-কোনো আশ্রয় পাকা করে নিতে হবে। আমি ছেলেগুলোকে সত্যিই ভালোবাসি অথচ তাদের সঙ্গে আসক্তি

বা স্বার্থের যোগ নেই বলে মন মুক্ত থাকে— এইজন্যে ওদের সেবায় যদি পুরোপুরি লাগি তাহলে প্রৌঢ় ও বৃদ্ধবয়সের জীর্ণতার সমস্ত ফাঁকগুলো ভরে যাবে অথচ ছাড়াও থাক্‌ব। সব-শেষ দফার কথাটা কাউকে বলবার কথা নয়। মোটামুটি সে হচ্চে এই যে, জীবনটাকে ত ত্যাগ করতেই হবে— এ কথা কেউই অস্বীকার করতে পারেনা। সেই ত্যাগটা যাতে নিছক লোকসান না হয় সে দিকে ভিতর থেকে বার বার তাগিদ আসে। তাই এখন পাঁচ কাজে আর মন লাগেনা। নিন্দা প্রশংসার উত্তেজনা এড়িয়ে চল্‌তে পারলে তবেই লক্ষ্যটা স্থির থাকে— নইলে মাতালের মত পা টলে টলে যায়। এই সব কারণেই, যে-জীবনটা এতদিন বহন করে এসেচি সেটাকে আর খাতির করতে পারিনে— তার বোঝা এইবার নামাব। তার মজুরি যা জুটেছে তা আমার যথেষ্ট হয়েচে, এখন সেইটেকে ট্যাঁকে নিয়ে অন্য কারবারে নাববার ইচ্ছা। তোমার কাছে সমস্তটা খোলসা করেই বল্লুম।

এ কথা বলা আমার তাৎপর্য্য নয় যে, লেখা আমি একেবারে ছেড়ে দেব। বল্লেও সেটা বাজে কথা হবে— কেননা কম্‌লি নেই ছোড়্‌তি হ্যয়। ওটা ম্যালেরিয়ার বিষ, কোনো নোটিস্ না দিয়ে হঠাৎ ক্ষণে ক্ষণে কাঁপন ধরাবে। কিন্তু সেটা তার নিজের অসাময়িক উত্তেজনায়, সাময়িক পত্রের বাঁধা মৌতাতের উত্তেজনায় নয়। এটুকু বলে রাখতে পারি — লেখবার কথাটা মনে রেখে দিলুম— এবং যখন লিখব তখন তোমাদের পেয়াদা পাঠাতে হবেনা। সুতরাং আমার

তরফ থেকে তোমাদের যেটা জুটবে সেটা উপ্‌রি-পাওনা। বাঁধাবরাদ্দর জন্যে অন্য পাকা বন্দোবস্ত রাখ্‌তেই হবে।

আমার মন অনেকদিন থেকেই ছুটির দরখাস্ত করচে— কিন্তু আপিসের কর্ত্তাদের কাছ থেকে কোনোমতেই ছুটি মঞ্জুর হচ্ছিল না। তাই এবার বিনা মঞ্জুরিতেই ছুটি নিয়ে দৌড় মারবার উদ্যোগ হচ্চে। পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের জেরটাকে Gordian-গ্রন্থির মতই ছেদন করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

এইবার নতুন লেখকদের খুব কষে নাড়া দাও। আমরা যে এতদিন সাহিত্যের দরবার করে এসেচি সে ত নেহাৎ সৌখীন চালে করি নি। যখন তম্বুরা ধরবার হুকুম পেয়েছি তখন ভৈঁরো থেকে সুরু করে মালকোষে এসে শেষ করেচি। আবার যখন ঢালসড়কির পালা তখন নিজের বা অন্যের মাথার পরে দরদ রাখি নি। গালমন্দর তুফান বেয়ে পাড়ি লাগিয়েচি, হাল ছাড়িনি। দিন রাত যে মাথার পরে কোথা দিয়ে গেচে খবর রাখিনি। যাঁরা নবীন সাহিত্যিক তাঁরা একথা মনে রাখবেন। সাহিত্যের পেয়ালা একেবারে চুমুক মেরে উজাড় করতে হয় এতে বাইরে থেকে ঠোকর মেরে কোনো ফল হয় না। যাঁরা লাগবেন তাঁদের পুরোপুরি লাগ্‌তে হবে।

বিবিকে আমার নববর্ষের আশীর্ব্বাদ দিয়ো। ক্লান্ত হয়ে আছি— আজ এইপর্যন্ত। ইতি ৩১ চৈত্র ১৩২৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৫৩] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

১৯ এপ্রিল, ১৯১৭

কল্যাণীয়েষু

প্রমথ, গড়িয়ে গড়িয়ে দিন যাচ্চে, লেখাপড়ার কাজ বন্ধ। কানের দিক দিয়ে মগজের উপর একটা পর্দ্দা পড়ে আস্‌চে। এর আয়োজন কিছুকাল থেকেই চল্‌চে। তাই মনটা ভারি একলা হয়ে পড়েচে। শুধু কেবল লেখাতে এখন ফাঁক ভরবে বলে মনে হয় না। বিদ্যালয় আমার সঙ্গী। ওখানে মানুষের সংসর্গ পাই, হৃদয়ের অন্ন জোটে— অথচ ঝগড়াঝাঁটি নেই। তাই আর সমস্ত ছেড়ে এই শিশু নরনারায়ণের মন্দিরে সেবায়েৎগিরির কাজেই লাগব মনে করচি। ঐ মন্দিরের পথটা নিষ্কণ্টক। আমাদের দেশে সাহিত্যব্যাপারটা এত বেশি মানবসঙ্গবর্জ্জিত, এত বেশি সৌখীন যে, ওতে হৃদয়টা উপবাসী থেকে যায়। অথচ ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবার গুঁতোগুলো ষোলো আনা খেতে হয়। সাহিত্য থেকে আমাদের দেশের সমাজ বহুদূরে। আমি স্বভাবতই নিছক বুদ্ধিব্যবসায়ী নই— এইজন্যে, যে তাস একলা বসে খেল্‌তে হয় সে তাস খেলায় আমার দিন আর কাটে না।

বিদ্যালয়ের ছুটি হবে ২৬শে বৈশাখে— তারপরে একবার কানের তদ্বির করা যাবে।

সেই যে বাংলা Home Library পর্য্যায়ের বই লেখাবার প্রস্তাব করেছিলে— সেটা ভুলোনা। ভারি দরকার।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৫৪] ওঁ

কল্যাণীয়েষু

আজ সকালে ভেবে দেখলুম সুখের চেয়ে যেমন সোয়াস্তি ভাল স্বাস্থ্যের চেয়ে শাস্তি তেমনি। আমার পক্ষে ঠাণ্ডা হাওয়ার তত দরকার নেই যেমন দরকার বোলপুরের রিক্ত মাঠ, মুক্ত আকাশ এবং প্রখর আলো। যদি সেখানে কোনো উৎপাত এসে জোটে তাহলে গিরিরাজের বক্ষে গিয়ে আশ্রয় নেব। আপাতত অন্তত কিছুদিন বোলপুরে চুপচাপ করে পড়ে থাকি। অতএব চল্লুম।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৫৫] ওঁ শান্তিনিকেতন

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪

কল্যাণীয়েষু

চল্‌তি কথায় একটা লম্বা ছন্দের কবিতা লিখেছি। এটা কি পড়া যায় কিম্বা বোঝা যায় কিম্বা ছাপানো যেতে পারে? নামরূপের মধ্যে রূপটা আমি দিলুম নাম দিতে হয় তুমি দিয়ো। শেষকালে তিনধরিয়ায় যাত্রাটা বোধ হচ্চে কপালে আছে, এখানে কিছু কিছু বিঘ্ন আছে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যারা আমার সাঁঝ-সকালের গানের দীপে জ্বালিয়ে

দিলে আলো

আপন হিয়ার পরশ দিয়ে, এই জীবনের সকল সাদা কালো

যাদের আলো-ছায়ার লীলা, বাইরে বেড়ায় মনের মানুষ যারা
তাদের প্রাণের ঝর্‌না স্রোতে আমার পরাণ হয়ে হাজার-ধারা
চল্‌চে বয়ে চতুর্দ্দিকে। কালের যোগে নয় ত মোদের আয়ু,
নয় সে কেবল দিবস-রাত্তির সাতনলী হার, নয় সে নিশাসবায়ু।
নানান্ প্রাণের প্রেমের মিলে নিবিড় হয়ে আত্মীয়ে বান্ধবে
মোদের পরমায়ুর পাত্র গভীর করে' পূরণ করে সবে।
সবার বাঁচায় আমার বাঁচা আপন সীমা ছাড়ায় বহুদূরে,
নিমেষগুলির ফল পেকে যায় বিচিত্র আনন্দরসে পূরে:
অতীত হয়ে তবুও তারা বর্ত্তমানের বৃন্ত-দোলায় দোলে,—
গর্ভ হতে মুক্ত শিশু তবুও যেমন মায়ের বক্ষে কোলে
বন্দী থাকে নিবিড় প্রেমের বাঁধন দিয়ে। তাই ত

যখন শেষে

একে একে আপন জনে সূর্য্য-আলোর অন্তরালের দেশে
আঁখির নাগাল এড়িয়ে পালায়, তখন রিক্ত শীর্ণ জীবন মম
শুষ্করেখায় মিলিয়ে আসে বর্ষাশেষের নির্ঝরিণী সম
শূন্য বালুর একটি প্রান্তে ক্লান্ত বারি স্রস্ত অবহেলায়।
তাই যারা আজ রইল পাশে এই জীবনের অপরাহ্ণ বেলায়
তাদের হাতে হাত দিয়ে তুই গান গেয়ে নে থাক্‌তে

দিনের আলো,—

বলে' নে ভাই, "এই যা দেখা, এই যা ছোঁওয়া, এই ভালো,

এই ভালো!

এই ভালো আজ এ সঙ্গমে কান্নাহাসির গঙ্গা-যমুনায়
ঢেউ খেয়েছি, ডুব দিয়েছি, ঘট ভরেছি, নিয়েছি বিদায়।

এই ভালোরে প্রাণের রঙ্গে এই আসঙ্গ সকল অঙ্গে মনে
পুণ্য ধরার ধূলোমাটি ফল হাওয়া জল তৃণ তরুর সনে।
এই ভালোরে ফুলের সঙ্গে আলোয় জাগা, গান গাওয়া
এই ভাষায়,
তারার সাথে নিশীথরাতে ঘুমিয়ে পড়া নূতন প্রাতের
আশায়।"

এই জাতের সাধু ছন্দে আঠারো অক্ষরের আসন থাকে—কিন্তু এটাতে কোনো কোনো লাইনে পঁচিশ পর্য্যন্ত উঠেছে। ফার্ষ্ট ক্লাসের এক বেঞ্চিতে ছ জনের বেশি বসবার হুকুম নেই—কিন্তু থার্ড ক্লাসে ঠেসাঠেসি ভিড়—এ সেই রকম। কিন্তু যদি এটা ছাপাও তাহলে লাইন ভেঙোনা, তাহলে ছন্দ পড়া কঠিন হবে। স্মল পাইকায় মার্জ্জিন কম দিয়ে ছাপলে পঁচিশ অক্ষর ধরতে পারবে। ইতি

[৫৬] ওঁ

কল্যাণীয়েষু

ক'দিন ব্যামোয় এবং বিষম গোলমালে কেটে গেছে। আজ বক্তৃতা। এমনি জড়িয়ে পড়েচি যে ফাঁক পাচ্চিনে। রথীরা বড় একটা বাড়িতে যাচ্চে। তোমরা নিশ্চয় একবার এসো। এখানে তোমাদের শরীরও ভালো থাক্‌বে। বিবিকে বোলো আমার তহবিল থেকে দিনুর কাপড়ের দামটা যেন শুধে দেয়। কিন্তু তোমাদের আসা চাই।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৫৭] ওঁ

কল্যাণীয়েষু

এখানে একলা ছাতের উপর চুপ করে বসে থেকে আমার মনটা বেশ ঠাণ্ডা থাকে কিন্তু দেখলুম শরীরের অবসাদ কিছুতেই ঘুচচে না। সেটা যেন সিন্ধ্‌বাদের বুড়ো মানুষটার মত ঘাড়ের উপর চেপে বসে আছে— যত দিন যাচ্চে ততই ভার যেন আরো বাড়চে। তাই ভাবচি একবার তিনধরিয়াটা পরখ করে দেখি। আমার এখানে আসবার একটা প্রধান কারণ ছিল দিনু।... যদি পাহাড়ে যাই ওকেও সঙ্গে নিতে হবে। তোমরা যদি তিনধরিয়ায় যাও তাহলে আমার কোনো ভাবনাই থাকেনা। কবে যেতে পারবে আমাকে জানালেই আমি চলে যাব। একটা গাড়ি সেই বুঝে রিজার্ভ কোরো। শরীরটাকে বদল করতে পারলে ভাল হত মেরামৎ করে আর চল্‌চে না। তাকে একটু নাড়া দিতে গেলেই আজকাল এত বেশি গ্যাঁগোঁ করচে যে আমার নিজেরই রাগ হয়। বেচারার বেশি দোষ নেই— পঞ্চাশ বছরে ওকে সত্তর বছরের ওজনে খাটিয়ে নিয়েচি— যাকে বলে overtime খাটুনি— কিন্তু তার মজুরী কি পেলুম তাই ভাবি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমি তোমাদের গুরুজন সে কথা মনে রেখো— অতএব যদি তিনধরিয়ায় তোমরা থাক তবে বাড়ির কর্ত্তা কে হবে সে কথা ভুল্লে চল্‌বে না। কিন্তু একটা বাবুর্চ্চি তোমরা নিয়ো, আমার উপর রসদের ভার রইল।

[৫৮] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

২৭ অগস্ট, ১৯১৭

কল্যাণীয়েষু

গানের লেকচারটা লেখা হয়েচে। Exercise bookএর ২৭ পাতা ভরল। সেটাকে ফর্ম্মায় ঢাললে তার পরিমাণ কি দাঁড়ায় জানিনে। কিন্তু গজবহরে এ সব জিনিসের মাপ হয় না অতএব গুরুত্ব কত তা শুনলে বুঝতে পারবে। দুই তিন দিনের মধ্যেই যাব। শ্রাবণের সবুজপত্র কি বেরয় নি? ও ঋতুটা ত সবুজপত্রের পক্ষে অনুকূল বলেই জানি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৫৯] ওঁ শান্তিনিকেতন

বোলপুর

পোস্টমার্ক, ২৩ অক্টোবর, ১৯১৭

কল্যাণীয়েষু

তোমাকে একখানি ফরাসী বই পাঠাচ্চি। এখানি একজন ইংরেজ অধ্যাপক খুব প্রশংসা করে আমাকে পাঠিয়েছিলেন— বলেছিলেন এ বই আমার পড়া উচিত। কিন্তু এই কর্ত্তব্যটি পালন করা কেন আমার পক্ষে কঠিন সে কথা তোমার কাছে গোপন নেই। সবুজপত্রে মাঝে মাঝে কাজের কথার আলোচনা হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি— বিশেষত যে সব কাজের মধ্যে নূতন চিন্তা ও নূতন চেষ্টার হাত আছে।

অর্থাৎ সবুজপত্রে কেবল ফুলের সূচনামাত্র করেনা তাতে ফলেরও আয়োজন আছে এইটে না প্রকাশ হলে জিনিসটা একটু সৌখীন হয়ে দাঁড়াবে। শিক্ষাতত্ত্বটাকে নতুন করে আমাদের ভাবতে হবে। সেই ভাববার প্রধান বাধা এই যে, আমরা পৃথিবীতে মনন ব্যাপারে যে solitary cellএর মধ্যে বন্দী আছি তার মধ্যে বসে আমাদের মনে হয় কেউ বুঝি কোথাও পুরোনো জিনিসকে নতুন করে ভাবচে না। সেইজন্যে আমাদের ভাবতেই ভয় হয়। নিজের দেশের শাস্ত্র সৃষ্টির গোড়াতেই একেবারে চতুর্মুখের মগজে চিন্তিত হয়ে তাঁর মুখ থেকে সম্পূর্ণ পরিণত হয়ে বেরিয়েচে বলে ঠিক করে বসে আছি— পরের দেশের শাস্ত্রকেও আমরা অচল ঠাটে বাঁধা অবস্থায় ধ্যান করি— ওটা আমাদের স্বভাব হয়ে গেচে। ওটা আমাদের মজ্জাগত মনের কুঁড়েমি। কিন্তু কুঁড়ে লোকের প্রধান শিক্ষা হচ্চে তাকে জানানো যে, পৃথিবীসুদ্ধ সবাই কুঁড়ে নয়— মানুষের মন ছয় দিন সৃষ্টি করে' সাতদিনের দিন তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বলচে না যে, তোফা হয়েচে— সৃষ্টির মধ্যে আরো-ভালোর ডাক কোনোদিন থামেনি এবং কোনোদিন থামবেনা! সবুজপত্রের সবুজত্বই এই নিয়ে। যে ডাকঘর দিয়ে এই পত্র আস্‌চে সেই ডাকঘরে তুলট কাগজ চলেনা— সেখানে হল্‌দের আমেজ দেখা দিলেই তাকে খসিয়ে দিয়ে সবুজ আপনার জয়পতাকা ওড়ায়। তাই সবুজের প্রেমিক আমার আবেদন এই যে, কাজের ক্ষেত্রে পৃথিবীতে যেখানে নূতন চিন্তা ও নূতন চেষ্টা দেখা দিয়েচে সেইখানকার বার্তা

তোমার পত্র বহন করে প্রচার করুক। তার সবগুলোই যে আমরা গ্রাহ্য করে নেব তা নয়, কিন্তু নিতান্তপক্ষে তার ধাক্কাটা আমাদের জাগরণের পক্ষে দরকার হয়েচে। আমাদের দেশের ইস্কুলমাষ্টার আমাদের শিখিয়েচে যে মনের ধর্ম্ম মুখস্থ করা— আমাদের এমন দৃষ্টান্ত জরুর চাই যার থেকে বুঝতে পারি মনের ধর্ম্ম ভাবা। তাই বেলজিয়মে যে নূতন ইস্কুল হয়েচে তার খবর সবুজপত্র থেকে দাবী করচি। তুমি সম্প্রতি নানা লেখা, কিম্বা সম্ভবত না-লেখা, নিয়ে ব্যস্ত আছ—অতএব আমার পরামর্শ বিবিকে এই কাজের ভার দেও। মস্ত আশার কথা, জ্যোতিদাদা ওখানে আছেন। তিনি এটা পেলে হয়ত ফস্ করে এটাকে গৌড়ীয় ভাষায় ঢালাই করে নিতে পারেন। যাই হোক্ তোমাদের যে রকম মর্জি তাই কোরো কিন্তু আমার এটাতে গরজ আছে। এর শেষ পরিচ্ছেদ, যার বিষয়টা হচ্চে "Education Morale, Sociale et Artistique"— ঐটেই আমার সবচেয়ে কৌতূহলের বিষয়। তর্জ্জমা নয় কিন্তু এর ভাবার্থটা কি পাওয়া যাবেনা ?

কাল বিষয়কর্ম্ম সম্বন্ধে যে চিঠি লিখেচি সেটা, ইংরেজিতে যাকে গম্ভীর ভাব বলে, সেইভাবে ভেবে দেখো। যারা কাজ করচে তাদের বিনা দোষে বিদায় করতে কিছুতে ইচ্ছা হয় না—কিন্তু আমাদের দায়টা খুব কঠিন হয়েচে বলে আমার মনে হচ্চে। শতকরা দশটাকা স্থদে হ্যাণ্ডনোট অনেকদিন লিখিনি— ন টাকা পর্য্যন্ত অভ্যাস আছে। শুনলুম মাসে

দেড় হাজার টাকা কেবল সুদই দিচ্চি—উটের পিঠে অনেক সয় কিন্তু তারো ত একটা শেষ খড় আছে—অথচ মেরুদণ্ড-হিসাবে আমরা উটও নই, আর বোঝা যা চাপ্‌চে তাকে খড় বলা চলে না। এমন অবস্থায় বিরাহিমপুরের সদর সেরেস্তার ভার কমাতে চাইলে অন্যায় হবেনা। সদরে একজন ইন্‌স্পেক্টর বাড়াতে হবে কিন্তু তার মাইনে অপেক্ষাকৃত কম হবে। ইস্‌মনবিশিকে ঝেড়ে দেখ্‌লে কমাবার উপায় পাওয়া যাবে। তুমি কলকাতায় থাক্‌তে থাক্‌তেই একাজটা সেরে নিতে পারলে ভাল হত—কিন্তু তখন অবস্থার শোচনীয়তাটা আমার এত স্পষ্ট জানা ছিলনা। জমাখরচের হিসেব কোনোকালেই আমার কাছে রমণীয় নয়—বিশেষত অবস্থা যখন সচ্ছল নয় তখন খরগোষের মত চোখ বুজে থাক্‌তে ইচ্ছে করে। এটর্নি পল্‌টু কর লিখন হাতে সশরীরে সম্মুখে উপস্থিত হওয়াতেই চোখ খুল্‌তে হল।...“ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ” আমার হজম হয় না তাই কিছু ব্যস্ত হয়ে পড়েচি— অতএব তোমাকে এই পূজোর ছুটির সময়টাতেও গম্ভীরভাবে ভাবাতে চেষ্টা করচি। এ বছর বিরাহিমপুর থেকে মুনফা বেশি আশা করা চল্‌বে না— আর কালীগ্রামে “শস্যঞ্চ গৃহমাগতং” পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত হবার জো নেই।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয়েষু

আচ্ছা, সেই ভাল, আলোচনার দ্বন্দ্ব অর্থাৎ duet লাগানো যাক্। তার একটা সুবিধা এই যে মূলধন ছাপিয়ে মুনফা উঠ্‌বে। তুমি তাহলে আর দেরি না করে তোমার খোলে চাঁটি লাগাও, তারপরে আমি এদিকে আছি। প্রবন্ধরচনায় তুমি যে এই যৌথ প্রণালীর উদ্ভাবন করলে এটাকে নানা দিকে চালিয়ে যাওয়া ভাল। অতুলবাবু প্রভৃতি আরো দুই একজন জুড়ি জুটিয়ে আসর জমাতে পার। Wells-এর ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধেও কোনো একজন ওস্তাদের সঙ্গে সঙ্গৎ লাগাও না। আমার মনে হয় Wells-এর বইয়ের যে জিনিসটা বিশেষ বিবেচ্য সেটা ওর বইয়ের তত্ত্ব নয়, ওর মনের গতি। ওরা একটা বড় আঘাত পেয়ে জেগে উঠেচে, যেটাকে চরম আশ্রয় বলে এতদিন নিশ্চিন্ত ছিল দেখেচে সেটা ভর সয় না। অথচ ওদের পুরাতন ধর্ম্মের ব্যবস্থাটাও নানা জায়গায় ফুটো হয়ে গেছে। কঁৎ যে একটা পূজার সামগ্রী সৃষ্টি করেছিলেন আমাদের পুরীর জগন্নাথের মতই তার হাত নেই— আমরা তাকে উদ্দেশ করে দিতে পারি কিন্তু সে নিতে পারে না। এরা এখন চাচ্চে এমন একটি Personality যে আমাদের অন্তরে বাহিরে সত্য, আমাদের আর সব চুরমার হয়ে গেলেও যে বাকি থাকে, এবং যে মৃত্যুর বিদীর্ণবক্ষ থেকে জীবনের উৎস উৎসারিত করে। সেই Personality আছে এই

উপলব্ধিটিই হচ্চে positive লাভ—কিন্তু তার স্বরূপটি কি এটার সম্বন্ধে পরিচয় পাকা হয় নি বলে নানা অদ্ভুত জল্পনার সৃষ্টি হচ্চে। সে জঞ্জালগুলো ক্রমেই পরিষ্কার হয়ে আসবে কিন্তু একটি পরম গতি সম্মুখে আছে বলে মানুষ যাত্রা করে বেরতে প্রস্তুত হয়েছে ;—তার একটা আশ্রয় ভেঙেচে বলেই সে একটি বৃহৎ আশায় উদ্দীপ্ত হয়ে সামনে আর এক পরম আশ্রয়ের দিকে উৎসুক হয়ে উঠেচে এইটেই হচ্চে বড় কথা। নিশ্চয়ই Wells যে কথাটা তুলেচে সে ওর একলার কথা নয়— অনেকের মুখপাত্র হয়েই সে একটা ভাবকে রূপ দেবার চেষ্টা করচে। ওদের সেই মনস্তত্ত্বটাই আমাদের ভেবে দেখবার কথা। বস্তুত মানুষের ধর্ম্মের ইতিহাসে তার ধর্ম্মের রূপটার চেয়ে ধর্ম্মসম্বন্ধে তার মনস্তত্ত্বটাই মূল্যবান এবং সেইটেতেই সত্যের পথ নির্দ্দেশ করে। Wells-এর বই পড়লেও সেই পথটাকে Science-এর বহুদিনের আবর্জ্জনার ভিতর দিয়ে আবার দেখ্‌তে পাই—তাতে এইটুকু দেখা যায় Science-র মধ্যেই মানুষ বদ্ধ হয়ে থাক্‌তে পারে না, কোনমতে তার পোড়া কয়লা, ছাই এবং ভাঙা সরঞ্জামের ভিতর দিয়ে রাস্তা করে সে একটা বাইরের দিকে ছুট্‌তে চায়। মানুষের ইতিহাসের নানা বিভিন্ন অবস্থায় মানুষের এই যে একই চেষ্টা দেখ্‌তে পাই এইটেই কি ধর্ম্মসম্বন্ধে সব চেয়ে বড় কথা নয়?

জমিদারী ব্যবস্থা সম্বন্ধে যতই ভাবচি ততই আমার দৃঢ় বিশ্বাস হচ্চে, ওটা অকারণে top heavy হয়েচে— ছুটো সদর

ওর পক্ষে অনাবশ্যক বোঝা। কলকাতার সদর এবং মফস্বল এবং তার মধ্যে একটি উভচর পরিদর্শক, অর্থাৎ যিনি Trinityর Holy Ghost, এই হলেই কাজ সহজ হয়। ভেবে দেখো কিন্তু মনস্থির করতে দেরি কোরো না। একবার সুরেন এবং তোমার সঙ্গে মোকাবিলায় কথা হলে ভাল হত। ইতি ১৩ই কার্ত্তিক ১৩২৪

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মঞ্জু ভাল আছে ত ?

[৬১] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

৩ নভেম্বর, ১৯১৭

কল্যাণীয়েষু

ইতিমধ্যে অমিয়র আর কোনো চিঠিপত্র না পেয়ে উদ্বিগ্ন আছি। তুমি কোনো খবর পেয়েচ কি ? এখানে আমার কাছে এলে আমি তাকে কি উপায়ে বল দেব তাই ভাবচি। আমার নিজের জীবনের যেটুকু সম্বল সে এত ভিতরের দিকে যে, সে ত কারো হাতে তুলে দিতে সহজে পারিনে। জীবনকে ছাড়িয়ে যে কথা যায় সেই কথা নিয়ে আমি বেঁচে আছি কিন্তু অমিয়ের মত ছেলেমানুষকে সেখানকার খোরাক দিতে চাইলে সে তা নিতে পারবেনা— তার কাছে এ সমস্ত খুবই ফাঁকা ঠেকবে। আমি সন্ধ্যার

সময় ছাতের উপর একলা বসে কাটাই— ওর কাছে আমার নিস্তব্ধতা আরো বেশি বিষাদের ভার বাড়িয়ে তুলবে। এইজন্যে ওর এই দায়িত্ব নিতে আমার ভারি ভাবনা হচ্চে। ওর সম্বন্ধে তুমিই বা কি ভাবচ আমাকে লিখো। বেলার শরীর— বোধহয় কয়দিনের নিরন্তর বাদলায়— খারাপ আছে খবর পেয়েচি। ১৭ কার্ত্তিক ১৩২৪

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৬২] ॐ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

তুমি দিন দশপনেরো পরে যদি কলকাতায় যাও তাহলে সেইসময়ে একবার রাজধানীতে হাজির হব। তখন একবার বিষয়কর্ম্মের কথাটা চুকিয়ে দিয়ে আসব। ওর আলোচনাটা আমার একেবারেই মনঃপূত নয় বলেই ওটা আমার মনের মধ্যে এমন তোলাপাড়া করচে— ওটাকে সম্পূর্ণ নিকেশ করে দিয়ে স্বভাবে প্রত্যাবর্ত্তন করতে চাই। আমার বিষয় ভোগের বয়স গেছে, যখন ছিল তখনও ভোগ করিনি। এখনও আমিরী সখ আমার একটিও নেই। সুন্দর জায়গায় নদীর ধারে পাহাড়ের গায়ে বনচ্ছায়াতলে একটি অতি মনোহর কুটীর বানিয়ে একটি আরাম কেদারা এবং তিন আলমারি বই নিয়ে নিভৃতে জীবনের বাকি কটা দিন কাটিয়ে দেব এই রকমের একটা সখ অনেকদিন থেকে মনের মধ্যে সময়ে

অসময়ে গুঞ্জন করে বেড়ায় বটে কিন্তু বুঝে নিয়েচি সে আমার কপালে নেই। টাকার যা সঙ্গতি হয়েছিল তাতে কিছুই অসম্ভব ছিল না কিন্তু আমার প্রকৃতির মধ্যে আরেক ব্যক্তি আছেন বসে, যাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আমাকে বল্‌তে হয় Thy need is greater than mine। অতএব অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত আমার অবস্থা কোনোদিনই সচ্ছল হবে না। এক-একবার ক্লান্ত হয়ে ভাবি একটা সেক্রেটারি রাখা যাক্, কিন্তু সে আমিরীটুকুও হিসাবে কুলয় না দেখতে পাই। কেননা রথীর সংসারেও দেখি অনাটন, আমার ইস্কুলেও দেখি তাই, অতএব ডাইনে বাঁয়ে হিসেবের নিষ্ঠুর খাতার দিক থেকে দৃষ্টি বাঁচিয়ে চক্ষু বুজে মনের শান্তি রাখ্‌তে চেষ্টা করি। ঠিক এমন সময়ে যখন ১০ পার্সেণ্ট সুদে হ্যাণ্ডনোটে সই করতে হয় তখন কোথায় যে দাঁড়িয়ে আছি ঠাওর পাইনে। এদিকে জানি আমার কাছ থেকেই এস্টেট ৩৭০০০ হাজার টাকা ধার নিয়েচে— এখনো তার এক পয়সা সুদ পাইনি। সুদ দাবি করতে গেলে উচ্চহারে সুদ দিয়ে ধার করতে হবে। অতএব যত রকম সখ আছে সমস্ত থাক্ এখন কুত্তা বুলিয়ে নিলে বাঁচি।

ডাক্তারের কথা লিখেচ ওটা আলোচ্য বটে। কিন্তু যেহেতু ঐ একটা বড় খরচ যা আমরা নিজের স্বার্থে করিনে প্রজাদের জন্যে করি, এই কারণে ওটাতে হাত দিতে কিছুতে ইচ্ছা করেনা। এই ডাক্তার এবং ডাক্তারখানায় আমাদের জমিদারীর এবং তারও চতুষ্পার্শ্বের লোকের বিশেষ

উপকার হয়েচে এই কথা যখন শুনতে পাই তখন সকল অভাবের দুঃখের উপর ঐ সুখটাই বড় হয়ে ওঠে। বিরাহিমপুরে প্রজাহিতের এই একটিমাত্র কার্য্যে সফল হয়েচি। লজ্জা এই যে হাঁসপাতালের চাঁদা আদায় করে' আজ পর্য্যন্ত তার একটি ইটও ভিতের উপর চড়েনি। আমাদের যা কিছু দেনা হয়েচে তা যদি আমাদের জমিদারীর এই রকম কাজের জন্য হত আমি এক মুহূর্ত্তের জন্য শোক করতুম না— কেননা এই ঋণ অন্যদিকে এমনভাবে সেণ্ট-পার্সেণ্ট্ সুদের উপরে শোধ হত যে হ্যাণ্ডনোট লিখে আনন্দ করতুম। আমার ত সবচেয়ে দুঃখ হয় এই জন্যে যে, প্রজাদের জন্যে লোকসান করবার পূর্ণ অধিকার আমার হাতে নেই তাহলে আমি শান্তিনিকেতন ছেড়ে ওদের মধ্যে গিয়ে বসতুম— মনের সাধে বিষয় নষ্ট করতে করতে সুখে মরতুম। তাই অর্থ নষ্ট করবার যে সুবিধাটুকু এই জায়গায় তৈরি করতে পেরেচি তাই নিয়ে অন্তিমকাল পর্য্যন্ত কেটে যাবে— তার পরে যারা বিষয় ভোগ করচে তারা তার দায়ও ভোগ করবে, তাতে এই বিশ্বজগতের কি আসে যায়, আর, আমারি বা কি মাথাব্যথা। ইতি ১৯ কার্ত্তিক ১৩২৪

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সেই cuttingsগুলো সুরেনকে পাঠিয়ে দিয়ো।

ঔ পোস্টমার্ক, ৯ নভেম্বর, ১৯১৭

কল্যাণীয়েষু

পশু´ রবিবারে কিছুদিনের জন্যে কলকাতায় যাচ্চি। বেলাকে দেখে আসব— ডাক্তার সরকারের বাড়িতে বিয়ের নিমন্ত্রণ সেরে আসব তারপরে Self Government-এর scheme সম্বন্ধে কারো কারো সঙ্গে আলোচনা করব এবং ইত্যাদি ইত্যাদি। ইতিমধ্যে হয়ত তোমরাও এসে পড়তে পার।

এবারকার সবুজপত্র খুব ঘন সবুজ হয়েচে— প্রায় সব লেখাতেই যথেষ্ট রস আছে। অন্নচিন্তা আবার পড়ে আবার ভাল লাগ্‌ল— তোমার নোটগুলি খুবই তীক্ষ্ণ ও ঝকঝকে হয়েচে এখানকার পাঠকেরা খুব তারিফ করচে। গীতিকাব্যও বেশ ভাল লেখা— বরদা বাবুর লেখাটিও বেশ সারালো ধারালো এবং রসালো হয়েচে। অতুল এবং বরদাবাবু তোমার সবুজপত্রের আসরে ওস্তাদের আসন নিয়েচেন— সাহিত্যের দ্যুলোকে ওঁরা নিজের আলোকে আলোকিত— এখন আশা হচ্চে সবুজের ক্ষেত্রে দুর্ভিক্ষের অবসান হল।

অমিয় সম্বন্ধে খুব নিশ্চিন্ত হয়েচি। ইতি ২৩ কার্ত্তিক ১৩২৪

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৬৪]　　　ঐ　　　পোস্টমার্ক, বড়বাজার

১২ নভেম্বর, ১৯১৭

কল্যাণীয়েষু

কলকাতায় এসেচি। মেরে কেটে ১৬ই পর্য্যন্ত থাকব। তার পরে পিঠাপুরমের রাজার ওখানে যাবার কথা আছে। যদি তার মধ্যে এসে পড় তাহলে বিষয়কর্ম্মের আলোচনা হবে। নইলে ফিরে এসে দেখা যাবে। ইতিমধ্যে সেই যে ইন্‌স্পেক্টর নিয়োগ করার কথা বলেচি সেটা ভেবে দেখো। ওটা না থাকাতে আমার বিশ্বাস যথেষ্ট শৈথিল্য এবং অনিয়ম ঘটে। আমি যে লোকের কথা বলেছিলুম সে হচ্চে সত্যেশ্বর নাগ। কালিগ্রামের বিভাগে ম্যানেজার ছিল— ৬ বছর কাঁকিনা স্টেটে নানাবিধ কাজ করেচে। লেখাপড়া ভালই জানে— এমন কি সাধারণ ইংরেজি বাংলায় ওর দখল বেশ নির্ভরযোগ্য। অর্থাৎ সবুজপত্রে যে রকম অসাধারণ রকমের বানান ভুল হয় সে ওর হাতে হতে পারত না— ওকে প্রুফ সংশোধন করতে দিলে সেটা বুঝতে পারবে। এবার সবুজপত্র ছেলেদের হাতে দিতে ভয় হয়— বানানভুলে পা ফেলবার জায়গা নেই।

দ্বিজেন্দ্রনারায়ণের ছন্দের হাত মোটে দুরস্ত নয়— সব সুদ্ধ ওর কবিতা সেইজন্যে দুর্ব্বল হয়ে আছে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয়েষু

মহাজনের এবং উইলের দেনায় যে রকম জড়িয়ে আছি তাতে আমার অংশ বিক্রি হওয়া প্রায় অসম্ভব এ কথা তোমাকে চিঠি লেখার পর মনে হয়েচে। অতএব বিভাগ হওয়া ছাড়া আর গতি নেই। কি রকম ভাবে হতে পারে তুমি মধ্যস্থ হয়ে স্থির করে দিয়ো। সুরেন কোনোমতে কিছুমাত্র আঘাত পায় এ আমার কিছুতে ভাল লাগে না। দেনার ভার ওর সঙ্গে সমান করে বহন করতেও আমি কুণ্ঠিত হতুম না। কিন্তু কেবল পারিবারিক দায়িত্বের মধ্যে আমি জড়িয়ে থাকতে পারব না। এই দেনার বিপাকে পড়ে বিদ্যালয়ের অবস্থা এমন সঙ্কটাপন্ন হয়েচে যে আমি আর উদাসীন থাক্‌তে পারিনে। একে যুদ্ধের জন্যে দাম চড়ে গেছে, তাতে আমাদের এস্টেট থেকে সুদ বন্ধ, শান্তিনিকেতন থেকে যে ২৫০টাকা পাওয়া যেত তাও বন্ধ, ছেলেদের অনেকেই দুর্দ্দশায় পড়ে বহুকাল বেতন মুল্‌তবি রেখেচে ইত্যাদি সমস্ত উৎপাত একসঙ্গে জড় হয়েচে। ভাগ্যে হঠাৎ ম্যাকমিলান হাজার টাকা পাঠিয়েছিল তাই উপস্থিতমত কাজ চল্‌চে। আমাদের নিজের ক্ষুধিত সংসারের গ্রাস থেকে এই হাজার টাকা ছিনিয়ে আনা আমার পক্ষে কম দুঃখকর নয়, কিন্তু সে কথা ভাববার সময় নেই। যাই হোক্ আমার নিজের দেনা শোধ করতে না পারলে আমার বিষয় এবং

আমার কাজ ছুইই ডুববে। অতএব অবিলম্বে আমাকে কোমর বাঁধতেই হবে।

মনের ভিতরটা এমনি ক্লান্ত হয়ে আছে যে কোনো কাজই করতে ইচ্ছা করে না। অথচ সম্পূর্ণ নৈষ্কর্ম্য বিরামজনক নয় বলেই অত্যন্ত মন্থরভাবে শান্তিনিকেতন থেকে একটু একটু করে ইংরেজি তর্জ্জমা করি। দেখব এরি মধ্যে সবুজপত্রের যদি কিছু লিখ্‌তে পারি। কিন্তু বোধ হচ্চে আমার দম ফুরিয়ে এসেচে এখন আমি যদি কিছু জোগান দিতে পারি সে এখানকার শিশুদের ছোট মুঠো ভরবার মত— তোমাদের সদর হাটে ব্যাপার করবার মত সম্বল আমার আর নেই। উৎসাহও বোধ করচিনে। মনটা যে রাস্তায় ছুট্‌চে সেটা নির্জ্জনের রাস্তা। ইতি ২০ মাঘ ১৩২৪

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অংশবিভাগের কথাটা ভুলো না। সুরেনের সঙ্গে পরামর্শ করে তোমরা যা ঠিক করবে আমার তাতে কোথাও বাধবে না। আমি মুনফার চেয়ে মুক্তি চাই। আগামী বৎসরের গোড়া থেকেই যেন খোলসার পথে যাত্রা করতে পারি।

[৬৬] ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

প্রিয়বাবুর বইগুলো কেনবার জন্যে ইচ্ছা খুবই আছে। এগুলো ছড়িয়ে নষ্ট হলে ছুঃখের বিষয় হবে। কি রকম

দামে পাওয়া যেতে পারে জানলে বুঝব আমার সামর্থ্যে কুলবে কিনা।

আচ্ছা, সেই শিক্ষা সম্বন্ধে একখানা পত্র লিখ্‌ব। আজকাল কলম আর সরতে চায় না। এটা যে কেবলমাত্র অন্তঃকরণগত ক্লান্তি তা নয় সত্যিই কল বিগ্‌ড়ে গেচে।

প্রুফ আজ ত আসেনি। তাহলে বোধ হয় পর্শু মঙ্গলবারে আস্‌বে।

কাজের কথা পরিণামের দিকে এগচ্চে কি?

আমারো মনে হয় প্রবন্ধ লিখে তোমার সময় নষ্ট হচ্চে। সবুজ পাতার চেয়ে পরিপক্ক ফলটা বেশি দামী হবে। কেবলি প্রবন্ধ লেখায় মনের চরিত্র খারাপ হয়ে যায়। এতে কাজেরও ফল পাওয়া যায় না অবকাশেরও না। অধিকাংশ অল্পপ্রাণ লোক যারা ফাঁকি দিয়ে সাহিত্য চর্চ্চার পুণ্য শস্তায় লাভ করতে চায় তাদের জন্যে মজুরি করে জীবন কাটাবার দৈন্য তোমাকে শোভা পায় না। আমি ত ইতিমধ্যেই হাঁফিয়ে উঠেচি— আমি স্ট্রায়িক্‌ করব। কারণ এই সাময়িক সাহিত্যের বারোয়ারি মজ্‌লিশে আমাকে নিয়ে এমনি টানাটানি চল্‌চে যে অস্থির হয়ে উঠেচি। বনের মধ্যে ভালুক জন্তুটারও একটা মর্য্যাদা আছে কিন্তু তাকে রাস্তার লোকের আমোদের জন্যে নাচ্‌তে হলে সেটা দুঃখের বিষয় হয়। ইতি ২৯ মাঘ ১৩২৪

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয়েষু

রথীকে লিখে দিয়েছি সুরেনের প্রস্তাবে আমি সম্মত আছি। যদিচ সুরেনের জন্যে আমার মনের মধ্যে যথেষ্ট উদ্বেগ রইল। এক হাতে সমস্ত বিষয় থাকার সুবিধা আছে যদি সেই এক হাত সতর্ক হয়। নতুবা একাধিপত্যে দায়িত্ব চলে যায় বলেই তার বিপদও আছে। সুরেন যদি সম্পূর্ণ মন দিয়ে বিষয়কর্ম্ম দেখ্‌তে পারে তাহলে ত ভালই হয়। কিন্তু যদি ওদের ইন্‌স্যুরেন্স কম্পানিই ওর সুয়োরাণী হয় এবং জমিদারীটা হয় দুয়োরাণী তাহলে ফল ভাল হবেনা। জমিদারী সম্বন্ধে আমাদের যে দায়িত্ব আছে সেটা আমোদের মনে থাকেনা বলেই এত দুর্গতি হয়েচে। আমি যদি নিঃসরিক কাজ করতে পারতুম তাহলে এইটেকেই মুখ্য কাজ করতুম। কিন্তু আমার ত কাজের বয়স চলে গেল। যাই হোক্ আগামী বৈশাখ থেকে নূতন নিয়ম যাতে চলে সেইরকম লেখাপড়া ইতিমধ্যে সেরে রেখে দিয়ো। দ্বিপুদের দলিলটা কপি করলেই ত হবে।

তুমি সাময়িক পত্রের সংক্ষিপ্ত সমালোচনাকে খাতির করে চল শুনে আশ্চর্য্য হলুম। ছাপার অক্ষর জিনিসটার একটা জাদু আছে। সেই জাদুর আবরণ কাটিয়ে স্বয়ং সমালোচক পুরুষটিকে যদি প্রত্যক্ষ দেখ্‌তে পেতে তাহলে অধিকাংশ স্থলেই দেখ্‌তে পেতে তার সম্পত্তির মধ্যে আছে

মাত্র কলম। আক্কেল এবং এলেম বেশি নয়। আমাদের দেশের পনেরো আনা লেখার মধ্যে মন জিনিষটা নেই— আমাদের পাঠকদের পাকযন্ত্র সেইজন্যে ওটা এখনও হজম করতে শেখেনি। উপদেশ এবং অশ্রু এবং উত্তেজনা যতই জোগাবে তার অফুরান কাট্‌তি। কিন্তু মন জিনিসটা বড় বালাই। ওটাকে গালের মধ্যে দিলেই অমনি গলে না। ওটার সঙ্গে কারবার করতে হলে যে পরিণতির দরকার যে কারণেই হোক আমাদের দেশে সেটা দুর্লভ হয়েচে। আমরা মননের আবহাওয়ার মধ্যে জন্মাইনি— যে দেশে সকল ভাবনা ভাবিত এবং সকল কর্ম্ম কৃত হয়ে চিরদিনের জন্যে খতম হয়ে গেচে সেই "আমার জন্মভূমি"তে আমরা মানুষ। তার পরে আবার আমাদের বিদ্যাশিক্ষাও মূল বই থেকে নয় নোটবই থেকে। এই রকম করে আরেক জনের মন যেটা চিবিয়ে আমাদের জন্যে অর্দ্ধেক হজম করে দেয় সেই খাদ্যেই আমাদের মনের বাড়বার বয়স কাটল। এমন সময়ে হঠাৎ আমাদের ভাবতে বল্লে আমাদের রাগ হয়— এবং ভেবে যেটা দাঁড়ায় সেটা অজীর্ণতা। তুমি কিছুকাল যদি ইব্‌সেন মেটারলিঙ্ক ডস্‌টেভ্‌স্কি বার্ণার্ড্‌শ্‌ কোট্‌ করে এবং ব্যাখ্যা করে ইস্কুলমাষ্টারি করতে পার তাহলে তার মূল্য যতই তুচ্ছ হোক্‌ তার কাট্‌তি এবং খ্যাতি হবে প্রচুর। কিন্তু তোমার দোষ হচ্চে তুমি নিজে ভাব সুতরাং তুমি ভাবনা দাবী কর—এতবড় দুরাশা আমাদের দেশে চল্‌বেনা। অক্ষয় মজুমদার বল্‌তেন "অভিনয় করবার সময় দর্শকদের মনে করতুম বাঁদর তাতেই

অভিনয় করা সহজ হত।" কিন্তু অভিনয়ের বেলা যেটা খাটে সাহিত্যের বেলা সেটা খাটে না। সাহিত্যের বেলা মনে রাখ্‌তেই হবে যাদের জন্যে লিখ্‌চি তারা সকলেই মানুষ, তাদের সকলেরই মন আছে। আমাদের পাঠকদের মধ্যে সেই মনের যাচাইটা খাঁটি এবং কড়া নয় বলেই কতই যে বাজে লেখা লিখেচি তার ঠিকানাই নেই। বাহির থেকে আদায় করে নেবার লোকটি না থাক্‌লে ভিতরের দান করবার শক্তিতে বিকার ঘটে। কিন্তু এ সমস্ত মেনেও কোমর বেঁধে চল্‌তে হবে এবং জান্‌তে হবে, দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।

প্রিয়বাবুর ইংরেজি বইগুলো কিনে রাখবার ইচ্ছা ত আছে। চেষ্টা করে দেখো যাতে আমার সাধ্যের মধ্যে কুলোয়। ইতি ২ ফাল্গুন ১৩২৪

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৬৮] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

আমারি দোষ। শরৎ চাটুজ্জে একটা নতুন কাগজ বের করে তাতে আমাকে সমালোচনা লিখ্‌তে অনুরোধ করছিলেন। তার জবাবে আমি তাঁকে বলেছিলুম যে, আজকাল আমার লেখার উৎসাহ একেবারে ছুটে গেছে, এমন কি, সবুজ পত্রে

লেখাও আমার আর চল্‌চে না। এর থেকেই কথাটা নিশ্চয় উঠেচে। সত্যিই আমার কেমন লেখা সম্বন্ধে জড়তা এসেচে। বারে বারে এই কথাই কেবল মনে হয় আমাদের দেশের পাঠক লেখকদের উপর আজকাল অত্যন্ত বেশি মুরুব্বিয়ানা করে। আমাদের যখন বয়স অল্প ছিল বঙ্কিমবাবুদের প্রতি আমাদের মনের ভাব ঠিক উল্টো ছিল। এমনতর পাঠক-সমাজের কাছে লিখ্‌তে কোনোমতেই গা লাগে না। এর ফল হয় এই যে, নিজের ভিতরে যতটা পূর্ণতা আছে বাইরে তার প্রকাশের পথ অনেকটা অবরুদ্ধ হয়ে যায়। কেননা বাইরে থেকে আদায় করে নেবার ব্যবস্থা না থাক্‌লে ইচ্ছা থাক্‌লেও দেওয়া যায় না— মন ত আমাদের সম্পূর্ণ নিজের বশ নয়— আমাদের নিজের যা সম্পদ আছে তা দিতে গেলে ভিতর বাহিরের যোগে সেটা ঘট্‌তে পারে। এই সকল কারণে, এবং হয়ত অন্য নানা কারণও আছে, আমার কেবলি দূরে পালিয়ে যেতে ইচ্ছা করে। মনে মনে কেবলি জিনিসপত্র প্যাক্‌ করচি, এবং টাইম টেব্‌ল দেখচি— এমন অবস্থায় মনটাকে কলমের ঘানিতে জুড়ে দেওয়া ভারি শক্ত হয়। আজকাল কবিতা লেখায় হাত দিয়েছিলুম, তারও দেখচি ইস্টিম্‌ ফুরিয়ে আস্‌চে। এই রকম মানসিক উড়ুক্ষুতা রোগের একমাত্র ওষুধ হচ্চে খুব ভরপুর বেগে একেবারে উড়ে যাওয়া। চেষ্টা ত কর্‌চি, কিন্তু আজকাল পথও চারদিকে বন্ধ, আবার পাথেয়ও তথৈবচ। সেইজন্য দিনরাত কেবল চলি-চলিই করচি অথচ চলা হচ্চে না,

সেইটেতে ক্ষতি হচ্চে। যাই হোক্ আপাতত তোমাকে একটা কবিতা পাঠাই তার পরে গদ্য একটা লেখবার চেষ্টা করব। ইতি ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৬৯] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন
১৯ জুলাই, ১৯১৮

কল্যাণীয়েষু

এখানে এসে অবধি এক লাইন লিখিনি। মনটা ক্লান্ত হয়ে আছে। বিদ্যালয়ে আজকাল মাষ্টারি করে থাকি। তাতে আমার প্রায় সমস্ত দিন কেটে যায়। এতে আর কিছু উপকার যদি নাও হয় তবু আমার মনটা সুস্থ থাকে। নানা কারণে উদ্বৃত্ত শক্তিকে যখন কাজে লাগাতে না পারি তখনি মন বিগ্‌ড়ে যায়। লেখার প্রেরণা সব সময়ে থাকে না অথচ মনের কলে দম দেওয়া থাকে বলে সে সব সময়েই চল্‌তে থাকে— এই চলার জাঁতাটা যদি কিছু পেষবার না পায় তাহলে নিজেকে নিজে ক্ষয় করে। লেখকরা অনেক সময়েই বেকার অবস্থায় এই আত্মপেষণের কাজে নিজেকে ক্ষয় করতেই থাকে— এ কাজ আমি অনেক করেচি সুতরাং জানি এটা প্রীতিকর নয়। এইজন্যে পঞ্চাশোর্দ্ধে ঐ অনিশ্চিত অনিয়মিত অসাময়িক কাজটা ছেড়ে দিয়ে গুরুমশায়গিরি ধরেচি। তাতে বেশ ভালই থাকি। এর কোনো একটা

ফাঁকে তোমাদের জন্যে কিছু একটা লেখবার চেষ্টা করব— কিন্তু মনের বেগটা লেখার দিক থেকে অন্য দিকে সরে গেছে। সুনীতি আমার কাছে আসবার আগেই অজিত আমার কাছ থেকে সার্টিফিকেট আদায় করে নিয়ে গেছে। কিন্তু তবু সুনীতিকে কিছু না দিয়ে পারলুমনা— কেননা ওঁর যোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহমাত্র নেই। ইতি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৭০] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

আজ এই খানিকক্ষণ হল সবুজপত্র পেয়েছি। পেয়েই পড়ে ফেল্লুম। সবুজপত্রের গুণ হচ্চে পড়তে বেশিক্ষণ লাগে না— খুব ব্যস্ত লোকেরও ভয় করবার দরকার হয় না। আমার সকাল বেলাকার ক্লাস এবং বিকাল বেলাকার কাজ এই দুইয়ের মাঝখানের ফাঁকটি ঠিক ভর্ত্তি করেচে এবং তার উপরে একখানি চিঠি লেখবার সময়ও বাকি রেখেচে। এবারকার কাগজটি খুব ঝক্‌ঝকে হয়ে উঠেচে। তোমার "বই পড়া" প্রবন্ধের মধ্যে অনেক মাল আছে কিন্তু তারা এম্‌নি ভাণ করচে যেন তাদের কোনো গৌরব নেই, অর্থাৎ যেন তারা ভারাকর্ষণের কোনো ধার ধারেনা—কিন্তু আমাদের দেশের পাঠক গুরুভক্ত এইজন্য সাহিত্য গুরুতর হয়ে না উঠ্‌লে তাদের মনে হয় যেন উপোষ করা হল। বাৎস্যায়ন থেকে

যে বর্ণনা তুলে দিয়েছ তার মধ্যে "পতৎগ্রহ" কথাটির মানে লিখেচ পিকদানি। কিন্তু তোমার মানে পড়্‌বার আগেই আমার মনে হয়েছিল ওটা হয়ত waste-paper basket-এর মত একটা জিনিস যার মধ্যে আবর্জ্জনা ফেলা যায়। কিন্তু ওর পিকদানি অর্থটা কি তোমার আন্দাজ, না ওটা পাকা কথা? গল্পটি কিন্তু তুমি সম্পূর্ণ আমার জীবনবৃত্তান্ত থেকে চুরি করেচ— ঠিক গল্পটি নয় কিন্তু তার বৃত্তান্তটি। কিন্তু খুব উপাদেয় হয়েচে। এ'কে মারাত্মক গল্প বলা যেতে পারে কারণ, বুদ্ধকে মার যে-রকম প্রলুব্ধ করেছিল, তোমার গল্পের উপসংহারে সেই রকম একটি মারের প্রলোভন উদ্যত আছে— সুকুমারমতি পাঠকেরা নিশ্চয় নিঃশ্বাস ছেড়ে বল্‌বে, আহা ঐ বিধবার সঙ্গে বিবাহ হলেই ত চুকে যায়— কিন্তু তাহলে গল্পের তপস্যা ঐখানেই মাটি। সুরেশের লেখার খানিকটা দূর পর্য্যন্ত পড়ে মনে হচ্ছিল তোমার লেখা পড়চি— হঠাৎ পাতা উল্টে দেখলুম সুরেশের নাম। লেখাটি খুব ভাল লাগ্‌ল। এবারকার সব লেখাই বেশ চোখা চোখা,— তোমার টীকা-টিপ্পনির ত কথাই নেই। আমি ইস্কুলমাস্টারির মধ্যে তলিয়ে গেছি— ওতে মনটা বাঁধা পড়েচে। মন্‌টাকে বাঁধা নিয়েই ত মানুষের যত তপস্যা, এক কথায়, ঐটেকেই বলে সুখ— ছাড়া মনটাই লক্ষ্মীছাড়া— অতএব যতদিন এই ভাবে চলে চলুক। ইতি ১ ভাদ্র ১৩২৫

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কেম্ব্রিজের এণ্ডার্সন সবুজপত্র পাননা বলে অভিযোগ

জানিয়েচেন। পেলে তিনি মাঝে মাঝে সেখানকার কাগজে তোমাদের লেখা সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারেন।

[৭১] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

আমাকে কন্‌গ্রেসের সভাপতিমঞ্চে টেনে তোলবার জন্যে পূর্ব্ব পশ্চিম দক্ষিণ সকল দিক থেকেই জাল ফেলা হয়েছিল। ইতিপূর্ব্বে জালের টান দুই একবার অনুভব করেছিলুম তাই এবার সেয়ানা হয়েচি। চিরকাল ভাবরসের জলাশয়ে বাস করে এসেছি, পলিটিক্সের শুক্‌নো ডাঙায় বাঁচব কেমন করে? শুধু তাই নয়— মানুষের ললাটে একবার ভুল মার্কা পড়ে গেলে তার পরে নিজের সত্য পরিচয় দিতে অনেক কষ্ট পেতে হয়। আর যাই হোক্, "কন্‌গ্রেস্‌ওয়ালা"র ছাপ আমার পক্ষে অত্যন্ত মিথ্যা। যে স্থান আমার, সে জায়গায় ও মার্কা একেবারেই চলেনা। আমার নিজের ক্ষেত্রে আমার ডাক পড়বার সময় নিকটবর্ত্তী হয়েচে— সেখানে হাজির হবার পূর্ব্বে কোনও কলঙ্ক নিয়ে যেতে ইচ্ছা করি না।

এবারকার সবুজপত্রে দেখলুম, তুমি লিখেচ Mystic কথার প্রতিশব্দরূপে অতিবাদী শব্দ ব্যবহার করা যেতে পারে। উপনিষদের একটা জায়গায় আমি যে "অতিবাদী" শব্দের ব্যবহার দেখেচি সে হচ্চে এই :—

"প্রাণোহ্যেষয়ঃ সর্ব্বভূতৈর্ব্বিভাতি বিজানন্
বিদ্বান ভবতে নাতিবাদী।" অর্থাৎ

"এই যে প্রাণ সর্ব্বভূতস্থ হইয়া প্রকাশ পাইতেছে ইহাই জানিয়া জ্ঞানী অতিবাদী হন না।" এখানে অতিবাদী বলতে নিশ্চয়ই বোঝাচ্চে, সত্যকে অতিক্রম করে' যে কথা কয়। তুমি কি অন্য অর্থে অতিবাদী দেখেচ?

আমি মাঝে মাদ্রাজ অভিমুখে যাত্রা করেছিলুম— ভুলে গিয়েছিলুম ভ্রমণ এবং অভ্যর্থনা আমার সয় না। দেখলুম দক্ষিণাপথে দুটোই খুব প্রবল এবং প্রচুর। আজ সাতান্ন বছর বাংলা দেশে বাস করে গালিগালাজ অবমাননায় এম্‌নি মৌতাত জমে গেছে যে অতিশয় সম্মান সহ্য করবার মত অভ্যাস চলে গিয়েচে। তাই পিঠাপুরম পর্য্যন্ত গিয়েই আর পুরোবর্ত্তী না হয়ে পিঠের দিকেই ফেরা গেল। ইতিমধ্যে খবর পেয়েছিলুম মীরা আর তার ছেলে নিজামের হায়দ্রাবাদে সঙ্কটাপন্নভাবে পীড়িত। "শান্তি" বলে তার ছোট দেবর এই ব্যামোতেই সেখানে মারা গেছে। আমি মনে ভাবলুম আমার যে রকম দুর্দ্দিন উপস্থিত হয়েচে তাতে এই আঘাতটা বোধ হয় কাট্‌বে না। টেলিগ্রামের গতিকও ভাল ঠেকছিল-না। ওখানে ডাক্তার ল্যাঙ্কেষ্টর আছেন, মীরাদের দেখ্‌বার জন্যে আমি তাঁকে টেলিগ্রাম করে দিলুম। তিনি এবং ডাক্তার নাইডুতে মিলে একরকম করে বিপদ থেকে উদ্ধার করে এনেচেন। কাল খবর পেয়েছি ডাক্তার বলেচে এখন আর কোনো ভাবনার কারণ নেই। এই সব নানা ছোট বড় আঘাতে ব্যাঘাতে আমার মন এখন আর কিছু লিখ্‌তে উৎসাহ পায় না। তাই ফের আর একবার ইস্কুল মাস্টারিতে

লাগব ভাবচি। মাঝে মাঝে দুটো একটা লেখবার বিষয় পূর্ব্বাভ্যাসক্রমে দরজার কাছে এসে করুণনেত্রে আমার মুখের দিকে চেয়ে ঘুরে ফিরে চলে যায়। বোধ হয় খুব একটা পরিবর্ত্তনের পর আবার সাহিত্যের দক্ষিণ হাওয়া বইতে পারে— এখন কিন্তু শুক্‌নো ফুলেই মনের বনতল আকীর্ণ।

বিবিকে আমার বিজয়ার আশীর্ব্বাদ জানিয়ো। ইতি ৮ই কার্ত্তিক ১৩২৫

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৭২] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

২১ ডিসেম্বর, ১৯১৮

কল্যাণীয়েষু

৭ই পৌষের হাঙ্গামে অত্যন্ত ব্যস্ত। কিন্তু না লিখে থাক্‌তে পারচিনে যে অনেকদিন পরে সবুজপত্র পড়ে খুব ভাল লাগ্‌ল। এবারে একটি লেখাও বাদ দেবার মত নয়— বীরেশ্বরের গল্পটিও ভাল হয়েচে। তোমার শেষ গল্পটি সুতীক্ষ্ণ— ওটা দেশোচিত, কালোচিত এবং পুরুষোচিত। এরকম খরধার এবং সুগঠিত লেখা আর কারো হাত দিয়ে বের হবার জো নেই। বিবির লেখাটা পড়ে আশ্চর্য হয়েছিলুম— শেষে ওর নাম পড়বার আগে ওর লেখা বলে মনেও করিনি— প্রবন্ধের বিষয়টির জন্যে বলচিনে, ওর স্টাইলের জন্যে। আমার বোধ হচ্চে ত্রৈমাসিক সবুজপত্র যদি বের কর তাহলে তোমরা হাত পা ছড়িয়ে লিখ্‌তে পার এবং সমস্ত লেখা বাছাই

করে নিতে পার। বাঙলা কোন্ বই পড়া উচিত প্রবন্ধটির নাম আমার কাছে ঠিক বোধ হয় না— ঐ নামের অনুসরণ করতে গিয়ে তুমি তোমার বক্তব্য বিষয়টিকে কতকটা খর্ব্ব করেচ। ভারতচন্দ্রের সমালোচনাই তোমার মুখ্য বিষয়। যাই হোক্ তোমাদের এবারকার পত্রটি যাকে বলে সাক্‌সেস্। তোমাদের পত্রোদ্‌গমের সময়টা যদি বেশ নিয়মিত হয় তাহলে পাঠকদের পক্ষে ভাল হয়। সবুজপত্র যেন আমার দিশি বিবাহের নিমন্ত্রণের খাওয়া—বারোটার মধ্যে খাওয়া হয়ে যাবে বলে শেষকালে পিত্তি পাড়িয়ে বেলা পাঁচটার সময় খাওয়ানো। আয়োজনটা খুব ভালো হলেও সময়টার দোষে তাল-কাটা গানের মত হয়ে পড়ে। আগামীবারে আমি একটা কিছু লেখা দেব মনে করচি— কিন্তু সেই আগামী বারটা কোন্‌বার?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৭৩] ওঁ

কল্যাণীয়েষু

আমার শারীরিক অবসাদ এত বেশি হয়েচে যে, চিঠিপত্র লেখা প্রভৃতি সংসারের ছোট ছোট ঋণগুলোও প্রতিদিন জমে উঠ্‌চে— পরজন্মে এই পাপের যদি দণ্ড থাকে তাহলে নিশ্চয়ই আমি দৈনিক সংবাদপত্রের এডিটর হব। সে আশঙ্কার কথা মনে উদয় হলেই নির্ব্বাণমুক্তির জন্যে উঠে পড়ে লাগ্‌তে ইচ্ছা হয়— কিন্তু আপাতত তার চেয়ে সহজ চিঠির জবাব দেওয়া।

সবুজ পত্রকে বাঁচিয়ে রাখ্‌তে বই কি। দেশের তরুণদের মনে সবুজ রংকে বেশ পাকা করে দেবার পূর্ব্বে তোমার ত নিষ্কৃতি নেই।— প্রবীণতার বর্ণহীন রসহীন চাঞ্চল্যহীন পবিত্র মরুভূমির মাঝে মাঝে অন্তত একটা আধটা এমন ওয়েসিস থাকা চাই যাকে সর্ব্বব্যাপী জ্যাঠামির মারী-হাওয়াতেও মেরে ফেল্‌তে না পারে। অন্তহীন বালুকারাশির মধ্যে তোমার নিত্যমুখর সবুজপত্রের দোদুল্যমান ছায়াটুকু যৌবনের চির-উৎসধারার পাশে অক্ষয় হয়ে থাক্‌। প্রাণের বৈচিত্র্য আপন বিদ্রোহের সবুজ জয়পতাকাটি শুভ্র একাকারত্বের বুকের মধ্যে গেড়ে দিয়ে অমর হয়ে দাঁড়াক। আমার এই খোলা জানলাটার কাছে বিশ্রামশয্যায় শুয়ে আমি আমার ঐ সাম্‌নের মাঠের দিকে [চেয়ে] অনেকটা সময় কাটাই। ওখানে দেখ্‌তে পাই মাঠের সমস্ত ঘাস শুকিয়ে পাণ্ডুবর্ণ হয়ে গেছে, শাস্ত্র উপদেশে ভরা অতিপুরাতন পুঁথির পাতার মত। অনেকদিন বৃষ্টি নেই রৌদ্রও প্রখর— তা'তে শুষ্কতা প্রবল হয়ে এক দিগন্ত থেকে আরেক দিগন্ত পর্য্যন্ত সমস্ত ভূমিকে অধিকার করেছে। তার প্রতাপ যে কত বড় তা এই দূর-বিস্তৃত শূন্যতার একটানা বিস্তার দেখলেই বুঝতে পারা যায়। কিন্তু এরই মধ্যে একটি মাত্র তালগাছ এতবড় সনাতন নির্জ্জীবতাকে উপেক্ষা করে একলাই দাঁড়িয়ে আকাশের সঙ্গে আলোকের সঙ্গে নিত্যই আপনার পত্রব্যবহার চালাচ্চে। কোথাও কিছুমাত্র বাণী নেই কিন্তু ঐ একটুখানি মাত্র জায়গায় বাণীর উৎস কিছুতেই আর বন্ধ হয় না। একটি দেবশিশু প্রকাণ্ড দৈত্যের মুখের

সাম্‌নে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে যদি তুড়ি মারে তাহলে সে যেমন হয় এও তেমনি। যে অমর তার ত প্রকাণ্ড হবার দরকার করে না, মৃত্যুই আপনার আয়তনের প্রসার নিয়ে বড়াই করে। তোমাদের সবুজপত্র ঐ তালগাছটিরই মত দিগন্তবিস্তৃত বার্দ্ধক্যের মরুদরবারের মাঝখানে একলা দাঁড়াক্। জরাসন্ধের দুর্গ ভয়ানক দুর্গ— সেখানে প্রকাণ্ড কারাগার, সেখানে লোহার শিকলের মালার আর অন্ত নেই। কিন্তু তার ভয়ঙ্কর কড়া পাহারার মধ্যেও পাণ্ডব এসে প্রবেশ করে, তার সৈন্য নেই সামন্ত নেই; সেই নিরস্ত্র তারুণ্য কত সহজে কত অল্প সময়ে জরা-সন্ধকে ভূমিসাৎ করে দিয়ে তার কারাগারের দ্বার ভেঙে দেয়; সেখানে বন্দী ক্ষত্রিয়দের মুক্তিদান করে। আমাদের দেশেও জরাসন্ধের দুর্গের মধ্যে দেশের ক্ষত্রিয়েরাই বন্দী রয়েছে, যারা ক্ষত থেকে দেশকে ত্রাণ করবে, যারা দূরে দূরান্তরে আপন অধিকার বিস্তার করবে, যারা বিরাট প্রাণের ক্ষেত্রে দেশের জয়ধ্বজা বহন করে নিয়ে যাবে, আমাদের অশ্বমেধের ঘোড়ার রক্ষক হবে যা'রা। সেই যুবক ক্ষত্রিয়দের হাত পা থেকে জরার লোহার বেড়ি ঘুচিয়ে দেবার ব্রত নিয়েচ তোমরা; তোমাদের সংখ্যা বেশি নয়, তোমাদের সমাদর কেউ করবে না, তোমাদের গাল দেবে, কিন্তু জয়ী হবে তোমরাই— জরার জয়, মৃত্যুর জয় কখনই হবে না।

তোমাদের সবুজপত্রের দরবারে আমাকে তোমরা আমন্ত্রণ করেচ। তোমাদের সাধনা যখন সবুজপত্রের নাম নিয়ে আপনাকে প্রকাশ করেনি তখনো এই সাধনা আমি গ্রহণ

করেছি বহন করেছি। তারুণ্য নূতন নূতন কালে, নূতন নূতন রূপে, নূতন নূতন পুষ্পপল্লবে নিজেকে বার বার প্রকাশ করে। প্রাণের অক্ষয়বট যে অক্ষয় তার কারণ তার মজ্জার মধ্যে চিরতারুণ্যের রসধারা বইচে। তাই প্রতিবসন্তেই সে বারে বারে নূতনবেশে নবযুবক হয়ে দেখা দেয়। আমাদের দেশেও জীর্ণ বটের মজ্জার মধ্যে যদি যৌবনের রস একেবারেই না থাকৃত তাহলে এর দ্বারা দেশের চিতাকাষ্ঠই রচনা হত। কিন্তু এখানেও দেখি, মাঝে মাঝে যৌবন একটা আকস্মিক বিদ্রোহের মত কোথা হতে আবির্ভূত হয়ে কঠিন জরার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে। আমাদের সময়েও সে নির্ভয়ে এসেছে, নূতন কথা বলেচে, মার খেয়েছে, পুরাতন আপন চণ্ডীমণ্ডপে বসে তাকে একঘরে করে দিয়েচে। সেদিন আমি সেই খোড়োদলের মধ্যেই ছিলুম। দল যে বাহিরে খুব বড় ছিল তা নয়, কিন্তু অন্তরে তার বেগ ছিল। চণ্ডীমণ্ডপনিবাসীরা এখনো সেজন্যে আমাকে ক্ষমা করেনি। আমি তাদের ক্ষমার দাবীও করিনে, কেননা আমি জেনে শুনে ইচ্ছাপূর্ব্বক চণ্ডীমণ্ডপের শান্তিভঙ্গ করেছি, সেখানকার বৈকালিক নিদ্রার যতদূর ব্যাঘাত করবার তা করতে ত্রুটি করিনি। অর্থাৎ বিকালের নিস্তব্ধ তন্দ্রা-লোকে সকালের চাঞ্চল্য সমীরিত করবার চেষ্টা করেচি।

আমাদের কালের সেই চাঞ্চল্যসাধনাই তোমাদের কালের নূতন পাতায় বিকাশিত হয়ে নীলাকাশের উপুড়-পেয়ালা থেকে সূর্য্যালোকের তেজোরস পান করবার চেষ্টা করচে।

সেই তেজ তোমাদের ফলে ফলে সঞ্চারিত ও সঞ্চিত হয়ে দেশের প্রাণভাণ্ডারকে পুনঃ পুনঃ পূর্ণ করবে।

কিন্তু একটা কথা তোমরা ভুলে গেছ, ইতিমধ্যে আমার পদোন্নতি হয়েচে। ছিলেম যুবকমহারাজের দ্বারের প্রহরী এখন শিশুমহারাজের সভায় সখার পদ পেয়েচি। অর্থাৎ নবজন্মের সীমানার কাছাকাছি এসে পৌঁচেছি— মৃত্যুর পূর্ব্বে এই চৌকাঠটি পেরোনোই বাকি আছে। এই যে এগোবার দিকে চলেচি এখন আমাকে পিছুডাক ডেকো না। বিধাতা আমাকে বর দিয়েচেন আমি বুড়ো হয়ে মরব না। সেইজন্যে যৌবনমধ্যাহ্ন পেরিয়ে আমার আয়ু চিরশ্যামল শিশুদিগন্তের দিকে নেমেচে। আমার জীবনের শেষকাজ এবং শেষ আনন্দ ঐখানেই রেখে যাবার জন্যে আমার ডাক পড়েচে। যৌবনের জয়যাত্রায় আমার জীবনের অধিকাংশ কালই আমি আঘাত অপমান নিন্দার কাছে হার মানিনি, আমি অশান্তির অভিঘাতের ভয়ে পিঠ ফিরিয়ে পালিয়ে যাইনি। কিন্তু এখন দিনশেষে আমার মনিবের হাত থেকে পুরস্কার নেবার সময় হয়েচে। আমার মনিব এসেচেন শিশু হয়ে, পুরস্কারও পাচ্চি। তাঁর কাজে শাস্তি অল্প, শান্তি যথেষ্ট, কিন্তু ছুটি একটুও নেই। সেইজন্যে এখান থেকে আমি তোমাদের জয় কামনা করি, কিন্তু তোমাদের তালে তালে পা ফেলে তোমাদের অভিযানে চল্‌ব এখন আমার আর সে অবকাশ নেই। আগামী কালে যারা যুবক হবে আমি এখন তাদের সঙ্গ নিয়েচি। তাদের সেই ভাবী যৌবন নির্ম্মল হবে, নির্ভয়

হবে, বাধামুক্ত হবে, জড়তা, স্বার্থ বা জনাদরের প্রবলতা বা প্রলোভনে অভিভূত না হয়ে সত্যের জন্য আপনাকে উৎসর্গ করবে এই যে আমি কামনা করেচি সেই কামনা যদি আমার কিছু পরিমাণেও সিদ্ধ হয় তাহলেই আমার জীবন চরিতার্থ হবে। ইতি ১৭ বৈশাখ ১৩২৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

…র কবিতার ছন্দটি এতই নিরতিশয় হাড়গোড়ভাঙা যে, এ'কে সংস্কার করার চেয়ে এ'কে নতুন করা অনেক্ সহজ। সে সাহস আমার নেই এবং সেটা ঠিক উচিতও হবেনা। যেমন আছে এম্‌নি ছাপিয়ো, লোকে ক্ষমা করে নেবে।

[৭৪] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

চিঠিখানা সবুজপত্রে ছাপ্‌তে চাও কিন্তু কোথাও ভাষা যদি আট-পৌরে এবং ভাব সর্ব্বজনপ্রকাশ্য না হয় তাহলে সেগুলো একটু সেরে সুরে নিয়ো। আজকাল সব মন দিয়ে এবং বেশিক্ষণ ধরে কিছু লিখ্‌তে পারিনে। দেহটা পৃথিবীর টানে মাটির দিকে ঝুঁক্‌চে— মনটাকে তার উল্টোদিকে নিয়ে যাবার চেষ্টায় আছি। সেইজন্যে যে-সব কাজে দেহটার দরকার হয় সেইগুলোকে কমিয়ে আনা যাচ্চে। এই উনষাট বছরের সেবকটাকে জবাব দেবার সময় হয়নি কিন্তু ছুটির দরবার করলেই সেটা তখনি মঞ্জুর করতে হয়। শরীর ত এই,

এর উপরে দেশের দুঃখে মন ভেঙে পড়েচে। ব্যথা পাবার শক্তি আছে অথচ প্রতিকারের শক্তি নেই— তাই কেবলি মনে হয় আমাদের পক্ষে মৃত্যুই সদ্‌গতি। ইতি ২০ বৈশাখ ১৩২৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৭৫] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

আচ্ছা মাঝে মাঝে তোমাদের কাগজে লিখব কিন্তু সে লেখা হবে বৈশাখের বালুতটবাহিনী মন্দস্রোত ক্ষীণ ধারাটির মত। অর্থাৎ তাতে পণ্যবোঝাই নৌকো চল্‌বার আশা নেই— অবগাহন স্নানও হবেনা— নিতান্ত স্বগত উক্তির মত— বর্ষার রাতে যখন সমস্ত তারা লুপ্ত তখনকার জোনাকি পোকার মত— কিম্বা যখন দিনের সমস্ত পাখী ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে তখনকার ঝিল্লিধ্বনির মত— অর্থাৎ কর্ম্মের টঙ্কার নয়, উৎসবেরও ঝঙ্কার নয়, বিশ্রামের গুঞ্জনমাত্র।

তোমার প্রবন্ধগুলি পেলে বেশ রয়ে বসে পড়ে দেখ্‌তে পারব। আজকাল সময় ঢের আছে। বিংশ শতাব্দীতে মানুষ শয্যাগত হয়ে না পড়লে বেশ চেখে চেখে বই পড়বার আর কোনো উপায় নেই— লাইব্রেরিদ্বারে শ্মশানে চ কাছাকাছি এসে ঠেকেচে। কিন্তু তাই বলে বিবি আমাকে বাসুদেব ভট্টাচার্য্যের যে বই পাঠিয়েছে সেটা পড়বার মত

অবকাশ যমের দেউড়িতে গিয়েও মিল্‌বেনা। ও লোকটা বুজ্‌রুগ— ওর লেখা কখনো খাঁটি হতেই পারে না।

কাল সবুজপত্রের জন্যে একটা লেখা খাঁ করে লিখে ফেলবার চেষ্টা করব। খাঁ করে যদি না হয় তবে হবেই না— কুঁড়েমির লেখা হাউয়ের মত যদি ছুট্‌ল তবে সোঁ করে আর যদি গড়িমসি হতে লাগ্‌ল তবে বুঝলুম আগুন ধরলনা। ইতি ২ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৭৬] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

একটা লেখা আজ লিখে রেজেস্ট্রি করে পাঠালুম। হাল্কা ছাঁদে হাল্কা কথা লিখব মনে করে কলম ধরেছিলুম— কিন্তু কলম কি সত্যই আমি ধরি? তাহলে এমন দশা হয়? যাই হোক্, একটা লেখা হয়েছে— সম্পাদকের দাবী মিট্‌ল। কুমোরের চাকে যখন বেগ পুরো মাত্রায় থাকে তখন সেই বেগের চোটে সূক্ষ্ম কাজ সহজেই আকার পায়। আজকাল আমার বুদ্ধিতে সেই বেগ নেই তাই জিনিষটা কিছু মোটা রকম হল। দেখচি এখনো কারখানা চলবার মত অবস্থা হয়নি। এখনো কাজ বন্ধ রাখাই উচিত। হঠাৎ এত ক্লান্তি কি করে যে একেবারে আমার মাথার উপরে চড়ে বস্‌ল তা বল্‌তে পারি নে। এই সামান্য একটুখানি লিখেই মনে হচ্চে

আমার মাথার দিকটা ঠিক যেন ঝড়ের পরে খড়ের চালের মত ভাব।

তোমরা কিন্তু সবুজপত্র যদি নিতান্তই যখন তখন বের কর তাহলে লেখকদের লেখবার উৎসাহ এবং পাঠকদের পড়বার আগ্রহ দুইই কমে যাবে। তা ছাড়া বানান সম্বন্ধেও একটু হুঁসিয়ার হলে কাগজটার একটু শ্রীবৃদ্ধি হবে। জ্যৈষ্ঠের আগে বোধ হচ্চে তোমরা কাগজ বের করবেনা— সেটা কিন্তু ক্ষতিজনক— এতে মন মিইয়ে যায়। ইতি ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৭৭] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

তোমার কাগজের জন্য দুটো পত্র পরে পরে পাঠিয়েছি। আবার আজ আর একটা পাঠাচ্চি। কিন্তু তবু সম্পাদকী বৈঠকে তোমার টনক নড়্‌স না দেখে আমি কিছু চিন্তিত আছি। হস্তগত হয়নি এমন আশঙ্কা করিনে, কিন্তু বুঝিবা দ্বিধায় পড়েচ। বড় ক্লান্তির মধ্যে লিখেচি কিন্তু বড় দুঃখে। মনে করি আর কিছু লিখব কিন্তু ঘুরে ফিরে একই কথা বেরিয়ে পড়ে। নিজের মনের বেদনা এবং লেখকের লেখনী এই দুইয়ের মধ্যে একটুখানি ফাঁক না থাকলে লেখা ভাল হয় না তা জানি— কিন্তু কি করা যাবে? সেই ফাঁকটা আজ নেই। এইজন্যে এগুলো সাহিত্যের হিসাবে কি রকম হল তা বিচার

করতে পারচিনে। তবে লিখে ফেলে নিজের মনটাকে খানিকটা পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার ছিল। যদি এগুলো সবুজপত্রে না চলে আমাকে ফিরিয়ে দিতে দ্বিধামাত্র কোরো-না। আর যদি চলে তাহলে ছাপতে এবং প্রুফ পাঠাতে দেরি কোরো না। প্রুফের সঙ্গে মূল কপিগুলো পাঠিয়ো।

দেশের দুঃখের বোঝায় আমার শরীরকে যেন আরও দলিত করচে— বিশেষত প্রতিকারের সমস্ত দরজা যখন এমন ভয়ানক এঁটে বন্ধ। আমাদের দেশ অতীতে অনেক মহাপাপ করেচে, মানুষকে অনেক দুঃখ দিয়েচে— তাই অন্যায়ের দুঃখ এমন নিরুপায়ভাবে সহ্য করচে। মানুষকে যে-অপমান করেচি চারদিক থেকে সেই অপমান ফিরে পাচ্চি। সকলের চেয়ে আমার এইটেই বুকে বাজে যে, আজ যদি হাতে ক্ষমতা পাই আবার এই কাজই করব। আমাদের মনের মধ্যে সেই পাপ তেমনিই জমে আছে। জাহাজের খোলটার ভিতরে যখন জল ঢোকে বাইরে জলের ঢেউ তখনি তাকে বড় মার মারতে থাকে। খোলের ভিতরকার জল নিঃশব্দ এবং নিশ্চল সেইজন্যে তাকে নিরীহ বলে মনে হয়, এবং যত রাগ হয় ঐ বাইরের চড়চাপড়ের উপরে। মোদ্দা কথা, মারের চোটে পাঁজর ভেঙে গেল। ইতি ৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয়েষু

Still they come. কিন্তু বাস্। তুমি দুই সংখ্যা একসঙ্গে বের করচ অতএব এস্থলে অধিক দোষের হবে না। এই চারটেতে মিলে চতুর্দ্দোলার বেহারার মত একটা কথাকেই কাঁধে করে নিয়ে চলেচে। অতএব এ'কে ভাগ করতে গেলে সেটা শোকাবহ হবে। পাল্কীর সোয়ারিটার খাতিরে বেহারা চারটেকেও আঙিনায় ঢুক্‌তে দিতে হবে।

যাহোক নটে শাকটাকে মুড়িয়ে দেওয়া গেল বোধ হয়। পরের কিস্তিতে কোনো একটা নতুন কথা আসরে প্রবেশ করবার ফাঁকা পাবে।

লাহোরিণী একটা কি গল্প লিখেচেন এমন গুজব শুনচি। আমার বোধ হয় তাঁর লেখা তুমি নির্ভয়ে সবুজপত্রের জন্যে দাবী করতে পার। কিন্তু নবীন লেখক চাই। তাদের সাড়া পাওয়া যাচ্চে না কেন? সবুজপত্রের সভার পনেরো আনা আসন আমরাই যদি জুড়ে থাকি তাহলে কাল-ব্যতিক্রম দোষ ঘটে। আমাকে যদি তোমরা দক্ষিণা দিয়ে বা না দিয়ে বিদায় করে দাও তাহলে আমি তোমাদের আশীর্ব্বাদ করে এখনি সরে পড়ি। আমি এক একবার যাত্রা করে বেরই; তোমরা হঠাৎ পিছু ডাক, আবার রাম রাম বলে আমাকে ফিরে আস্‌তে হয়। এবারে কিন্তু বিধাতার কাছ থেকে আমার ছুটির মঞ্জুরী হুকুম বেরিয়েচে— আমার উপর বেশি

ভরসা রেখো না— হাওয়া বদলের জন্তে মনটা ব্যগ্র হয়ে আছে— Waiting room-এ গাড়ির জন্যে বসে আছি।

কাপি সমেত প্রুফ পাঠিয়ো। অত্যন্ত তাড়াতাড়িতে লেখা— গলদ থাকবার সম্ভাবনা আছে। ইতি ৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৭৯]

ঔ * Brahmacharya-Ashram
Santiniketan, Birbhum
পোস্টমার্ক ৩০ জুলাই, ১৯১৯

কল্যাণীয়েষু

সবুজপত্র প'ড়ে খুব খুসি হলুম। কিন্তু আরো লেখক চাই। লেখাসৃষ্টির চেয়ে লেখকসৃষ্টির বেশি দরকার। লেখা-সৃষ্টির দ্বারাই লেখককে টানা যায় কিন্তু এখনো বেশি দূর পর্য্যন্ত সবুজপত্রের টান পৌঁচচ্চে না। নবীন লেখকেরা সবুজপত্রের আদর্শকে ভয় পায়— তাদের একটু অভয় দিয়ে দলে টেনে নিয়ো, ক্রমে তাদের বিকাশ হবে।

আমি ভয়ঙ্কর জোরে মাস্টারি করচি। তাতে অনেক ভাবনার কথা দুঃখের কথা অপমানের কথা ভুলে থাকা যায়।

কাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার সময় কলকাতায় পৌঁছব। রবিবারে রামেন্দ্রসুন্দরের স্মৃতিসভা বসবে সন্ধ্যা ছটার সময়— অতএব তোমাদের ওখানে শনিবারে যদি সভা কর তাহলে

কোনো বিঘ্ন হবে না। শুক্রবারে সরস্বতীর বিবাহ। সোমবারেই আমাকে ফিরতে হবে। ইতি বুধবার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৮০] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

আমার লেখাটির কি নাম দেব ভেবে পাইনে। "পুরাণো শোক" বোধ হয় চল্‌তে পারে।

ছোট ছোট গল্পকে "কথাণু" না বলে "কথিকা" বলা যেতে পারে। "গল্পস্বল্প" বল্‌লে ক্ষতি কি?

তোমার আহুতি এখানে পৌঁছাবামাত্র এখানকার মেয়ের দলে সেটি অধিকার করেচেন— তাঁদের সংখ্যা কম নয় সুতরাং সেটি ঘূর্ণির মত ঘুরে বেড়াচ্চে। পরিণামে আমার হাতে এসে পৌঁছবে।—

সবুজপত্রে তোমার হু-ইয়ার্কি লোকের ভাল লেগেচে— আমি আজকাল অত্যন্ত কাজের ভিড়ে পড়ে এখনো পড়বার সুযোগ করতে পারিনি। ক্লান্তি এবং ব্যস্ততা দুই একসঙ্গে এসে মেলাতে আমার না হচ্চে ভাল করে কাজ, না হচ্চে ভাল করে বিশ্রাম। কিছুকাল থেকে বিদেশী অতিথির আনাগোনা বড় বেশি হয়েচে— তাতেও অনেক সময় যায়। সম্প্রতি এখানে একজন পার্সির আবির্ভাব হয়েচে— তাঁর ছেলে এখানে বেদান্ত শেখবার জন্যে ইচ্ছুক— অথচ তার

সংস্কৃত জানা নেই— দেবনাগরী অক্ষর পর্য্যন্ত জানে না। বর্ণপরিচয় থেকে বেদান্ত পর্য্যন্ত বহুদূর পথ— এতদূর এ'কে বহন করে চলা সহজ হবেনা। ইতি ৪ ভাদ্র ১৩২৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৮১] ঁ

কল্যাণীয়েষু

তোমার কাব্যগ্রন্থটির জন্যে একটি নাম একরাত্রে স্বপ্নের মত এসে পরক্ষণে হাতছাড়া হয়ে গেছে। তখন মনে হয়েছিল সেটা ভাল কিন্তু মনে থাক্‌লে হয়ত তত ভাল লাগ্‌ত না— অতএব অনুশোচনা না করে আর একটা নতুন নাম ভেবে স্থির করলুম। "পদ-চারণ"— ওর সাদা অর্থ পায়চারী। কিন্তু কাব্যের পদ আর প্রাণীর পদ এক নয়। আমাদের দিশী troubadourদেরও চারণ বলে থাকে।

সবুজপত্রের জন্যে একটা লেখা পাঠালুম। যদি এটা পছন্দ না কর তাহলে প্রবাসীতে পাঠিয়ো।

আবার আমি ইস্কুলমাষ্টারীতে লেগে গেছি।

এণ্ড্রুজ আশুর ওখানে যাচ্চে তার হাতে পত্র ও প্রবন্ধ দুই দিলুম।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয়েষু

তোমরা আমার বিজয়ার আশীর্ব্বাদ জেনো। এইসঙ্গে একটা ইংরেজি চিঠির খসড়া পাঠাচ্চি। রোমাঁ রোলাঁদের চিঠির উত্তর। যদি কোথাও আপত্তি বোধ কর বা বদল ইচ্ছা কর স্পষ্টভাষায় জানিয়ো। সুরেন ওখানে আছে কিনা জানিনে— যদি থাকে তাকে দেখিয়ো। এই চিঠি এবং রোমাঁ রোঁলাদের পত্রের তর্জ্জমা মডারন রিভিয়ুতে ছাপানর ইতিকর্ত্তব্যতা বিচার করে জানিয়ো। পত্রের উত্তর কলকাতায় দিয়ো, কারণ এখানে আমার ছুটিযাপন অনিশ্চিত। শিলঙ যাওয়া প্রায় স্থির। কাঞ্চি-কাহিনীর ইংরেজিটেও পাঠাই। ভাষা সম্বন্ধে তোমাদের মন্তব্য চাই এবং এটা এখানকার কোনো কাগজে ছাপব কি না বোলো। ইংলণ্ডের Daily News বা Nationএ পাঠাতে পারি। তোমাদের সবুজপত্রের জন্যেও কিছু পার্ব্বণী পাঠাচ্চি— আশা করি, বর্ত্তমান বছরের পঞ্জিকার সঙ্গে সবুজপত্রের যে ঘোড়দৌড় চল্‌চে তাতে সে শেষ পর্য্যন্ত পরাস্ত হবে না।

গুরুজনদের আমার প্রণাম জানিয়ো। ইতি বিজয়া ১৩২৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ইংরেজি লেখা স্বতন্ত্র লেফাফায়
রেজেষ্ট্রিডাকে পাঠালুম।

পরপৃষ্ঠায়

কল্যাণীয়েষু

"মায়ার খেলা"র স্বরলিপি পেয়েচ শুনে খুব খুসি হলুম। কলকাতায় গিয়ে ওর ছাপার ব্যবস্থা করা যাবে।

কাল আমি শিলঙ ছেড়ে গৌহাটি যাব— তার পরে সেখান থেকে আমাদের মণিপুরে যাবার কথা চল্‌চে। তাহলে আরো দিন দশেক পরে আমরা ফিরব।

এখানে ইংরেজি লেখায় হাত দিয়েচি। অস্ট্রেলিয়ায় বক্তৃতার কথা আছে তাই তৈরি হতে হচ্চে। কিছু ইংরেজি তর্জ্জমাও করেচি। দুই একটা ছোট কথিকা লিখেচি।

তোমরা জমিদারী সম্বন্ধে যে তিনটে প্রস্তাব পাঠিয়েচ, তার প্রথমটা ঠিক সঙ্গত নয়। কারণ বিরাহিমপুর এবং কালিগ্রাম এক হাতে থাক্‌লে তবে দৈবদুর্য্যোগ প্রভৃতি উপসর্গে কতক রক্ষা পাওয়া যায়— একটার ক্ষতি আরেকটায় পূরণ করে।

দ্বিতীয়টা সুরেনের পক্ষে বহন করা অসম্ভব হবে।

আমার নিজের পছন্দ তৃতীয় প্রস্তাব।

কলকাতায় গিয়ে একটা ঠিক করা যাবে। এ বছরটা দুই পরগণার পক্ষেই ভাল এইজন্যে এই সুযোগেই যদি কোনো ব্যবস্থা হয় সুরেনের পক্ষে সেটা কষ্টকর হবেনা। যাই হোক্‌ না, আমার নিজের দিক আমি যেমন ভাবব সুরেনের দিকও আমি ঠিক তেমনি করেই ভাবব— ওকে

মুস্কিলের মধ্যে ফেলে আমি কোনো সুবিধেই চাইনে। আমার স্থির বিশ্বাস, সুরেন যদি আমার কাছ থেকে আমার অংশ সম্পূর্ণ নেয় তাহলে ও আমাকে যা মূল্য দেবে চেষ্টা করলে তার অনেকটাই ও তুলে নিতে পারবে ইতি ১৩ কার্ত্তিক ১৩২৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৮৩ক] ওঁ

কল্যাণীয়েষু

পর্শু রাত্রে বাড়ি ফিরে এসেই দেখি রোগীতে বাড়ি ভরা। পরদিন সকালেই চলে এসেচি। ইচ্ছা ছিল তোমাদের সঙ্গে দেখা করে আসব সময় হলনা।

ফরাসী চিঠিগুলি আমাকে তর্জ্জমা করে পাঠাতে পারবে কি জবাব দিতে হবে। দেরি কোরোনা।

বিবিকে বোলো মায়ার খেলা স্বরলিপি রেজেস্ট্রি করে যেন শীঘ্র পাঠিয়ে দেয় তাহলে ছাপার কাজ এখনি সুরু করে দিতে পারি।

এখানে মেঘলা করে আকাশ বিমর্ষ হয়ে আছে। শীতের দিনে বর্ষার নকল একেবারেই ভাল লাগেনা।

স্বাঃ— শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয়েষু

স্প্যানিশ ভাষায় তোমাদের দখল আছে কি না জানিনে তবে কিনা ওটা ফরাসী ভাষার প্রতিবেশী— তোমরা হয়ত কতক ইসারায় কতক অভিধানের সাহায্যে এর একটা মোটামুটি মর্ম্ম গ্রহণ করতে পারবে। সেইটে যদি আমাকে জানিয়ে দাও তাহলে জবাব লিখে পাঠাতে পারি। অল্পকাল হল বোধ হচ্চে Danish এ একখানা পত্র পেয়েছিলুম সেটা বুঝতেও পারিনি হারিয়েও গেছে— এমন ঘটনা বারম্বার ঘটচে। Ollendorff যদি বেঁচে থাকে তাহলে তাকে আমার সেক্রেটারি রাখি।

ইংলণ্ডে Flame বলে একটা কাগজ বেরচ্চে। বোধ হচ্চে উচ্চ অঙ্গের জিনিষ হবে। আমি একটা কবিতা পাঠিয়েচি। এবং লিখেচি আমার বন্ধুরাও মাঝে মাঝে কিছু কিছু লেখা দেবেন। তোমার কথা মনে করে লিখেছিলুম। তার চিঠিটা পাঠাচ্ছি। পড়ে দেখলে ব্যাপারটা বুঝতে পারবে।

আর্য্যর কাছ থেকে একখানি ফোটোগ্রাফ সংগ্রহ করে আমাকে পাঠিয়ে দিয়ো।

স্বরলিপি প্রভৃতি কাল পাব— তার যথোচিত ব্যবস্থা করব। ইতি ২রা অগ্রহায়ণ ১৩২৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রাবণের সবুজপত্র যদি অঘ্রাণে বেরয় তাহলে কি হলদে হয়ে যাবে না?

কল্যাণীয়েষু

Harvard Oriental Series এর কিছু কিছু বই রথীর হাত দিয়ে পাওয়া গেল। শাস্ত্রীমশায় খুব খুসি হবেন।

তুমি যে এতদিন সবুজপত্র চালিয়ে এসেচ এই আমার আশ্চর্য্য বোধ হয়। উজানস্রোতে সাহিত্যের লগি ঠেলা বারোমাস মানুষের ভাল লাগে না। আমার এমন হয়েচে, কোনো লেখা প্রকাশ করতে শিকি পয়সার উৎসাহ বোধ হয় না। যে মূঢ়তা সরল তারও একটা সৌন্দর্য্য আছে যেমন শিশুদের— কিন্তু যে মূঢ়তা কুটিল এবং উদ্ধত তাকে সহ্য করা যায় না। যে সব জিনিষের প্রতি দরদ আছে সজারুদের সভায় তাদের বর্ণণ করতে কতদিন উৎসাহ থাকে বল? ওদের পিঠের কাঁটা এখনো পর্য্যন্ত নাম্‌ল না— থাক্ ওরা ঐ আকাশের দিকে কাঁটা উঁচিয়ে— ওরা ভাব্‌চে আকাশের সব জ্যোতিষ্ককে ওদের ঐ সহজাত সম্মার্জ্জনী দিয়ে ওরা ঝেঁটিয়ে দেবে। পারে ত তাই করুক। ওদের কাঁটার ঝাঁটারই জিৎ হোক্।

আচ্ছা, তাই সই, সবুজপত্রের যজ্ঞাবসানে পাঠকবিদায়-স্বরূপে আমার শেষ দেয় কিছু দেব—তার পরে গেট বন্ধ করে দিয়ো। ইতি ১৪ ফাল্গুন ১৩২৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৮৬] ওঁ পোস্টমার্ক, কলকাতা

১৭ অগস্ট, ১৯২১

কল্যাণীয়েষু

শান্তিনিকেতনে ফিরে এসে দেখি আশ্রমে দুর্ভিক্ষ। মাসে প্রায় হাজার টাকার নাজাই, আমার সম্বল ত জান,— ভিক্ষাও মেলে না। বক্তৃতা তোমাকেই পাঠাব ঠিক করেছিলুম— কিন্তু বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষেরা ধরে পড়লেন ছাপিয়ে বিক্রি করতে। দুই এক শো টাকা যা পাওয়া যায় তাই সই—কেননা সেখানে অদ্য ভক্ষ্যো ধনুর্গুণঃ— তাই প্যাম্ফলেট্ আকারে বেরিয়েচে— এর থেকে যদি তোমরা ছাপতে চাও ছাপিয়ো —কিন্তু এটা সাধারণ্যে প্রকাশিত হয়ে যাচ্চে— তবু অধিকন্তু ন দোষায়— তোমরা ছাপলে আমার আপত্তি নেই— তোমাদের যদি আপত্তি না থাকে। গত বছরে আশ্রমে একলক্ষ দশ হাজার টাকা ব্যয় হয়েচে— এবারে হয়ত তার বেশিই হবে— এমন দুই একটা ঢেউ লাগ্‌লেই নৌকো কাৎ হবে— সেইসঙ্গে আমিও। তাই অর্থচিন্তায় আছি। অর্থচিন্তায় শরীর মনকে শোষণ করে— করে'ও অর্থের সুযোগ ঘটায় না। আমার অবস্থা এই। তোমরা কেমন আছ? বিবির খবর কি?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয়েষু

প্রমথ, আমার মনটা অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে আছে— সেই জন্যেই কোনো রীতিমত লেখায় হাত দিতে পারিনি। রামমোহন রায় লিখ্‌তে বসেছিলুম কিন্তু শেষ করিনি। মনে বলে যে, "পৃথিবীর উপকার করা তোমার কাজ নয়। ঐ কাজে বিস্তর লোক লেগেচে, আর ভিড় বাড়ালে বসুন্ধরার ভার হরণের জন্যে খুব মজবুৎ গোছের অবতারের দরকার হবে।" অত্যন্ত গম্ভীর কর্ত্তব্যগুলো দেখলে আজকাল কেবল যে ক্লান্তি আসে তা নয়, হাসি পায়। মনে হয় ওর বারো আনাই মুখোস্ পরা ফাঁকি। আমি এখানে যে মস্ত একটা কাজ ফেঁদে বসেচি তার মহিমা আমাকে আর দাবিয়ে রাখ্‌তে পারচে না। আমার পক্ষে এগুলো হচ্চে সময় নষ্ট করবার উপায়— কারণ, আমার জীবনটার শীর্ষদেশে বিধাতার শিলমোহর করা ছুটির মঞ্জুরি হুকুম ছিল। সেইজন্যেই বরাবর ইস্কুল পালিয়েচি অথচ সাজা পাইনি। এই ছুটি নষ্ট করতে বসেচি বলেই আজকাল ভিতরে ভিতরে সাজা পাচ্চি। জরুরি চিঠি জরুরি প্রবন্ধ সমস্ত ঠেলে রেখে মাঝে মাঝে প্রায়ই গান লিখি। যখন লিখি তখন মনে হয় স্বরাজ ব্যাপারটা এমন কিছু গুরুতর জিনিষ নয়— মানুষের ইতিহাসে অনেক স্বরাজ বুদ্‌বুদের মত উঠেচে আর ফেটে গেছে— কিন্তু যে গানগুলোকে দেখ্‌তে বুদ্‌বুদের মত তা'রা

আলোর বুদ্বুদ নক্ষত্রের মতই। সৃষ্টিকর্ত্তার খেলনাগুলির সঙ্গে তাদের রঙের মিল আছে। সেইজন্যেই যখন তারা গড়ে উঠ্‌তে থাকে তখন কর্ত্তব্য ভুলে যাই। অথচ দেশের কর্ত্তাব্যক্তিদের কাছ থেকে হুকুম আস্‌চে যে, "সময় খারাপ অতএব বাঁশি রাখ, লাঠি ধর।" যদি তা করি তাহলে কর্ত্তারা খুসি হবেন, কিন্তু আমার এক বাঁশিওয়ালা মিতা আছেন কর্ত্তাদের অনেক উপরে, তিনি আমাকে একেবারে বরখাস্ত করে দেবেন। কর্ত্তারা বলেন, "তিনি আবার কে? একত আছে বন্দেমাতরং।" তাঁদের গড় করে আমাকে আজ বল্‌তে হচ্চে— "আমার বন্দেমাতরং ভুলিয়েচেন ঐ তিনি। আমি দেশছাড়া ঘরছাড়ার দলে। আমি ভূগোলের প্রতিমার পাণ্ডাদের যদি আজ মান্‌তে বসি তাহলে আমার জাত যাবে।" কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ভূগোলের প্রতিমার পাণ্ডারা শুধু পাণ্ডা নয় তারা গুণ্ডা— অতএব মার খেতে হবে। তাই সই। মার সুরু হয়েচে। "মরার বাড়া গাল নেই" আমাদের ভাষায় বলে, সে কথা মিথ্যে। মরাটা গাল নয় মরার ভয় করাটাই গাল। মরার ভয়ে চাঁদ সদাগর শিবকে ছেড়ে সাপের দেবতার কাছে হার মেনেছিল, সেইখানে তার গাল রয়ে গেল। আমি কিন্তু শিবকে ছাড়ব না। আমার শিব সকল জগতের— কিন্তু সাপের দেবতার জায়গা হচ্চে গর্ত্তর ভিতরে। সেই গর্ত্তর মুখে দুধকলা জোগাবার বায়না যাঁরা নিয়েচেন তাঁরা যে-ফলের লোভ করেন আমি সেই ফলকে বড় মনে করিনে। আমার মন ম্যাপের গর্ত্তর মধ্যে আর

কোনোদিন দেবতা খুঁজ্‌বে না। বুঝতে পেরেচি এই নিয়ে ঘরে পরে আমাকে ত্যাগ করবে। আমি ঠিক করেচি, যার যা মনের সাধ মিটিয়ে নিক্‌, আমি আর কথা কইব না।

তুমি হাবলুর সেই নোটগুলো নিয়ে ছাপতে দিতে চাও। কিন্তু আমার বক্তৃতার নোট নেওয়া শক্ত— আমি তড়বড় করে বলে যাই— তাছাড়া আমার ভাষা একটু বিশেষভাবে আমারই— যারা নোট নেয় তাদের পেন্সিলের ঠোকরে ওর চেহারা একেবারে বদ্‌লে যায়— বসন্তরোগের ঠোকর মারা মুখের চেয়েও বেশি। তা ছাড়া এসব বিচ্ছিন্ন বাক্যকে প্রবন্ধের রূপ দেবে কে? আমার ত আর প্রবৃত্তি হয় না। লিখ্‌তে বস্‌তে একটুও রুচি নেই। তার উপরে আবার তর্ক বিতর্কের ঘুরপাকের মধ্যেও ঢুকতে ঘোর অনিচ্ছা। তুমি যদি জোড়াতাড়া দিয়ে একটা কিছু খাড়া করে তুল্‌তে পার তাহলে চেষ্টা দেখো। রামমোহনরায়ের সম্বন্ধে এখানে ছেলেদের কিছু বলেছিলুম— তারও নোট আছে। কিন্তু সেই নোটের টুক্‌রো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে ভালা লাগেনা বলে তাতে হাত দিইনি।

...কিছুদিন শান্তিনিকেতনে ঘোরতর মিশনারিগিরি করে গেছে। নারী-মিশনারীরা কি পদার্থ তা ত জানই— তার পরে...আবার যে-সে নারী নয়। এখানকার মেয়েদের খুব ধিক্কার দিয়ে গেছে। আমাকে জানিয়েচে দেশে যখন আগুন লেগেছে তখন বর্ষামঙ্গলের গান করা অকর্ত্তব্য এবং যে

মেয়েরা সেদিন গানের সভায় সেজে এসেছিল তারা এই অগ্নিকাণ্ডে আহুতি দিয়েচে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে,…নিজে চরকা কাটে না— সে মনে করে তার পক্ষে ওটা জরুরি নয়। চরকা যদি নাও কাটে তাহলে অন্তত ওর উচিত প্রতিদিন চরকা কেটে যে আয় হয় তাতেই জীবিকানির্ব্বাহ করে' তার বেশি সমস্তই দেশকে দান করা। আমি আমার একটা কর্ত্তব্য স্থির করে বসেচি— অন্তত তার জন্যে আমি নিজের লোকসান করতে ছাড়িনি— শুধুই যদি বাক্যব্যয় করতুম তাহলে জীবনের হিসাবের খাতায় জমাখরচের কোন্ কোঠায় সেটা কি রকম অঙ্কপাত করত? যাঁরা বাংলা দেশের জমিদার তাঁরা যতক্ষণ সদর খাজনা জুগিয়ে নিজের জীবিকা ও আরামের সংস্থান করতে চান ততক্ষণ অন্যলোককে ত্যাগস্বীকার করতে বল্‌তেই পারেন না। আমি আমার এক চিঠিতে বড়দাদাকে এই কথাটা স্মরণ করিয়েছিলেম। বাংলাদেশে জমিদারদের চেয়ে গবর্মেণ্টের বড় কর্ম্মচারী আর কে আছে?

বিবিকে বোলো সার্কিসের হাঙ্গামায় আমি জড়িত হতে চাইনে। সে নিজে যা ভাল বোঝে তাই যেন করে। আমি ইংরেজি সঙ্গীত ভাল বুঝিও নে, বোঝবার চেষ্টা করার মত উদ্যম একটুও নেই— তার উপরে বিশ্বভারতীর দুঃসাধ্য সাধনায় অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হয়ে আছি। কলকাতায় যদি যাই মোকাবিলায় কথা হবে। ইতি ১৮ কার্ত্তিক ১৩২৮

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয়েষু

প্রমথ, বিশ্বভারতী ক্রমেই এর সঙ্কীর্ণ সীমা ছাড়িয়ে বিস্তীর্ণ হয়ে উঠ্‌চে। এইবার ৭ই পৌষের সাম্বৎসরিকে এ'কে সাধারণের হাতে দেব। তার Constitution তৈরি হচ্চে। আমি নামে মাত্র Founder Presidentরূপে মাথায় বসে থাকব। কিন্তু একজন সত্যকার কর্ম্মকর্ত্তা চাই— ইংরেজিতে যাকে বলে Vice-Chancellor। অনেক ভেবে দেখ্‌লুম। শেষকালে এই স্থির করচি তুমি যদি রাজি হও তবে তোমাকে এই পদে বসাই। আশা করচি অর্থসম্বল হবে— কিন্তু আপাতত এই পদের বেতনস্বরূপে কোনোমতে মাসিক ৩০০ তিনশত টাকা বন্দোবস্ত করা যেতে পারে। অবশ্য এখানেই থাক্‌তে হবে— প্রথম organise করবার যে মেহন্নত ও চিন্তা ও দায়িত্ব তার সমস্তটাই তোমার উপরে পড়্‌বে। চেষ্টা করব তোমাদের একটা বসতির সুবিধা করে দিতে। এই কথাটি বিশ্বাস কোরো যে এই institutionটার প্রসার সমস্ত সভ্যপৃথিবীতে— এর প্রতিষ্ঠা এর মধ্যেই হয়েচে, এখনো সকলে তা দেখ্‌তে পাচ্চে না— অতএব এর কর্ণধার হবার সম্মান কারো পক্ষেই অল্প নয়। সংক্ষেপে এইটুকু বল্‌লুম। যদি একবার আস্‌তে পার তাহলে আলোচনা করবার সুযোগ হবে— কিন্তু বেশি বিলম্ব করা চল্‌বে না।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

Clarté কাগজের নাম নিশ্চয় জানো। তারা ভারতবর্ষীয় লেখক পেতে চায়— এখানকার খবর এখানকার লোকের মুখে শোনবার ইচ্ছা। অধ্যাপক লেভির সঙ্গে এ সম্বন্ধে আলাপ করেছি। তিনি বলেন সুরেশ যদি লেখা পাঠান ত ভাল হয়। এই সুযোগটি ছাড়া উচিত হবে না। কেননা আমাদের কথা য়ুরোপের কানে পৌছন চাই। অথচ অত্যুক্তি থাকাটা ঠিক নয়। তুমি যদি সুরেশের সঙ্গে মিলে Clartéর জন্যে সংবাদ ও সমালোচনার জোগান দাও ত ভাল হয়। সুরেশকে বোলো Barbusseকে এই চিঠির যেন উত্তর দেন— আমি যে তাঁর চিঠি পেয়েছি এবং সুরেশকে লিখতে অনুরোধ করেচি সেটা যেন তাঁকে লেখা হয়। Levi সাহেব ১৭।১৮ মার্চ্চে কলকাতায় যাবেন সেই সময়ে তোমাদের সঙ্গে আলোচনা হতে পারবে। ইতি ২০ ফাল্গুন ১৩২৮

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তোমার হাল ঠিকানা ভুলে গেছি তাই তোমার ব্যবসায়িক ঠিকানায় পাঠালুম।

[১০] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

মার্চ, ১৯২২

কল্যাণীয়েষু

প্রমথ, যদি রেলের পথে বিশেষ বিঘ্ন না ঘটে তবে লেডি সাহেবের সঙ্গে বুধবার প্রাতে কলকাতায় গিয়ে পৌঁছব— একবার আমাদের সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা কোরো— বিবিকেও এনো— আমার যানবাহন নেই জান ত। আঠারই তারিখে নেপাল রওনা হব। ইতি রবিবার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১১] ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

বিশ্বভারতীর Constitution রেজেস্ট্রি হতে চলেচে। এর ট্রাস্টিদের মধ্যে তোমার নাম আছে জানিয়ে রাখচি। সম্মতি জানিয়ে একখানা চিঠি পাঠিয়ে দিয়ো। শীঘ্রই মুদ্রিত Constitution একখণ্ড তোমাকে পাঠাব।

মাঝে বৃষ্টি হয়ে গিয়েচে বটে কিন্তু আজ আবার আকাশ তেতে উঠেচে, নালিশ করে কোনো লাভ নেই তাই সহ্য করচি। পদ্মপত্র চন্দনপঙ্ক প্রভৃতি কোনো উপকরণ হাতের কাছে নেই— ইলেক্‌ট্রিক পাখা বরফের ত কথাই নেই। মিস্ ক্রামরিশ ত পলাতক— এ জায়গা তার সইবে কিনা সন্দেহ

হচ্চে— ওর বয়স একে অল্প তাতে জাতিতে রমণী, ওর ধাতটা বোধহয় সহুরে। এখানে Benoit নামে একজন Swiss ফরাসী এসেচেন তিনি বড় চমৎকার লোক। দেখা হলে খুসি হবে। ইতি ২৯ বৈশাখ ১৩২৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১২] ॐ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

আমার হাতে একটিও লেখা নেই। যে অসহ্য গরম, মাঠের ঘাস, গাছের পাতার মত মাথার ভিতরকার সমস্ত ভাব শুকিয়ে গেচে। লিখ্‌তে বসাই অসম্ভব। আমার জন্মদিনে নিজের খেয়ালে নিজেরই উদ্দেশে একটা কবিতা লিখেছিলুম। ভেবেছিলুম সেটাকে খাতার অন্তঃপুরেই রেখে দেব। কিন্তু তুমি লেখা দাবী করেচ বলে সেইটেই পাঠালুম। বিশেষ কিছুই নয়। ইতি ১ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ও পাতায়—

কল্যাণীয়েষু

প্রথম আষাঢ়ের বর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে শৈলশিখর থেকে নীচে নেমে এসেছ বোধ হয়। সবুজপত্র বের করতে চাচ্চ কিন্তু রস জুগিয়ে পত্রোদ্‌গমের সহায়তা করতে পারি আজকাল আমার মধ্যে শক্তির তেমন দাক্ষিণ্য নেই। মুস্কিল এই, তুমি স্বয়ং ছাড়া লেখবার লোক কেউ নেই। চারু বাঁড়ুয়ো সেদিন এসেছিলেন, তাঁর সঙ্গে কথা হচ্ছিল, তিনি বল্‌লেন আমরা বঙ্গসাহিত্যের বড়াই করি বটে কিন্তু ওস্তাদ লেখকের দারুণ দুর্ভিক্ষ। তিনি একমাত্র তোমার নাম করলেন; আরো একব্যক্তির উল্লেখ করেছিলেন পাপমুখে তার কথা বল্‌তে পারচিনে। এমন অবস্থায় কাগজ খুলে বসে লেখার হাট জমাতে চাও কোন্ সাহসে? মাঝে-মাঝে যখন-তখন তোমার একলার লেখাঙ্কিত উড়ো কাগজ এক এক পসলা বর্ষণ করে দিতে দোষ কি? তাতে ইচ্ছেমত বজ্রবিদ্যুত শিলবৃষ্টি জলবৃষ্টি যা খুসি তাই চালাতে পার। ইন্দ্রদেব এ কাজ করে থাকেন, তাঁর সরিকের মধ্যে আছেন বায়ু, আর কেউ না। আমি যতদূর জানি তোমার উপর বায়ুর আনুকূল্য ত আছেই। অতএব দেবতার মত একলার কাজ একলাই চালিয়ে দাও। Count Keyserling ভারতীয় বিবাহ সম্বন্ধে আমার কাছে একটা লেখা চেয়েছিলেন। ইংরেজিতে লিখ্‌তে দেরি হবে ভয় করে বাংলায় লিখেচি— পরে তর্জ্জমা করে তাকে পাঠাতে

হবে। সে লেখাটা মস্ত বড়। তোমার একমাসের সবুজ-পত্রপুট আগাগোড়া ভরে দিতে পারে। এরকম অত্যন্ত ভারিক্কি গোছের লেখা তোমার ঠিক চল্‌বে না—এ অনেকটা তোমাদের রাজসাহির সেই "পিপিসারে"র স্ত্রীর দেহসজ্জার মত— গা ভরাবার জন্যে "কিমিকাল্" চালাতে হয়েচে। দেখি, যদি এর মধ্যে ছোটখাটো কিছু লেখা কলমের মুখে এসে পড়ে তবে চালান করে দেব। ইতি ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৯৪] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

৬ জুলাই, ১৯২৫

কল্যাণীয়েষু

প্রমথ, চরকার উপর একটা আমার মন্তব্য লিখেছি। তোমাকে দিতে পারি কিন্তু সবুজপত্রের পুনরুদ্গম হবে কোন্ ঋতুতে কোন্ মাসে এখনো তার কোনো খবর পাইনি। যে-হেতু বিষয়টা সাময়িক এবং মহাত্মাজি অতি শীঘ্র আমার একটা অভিমত দাবী করচেন তোমার যদি বিলম্ব থাকে তাহলে অগত্যা আর কোথাও ছাপতে দিতে হবে। লেখাটা কিন্তু সবুজপত্রেরই সবর্ণ। এটার একটা ইংরেজি করাও চাই— যদি তুমি বাংলাটা গ্রহণ কর তাহলে ইংরেজীকরণের ভার বিবিকে নিতে হবে। নইলে সুরেন আছে। শীঘ্র জবাব দিয়ো।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১৫]　　　　　　　　ওঁ　　　　　পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

১৪ জুলাই, ১৯২৫

কল্যাণীয়েষু

লেখাটা হিন্দুস্থান ইন্‌সিয়ুরেন্স্‌ ঠিকানায় সুরেনকে রেজেস্ট্রিডাকে পাঠিয়েছি। ওর ইংরেজিটা আগামী Augustএ Modern Reviewতে ছাপানো চাই বলে সুরেনকে পাঠাতে হোলো। বিবি বলেছিল তাড়ার মুখে তর্জ্জমা করা তার দ্বারা হয়ে ওঠেনি। ও সম্বন্ধে সুরেনের অসামান্য ক্ষমতা। বাংলাটা তোমাদেরই প্রাপ্য। তর্জ্জমা হয়ে গেলেই ছাপতে দিতে পারবে। কলকাতায় যখন যাব তখন কোনো একটা ছোট গোছের সভায় ওটা পড়বার ইচ্ছে আছে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভাদ্রমাসের পূর্বেই আমি তো সমুদ্রে ভাসমান— কিন্তু লেখাটা ছাপতে তোমরা যেন বেশি দেরি কোরো না। তোমাদের সবুজপত্রের পঞ্জিকা প্রাচীন মতে চলে না বলে মনের মধ্যে উদ্বেগ আছে। আর একটি ভয় বানান ভুলের। প্রুফ দেখে যেতে পারবো না— যেটা ছাপা হয়ে বেরবে এমন সব পাপের বোঝা নিয়ে জন্মাবে যেটা আমার কৃত নয়, অথচ শাস্তিটা বিশুদ্ধ খৃষ্টানীমতে আমাকেই বহন করতে হবে। একটু দয়ামায়া করে দেখেশুনে দিয়ো।

[৯৬] ॐ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯২৫

কল্যাণীয়েষু

আগামী কাল সোমবারে রথী কলকাতায় যাচ্চে। তার হাতে শেষবর্ষণের সংশোধিত কপি দিচ্চি। তাকে টেলিফোন করে জিনিষটা হস্তগত কোরো। তোমরা দার্জ্জিলিং যাচ্চ, প্রুফের কি দশা হবে? কাপিটা বেশ পরিষ্কার করে লেখা হয়েচে— ঠিকমত মিলিয়ে গেলেই কোনো আশঙ্কার বিষয় থাকবে না। এক একবার ভাবচি Waltairএ গিয়ে কিছুদিন চুপ করে থাকব।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৯৭] ॐ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

১০ ডিসেম্বর, ১৯২৫

কল্যাণীয়েষু

প্রমথ, এইমাত্র দিলীপকে একখানি চিঠিতে আর্ট সম্বন্ধে দুচার কথা আলোচনা করে লিখেছি। যদি সে চিঠি সবুজ-পত্রে ছাপতে দিতে তার সম্মতি নিতে পারো তাহলে এই আলোচনাটির অনুবর্ত্তন করে তোমরাও কিছু বলতে পারবে। বড় কিছু লেখবার না পাচ্চি সময় না পাচ্চি শক্তি।

বৃহস্পতিবার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১৮] ঔঁ * Santiniketan
Bengal, India

কল্যাণীয়েষু

প্রমথ, আলিপুরে টেবিলের উপর তোমার সেই ফর্ম্মার ফাইল ছিল— মরিস আমার লেখা প্রভৃতি প্যাক করবার সময় তার যে কি গতি করলে তা বুঝতে পারলুম না। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তার নিদর্শন পেলুম না। আরেকটা কপি পাঠিয়ো। তোমাকে লিখব ভেবেছিলুম কিন্তু তুমি রাঁচিতে ছিলে বলে লেখা হয় নি।

হিন্দু মুসলমান সমস্যার কূল পাওয়া যায় না। লাঠালাঠির দ্বারা কোনো জিনিষের সমাধান হয় না। যে রীতিমত জ্ঞান-শিক্ষা দ্বারা ধর্ম্মান্ধতার আরোগ্য ঘটে তা ছাড়া উপায় নেই। য়ুরোপেও এককালে এই বিপদ ছিল, তারা কেবল শিক্ষা দ্বারা মনের বিকার ঘুচিয়ে তবে উদ্ধার পেয়েছে। আমাদের ৩৩ কোটিকে তেমন শিক্ষা কবে দেবে, কে দেবে? ইতি ৬ এপ্রেল ১৯২৬।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১৯] ঔঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

তোমার "রায়তের কথা" হস্তগত হয়েচে—শীঘ্র হস্তান্তরিত হবেনা। সম্প্রতি একটা দুর্য্যোগের মধ্যে আছি। একটা নাটক আমার সমস্ত মন এবং অবকাশ অধিকার করে বসেচে।

আগামী ২৫শে বৈশাখের মধ্যে লিখে শেষ করে অভিনয় করিয়ে চুকিয়ে দিতে হবে এই হচ্চে ফরমাস। তাগিদে পড়ে লিখ্‌তে স্থরু করেছিলেম কিন্তু এখন লেখার আভ্যন্তরিক তাগিদ তার বাহ্য তাগিদকে অতিক্রম করেছে। তার ফল হয়েছে সময়মতো নাওয়া খাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে, চিঠির আমদানি সমানই চল্‌চে কিন্তু রপ্তানি নেই— পৃথিবীর উন্নতি-সাধনের দিকে একেবারেই ঔদাসীন্য। এই ধাকাটা কেটে গিয়ে প্রকৃতিস্থ হবা মাত্র সব প্রথমে রায়তের কথা নিয়ে পড়ব তার পরে সমাজের অন্য সব মুল্‌তবি কর্ত্তব্যের দিকে মন দেওয়া যাবে। তোমরা কি এবার গিরিব্রজে যাবার সঙ্কল্প করচ? শুনচি কলকাতায় আজকাল রক্ত বর্ষণ ছাড়া আর সব রকম বৃষ্টি বন্ধ— উত্তাপ ক্রমেই বেড়ে চলেচে। আমাদের এখানে দেবতা বা মানুষের প্রকোপ বিশেষ অসহ্য হয়নি— গরম অন্তবারের চেয়ে অনেক কম। ইতি ১৪ বৈশাখ ১৩৩৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১০০] পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

সময় অল্প, ক্লান্তিও প্রবল। তবু "রায়তের কথা" সম্বন্ধে কয়েক পাতা লিখেচি। কাল রেজেস্ট্রি ডাকে পাঠাব। পূর্ব্বেই শুনেচ একটা নাটক লিখ্‌ছিলুম। দুর্ভাগ্যক্রমে······ সে খবর পায়। পেয়েই আমাকে একশো টাকার চেক্

ও আত্মীয়তা খেলাপের খোঁটা দিয়ে ঐ নাটকটা দাবী করে। লজ্জার সঙ্গে মান্‌তে হোলো যে অর্থের অভাব মেটাবার জন্যে নাটকটা সর্ব্বোচ্চ ডাকে অনাত্মীয় হাটে বেচবার চেষ্টায় আছি। ৪।৫ শো টাকা নগদ পাবার আশা আছে—পেলে নিজের ভোগে সে টাকার অপব্যয় হবে না। তহবিল শূন্য অথচ ভিক্ষা মেলে না বলেই আমাকে ব্যবসাদারী করতে হয়। চেক্‌টা ফেরৎ দিতে হয়েচে অথচ আত্মীয়তার সম্মান রাখবার জন্যে কথা দিয়েছিলেম অবিলম্বে একটা কোনো লেখা পাঠাব। ইতিমধ্যে "রায়তের কথা"র উপোদ্‌ঘাত লিখ্‌তে বসলুম— কথায় কথায় লেখা বেড়ে গেল, সময় গেল ফুরিয়ে। এখন আরো একটা কিছু লেখবার মতো শক্তিও নেই অবকাশও নেই। অতএব এই লেখাটা যদি ভারতী সম্পাদিকার হাতে উদারভাবে দিতে পারো তবে এবারকার মতো মাতুল-দায়িত্ব থেকে ছুটি পাই। তোমার বইয়ের ভূমিকারূপে তুমি তো এটাকে ব্যবহার করবেই তার উপরে ভারতীরও পেট ভরবে। এরকম দায়যুক্ত দান ভালো দান নয় জানি তবু নিরুপায় হয়ে একাজ করা গেল। তোমার টীকাসমেত তুমি এ লেখা সবুজ-পত্রেও ব্যবহার করলে হয় তো অপরপক্ষে অত্যন্ত আপত্তি না হতে পারে।

কয়েকদিন হল কলকাতা থেকে এখানে সাত আটশো মুসলমান গুণ্ডার সমাগম হয়েছিল। রক্তবৃষ্টির পূর্ব্বেই মেঘ গিয়েছে কেটে— সিউড়ি থেকে অবিলম্বে শস্ত্রধারী পুলিস

আসাতে চাপা পড়ে গেল। রক্তমোক্ষণের পরে কলকাতার বায়ুপ্রকোপের কিছু উপশম হয়েচে শুনচি। ইতি ১৮ বৈশাখ ১৩৩৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১০১]

* Hotel Bristol
Wien

পোস্টমার্ক, ২১ জুলাই, ১৯২৬

কল্যাণীয়েষু

প্রমথ, বৈশাখের পঞ্চাশবর্ষীয়সী ভারতী পড়ে অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করেছি।···তাই নিরতিশয় ক্লান্তি ও ব্যস্ততার মধ্যেও আমি যে লেখাটা লিখেছি সবুজপত্রের জন্যে পাঠাচ্চি। মনে জানি তোমরা আত্মীয়তার দায়িত্ব রক্ষার জন্যে হয়ত ছাপতে কুণ্ঠিত হবে। কিন্তু সে দায়িত্ব ত আমারো আছে— কিন্তু তার চেয়েও ন্যায়বিচারের দায়িত্ব বড়। আমার দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়েই তোমরা ছাপাচ্চ একথা জানিয়ে যদি এটা তোমাদের কাগজে স্থান দাও তাহলে খুসি হব। কিন্তু যদি নিতান্তই অনিচ্ছুক হও তাহলে এটা প্রবাসীতে নিশ্চয়ই পাঠিয়ে দিয়ো—···

দেশে দেশে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চি। য়ুরোপের লোকেরা আমাকে যে অত্যন্ত গভীরভাবে শ্রদ্ধা করে, কেবল শ্রদ্ধা নয় ভালোবাসে, এটা যতই আমি উপলব্ধি করি ততই আমি

বিস্মিত হই। ভালো বুঝতেই পারি নে। তোমরা যদি আমার সঙ্গে থাকতে তাহলে স্পষ্ট বুঝতে জিনিষটা কতই প্রবল এবং সর্ব্বজনপ্রসারিত। তাই আমার কেবলি মনে হয় যদি যথেষ্ট সময় দিতে পারি তাহলে পশ্চিম মহাদেশে হয়ত স্থায়ীভাবে কিছু কাজ করতে পারি। পূর্ব্বদিগন্তে জীবনের অধিকাংশই ত ঢেলে দিয়েছি, অতি অল্পই এখন বাকী আছে, সেটুকু যদি এখানে রেখে যেতে পারি তাহলে নষ্ট হবেনা।

চিকিৎসার প্রয়োজন আছে। এখন গরমে সেটা চল্‌বে না। ডাক্তার বল্‌চেন আগামী সমস্ত অক্টোবর মাসটা ভিয়েনায় কোনো শুশ্রূষাগারে থেকে দেহযন্ত্রটাকে সম্পূর্ণ রকম মেরামত করলে আরো কিছুদিন এটাকে নিয়ে কাজ চালাতে পারব— সম্প্রতি অত্যন্ত বেশি নড়নড়ে হয়ে পড়েচে— এর উপর দিয়ে আঘাত অপঘাত ত কম যায় নি— যন্ত্রটা খুব পাকা করে গড়া হয়েছিল বলেই এখনো সম্পূর্ণ অকর্ম্মণ্য হয় নি— ডাক্তাররা সকলেই দেহের রচনা কৌশলের বিশেষভাবে প্রশংসাই করেচেন।

বোধ হয় আগামী কাল পোলাণ্ডে, তার পর সুইজারল্যাণ্ড, তার পরে ফ্রান্স, তার পরে ইংলণ্ড নরোয়ে সুইডেন হয়ে জর্ম্মনীতে সেপ্টেম্বর মাস কাটিয়ে অক্টোবরে ভিয়েনাতে ডাক্তারের হাতে আত্মসমর্পণ করব। তোমরা বোধ হয় জানো ভিয়েনার মত বিচক্ষণ ডাক্তার আর কোথাও নেই।— আশা করি অনুকূল বর্ষণের আবির্ভাব বাংলাদেশে হয়েচে—

আমার মনের মধ্যে সেই বাংলাদেশের প্রান্তরপ্রান্তের ধারাপাতের কলধ্বনি মুখরিত হয়ে উঠ্‌চে। ২০ জুলাই ১৯২৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১০২] পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

কলকাতায় নানাজাতীয় উপদ্রবে ব্যতিব্যস্ত হয়ে আধমরা অবস্থায় পালিয়ে এসেছি। য়ুরোপের হাওয়ায় ও শুশ্রূষায় যে আরোগ্যটুকু লাভ করেছিলুম তা দুই এক দিনেই ফুঁকে নিঃশেষ করে দেবার গতিক দেখে আর ভরসা হোলো না। যেদিন সকালেই তোমাদের ওখানে যাবার সংকল্প ছিল সেইদিন প্রভাতে নিদ্রাহীন রাত্রের অবসানে নিজের আসন্ন দশম দশার আশঙ্কা করে দুপুরের গাড়িতেই চলে এলুম। এখানে এসে অনেকটা আরাম পাচ্চি— যদিও এখানেও লোকসমাগম থেকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি পাওয়া অসম্ভব।

তোমার অভিভাষণটি আমার বিশেষ ভালো লেগেছে সে কথা অমিয়র কাছ থেকেই খবর পেয়েছ। সবুজপত্রে গাছ সম্বন্ধে যে লেখা বের হচ্চে সেটা বড় উপাদেয় ঠেকচে। বিষয়টি এমন সরল সরস করে লেখা সহজ নয়। ওটা অবিলম্বে ছেলেদের জন্যে বই আকারে প্রকাশ করা উচিত,

যদিও ছেলেদের বাপদাদারাও যদি যথোচিত নম্র হয়ে ওটা পড়েন তাহলে বঞ্চিত হবেন না। সাধুমায়ের জীবনী বড়ো— বাংলায় কি বল্‌ব?— ইংরেজিতে যাকে বলে interesting (ঔৎসুক্যজনক?)। অতুলবাবুর প্রবন্ধগুলির কথা বলা বাহুল্য— ও হোলো পাকা মাথার চিন্তা পাকা হাতে লেখা,— বাংলায় মাথা ও হাতের এরকম ভাল রক্ষে করে চলার দৃষ্টান্ত বিরল। আমার প্রগল্‌ভতা আজকাল লেখা ছেড়ে বকায় এসে ঠেকেছে— ওটা বোধহয় বয়সের ধর্ম্ম। মনের মধ্যে যা কিছু ফসল ফলে সে আর ভাণ্ডারে ওঠে না— পথিকরা যদি সংগ্রহ করে নিল ত ভালো, নইলে ঝরে পড়ে মাটি হয়। তা হোক কিছু একটা লেখবার চেষ্টা করব। তোমার পক্ষে মস্ত একজন মোক্তার আছে অমিয়। তোমরা অবসরমত এখানে কিছুকাল যাপন করে গেলে খুবই খুসি হব সেকথা নিশ্চয় জেনো। ইতি ২৮ পৌষ ১৩৩৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১০৩]

* Santiniketan
Bengal, India

কল্যাণীয়েষু

সবুজপত্রের জন্যে একটা কবিতা পাঠাই। "বিচিত্রা" নাম দিয়ে একটি কাগজ বের করবার উদ্যোগ চল্‌চে— যাঁরা উদ্যোগী তাঁরা উৎসাহী ও ধনী। তাঁদের দলে তোমার ও

আমার পরিচিত কেউ কেউ আছেন। আমি তাঁদের ফাঁদে কতকটা ধরা দিয়েছি, অভাবের দায়ে, লোভের তাড়নায়। আমার দৈন্য যে কত কঠিন হয়ে উঠেচে সে তোমরা অনুমান করতে পারবেনা— সেই কারণে নিষ্কামভাবে লেখা আমার পক্ষে এখন অসম্ভব। নিজের কলমের জোরে ছাড়া, সাধুতা রক্ষা করে অর্থোপার্জ্জনের আর কোনো উপায় জানি নে। অথচ রচনার রাস্তায় তোমাদের সঙ্গে যোগ বিচ্ছিন্ন করতে ভালো লাগে না— কেননা তোমাদের সঙ্গে আমার সাহিত্যিক আত্মীয়তা আছে। ইদানীং এই বাহ্য বিচ্ছেদ নিয়ে আমার মন অনেক সময় পীড়িত হয়েচে— কিন্তু লক্ষ্মীর প্রকোপে পড়ে বাণীর প্রসাদপদ্ম নিয়েও ব্যবসা ফাঁদতে হ'ল এই শেষ বয়সে। যাই হোক তুমি যদি সবুজপত্রের নাম ফিরিয়ে দিয়ে "বিচিত্রা"য় তোমার আসন নিতে পারো তাহলে তোমারও ক্ষতি নেই আমারও আনন্দ আছে। ধনীর অর্থের সঙ্গে গুণীর সামর্থ্য মিল্‌লে পরে জিনিষটা সকল দিকে দামী হয়ে উঠ্‌বে বলে বিশ্বাস করি। ইতি ১২ চৈত্র ১৩৩৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয়েষু

কতবার মনে মনে ইচ্ছে করেচি তোমরা এখানে বসবাস করো। কিন্তু সেটাকে মনের অনেক অসম্ভব আশার কোঠায় বন্ধ করেই রাখা হয়েচে। সম্ভব হতে পারবে শুনে খুব খুসি হয়েচি। একান্ত আশা করি এখানে তোমাদের শরীর ভালোই থাকবে— লোকসঙ্গ ও বাক্‌প্রসঙ্গ দুই যথেষ্ট পাবে— পড়বার বইয়েরও অভাব হবেনা। তুমি সাক্ষাৎ-ভাবে এখানে কোনো বিশেষ কাজ করতে পারো বা না পারো এখানকার atmosphere জমিয়ে তুল্‌তে পারবে— সেটার দাম সব চেয়ে বেশি, কেননা সেটাকে হাটে কিন্‌তে পাওয়া যায় না। উত্তরায়ণে যে বাড়িটাকে কোণার্ক বলি সেটাতে তোমাদের অসুবিধে হবেনা— তার ঠিক পাশেই আছে অমিয়দম্পতি— নিষ্করুণ হয়ে তোমরা তাদের মিলন-পালায় রসভঙ্গ করবেনা একথা ধরে নিতে পারি। রথীরা কলকাতায়— তাদের সঙ্গে এ সম্বন্ধে কথা কয়ে দেখতে পারো, তারা খুসি হবে। সম্প্রতি শীতাগমের পর থেকে এখানে আন্তর্জাতিক সম্মিলনটা খুবই চল্‌চে— এই বাহিরের নিরন্তর সংঘাতে এখানকার ভিতরের কাজগুলোর ব্যাঘাত ঘটচে। কিন্তু এই সমাগমটা আমাদের কাজেরই অঙ্গ— তাই নালিশ করা চলেনা। ইতি ৭ ফাল্গুন ১৩৩৪

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১০৫] ॐ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

২০ জুলাই, ১৯২৯

কল্যাণীয়েষু

প্রমথ, তোমরা যদি এক আধ দিনের জন্যে এখানে এসে দেখে যাও তোমাদের ঘর দুয়ারের কি রকমের প্রয়োজন তাহলে আমরা সারিয়ে বাড়িয়ে তোমাদের ভালোরকম বাসযোগ্য ব্যবস্থা করে দিতে পারি। এই বেলা মিস্ত্রি লাগিয়ে দিলে যথাসময়ে প্রস্তুত হতে পারবে। এখন এখানে মিস্ত্রি খাটচে, ব্যবস্থা করা সহজ— বিবিকে সঙ্গে এনো, তারো মত জানা দরকার হবে।

রীতিমত বর্ষা। ৩ শ্রাবণ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১০৬] পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

১১ ডিসেম্বর, ১৯২৯

কল্যাণীয়েষু

এই কদিন আমার মনে একটা ধারণা ছিল যে তোমার চিঠির উত্তর দেওয়া হয়ে গেছে। আজ হঠাৎ মনে সন্দেহ হল যে সেটা সংকল্পিত হয়েছিল রচিত হয়নি। নানাপ্রকার চিত্তবিক্ষেপে এই রকমের প্রমাদ ঘটে। তোমরা নিশ্চয়ই এসো খৃষ্টজন্মসপ্তাহে। আশা করেছিলুম আগামী বৎসর থেকে এইখানেই বাসা বাঁধবে, এখন সংশয় লাগচে। আমি

আগামী রবিবারে দুইএকদিনের জন্যে কলকাতায় যাব তখন মোকাবিলায় আলোচনা হবে। ইতি ২১ অগ্রহায়ণ ১৩৩৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১০৭] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

আমাদের শীঘ্র য়ুরোপে যাবার কথা আছে। যদি ঘটে ওঠে তবে কলকাতায় তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে।

বাংলা অধ্যাপনার জন্যে লোকের বিশেষ দরকার হয়েচে। একবার সতীশ ঘটক এখানে আসতে রাজি ছিলেন। তাঁকে পেলে খুবই খুসি হই। একবার চেষ্টা করে দেখবে কি? বিবিকে একটা ফরাসী কাগজ থেকে আমার সম্বন্ধীয় একটা আলোচনা তর্জ্জমা করতে পাঠিয়েছি— সেটা সে পেয়েচে কি? তোমার সেই গল্পগুলোর কী হল? আজকাল তোমার নতুন লেখার স্রোত বন্ধ আছে বুঝি? আমিও কাজের ঝঞ্ঝাটে পড়ে' কলম বন্ধ করে আছি। ইতি ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৩০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১০৮]

কল্যাণীয়েষু

প্রমথ, কোথায় তোমার কোন্ লেখা বিক্ষিপ্ত হয়ে দেখা দেয় আজকাল আমার চোখে পড়ে না। কাগজ পড়া ছেড়েও দিয়েচি। এককালে যে বালকবয়সে লোকালয়ের জঞ্জাল ও জঙ্গলের বাইরে ছিলেম আজ আবার সেই ফাঁকায় আশ্রয় নেবার জন্যে মন উৎসুক হয়ে উঠেচে। সব দায়িত্ব কাটিয়ে সব তর্ক বিতর্ক এড়িয়ে দিয়ে জীবনের অন্ত্যলীলাকে আদ্য-লীলার সঙ্গে মিলিয়ে দেবার জন্যে একটা প্রবল ইচ্ছে জেগে উঠেচে মনে। ছেলেবেলায় বিশুদ্ধ খেলা নিয়ে কাটত এখন বিশুদ্ধ খেয়াল নিয়ে থাকতে ভালো লাগে। অর্থাৎ ইস্কুল-পালানো নিয়ে জীবনযাত্রা সুরু করেচি। সেই ইস্কুল-পালানো নিয়েই এটাকে সাঙ্গ ক'রে দৌড় মারবার মৎলব।

গরম পড়েচে বৈ কি। কিন্তু এই তপ্ত হাওয়ায় যেমন মাঝে মাঝে খড়কুটো শুক্‌নো পাতার ঘূর্ণিনাচ চলচে আমারও মনের অনাবশ্যক অকিঞ্চিৎকর উড়ো ভাবনাগুলো চিদাকাশে ধূসর ওড়না উড়িয়ে ঘুরপাক খেয়ে খেয়ে বেড়াচ্চে। ইতি ৩ বৈশাখ ১৩৩৮

শ্রীরবীন্দ্রনাথ

ওঁ

পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

তোমার দুখানি বই পেয়েছি, নিশ্চয় কাজে লাগ্‌বে। ব্র্যাডলির বই পূর্ব্বেই পড়েছিলুম, সেটা মনে নেই। আর একবার দেখে নিতে হবে। মূলতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা দিয়েই লেকচারগুলো ভর্ত্তি করে দিতে হবে। আপাতত কমলা লেকচার নিয়ে পড়েচি। বিষয়টা মানবের ধর্ম্ম। সহজ করে সরস করে গৌড়ীয় ভাষায় লেখা দুঃসাধ্য কাজ। কেননা ভাষার অস্পষ্টতাবশত হঠাৎ লোকের মনে হতে পারে এ সমস্তই জানা কথা। নতুন জিনিষকে নতুন বলে উপলব্ধি করানো বাংলা ভাষায় সহজ নয়। লোকে আধখানা মন নিয়ে শোনে এবং হুঁ। হুঁ। করে যায়। তা ছাড়া আজকাল কলমটাও কৃপণ হয়ে পড়েচে, সবকথাটা পুরোপুরি বলতে জানেনা। অর্থাৎ এমন একটি সেবক পেয়েছি যে আমার অতিথিদের পাতে হাতা ভরে দিতে জানেনা। মেঘ কেটে গিয়ে নির্ম্মল আকাশে হেমন্তের আসর জমেচে। ইতি
২৯ কার্ত্তিক ১৩৩৯

রবীন্দ্রনাথ

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

বিবির চিঠির উত্তর আমি পত্রপাঠ দিয়েছি। তখন ছিলুম দার্জ্জিলিং। হয়তো ডাকঘরে পৌঁছবার পূর্ব্বেই সেটার দুর্গতি ঘটে থাকবে।

তোমার বইগুলো আমার বিশেষ কাজে লাগবে। অনেকদিন থেকে বিলিতি আধুনিক সাহিত্যের সঙ্গে সংস্রব নেই। অথচ এখন বাংলা সাহিত্যে সকলেই সেই পাড়ায় গুরুকরণ করে বসেচে। তারা যখন সব মডারন মন্ত্র আওড়াতে থাকে বোকার মতো বসে থাকি। এই দুর্য্যোগে বইগুলি যদি পাই তবে মান বাঁচাবার উপায় ঘটে। আমরা আছি মিড্ভিক্টোরীয় যুগের মাঝদরিয়ার বালুচরে— খেয়ার সুবিধে পেলে পার হয়ে আসি এপারে। কাল্চার সম্বন্ধে আমার তো এই অবস্থা। তোমার বইগুলি দখল নেবার উপায় শীঘ্রই করব।

আর্থিক অবস্থার কথা বলবার প্রয়োজন নেই— অনুমান করতেই পারবে।

দার্জ্জিলিং থাকতে নিরবচ্ছিন্ন অস্বাস্থ্য ভোগ করেছি। সেই দুঃখের কথাই চিঠিতে বিবিকে লিখেছিলুম। পায় নি ভালোই হয়েচে। কেননা এসব খবরের নিত্যতা নেই। উদ্বেগটা নিতান্তই বিড়ম্বনা।

সম্প্রতি ভালো আছি। অর্থাৎ জরার অবসাদ আছে, তার বেশি উপদ্রব নেই।

তোমার শরীর মনের যে রকম বিবরণ পাচ্ছি তাতে তোমাকে এখানে আমন্ত্রণ করে কোনো ফল পাবার আশা নেই। আমিই হয় তো কোনো কর্ম্মফল বশত রাজধানীতে উপস্থিত হতে পারি— কিন্তু তার নিশ্চয়তা নেই, ইচ্ছাও নেই।

আমার জন্মদিন উপলক্ষ্যে যে আশীর্ব্বাদ বিবিকে চিঠিতে দিয়েছিলুম সেইটে আর একবার তার কাছে রওনা করে দিলুম, আশা করি ডাকঘরের ভিতরে কি বাইরে কোনো বিঘ্ন ঘটবেনা। ইতি ৫ই শ্রাবণ শুক্রবার ১৩৪০

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১১১] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

প্রমথ, যোগেশের ছেলের মৃত্যুর খবরে মনটা খারাপ হয়ে গেল। কিছুকাল থেকে আমি আছি মৃত্যুর ছায়ায় ডুবে। নীতুর বই তার কাপড় তার জিনিষপত্র এসে পৌঁচেছে। যে নিজে যায় চলে সে যা কিছু ফেলে রেখে যায় তাতে তার বিচ্ছেদকে আরো দুঃসহ করে তোলে— সংসারের সমস্ত আয়োজনকে কী ফাঁকি বলেই মনে হয়। ওর একটি ডায়ারি পেয়েছি, অতি অল্প কিছুই লিখেছে, সেটুকু লেখার মধ্যে এমন একটি পরিচয় আছে তাতে ও যে নেই সেটাকে একটা নিষ্ঠুর

অন্যায় বলে মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। যে মৃত্যুর সমস্ত ব্যর্থতা নিজের ঘরেই দেখচি বুঝতে পারচিনে জীবলীলার চরম অভি-প্রায়— সেই মৃত্যুই তোমাদের ঘরে এসেচে। অনুভব করচি যে প্রাণ গেছে— ছোটোবড়ো তার কতগুলো শিকড় সংসারের অন্তরে অন্তরে আঁকড়ে রয়েছে, তারা ছিল বিচিত্র আনন্দের সম্বন্ধসূত্র আজ তারাই অসহ্য বেদনার জাল বিস্তার করেছে চারদিকে— সান্ত্বনা দেবার কোনো কথাই নেই, স্তম্ভিত হয়ে নির্ব্বাক হয়ে থাকতে হয়। মৃত্যু আপন বেদনা মারবার জন্যে বৈরাগ্য আনে— একমাত্র সেই বৈরাগ্যই— যে গেছে এবং যে সংসারটা পড়ে আছে তাদের মধ্যে নীরব গম্ভীর বাণী বহন করতে থাকে। ইতি ১২ অগস্ট ১৯৩০

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১১২] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

প্রমথ তোমার বইগুলি নাড়াচাড়া করতে করতে মন চঞ্চল হয়ে উঠল। অনেকদিন ছিলুম নানা কাজে নানা অকাজে আপাদমস্তক জড়িয়ে, আধুনিক কালের বাণীলোকে প্রবেশের ছুটি পাইনি। লোভ হোলো অত্যন্ত। কাজকর্ম্ম সব ফেলে দিয়ে আর একবার সাহিত্যের ভোজে রাজবৎ আনন্দে বসে পড়্‌তে ইচ্ছে করছে— সমস্ত কর্ত্তব্যকে হাঁকিয়ে দরজার বার করে দিয়ে। এইজন্যে বইগুলি আমার ঘরেই রাখলুম। দুই

কারণে— প্রথম আমাদের uncharted লাইব্রেরি কলকাতার চেয়ে আমার পক্ষে দুর্গম। তোমার পূর্ব্বদত্ত বইগুলি আজ পর্য্যন্ত জেনেনায়— নাম পর্য্যন্ত জানবার সুযোগ হয়নি। এদের জন্যে সেই অজ্ঞাতবাসের ব্যবস্থা করবনা। দ্বিতীয়ত এই বইগুলি তোমার অনেকদিনের সুখদুঃখের সঙ্গিনী (পুস্তক-সম্বন্ধে হিন্দুস্থানী ব্যাকরণকে পছন্দ করি) যদি কখনো কোনোদিন কোনোটি তোমার স্মৃতিপটে উদিত হয় তাকে নির্ব্বাসন থেকে উদ্ধার করে তোমার হাতে দিতে দুঃখ পেতে হবে না। তোমার সঙ্গে এদের সম্বন্ধ পূর্ব্ববৎই রইল।

আমি নানা খুচরো উৎপাতে আছি— সরস্বতীর ক্ষুদে চরগুলি আমাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুল্‌লে।

হয় তো অনতিকাল পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের নোকরি উপলক্ষ্যে কলকাতায় যেতে হবে তখন দেখা হতে পারবে। ইতি ১ ভাদ্র ১৩৪০

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১১৩] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন
২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩

কল্যাণীয়েষু

প্রমথ, নাচ সম্বন্ধে তোমার লেখাটি পড়ে খুসি হলুম। উদয়শঙ্করের নাচের প্রধান গুণ হচ্চে এ নাচে তার আত্মশক্তি ও তার শিক্ষা দুইই মিলেছে। আঙ্গিক দিকে উৎকর্ষপ্রাপ্ত এ জিনিষটা— ভাবিক দিকে ক্ষুণ্ণ। ওর য়ুরোপীয় নৃত্যসঙ্গিনী

সিমকি বাইজিদের যে ভাওবাৎলানোর নকল করেছে— সেই ভাওবাৎলানোতে ভাবের গভীরতা নেই— তাতে নারী অঙ্গে কামনার লহরীলীলা প্রকাশ পায়। কামনা উদ্রেকের দ্বারা মন ভোলানো আর্টের ইতর পন্থা। জাভাতে জাপানে এর লেশমাত্র আভাস পাইনি— এ ইন্দ্রিয়পরায়ণ ভোগলোলুপ চিত্তবিকার থেকে সম্ভূত। যে কল্পনাবৃত্তির উৎকর্ষ থেকে সৌন্দর্য্যসৃষ্টি হয় উদয়শঙ্করের নাচে এখনো তার অপেক্ষা আছে। প্রোগ্রামের আরম্ভেই সেদিন নৃত্যকলাকে বিশ্লেষণ করে ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ চালনার বাহাদুরী দেখিয়েছিল, কোনো যথার্থ আর্টিস্ট্ এ কাজ করতে লজ্জা পেত— উপাদানকে উপকরণকে রূপসৃষ্টি যদি না ভোলে তবে তা সৃষ্টিই হয় না। উদয়শঙ্কর এখনো তা ভোলে নি, তার কারণ নদীপথের নুড়ি-গুলোর উপরে কল্পনানির্ঝরিণীর ধারা পূরো আনন্দে বইতে পারেনি।

ছন্দ সম্বন্ধে আমি যে বক্তৃতা পাঠ করেছি স্থানে স্থানে তার সঙ্গে তোমার এই লেখার অনেক মিল আছে।

সেদিনকার ডাকাতি ব্যাপারটা অদ্ভুত। সে যেন ডাকাতির ভাও-বাৎলানো— তার বেশি কিছুই না, কেবল ভয়ানক রসের ভাবভঙ্গী— ঝোড়ো রাত্রিটা ছিল এর উপযুক্ত পটভূমিকা— কারো লোকসান করেনি, কেবল আলোচনার রস জমিয়ে গেছে।

ব্যস্ত আছি অন্ধ্র য়ুনিভর্সিটির বক্তৃতায়। ইতি

রবীন্দ্রনাথ

[১১৪] ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

কাল সন্ধের সময় হঠাৎ কুমুদের খবর শুনে মনটা অত্যন্ত ধাক্কা পেয়েছে। এ রকম অপঘাতের অকস্মাৎ সংবাদে মৃত্যুশোকের বেদনা দ্বিগুণ তীব্র হয়ে ওঠে। মৃত্যুকেই আমরা সকলের চেয়ে ভুলে থাকি, অথচ মৃত্যু যখন ঘরের মধ্যে দেখা দেয় তখন বুঝতে পারি আমরা কী অসহায়— একেবারে চরম আঘাত, কোথাও কোনো আপিল নেই। বুঝতে পারচি তোমাদের ওখানে শোকের আবর্ত্ত কী রকম প্রচণ্ড বেগে আলোড়িত হয়ে উঠেচে— কিন্তু কারো কিছুই করবার ক্ষমতা নেই— যে কাল হরণ করে নিয়ে গেছে একমাত্র সেই কালেরই পরে নির্ভর করতে হবে, শোক আর সান্ত্বনা এক হাতেই। ইতি ৪ এপ্রেল ১৯৩৪

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১১৫] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

প্রমথ,… পর্শু শনিবারে দিন তিনেকের মতো যাচ্চি কলকাতায়, অর্থাৎ বরানগরে— জোড়াসাঁকো আমার পক্ষে দুর্গম। রবিবারে একটা গল্প পড়ে শোনাব, অপরাহ্নে কোনো এক সময়ে— সময়টার নিশ্চিত তথ্য বোধ করি পাবে প্রশান্তের

প্রমুখাৎ—যদি আসতে পারো খুসি হবো— কিন্তু বিবি যেন চুল বাঁধতে অযথা দেরি না করে, কারণ কিনা পাঠের মাঝখানে এসে আসন সন্ধান ও সহাস্যমুখে গৃহকর্ত্রীকে কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা গল্পটাকে আহত করে দেয়। আমার প্যালেস্‌টাইন যাত্রার একটা জনশ্রুতি উঠেছে— এখনো সেটা কল্পনার সুদূরপ্রান্তে আছে সঙ্কল্পরূপেও দানা বাঁধেনি। সিংহলযাত্রাটা অনেকপরিমাণে সার্থক হয়েছে—শুধু অর্থের দিকে নয়— সেখানকার লোকের মন পাওয়া গেছে সন্দেহ নেই।

সোমবারে য়ুনিভর্সিটিতে সাহিত্যের তাৎপর্য্য নামক একটা প্রবন্ধ পাঠ করব প্রস্তাব পাঠিয়েছি— এটা অন্নঋণ শোধ করবার উদ্দেশে— শুনেছি না করলেও কারো লোকসান হয় না। ইতি ১২ জুলাই ১৯৩৪

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১১৬] ঙ * "Uttarayan"
Santiniketan, Birbhum

কল্যাণীয়েষু

তোমার গল্পগুলি আর একবার পড়লুম। ইতিপূর্ব্বেও পড়েচি। ঠিক যেন তোমার সনেটেরই মত— পালিশকরা, ঝক্‌ঝকে, তীক্ষ্ণ। উজ্জ্বলতার বাতায়ন মগজের তিনতলা মহলে মধ্যাহ্নের আলো সেখানে অনাবৃত। রসাক্ত সুমিষ্টতা

দোতলায়, সেখানে রসনার লোলুপতা। তোমার লেখনী সে পাড়া মাড়াতে চায় না।

বেকার অবস্থায় তুমি উত্যক্ত হয়ে উঠেচ— আমার কর্ম্মের বিরাম নেই— মন ছুটির দরবার করে। বানপ্রস্থ্যের ডাক আসে কিন্তু রাস্তা বন্ধ। সামনের দিকে তাকিয়ে দেখি দিগন্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত কাজের প্রোগ্রাম। ইতি ২৫ অগস্ট ১৯৩৪

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১১৭] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

প্রমথ আমার নববর্ষের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করো। তোমরা দীর্ঘকাল কলকাতার আবেষ্টনে আবদ্ধ হয়ে আছ এইজন্যেই বদ্ধ হাওয়ার বিষে তোমাদের মন অবসাদগ্রস্ত হয়ে আছে। সমস্ত পৃথিবী এখন অর্থাভাবের গ্রহণ লাগা— তার ছায়া এখানেও আছে— কিন্তু একটা সুবিধে এই যে, যে হেতু এ জায়গাটা উদ্ধত সহর নয় সেইজন্যে দারিদ্র্যটা অত্যন্ত বেমানান হয়ে মানুষকে প্রতিদিন অবমানিত করে না। অভাবটাকে এখানে স্বভাবের মতোই করে নেওয়া চলে।

বিবিকে বোলো সঙ্গীতের যা সে সংগ্রহ করতে পেরেছে সেগুলো তার কাছ থেকে আনবার জন্যে বাহনের ব্যবস্থা সুবিধে পেলেই করে দেব। যে সব বই দুর্লভ, সেগুলোকে যেখানে সেখানে বিতরণ করায় প্রত্যবায় আছে। এখানে

দানগুলো সকলের জন্যে রক্ষিত হবার উপায় আছে। শুধু তাই নয় ওগুলো আমরা নূতন সংস্করণ করে ছাপিয়ে নিতেও পারি। পৃথিবীতে যারা নষ্ট করবার জন্যে নেয়, তারাই পায়োনিয়র, যারা রক্ষা করবার জন্যে নেয় তারা পরে আসে, তখন অল্পই বাকি থাকে।

তোমাদের কাছে আর একটা দরবার আছে, এখানে যন্ত্র-শিখিয়ে লোকের অভাব ঘটেছে। পাওয়া সম্ভব কি? সেতার এসরাজ বাজাতে পারলেই চলবে। খুব পয়লা নম্বরের দামী চীজ, আমাদের মতো বামনের পক্ষে প্রাংশুলভ্য ফল। যে লোকটি রুগ্ন হয়ে চলে গেল সে পেত পঞ্চাশের কাছাকাছি। তোমাদের সংঘ বা সাম্মলনের বাজারে সন্ধান নিলে কি জুটতে পারে? ইতি ৩ বৈশাখ ১৩৪২

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১১৮] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

আজকাল যেন আলো কমে এসেছে তাই পড়াশোনা একেবারে ছেড়ে দিয়েছি, হঠাৎ বিচিত্রায় তোমার নাম দেখে তোমার লেখা গল্পটি পড়লেম। পড়ে তোমাকে চিঠি লিখ্‌তে যাচ্ছিলুম। এ লেখায় তোমার সবুজ পত্রী যুগের উজ্জ্বলতা দেখে খুব খুসি হয়েছি। আজকাল যে সব লেখা বেরোয় তার মাঝখানে এই আকস্মিক আগন্তুকটির চেহারা দেখে চমক

লাগে, এর জাতই আলাদা। অনেকদিন চুপচাপ ছিলে, ভয় হয়েছিল তোমার আলো-ওয়ালা কলমের দীপ্তি পাছে কমে গিয়ে থাকে, দেখচি তার আশঙ্কা নেই। তোমার চেয়ে বয়সে আমি এগিয়ে গেছি— শরীরে মনে আমার অপরাহ্ণ সায়াহ্নে এসে পড়েছে— হয়তো চিত্তযন্ত্রের এঞ্জিনটা এখনো বিগড়োয় নি কিন্তু চাকাটা হয়ে পড়েছে ঢিলে, চালাতে চাইলে তেলের অভাবে আর্ত্তনাদ করতে থাকে। বাহিরমুখো গতি-বেগটাকে ভিতরবাগে প্রতিসংহার করবার চেষ্টায় আছি। কিছু না করাটা নিশ্চেষ্টতা বলে বোধ হয় না— তার মধ্যে এক রকম অচঞ্চল ক্রিয়াশীলতা সমাহিত আছে সেটা ভালোই লাগ্‌চে— নানা তুচ্ছ উপলক্ষ্যে পাঁচ জনে মিলে সেটাকে নাড়া দিতে এলে পরিণতপ্রায় ফলের উপর শিলবৃষ্টির মতো অত্যন্ত কড়া ঠেকে। ইতি ১৩ ভাদ্র ১৩৪২

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১১৯] ওঁ

কল্যাণীয়েষু

বিচিত্রা আনিয়ে নিয়ে তোমার "নিয়তিবাদের প্রতিবাদ" পড়লুম। খুব ভালোই লাগল। এর মধ্যে তোমার রচনার স্বাদ সম্পূর্ণ মাত্রায় আছে। পরিচয় সম্পাদক কী বিচার করে এ লেখা অগ্রাহ্য করেচেন আমি বুঝতেই পারলুম না। যে শুনচে সেই বিস্মিত হচ্চে। ইতি ২৪ ভাদ্র ১৩৪২

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১২০] ওঁ * "Uttarayan"

Santiniketan, Bengal.

কল্যাণীয়েষু

সাময়িক নানাপ্রসঙ্গে ভরা তোমার ঘরে বাইরে বইখানি পেয়েছি। লিপিনৈপুণ্য আছে কিন্তু বিষয়বস্তুগুলি চলতি মুহূর্ত্তের বিলীয়মান কালি দিয়ে লেখা। ইচ্ছা করচি নদীপথে বেরিয়ে পড়তে, কিন্তু বদ্ধ হয়ে আছি কর্ম্মজালে। নিষ্কৃতির আশায় আছি— পদ্মার ডাক আমার রক্তে এসে পৌঁচেছে। সুহৃৎ এবার এখানে এসে ভালো ছিল না— কলিকে ধরেছিল। আমার ওষুধে সেরেচে বলে আমার বিশ্বাস, তার বিশ্বাস বোধ হয় অন্যরকম। ইতি ৩০।১২।৩৬

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১২১] ওঁ * Sriniketan

পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

১৪ জুলাই ১৯৩৭

কল্যাণীয়েষু

পত্রে লিখেছিলে একখানি বই পাঠিয়েছ কিম্বা পাঠাবে— সে সম্বন্ধে আমার কাছ থেকে আমার অভিমত পেতে ইচ্ছা করো। আমি রাজি আছি যদি বইখানি পাই। তিন রাত্রি কেটে গেছে বইয়ের কোনো লক্ষণ কোনো দিগন্তে দেখচি নে। না পড়েও আমি একরকম নিশ্চয় বলতে পারি বইখানি ভালই

হয়েছে— কথাটা মিথ্যে হবেনা— কিন্তু সেটা হয়তো তোমার সন্তোষজনক না হতে পারে। তোমার বিজ্ঞপ্তির জন্যে লিখলুম। অলমতি বিস্তরেণ

রবীন্দ্রনাথ

[১২২] ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

পেয়েছি ভারতবর্ষ। সাবাস্। খুব ভালো হয়েছে। অর্থাৎ তোমার শিলমোহরের ছাপ পড়েছে অতএব এর দাম কম নয়। এ ধরণের লেখা আর কারো কলমে ফুটতে পারে না। সাহিত্যে যারা জালিয়াতি করে দিন চালায় তারা হতাশ হবে। ইতি ৩ শ্রাবণ ১৩৪৪।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১২৩] ওঁ * "Uttarayan"
Santiniketan, Bengal.

কল্যাণীয়েষু

ঘরে বাইরে সব জায়গাতেই গোলমাল চলচে— চীন জাপানের যুদ্ধই যথেষ্ট নয়, তোমাদের উপরেও চলচে দুর্গ্রহের অভিযান। তোমরা এখানে আসবে বলে অপেক্ষা করে ছিলুম— খালি ছিলনা ঘর— তোমাদের বদলে এসেছিল

বিস্তর আগন্তুক। তোমার শরীরের খবরও সন্তোষজনক নয়। তোমার লেখাটার জন্যে তোমাকে লিখতে যাচ্ছিলুম— শেষ হয়ে গেছে শুনে খুশি হয়েছি। যদি নিতান্তই আসবার ব্যাঘাত হয় সেখানা পাঠিয়ে দিয়ো। ভালো নিশ্চয়ই লাগবে বলে ধরে রেখেছি। ইতি ২৪।৮।৩৮

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১২৪] ওঁ * "Uttarayan"
Santiniketan, Bengal

কল্যাণীয়েষু

তোমার আর্য সভ্যতা ঠিক আমাদের কাজে লাগবে। এটা বিবির তর্জমার উপক্রমণিকার মতো হয়েছে। বিবির ওটা খুব ভালো হবে। সম্পূর্ণ করতে বোলো। অত্যন্ত গরম এবং অত্যন্ত ব্যস্ততায় মিলে ভবযন্ত্রণা বাড়িয়ে তুলেছে। বাড়িতে আমি আছি সম্পূর্ণ একা। একটি নাৎনী আছে ব'লে রক্ষে। ইতি ১৩।৯।৩৮

রবীন্দ্রনাথ

[১২৫] ওঁ * "Uttarayan"
Santiniketan, Bengal

কল্যাণীয়েষু

একে চোখে কম দেখি মনের তেজও কমেছে তার উপরে ভাষাপরিচয়ের রচনা, তাসের দেশের রিহার্সাল, অন্তরে

বাহিরে তাড়া খেয়ে কিছু কিছু ইংরেজি লেখা, এই সব ব্যাপারে দিনরাত ধাঁদা লাগিয়ে রেখেছিল তাই তোমার চিঠির জবাব দিতে পারিনি। দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসচে বলে পারতপক্ষে চিঠি লেখালেখি করি নে। চোখ মেলে দেখাটাই জীবনে আমার প্রধান শখ, ওরা আপন কাজে ঢিল দিলে সেটা আমার পক্ষে শোচনীয়। তুমি ইতিহাসে ভূগোলে মিলিয়ে যে বই লেখবার সংকল্প করেছ সেটা ভালো কথা। তোমার ইতিহাসের চটি পেট ভরাবার মতো হয়নি। আমার এই অত্যন্ত ব্যস্ততার দিনের অবসান হলেই বিবির বইখানা নিয়ে পড়ব। ওটার কপি হয়ে গেছে, আগেকার মতো দুর্গম নেই। ইতি ২০।১১।৩৮

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১২৬] ওঁ * "UTTARAYAN"
Santiniketan, Bengal

কল্যাণীয়েষু

প্রমথ, তোমার লেখাটি রথীর হাতে দিয়েছি, সে ব্যবস্থা করবে। রথী বিশেষ কাজে কলকাতায় গেছে। এখানে তোমাদের বাসস্থানের সুযোগ করবার উদ্দেশে ···কে একখানা চিঠি লিখেছি— তিনি এখানে একটা বাড়ি আশ্রয় করে থাকেন— প্রায় অনুপস্থিত থাকেন— তার একতলায় তোমাদের জায়গা হতে পারে— এককালে ওখানে আমি

ছিলুম। আমার বিশ্বাস …কে রাজি করা যেতে পারে। ইতি ১৫।৩।৩৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১২৭] ওঁ "UTTARAYAN"
Santiniketan, Bengal

প্রমথ

তোমার লেখাটি রথী বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারীর জিম্মে করে দিয়েছেন— ছাপাখানা পর্যন্ত পৌঁছবে কি না সংশয় আছে— ওঁদের দল আছে এবং ছাঁচ আছে। আমরা স্থির করেছি যদি বাধা পাই বিশ্বভারতীর তরফ থেকে ছাপতে দেব। অপেক্ষা করে দেখা যাক। আমাদের প্রস্তাবে তোমার সম্মতি থাকলে জানিয়ো।

খুব আশা করেছিলুম … তাঁর অধিকৃত বাড়িতে তোমাদের আশ্রয় দিতে আপত্তি করবেন না। ভুল করেছিলুম হোলো না। আশ্রমে বাসের টানাটানি নিয়ে আমরা প্রায়ই দুঃখ পাচ্চি। তোমরা থাকলে কাজে লাগাতে পারতুম। চেয়ে থাকব সেই সুযোগের জন্যে।— এপ্রিলের আরম্ভে কলকাতায় আমি যেতে বাধ্য সেই সময়ে মোকাবিলায় আলোচনা হবে। ইতি ২৩।৩।৩৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পোস্টমার্ক, মংপু
১১ জুন, ১৯৩৯

কল্যাণীয়েষু

তোমার ছোটো গল্প পড়ে চেকভের ছোট গল্প মনে পড়ল। যা মুখে এসেছে তাই বলে গেছ হাল্‌কা চালে। এতে আলবোলার ধোঁয়ার গন্ধ পাওয়া যায়। এ রকম কিছুই না লিখতে সাহসের দরকার করে। দেশের লোক সাহিত্যে ভূরিভোজন ভালোবাসে— তারা ভাববে ফাঁকি দিয়েছ— কিম্বা ভাববে ঠাট্টা।

বিবি আমার শরীরের খবর চায়— বিশেষ করে বলবার মতো নয়। গ্রীষ্মকালের অজয় নদীর মতো দশা, স্রোত বয় না— এখানে ওখানে প্রয়োজনের মতো জল পাওয়া যায়। খেয়ালমতো লেখার জোগান দিই কিন্তু সে হাঁটুজলের জোগান। বেঁচে থাকলেই দাবীর অন্ত থাকে না— নাম রক্ষে করার মতো সম্বল কোথায়। আমার অবস্থাটা হয়েছে সেই রকম, যখন পাওনাদার ভিড় করে দাঁড়ায় আপিসে, খাতাঞ্চি মুখ লুকিয়ে থাকে বাসায়। সামান্য কাজ করতেও এত অত্যন্ত বিতৃষ্ণা ও ক্লান্তি বোধ হয় যে বেঁচে থাকাটা দুর্ভর হয়ে উঠেছে। এতদিন ধরে অনেক তো দিয়েছি—কিন্তু দেওয়া একটু বন্ধ হলেই পূর্বদানের উপরেও বদনাম আসে। দীর্ঘায়ুর বিপদ ঐ— সাবেক চালের ভূতটা কাঁধে চেপে থাকে তার পিণ্ডি জোটে না।

আষাঢ়ের আরম্ভে স্বস্থানে ফিরব।

রবীন্দ্র

[১২৯] ওঁ * "Uttarayan"

Santiniketan, Bengal.

পোস্টমার্ক, ২৪ জুলাই, ১৯৩৯

কল্যাণীয়েষু

পুস্তিকাখানি বিশ্ববিদ্যালয়ের পছন্দ হয়নি। আমরা নিয়েছি। ওর মধ্যে আমার হাত চালিয়েছি অনেকখানি। তার কারণ, ওটাকে আমাদের লোকশিক্ষা সংসদের আদর্শে তৈরি করতে হোলো। ভয় আছে পাছে জিনিষটাকে না চিনতে পেরে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠ। যাই হোক, ওটা এইবার প্রেসে চড়বে—পূজোর পূর্বেই আট-আনা সংস্করণের মাপে বেরবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১৩০] ওঁ * "Uttarayan"

Santiniketan, Bengal.

কল্যাণীয়েষু

বৌমার ছবি-আঁকা হাতের একটি লেখা তোমাকে পাঠাই। আমার তো মনে হোলো ভালো হয়েছে তোমারও যদি তাই মনে হয় অলকায় ছাপাতে পারো। ঘোমটার আবরণে ইতিপূর্বে ওঁর দুটো একটা লেখা প্রবাসীতে বেরিয়ে গেছে।— মংপু পাহাড়ের পথে আগামী বুধবারে রওনা হব কলকাতায়। আগেকার মতো কলমের ক্ষিপ্রবেগ নেই।

থাকলে অলকাকে করা যেতে পারত দ্বিতীয় সবুজ পত্র। এখন পাতায় হলদে রং ধরে আসচে। ইতি ১।৯।৩৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১৩১] ওঁ পোস্টমার্ক, মংপু

কল্যাণীয়েষু

প্রমথ বিশিকে একখানা পত্র লিখেছি। কিন্তু ঠিকানা পাচ্চিনে। তুমি নিশ্চয় জানো। যথাস্থানে পাঠিয়ে দিয়ো।

এখানে শরৎকালের দুর্গতির একশেষ— ঘোর শ্রাবণ হিটলরের মতো এর করিডর অধিকার করে বসে আছে— একেবারে সারেণ্ডার। আয়ু থেকে একটা শরতের আলো বাদ পড়লে ভালো লাগেনা, কটাই বা আছে। কবির জন্যে তাকিয়ে রয়েছে শান্তিনিকেতনের শিউলি বন, আর সূর্যাস্তের আকাশ। ইতি ২।১০।৩৯

রবীন্দ্রনাথ

[১৩২] ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

এতদিনে হিন্দুস্থান পেয়ে থাকবে। হয় তো তোমার কোথাও কোথাও খটকা লেগেছে, তোমার সঙ্গে কিছু কিছু অমিল থাকাও অসম্ভব নয়। তোমার মুখের কথাকে আমাদের

প্রয়োজনবশত কলমের কথায় বদল করতে হয়েছে— কিছু ছাঁটাও পড়েছে কিছু জোড়াও লেগেছে— তোমার কপিটা মিলিয়ে দেখলে দেখ্‌তে পাবে চলতি কথার ধর্মবশত তার মধ্যে নানারকম মিশোল ছিল— যাই হোক মাঝে মাঝে যে অল্পস্বল্প বদল হয়েছে, তাতে তোমাকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি— তোমারি লেখার রস এবং মালমসলা ওতে প্রভাবান্বিত হয়েই আছে।

বিবির একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে যে আমার শক্তি পূর্বের মতোই অক্ষুণ্ণ আছে। এখন যেটুকু বাকি আছে সে ফাটল ধরা ও কানাভাঙা। বিবি যদি সামনে উপস্থিত থেকে চেপে ধরত তাহলে হয় ত অগত্যা গুনগুন করতে করতে কিছু আর্তধ্বনি বেরত। আজকাল আমি গানের অন্তরা ভাঁজতে ভাঁজতে আস্থায়ীটা ভুলে যাই— কাউকে সামনে বসিয়ে সুর দিতে হয়। এ রকম কৃচ্ছসাধন ইচ্ছে ক'রে কি চালানো যায়। দিনের নানা খুচরো কাজ এসে পড়ে, তলিয়ে পড়ে সেইগুলোই যেগুলো ভারি এবং সহজ নয়।

ফিন্‌ল্যাণ্ডের একটা বিবরণ সংগ্রহ করে লিখেছি যদি মর্জি হয় অলকায় দিতে পারো।

আগন্তুকের বিষম ভীড়, প্রাণ বেরিয়ে গেল। কাজকর্ম ক্ষতবিক্ষত, অকাজ ধরাশায়ী। ১০।১।৪০

রবীন্দ্রনাথ

[১৩৩] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

প্রমথ, ফিনল্যাণ্ড তুমি পরিচয়েই পাঠিয়ে দিয়ো। জিনিষটা সাময়িক কিন্তু অলকা পত্রটি অসাময়িক হয়ে পড়েছে পঞ্জিকার বিধান মানে না। তোমাকে খুশি করবার জন্যই ওটা পাঠিয়েছিলুম। পরিচয়ে প্রাচীন হিন্দুস্থানের সমালোচনার জন্যে হাবলকে তুমি অনুরোধ কোরো। আমি দূরে থাকাতে পাব্লিসিটি ক্ষেত্রের বাইরে পড়ে আছি অব্‌স্কুরিটির গহনে। ইতি ১৩।১।৪০

রবীন্দ্রনাথ

[১৩৪] ওঁ "Uttarayan"
Santiniketan, Bengal

কল্যাণীয়েষু

প্রমথ, এবার পরিচয়ে তোমার গল্পটি পড়ে আশ্চর্য হয়ে গেছি, না লিখে থাকতে পারলুম না। বয়স হলে কলমকে বাতে ধরে, কিন্তু তোমার কলম এখনো যে রকম খাড়া চলতে পারে এমন তো আর কারো দেখিনি। এ একেবারে তোমার খাসদখলের লেখা, আর কারো হাত দিয়ে বেরবার জো নেই। আজ তোমার এই পরিচয়ের দরকার ছিল, কেননা বাজে লোকেরা উস্‌খুস্ করতে আরম্ভ করেছিল।

যারা জাত আনাড়ি তারা যখন ওস্তাদি ফলাবার সুযোগ পায় তখন সেটা শোকাবহ হয়ে ওঠে। সেইজন্যে খুব খুষি হয়েছি। খাঁটি জিনিষ একটা আধটাই যথেষ্ট, সেই কথাটা আমাদের দেশের বদরসিকদের বোঝানো শক্ত,—কালকেতুর ব্যাধের মতো তাদের গ্রাস—মাসে মাসে মুঠো মুঠো অপথ্যর জোগান দিতে না পারলে তাদের বাহবা মিইয়ে আসে। আজকালকার বাজারে বিলিতি ভেজালের গতিক দেখে মনের মধ্যে লেখবার তাগিদ পাইনে। এবার পাততাড়ি গুটিয়ে নেবার সময় এল। ইতি ৬ শ্রাবণ ১৩৪৭

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অঘোর—অঘোরনাথ মৈত্র, মোক্তার

অজিত—অজিতকুমার চক্রবর্তী, শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক

অতুলবাবু—শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত, ব্যবহারজীবী ও সাহিত্যিক

অনাথবাবু—অনাথকৃষ্ণ দেব, শোভাবাজার

অনাদি—শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদার, শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র ও সংগীতশিক্ষক

অনিলা দেবী—'যমুনা' পত্রিকায় একদা-ব্যবহৃত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম।

অপূর্ব্ব—শ্রীঅপূর্বকুমার চন্দ, শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছা

অমল—শ্রীঅমল হোম

অমিয়—শ্রীঅমিয় চক্রবর্তী

অমিয়া—শ্রীহৈমন্তী দেবী, অমিয় চক্রবর্তীর পত্নী

অমৃত রায়—অমৃতলাল রায়, নায়েব

অম্বাচরণ—অম্বাচরণ মৈত্র, জমিদারির সার্ভে আমিন

অরু—অরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র

আঢ্য, মিস্—শ্রীবীণা আঢ্য, বাঙালী খ্রীস্টান সুগায়িকা

"আর একজন ভারতবর্ষীয়" (পৃ ২১)—ভাই প্রমথলাল সেন, নববিধান সমাজের প্রচারক

আরিয়াম, এরিয়াম—শ্রীআর্যনায়কম এরিয়ম উইলিয়মস্, শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন সিংহলী অধ্যাপক

আর্য্য—আর্যকুমার চৌধুরী, আশুতোষ চৌধুরীর জ্যেষ্ঠপুত্র

আশু—স্যর আশুতোষ চৌধুরী, প্রমথনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা

"একটি শরীরী" (পৃ ১৪৮)—মধ্যমা কন্যা রেণুকা, জন্ম ইং ১৮৯০

এণ্ডার্সন—জে. ডি. এণ্ডার্সন, কেম্বিজের বাংলা অধ্যাপক

এণ্ড্রুজ—C. F. Andrews, সি. এফ. এণ্ড্রুজ

ওকাকুরা—কাকুজো ওকাকুরা, জাপানের সুবিখ্যাত মনীষী

কমল—কমলা দেবী, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী

কল্যাণ—শ্রীকল্যাণকুমার চৌধুরী, প্রমথনাথের অগ্রজ
কুমুদনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র

"কাঠের পুতুলটা" (পৃ ১৯৬)—দ্রষ্টব্য 'কাঠের রাজা', বীরবল ;
বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৪৯ মাঘ, পৃ ৪৫৫-৫৭

"কারমাইকেলের হাঙ্গাম" (পৃ ১৯৫)—বাংলার গভর্নর লর্ড
কারমাইকেলের শান্তিনিকেতন পরিদর্শন, ২০ মার্চ ১৯১৫

কুমুদ—কুমুদনাথ চৌধুরী, প্রমথনাথের অগ্রজ

কৃষ্ণকুমার মিত্র—সুবিখ্যাত দেশনেতা ও সঞ্জীবনী সাপ্তাহিক পত্রের
সম্পাদক

ক্র্যামরিশ—শ্রীমতী স্টেলা ক্র্যামরিশ, বিশ্বভারতীর প্রাক্তন
অধ্যাপিকা, বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিযুক্ত

ক্ষিতিমোহন বাবু, ক্ষিতিবাবু—শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

খগেন—খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, এটর্নি ; মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মীয়

খুকু—অমিতা সেন, শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রী

গগন—গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

গোপাল—গোপাল চট্টোপাধ্যায়, জোড়াসাঁকোর প্রাক্তন সরকার

গোপীনাথ—দক্ষিণী নৃত্যশিল্পী, রাগিণী দেবীর তৎকালীন নৃত্যসঙ্গী

গোপেশ্বর—গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

চারু, চারু বাঁড়ুয্যে—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্যিক

চিত্তরঞ্জন—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ

ছোট বউ—কবিপত্নী মৃণালিনী দেবী

জয়া—শ্রীজয়শ্রী দেবী, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠা কন্যা ও
শ্রীকুলদাপ্রসাদ সেনগুপ্তের পত্নী
জ্যোৎস্না—স্তর জ্যোৎস্নানাথ ঘোষাল, স্বর্ণকুমারী দেবীর পুত্র
ডাক্তার নাইডু—মেজর গোবিন্দরাজু নাইডু, শ্রীসরোজিনী নাইডুর
স্বামী
ডাক্তার সরকার—নীলরতন সরকার
তারকবাবু—স্তর তারকনাথ পালিত
দাদা—সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথের অব্যবহিত অগ্রজ
দিনু—দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিপেন্দ্রনাথের পুত্র
দিলীপ—শ্রীদিলীপকুমার রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুত্র
দ্বিজু রায়—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ—দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী, সাহিত্যিক
দ্বিজেন্দ্র মৈত্র—ডাঃ ডি. এন্. মৈত্র, বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর
প্রতিষ্ঠাতা
দ্বিপু—দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র
ধূর্জটি—শ্রীধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
নগেন—শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ জামাতা
নগেন্দ্র—কবিশেখর শ্রীনগেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী
নতুন বৌঠান—কাদম্বরী দেবী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী
নরু—নরেন্দ্রবালা দেবী, সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের পত্নী
নলিনী—নলিনী দেবী, দ্বিপেন্দ্রনাথের কন্যা
নলিনী (পৃ ১৯৮)—শ্রীনলিনীকান্ত চক্রবর্তী, নায়েব
নলিনীরঞ্জন—শ্রীসুহৃৎনাথ চৌধুরী, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা
নলিনী দেবীর স্বামী
নাটোর—জগদিন্দ্রনাথ রায়, নাটোরের মহারাজা

নদিদি—স্বর্ণকুমারী দেবী

নাৎনি—শ্রীনন্দিনী দেবী, শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা

নীতু—নীতীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথের দৌহিত্র

নীলরতনবাবু, নীলরতন ডাক্তার— ডাক্তার নীলরতন সরকার

নুটু—রমা দেবী, সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের অন্যতম কনিষ্ঠা ভগিনী ও শ্রীসুরেন্দ্রনাথ করের পত্নী

নেপু—শ্রীঅরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুধীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র

পঞ্চাশ নম্বর পার্কস্ট্রিট (পৃ ১৬৪)— সত্যেন্দ্রনাথের বাটী

পল্টু কর—প্রমথ কর, এটর্নি

পিয়ার্সন—উইলিয়ম উইনস্ট্যানলি পিয়ার্সন, শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের প্রাক্তন ইংরেজ অধ্যাপক

পুপু, পুপে— শ্রীনন্দিনী দেবী, 'নাৎনি' দ্রষ্টব্য

প্রতিমা— শ্রীপ্রতিমা দেবী, শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী

প্রবোধ— কবিসুহৃদ্ প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, 'কবিকাহিনী'র প্রকাশক

প্রভাস মিত্র— স্যর পি. সি. মিত্র

প্রভাতকুমার (পৃ ৯৫)—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারিক

প্রভাতকুমার—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ঔপন্যাসিক

প্রমথ— শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা

প্রমথ বিশি— শ্রীপ্রমথনাথ বিশি, শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র

প্রশান্ত— শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ

প্রশান্তনিকেতন— শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের বাটী, বরাহনগর

প্রিয়— কবি প্রিয়ম্বদা দেবী, প্রমথনাথের ভাগিনেয়ী

প্রিয়বাবু— প্রিয়নাথ সেন, কবিসুহৃদ্

"ফরেন মিনিস্টার" (পৃ ৮৫)— শ্রীঅমিয় চক্রবর্তী

বঙ্কিমবাবু— বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
বনমালী— রবীন্দ্রনাথের শেষজীবনের ভৃত্য
বরদাবাবু— শ্রীবরদাচরণ গুপ্ত, সাহিত্যিক
বলু— বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অগ্রজ বীরেন্দ্রনাথের পুত্র
বড়দিদি— সৌদামিনী দেবী
বাঁড়ুয্যের পুত্রবধূ— গার্ট্রুড্ বোনার্জি, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের
(ডব্লিউ. সি. বোনার্জি) জ্যেষ্ঠপুত্র শেলী বোনার্জির পত্নী
বিবি— শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের
একমাত্র কন্যা
বিহারী চক্রবর্তী— বিহারীলাল চক্রবর্তী, 'সারদামঙ্গল'-এর কবি
বীরেশ্বর— শ্রীবীরেশ্বর মজুমদার
বেবি— শ্রীনলিনী দেবী, অধ্যাপক শ্রীদেবেন্দ্রমোহন বসুর পত্নী
বেলা— মাধুরীলতা দেবী, রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা
বুবু— শ্রীপূর্ণিমা ঠাকুর, শ্রীসুহৃৎনাথ চৌধুরীর কন্যা, ও সুবীরেন্দ্রনাথ
ঠাকুরের পত্নী
বৌমা— শ্রীপ্রতিমা দেবী, 'প্রতিমা' দ্রষ্টব্য
ব্রজেন্দ্রবাবু— ব্রজেন্দ্রনাথ শীল
মঞ্জু— শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী দেবী, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠা কন্যা ও
শ্রীক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের পত্নী
মণ্টু— শ্রীদিলীপকুমার রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুত্র
মন্দিরা— শ্রীমন্দিরা গুপ্ত, শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রী
মন্মথ— মন্মথনাথ চৌধুরী, প্রমথনাথের অনুজ
মণিলাল— মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যম
জামাতা
মরিস— এইচ. পি. মরিস, বিশ্বভারতীর প্রাক্তন পার্শী অধ্যাপক

মহেন্দ্র— মহেন্দ্রলাল রায়, প্রমথনাথের বেশস্থ কর্মী
মীরা— শ্রীমীরা দেবী, রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা
মুনীন্দ্র— মুনীন্দ্র সর্বাধিকারী, জমিদারী সেরেস্তার কর্মচারী
মেজদাদা— সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
মেজবৌঠান— জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের পত্নী
মেনা—মৃণালিনী দেবী, শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরীর কনিষ্ঠা ভগিনী
মেব্‌ল্—লোকেন্দ্রনাথ পালিতের পত্নী
যামিনীকান্ত সেন—সুপরিচিত শিল্পকলারসিক
যোগেশ—শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী, প্রমথনাথের অগ্রজ
যোগিনী—যোগিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ জামাতা মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের অগ্রজ
য়েট্‌স—W. B. Yeats, আইরিশ কবি
রথী—শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র
রাগিণী দেবী—ভারতীয়নৃত্যকুশলী য়ুরোপীয় মহিলা
রামেন্দ্রসুন্দর—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
রোটেনস্টাইন—উইলিয়ম রোটেনস্টাইন, সুবিখ্যাত ইংরেজ শিল্পী
রোমাঁ রোলাঁ—Romain Rolland, ফরাসী সাহিত্যিক
লটি—শ্রীস্নেহলতা সেন, বিহারীলাল গুপ্তের জ্যেষ্ঠা কন্যা
লাহোরিণী—শরৎকুমারী চৌধুরাণী, কবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর পত্নী
লিল্—লিলিয়ান [বাসন্তী ললনা] পালিত, তারকনাথ পালিতের কন্যা
লেভি সাহেব—সিলভ্যাঁ লেভি, সুবিখ্যাত ফরাসী মনীষী, একদা বিশ্বভারতীর অধ্যাপক
লোকেন—লোকেন্দ্রনাথ পালিত, তারকনাথ পালিতের তৃতীয় পুত্র
শাস্ত্রীমশাই—শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী, বিশ্বভারতীর প্রাক্তন অধ্যাপক
শিবু—শ্রীশিবকুমার চৌধুরী, আশুতোষ চৌধুরীর তৃতীয় পুত্র

শৈলেন্দ্র—শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র, জমিদারির জুনিয়র উকিল

শৈলেশ—শৈলেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের অনুজ, একসময়ে রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থপ্রকাশক

শ্রীমতী—শ্রীমতী হাথী সিং, বিশ্বভারতী কলাভবনের প্রাক্তন গুজরাটী ছাত্রী, শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী

সতু—সত্যেন্দ্রনাথ পালিত, তারকনাথ পালিতের কনিষ্ঠ পুত্র

সত্য—সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, কবির বড়দিদি সৌদামিনী দেবীর পুত্র

"সত্যকুমারের স্ত্রী"—শ্রীবিভাময়ী দেবী, শিলাইদহ সদর আফিসের সেক্রেটারি সত্যকুমার মজুমদারের পত্নী

সন্তোষ—সন্তোষচন্দ্র মজুমদার, শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের জ্যেষ্ঠ পুত্র, শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র অধ্যাপক ও কর্মী

সরলা—সরলাদেবী চৌধুরাণী, স্বর্ণকুমারী দেবীর মধ্যমা কন্যা

সরস্বতী—শ্রীসরস্বতী দেবী, হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অষ্টমা দৌহিত্রী ও শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পত্নী

"সাকিসের হাঙ্গামা" (পৃ ২৭২)—সাকিস, কলিকাতাবাসী জনৈক আরমানী সংগীতজ্ঞ। রবীন্দ্র-সংগীতের কয়েকটি ইংরেজি স্বরলিপিতে হার্মনি বসাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

সুধা—শ্রীসুধাময়ী দেবী, শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের পত্নী

সুধী—সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথের চতুর্থ পুত্র

সুনীতি—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

সুবীর—শ্রীসুবীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র

সুবোধ—সুবোধচন্দ্র মজুমদার, শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা

সুরেন—সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের পুত্র

সুরেশ—শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, পণ্ডিচেরী

সুহৃদ—শ্রীসুহৃৎনাথ চৌধুরী, দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা

হাবলু—শ্রীপ্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্ত, শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র

হাবল—শ্রীহিরণকুমার সান্যাল

হারাসান—শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন জাপানী ছাত্রী

Barbusse—Henri Barbusse, আঁরি বারবুস্, ফরাসী সাহিত্যিক

Clarté—উক্ত নামে খ্যাত ফরাসী নবীন সাহিত্যিক গোষ্ঠীর মুখপত্র

Benoit—F. Benoit, এফ. বেনোয়া, বিশ্বভারতীর প্রাক্তন ফরাসী অধ্যাপক

Elmhirst—L.K. Elmhirst, এল্, কে, এল্ম্হার্স্ট্, বিশ্বভারতী শ্রীনিকেতনের পূর্বতন ইংরেজ পরিচালক ও কর্মী

Gourlay—W. R. Gourlay, লর্ড কারমাইকেলের প্রাইভেট সেক্রেটারি

N. C. O.—নন্-কো-অপারেশন

Ollendorff—সুবিখ্যাত জর্মান ভাষাবিদ্

Rothenstein—'রোটেনস্টাইন' দ্রষ্টব্য

Sylvain Levy—'লেভি সাহেব' দ্রষ্টব্য

Tree daubing (পৃ ১৬৬)—"The tree daubing mystery offered the widest grounds for speculation. This movement consisted in marking trees with daubs of mud....It slowly spread through the North-Gangetic districts...and was generally attributed to wandering gangs of *Sadhus*... The movement died out in a few months and the result seemed to show that it had no real political significance."—Buckland, Bengal under the Leutenant Governors, Vol II, p. 954.

* পত্রের সর্বত্র তারকা চিহ্ন চিঠির কাগজে মুদ্রিত ঠিকানা নির্দেশক।

সঞ্চয়িতা

চিঠিপত্র ১ । পত্নী মৃণালিনী দেবীকে লিখিত

চিঠিপত্র ২ । রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত

চিঠিপত্র ৩ । প্রতিমা দেবীকে লিখিত

চিঠিপত্র ৪ । মাধুরীলতা দেবী, মীরা দেবী, দৌহিত্র নীতীন্দ্রনাথ, দৌহিত্রী নন্দিতা ও পৌত্রী শ্রীমতী নন্দিনীকে লিখিত

চিঠিপত্র ৫ । সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইন্দিরা দেবী ও প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত

ছিন্নপত্র । শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ও ইন্দিরা দেবীকে লিখিত

পথে ও পথের প্রান্তে । রানী মহলানবীশকে লিখিত

ভানুসিংহের পত্রাবলী । শ্রীমতী রানু দেবীকে লিখিত

ষষ্ঠ খণ্ড

চিঠিপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলিকাতা

চিঠিপত্র ॥ ষষ্ঠ খণ্ড

জগদীশচন্দ্র বসু ও অবলা বসুকে লিখিত পত্রাবলী

প্রকাশ বৈশাখ ১৮৭৯ : মে ১৯৫৭

সংস্করণ মাঘ ১৩৯৯ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩

পুলিনবিহারী সেন -কর্তৃক সংকলিত

প্রকাশক শ্রীসুধাংশুশেখর ঘোষ

বিশ্বভারতী। ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড। কলিকাতা ১৭

মুদ্রক ম্যাসকট প্রেস

২৪৬এ/বি মানিকতলা মেন রোড। কলিকাতা ৫৪

সূচীপত্র

চিত্রসূচী

বিজ্ঞান-লক্ষ্মীর প্রিয় পশ্চিমমন্দিরে
দূর সিন্ধুতীরে,
হে বন্ধু, গিয়েছ তুমি ; জয়মাল্যখানি
সেথা হতে আনি
দীনহীনা জননীর লজ্জানত-শিরে,
পরায়েছ ধীরে।
বিদেশের মহোজ্জ্বল মহিমা-মণ্ডিত
পণ্ডিত-সভায়
বহু সাধুবাদধ্বনি নানা কণ্ঠরবে
শুনেছ গৌরবে!
সে ধ্বনি গভীর মন্দ্রে ছায় চারিধার
হ'য়ে সিন্ধুপার।

আজি মাতা পাঠাইছে—অশ্রুসিক্ত বাণী
আশীর্বাদখানি
জগৎ-সভার কাছে অখ্যাত অজ্ঞাত
কবিকণ্ঠে, ভ্রাতঃ!
সে বাণী পশিবে শুধু তোমারি অন্তরে
ক্ষীণ মাতৃস্বরে!

৪ঠা শ্রাবণ ১৩০৪
[19 July 1897]

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুকে লিখিত

১
২৬ মে ১৮৯৯

ওঁ

কলিকাতা

প্রিয়বরেষু

বলেন্দ্রনাথ ও আমার পুত্র রথীর রোগপরিচর্য্যার জন্য আমাকে হঠাৎ কলিকাতায় আসিতে হইয়াছে— প্রায় পনেরো দিন এইখানেই কাটিয়াছে, আরও দিন পাঁচ সাত কাটিতে পারে। নিজেও সুস্থ নহি।

এদিকে অকালবর্ষা নামিয়াছে— ঠিক শ্রাবণ মাসের মত। ইহাতে আমার কোন আপত্তি ছিল না, শঙ্কা হয় পাছে প্রকৃতি শ্রাবণ মাসে ফাঁকি দিয়া বসেন। দার্জ্জিলিঙেও যদি এখানকার অনুরূপ বর্ষার প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে তবে আপনার সৌভাগ্য আমি ঈর্ষা করি না। পাহাড়ের বর্ষা আমাদের বাঙ্গালীর কান্নার মত একঘেয়ে এবং অবিশ্রাম। তবু একবার আপনাদের শৈলনীড়ের মধ্যে অকস্মাৎ অবতীর্ণ হইতে ইচ্ছা হয়— কিন্তু অবকাশ এবং পাখা না থাকায় সে দুরাশা মনে স্থান দিই না। রোগতাপের মধ্যে লেখাপড়া বন্ধ আছে— সুযোগের অপেক্ষা করিতেছি— এক একবার ভাবি সুযোগও হয়ত আমার অপেক্ষা করিতেছে— জোর করিয়া মনটাকে

সংগ্রহ করিয়া আনিয়া একবার লিখিতে বসিলেই হয়— কিন্তু সেই জোরটুকু সম্প্রতি পাইতেছি না।

কতকগুলি পৌরাণিক গল্প আমার মস্তিষ্কের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে— যেমন করিয়া হৌক্ তাহাদের একটা গতি করিতে হইবে— তাহারা আমার কন্যাদায়ের মত— পাব্লিকের সহিত তাহাদের পরিণয় সাধন করিতে না পারিলে তাহারা অরক্ষণীয়া হইয়া উঠিবে— কিন্তু ইহাদের সম্বন্ধেও বাল্যবিবাহটা ভাল নয়— উপযুক্ত বয়স পর্য্যন্ত ইহাদের কলরব ও উপদ্রব আমাকে সহ্য করিতেই হইবে। শরীর আজ পীড়িত আছে— এইখানেই বিদায় গ্রহণ করিলাম। ইতি ১৩ই জ্যৈষ্ঠ। ১৩০৬

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২

১৮ জুন ১৮৯৯

ওঁ

শিলাইদহ
কুমারখালি
E. B. S. Ry.

প্রিয়বরেষু

দার্জ্জিলিঙের ঠিকানায় আমি আপনার পত্রের উত্তর দিয়াছিলাম, পাইয়াছেন কি না জানি না। আপনার পত্রে দার্জ্জিলিং ছাড়া আর কোন প্রকার বিশেষ ঠিকানা লিখিত ছিল না। এ পত্র কলিকাতার ঠিকানায় লিখিলাম।

যেরূপ প্রবল বর্ষা পড়িয়াছে এখন বোধ করি নদীনির্ঝর ও সঙ্গে সঙ্গে বহুতর ভূখণ্ড শিলাখণ্ড পাহাড় ছাড়িয়া নীচে নামিয়া আসিতেছে— আপনারা কি শিখরদেশেই অটল হইয়া থাকিবেন? যদি নামেন ত এই পদ্মা নদীর পথটা কি অনুসরণ করিতে পারেন না? এখন আকাশ মেঘে, নদী জলে, এবং পৃথিবী শস্যে পরিপূর্ণ। ঘরের বাহির হওয়া শক্ত কিন্তু জানালা আছে কি করিতে? আপনাদের বাইসিক্‌ল্‌ চলিবার মত একটা পথ গড়িয়া লওয়া গেছে।

আত্মীয়দের পীড়া লইয়া প্রায় এক মাস কলিকাতায় ছিলাম— সম্প্রতি ফিরিয়া আসিয়া আপনাদের সেই অর্দ্ধশ্রুত

গল্পটিতে হাত দিয়াছি। মাসিক পত্রিকার তাড়া নাই—আপন মনে আস্তে আস্তে লিখি। কোন একদিন সায়াহ্নে আপনাদের সেই কোণের ঘরে বসিয়া·বোধ করি পড়িয়া শুনাইবার অবকাশ পাইব। ইতি ৪ঠা আষাঢ়! ১৩০৬

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩
২৪ জুন ১৮৯৯

ওঁ

শিলাইদহ
কুমারখালি
১০ই আষাঢ় ১৩০৬

প্রিয়বরেষু—

আপনার পত্রখানি পড়িয়া আমি বিশেষ সান্ত্বনা ও আনন্দ লাভ করিয়াছি। স্তুতিনিন্দার প্রতি উদাসীন থাকিতে বিশেষ চেষ্টা করি, কৃতকার্য্য হইতে পারি না বলিয়া যথাসম্ভব দূরে থাকি; কিন্তু সংসারকে ফাঁকি দেওয়া চলে না; প্রেমদাসের একটা গানে আছে:—

বৃথা শোচ কুছ কাম ন আওয়ে—
ভোগ বিনা নাহি মিট্‌না।

বৃথা শোক করিয়া কোন ফল হয় না— যাহা ভোগ করিবার তাহা না করিয়া এড়াইবার যো নাই। কিন্তু দুঃখের মধ্যে পরম সুখ এই যে বন্ধুদের সস্নেহ হৃদয় নিজের বেদনার নিকট অগ্রসর হইতে দেখি।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় কুক্ষণে ২০টি রেশমের গুটি আমার ঘরে ফেলিয়া গিয়াছিলেন। আজ দুই লক্ষ ক্ষুধিত কীটকে দিবারাত্রি আহার এবং আশ্রয় দিতে আমি ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছি— দশ বারোজন লোক অহর্নিশি

তাহাদের ডালা সাফ করা ও গ্রাম-গ্রামান্তর হইতে পাতা আনার কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে— লরেন্স্ স্নান-আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া কীট-সেবায় নিযুক্ত। আমাকে সে দিনের মধ্যে দশ বার করিয়া টানাটানি করে— প্রায় পাগল করিয়া তুলিল। ইংরেজ জাতি কেন যে সকল বিষয়ে কৃতকার্য্য হয় তাহার প্রত্যক্ষ কারণ দেখিতেছি। উহাদের শক্তি চালনা করিবার জন্য বিধাতা উনপঞ্চাশ বায়ু নিযুক্ত করিয়াছেন, অথচ উহাদের মধ্যে বোঝাই এত আছে যে কাৎ করিতে পারে না। এখন যদি আমাদের কীটশালায় একবার আসিতে পারিতেন তবে একটা দৃশ্য দেখিতে পাইতেন। বৃহৎ ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। কোন এক সময় ছুটী পাইলে এদিককার কথা স্মরণ করিবেন।

আমার চাষ-বাসের কাজও মন্দ চলিতেছে না। আমেরিকান ভুট্টার বীজ আনাইয়াছিলাম— তাহার গাছগুলা দ্রুতবেগে বাড়িয়া উঠিতেছে। মান্দ্রাজি সরু ধান রোপণ করাইয়াছি, তাহাতেও কোন অংশে নিরাশ হইবার কারণ দেখিতেছি না। দ্বিজেন্দ্রলালবাবু সোমবারে সস্ত্রীক আমার শস্যক্ষেত্র পর্য্যবেক্ষণ করিতে আসিবেন।

আপনারা উভয়ে আমাদের আন্তরিক প্রীতি-অভিবাদন গ্রহণ করিবেন।

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪

১৭ সেপ্টেম্বর [১৯০০]

ওঁ

শিলাইদহ
কুমারখালি
নদীয়া

প্রিয় বন্ধু,

চুপচাপ বসে একখানা ফরাসী ব্যাকরণ নিয়ে ওল্‌টাচ্ছিলুম এমন সময় চিঠিখানি পেয়ে মৃত ভেকের মধ্যে তড়িৎ-প্রবাহের সঞ্চার হ'য়ে খুব ধড়ফড় ক'রে উঠেছি। লোকেনকে, সুরেনকে আপনার চিঠিখানা দেখাবার জন্যে ছট্‌ফট্‌ করচি, কিন্তু তারা দূরে, আজই তাদের লিখে পাঠাতে হবে। যুদ্ধ ঘোষণা ক'রে দিন্‌। কাউকে রেয়াৎ কর্‌বেন না— যে হতভাগ্য surrender না কর্‌বে, লর্ড রবার্টসের মত নির্ম্মম চিত্তে তাদের পুরাতন ঘর-দুয়ার তর্কানলে জ্বালিয়ে দেবেন— আপনি এক সৈন্য-সম্প্রদায়ের সঙ্গে আর-এক সৈন্য-সম্প্রদায় গেঁথে যে-রকম ব্যূহ রচনা করেচেন তাতে প্রিটোরিয়ায় ক্রিষ্ট্‌মাস্‌ করতে পার্‌বেন ব'লে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তারপরে আপনি জয় ক'রে এলে আপনার সেই বিজয়গৌরব আমরা বাঙ্গালীরা মিলে ভাগ ক'রে নেব— আপনি কি কর্‌লেন তা বোঝবার কিছু দরকার হবে না, না বুদ্ধি, না অর্থ, না সময় কিছুই খরচ কর্‌তে হবে না, কেবল টাইম্‌স্‌ পত্রে ইংরেজের মুখ থেকে বাহবা শোন্‌বামাত্র সেই বাহবা আমরা লুফে নেব। তখন

আমাদের দেশীয় কোন বিখ্যাত কাগজে বল্‌বে, আমরা বড় কম লোক নই ; অন্য কাগজে বল্‌বে, আমরা বিজ্ঞানে নব নব তথ্য আবিষ্কার কর্‌চি ;— এদিকে আপনার জন্যে কায়ো সিকি পয়সার মাথাব্যথা নেই, কিন্তু যখন জগৎ থেকে যশের ফসল ঘরে আন্‌বেন তখন আপনি আমাদের ;— চাষের বেলা আপনি একা, লাভের বেলা আমরা সবাই ; অতএব আপনি জয়ী হ'লে আপনার চেয়ে আমাদেরই জিৎ।

আপনি 'ক' বিন্দুতে কম্পমান, আমি 'খ' বিন্দুতে দিব্য নিশ্চেষ্ট নিরুদ্বিগ্ন হ'য়ে ব'সে আছি— আমার চারিদিকে আমন ধান এবং আখের ক্ষেত আসন্ন শরতের শিশিরাক্ত বাতাসে দোদুল্যমান। শুনে আশ্চর্য্য হবেন, একখানা Sketch book নিয়ে ব'সে ব'সে ছবি আঁক্‌চি। বলা বাহুল্য, সে-ছবি আমি প্যারিস সেলোন-এর জন্যে তৈরী কর্‌চিনে, এবং কোন দেশের ন্যাশন্যাল গ্যালারী যে এগুলি স্বদেশের ট্যাক্স বাড়িয়ে সহসা কিনে নেবেন এরকম আশঙ্কা আমার মনে লেশমাত্র নেই। কিন্তু কুৎসিত ছেলের প্রতি মার যেমন অপূর্ব্ব স্নেহ জন্মে তেমনি যে বিদ্যাটা ভাল আসে না সেইটের উপর অন্তরের একটা টান থাকে। সেই কারণে যখন প্রতিজ্ঞা কর্‌লুম, এবারে ষোল আনা কুঁড়েমিতে মন দেবো তখন ভেবে ভেবে এই ছবি আঁকাটা আবিষ্কার করা গেছে। এই সম্বন্ধে উন্নতি লাভ কর্‌বার একটা মস্ত বাধা হয়েছে এই যে, যত পেন্সিল চালাচ্ছি তার চেয়ে ঢের বেশী রবার চালাতে

হচ্ছে, সুতরাং ঐ রবার চালনাটাই অধিক অভ্যাস হ'য়ে যাচ্চে— অতএব মৃত র‍্যাফেল্ তাঁর কবরের মধ্যে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ম'রে থাকৃতে পারেন— আমার দ্বারা তাঁর যশের কোন লাঘব হবে না।

লোকেন আসন্ন পূজার ছুটিতে আমাকে তার ভ্রমণের সহচর ক'রে সিমলা-শিখরে টান্‌বার জন্যে চেষ্টা কর্‌চে— কিন্তু আমি নড়্‌চিনে। ঋষিরা যখন পর্ব্বত-শিখরে তপস্যা কর্‌তে যেতেন তখন সে এক সময় ছিল— কিন্তু এখন যে গিরিশৃঙ্গে শান্তি নেই সে কথা আপনার অগোচর নেই। আশা করি, দার্জ্জিলিঙের সেই পথে-পাওয়া বন্ধুটিকে ভোলেননি। আমি আমার পদ্মা-তীরের কলহংস-মুখর বালুতটে শারদশ্রীর শুভ শুভ্র সমাগম প্রতীক্ষা কর্‌চি। বোধ করি, মনে আছে, আপনি আমাকে একটি ভ্রমণ-সঙ্গ-দানে প্রতিশ্রুত আছেন, কাশ্মীরে হোক্, উড়িষ্যায় হোক্, ত্রিবাঙ্কুরে হোক্, আপনার সঙ্গে ভ্রমণ ক'রে আপনার জীবনচরিতের একটা অধ্যায়ের মধ্যে ফাঁকি দিয়ে স্থান পেতে ইচ্ছে করি। আশা করি, বঞ্চিত কর্‌বেন না— সেই ভবিষ্যৎ কোন একটা ছুটির জন্যে পাথেয় সঞ্চয় ক'রে রাখ্‌চি। গৃহিণী আমার অনতিদূরে একটা কেদারায় ব'সে আমাকে স্নানাহারের জন্যে অত্যন্ত তাগিদ কর্‌চেন— বেলাও হয়েচে। অতএব ক্ষণকালের জন্যে মার্জ্জনা কর্‌বেন— আমার অধিক দেরী হবে না।

লোকেন আমার যে কাব্য-চয়ন প্রকাশে প্রবৃত্ত ছিল

মাঝখানে বিলাতে গিয়ে তার উদ্যম কিছু যেন ক'মে এসেছে। সে যদি কিছু না মনে করে তা'হলে আমি নিজেই এ কাজে হাত দিতে পারি। আমি ছবি আঁকৃচি শুনে যদি আশ্চর্য্য হন ত লোকেন কবিতা লিখ্‌তে ব'সে গেছে শুনে বোধহয় কম আশ্চর্য্য হবেন না। তার এতই দুরবস্থা হয়েচে! বেচারাকে শেষকালে কবিতা লেখালে। ওমার খায়েমের বাঙ্গলা পদ্যানুবাদ কর্‌চে। দুই-একটা নমুনা দেখ্‌লে তার মনের অবস্থা কতকটা বুঝ্‌তে পার্‌বেন :—

মূঢ় তোরা, ত্যজি' সুখ স্বর্গসুখ-আশে
থাকিস্‌ মুক্তির তরে অন্ধ কারাবাসে।
সুদ পাবি ব'লে ফেলে রাখিস্‌ পাওনা,
ছাড়ি না নগদ আমি যাহা হাতে আসে!

এই সমস্ত কবিতায় লোকেন মূলধন ফুঁকে দিয়ে ব্যবসা চালাবার প্রস্পেক্টস্‌ জারি করেচে— সুদ চায় না, লাভ চায় না, যা কিছু জমা আছে সব উড়িয়ে দিতে চায়— আমি এ ব্যবসায়ে শেয়ার কিন্‌তে প্রস্তুত নই।

আপনার শ্যালকজায়া আর্য্যা সরলা, বিদ্যার্ণবের কাছে সম্প্রতি সংস্কৃত পড়্‌তে আরম্ভ করেচেন। শিক্ষা-প্রণালীটি আমার রচিত। খুব দ্রুত উন্নতি লাভ কর্‌চেন— পণ্ডিতমশায় এমন বুদ্ধিমতী ছাত্রী পেয়ে ভারী খুসীতে আছেন। আমি তাঁকে পূর্ব্বেই আশ্বাস দিয়েছি আমার পদ্ধতি মতে যদি তিনি সংস্কৃত শেখেন তাহ'লে এক বৎসরের মধ্যেই তাঁর সংস্কৃত

ভাষায় অধিকার জন্মাবে। তাঁর সংস্কৃত-চর্চ্চায় আমি ভারি আনন্দিত হয়েছি। আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষিত মেয়েদের অতিমাত্রায় ইংরেজী চর্চ্চার সামঞ্জস্য রক্ষার জন্যে সংস্কৃত শেখাটা একান্ত দরকার হয়েছে।

মশায়, আপনার জন্যে পুরীর জমীটি ঠেকিয়ে রাখ্‌তে পার্‌ব ব'লে আশা হচ্ছে না, তার প্রতি ম্যাজিষ্ট্রেটের দৃষ্টি পড়েচে। কর্ত্তা আমাকে লিখেচেন, পুরী ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের আমার ঐ ভূখণ্ডটুকুতে ভারি প্রয়োজন হয়েচে। জোর যার মুল্লুক তার যদি সত্য হয় তা'হলে ও জমিটুকু রক্ষা হবে না। আপনি যদি এখানে থাক্‌তে থাক্‌তেই বাড়ী আরম্ভ ক'রে দিতে পার্‌তেন তাহ'লে ও লোকটা দাবী কর্‌তে পার্‌ত না।

আজকের দিনটা ঝোড়ো। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন— মাঝে মাঝে হঠাৎ মুষলধারে বৃষ্টি হ'য়ে যাচ্চে— মাঝে মাঝে বাতাসের দমকা এসে জানলাদরজাগুলো দুদ্দাড় ক'রে দিয়ে যাচ্চে। এই ঝড়-বৃষ্টি-বাদলে বেশ একটি ছুটীর ভাব এনেছে— সেই কর্ম্মপরায়ণ পশ্চিম দেশে এই ভাবটা ঠিক অনুভব কর্‌তে পার্‌বেন না। একে ত সপ্তাহের মধ্যে সাত দিন কাজ করিনে— তার পরে আবার যেদিন একটু বাদ্‌লা হয়, বা শরতের রৌদ্র ওঠে, বা দক্ষিণের হাওয়া বয়, সেদিন আরও বেশী ছুটী নিতে ইচ্ছে হয়। আমি ঘরের দরজা খুলে শার্সিগুলো বন্ধ ক'রে ব'সে আছি— ঝর্‌ঝর শব্দে প্রবল বেগে বৃষ্টি পড়্‌চে।

পত্রোত্তর দানের বিশ্বাস হ'তে যদি নিষ্কৃতি পেতে ইচ্ছা **করেন তাহ'লে আর্য্যার শরণাপন্ন হবেন**— *তিনি যদি আপনার* হ'য়ে উত্তর দেন তাহ'লে আমার কোন নালিশ থাক্‌বে না। তাঁকে আমার সাদর অভিবাদন জানাবেন। আপনি যে কাজে গেছেন তার প্রত্যেক টুক্‌রো খবরটুকু পর্য্যন্ত আমার কাছে পরম উপাদেয়, এটুকু মনে রাখ্‌বেন। কে কি বল্‌চে, কি লিখ্‌চে, কি হচ্ছে সমস্ত আদ্যোপান্ত জান্‌বার জন্যে সতৃষ্ণ হ'য়ে আছি। ইতি ১লা আশ্বিন [১৩০৭]

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫

[অক্টোবর বা নভেম্বর ১৯০০]

বন্ধু

সীজার যে নৌকায় চড়েন সে নৌকা কি কখনও ডুবিতে পারে? মহৎ কর্ম্ম আপনাকে আশ্রয় করিয়া আছে, আপনাকে অতি শীঘ্র সারিয়া উঠিতে হইবে।

আমার একটি ভ্রাতুষ্পুত্র সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত বলিয়া আমি কলিকাতায় আসিয়াছি— প্রায় আট রাত্রি ঘুমাইতে অবসর পাই নাই। তাই আজ মাথার ঠিক নাই— শরীর অবসন্ন। কাল হইতে তাহার বিপদ কাটিয়াছে বলিয়া আশ্বাস পাইয়াছি এখন নিজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার সময় আসিয়াছে। মনে করিয়াছি দুই-চারি দিন বোলপুর শান্তি-নিকেতনে যাইব।

আমার সমস্ত ছোট গল্প একত্র ছাপিতে প্রবৃত্তি হইয়াছে। প্রথম খণ্ড বাহির হইয়াছে দ্বিতীয় খণ্ডের অপেক্ষায় আপনাকে পাঠাইতে পারি নাই। এক্ষণে, আপনার প্রস্তাব উপলক্ষ্যে প্রথম খণ্ডই পাঠাইতেছি। দ্বিতীয় খণ্ডেই অধিকাংশ ভাল গল্প বাহির হইবে। প্রথম খণ্ডে তর্জ্জমার যোগ্য গল্প বোধ হয় নিম্ন কয়েকটি হইতে পারে:— পোষ্টমাষ্টার, কঙ্কাল, নিশীথে, কাবুলিওয়ালা এবং প্রতিবেশিনী। কিন্তু Mrs. Knight-এর রচনানৈপুণ্যের প্রতি আমার বড় একটা আস্থা নাই।

ত্রিপুরার মহারাজকে আপনার সমস্ত খবরই আমি

পাঠাইয়া থাকি। আপনার প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধার পরিচয় পাইয়া আমি বড়ই আনন্দ লাভ করিয়াছি। তিনি বলিয়া পাঠাইয়াছেন আপনার কার্য্যের সহায়তার জন্য তাঁহার পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত দানের অপেক্ষা আরো অনেকটা দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।

বিলাতে কাজ লওয়া সম্বন্ধে কি স্থির করিলেন? এ সম্বন্ধে আমার মত পূর্ব্বেই বলিয়াছি— আপনি দ্বিধামাত্র করিবেন না। আপনার সফলতার পথে যদি আপনার স্বদেশও অন্তরায় হয় তবে তাহাকেও ক্ষুণ্ণ মনে বিদায় দিতে হইবে।

শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত। একান্ত মনে প্রার্থনা করি সুস্থ হইয়া উঠুন।

আপনার চিরন্তন
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬

২০ নভেম্বর ১৯০০

ওঁ কলিকাতা

বন্ধু

কিছুকাল থেকে সাংসারিক নানা কাজে আমাকে কলকাতায় বদ্ধ থাকতে হয়েচে। কিন্তু কলকাতায় আমার সুখ নেই। পূর্ব্বে এখানে যখন আস্‌তুম তোমাদের ওখানেই সর্ব্বপ্রথমে ছুটে যেতুম, এবারে সে-রকম আগ্রহের সঙ্গে কোনখানে যাবার নেই। আজ প্রভাতেই তোমার চিঠিখানি পেয়ে তোমার সঙ্গে আবার দেখা হল— তোমার সেই ছোট ঘরটি থেকে তোমার আলাপগুঞ্জন যেমন আমি হৃদয়ে পূর্ণ করে নিয়ে আস্‌তুম নিজেকে আজও সেই রকম পূর্ণ বোধ করচি। এক এক সময় সাংসারিক নানা ঝঞ্ঝাটে হৃদয় অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে, কাজ করবার শক্তি শতধা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তখন তোমার সঙ্গে আলাপ করে এলে কর্ত্তব্যের গৌরব পুনর্ব্বার নিজের অন্তরের মধ্যে অনুভব করতে পারি— সংসারের সমস্ত জটিল বাধা তুচ্ছ করবার মত বল মনের মধ্যে সঞ্চয় করি। তোমার চিঠিতেও আজ অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্যও আমার সংসারবন্ধন লঘু হল।

ত্রিপুরার মহারাজ এখন কলকাতায়। তোমার সফলতায় তিনি যে কি রকম আন্তরিক আনন্দ অনুভব করেন তা তোমাকে আর কি বল্‌ব! বাস্তবিক তিনি যে হৃদয়ের সঙ্গে

তোমাকে শ্রদ্ধা করেন এতেই তিনি বিশেষরূপে আমার হৃদয় আকর্ষণ করেচেন। আজ তোমার চিঠি নিয়ে তাঁর ওখানে যাব— তিনি খুব খুসি হবেন। তুমি তাঁকে অল্পদিন হল যে চিঠি লিখেছিলে সেখানি পেয়ে তিনি যেন বিশেষ সম্মানিত হয়ে উঠেছিলেন এমনি উৎফুল্ল হয়েছিলেন। কোনরূপে তোমাকে সহায়তা করবার জন্যে তিনি যেন ব্যগ্র হয়ে আছেন।

লোকেনকে আমার গল্প তর্জ্জমার জন্যে ধরেছি— কিন্তু সে নিতান্ত কুঁড়ে এবং নিজের শক্তির প্রতি বিশ্বাসহীন। সেই জন্যে তাকে কোন কাজে প্রবৃত্ত করাতে পারি নে। সে এখন আমার কাব্যনির্ব্বাচনে ব্যস্ত আছে। তার সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করে তাকে পরাস্ত করেছি— তার অনেকগুলি সখের কবিতা এই Selection থেকে নির্ব্বাসিত করে বইটাকে সর্ব্বসাধারণের গ্রহণযোগ্য করে তোলা গেছে— এখনো দুই এক জায়গায় একটু আধটু কণ্টক লুকিয়ে আছে—সে আর পারা গেল না।

আমি আজকাল নানা গোলমালের মধ্যে "নৈবেদ্য" বলে এক একটি কবিতা প্রত্যহ আমার কোন এক অবসরে লিখে ফেলে আমার অন্তর্য্যামীকে নিবেদন করে দিই। আমার জীবনের সমস্ত কৃত কর্ম্মের সমস্ত চিন্তিত সংকল্পের সমস্ত দুঃখ-সুখের কেন্দ্রস্থলে যিনি ধ্রুব নিশ্চলভাবে বিরাজ করচেন এবং সেই সঙ্গে সমস্ত অণুপরমাণু সমস্ত বিরাট জগৎমণ্ডলের যিনি একটিমাত্র ঐক্যস্থল— তাঁর কাছে নির্জ্জনে গোপনে প্রত্যহ জীবনের একটি একটি দিন সমর্পণ করে দিচ্চি। সে দিনগুলিকে

যদি কর্ম্মের দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিতে পারতুম তাহলেই ভাল হত কিন্তু অন্তত তাতে পত্রপুটে ফুলের মত একটি করে গান সাজিয়ে আমার জীবনের নদীর ঘাটে সেই সমুদ্রের উদ্দেশে ভাসিয়ে দিয়েও সুখ আছে। শীঘ্রই এগুলো ছাপ্‌তে দেব— বোধ হয় তুমি ইংলণ্ডে থাক্‌তে থাক্‌তেই পাবে। কিন্তু সেখানকার কর্ম্ম-কোলাহলের মধ্যে আমাদের ভারতবর্ষের নির্জ্জন দেবা-লয়ের এই গানগুলি ঠিক সুরে বাজ্‌বে কি না জানি নে— এর আনন্দ এবং বিষাদ এবং শান্তি সেখানে কি রকম শোনাবে?

মহারাজের সঙ্গে দেখা করে এলুম— তাঁকে তোমার চিঠি শোনালুম— তিনি ভারি খুসি হলেন। আচ্ছা, তুমি এদেশে থেকেই যদি কাজ করতে চাও তোমাকে কি আমরা সকলে মিলে স্বাধীন করে দিতে পারি নে? কাজ করে তুমি সামান্য যে টাকাটা পাও সেটা যদি আমরা পূরিয়ে দিতে না পারি তা হলে আমাদের ধিক্। কিন্তু তুমি সাহস করে এ প্রস্তাব কি গ্রহণ করবে? পায়ে বন্ধন জড়িয়ে পদে পদে লাঞ্ছনা সহ্য করে তুমি কাজ করতে পারবে কেন? আমরা তোমাকে মুক্তি দিতে ইচ্ছা করি— সেটা সাধন করা আমাদের পক্ষে যে দুরূহ হবে তা আমি মনে করি নে। তুমি কি বল?

অনেক দিন বিরহী আছি— শিলাইদহের নীড়টির জন্যে প্রাণ কাঁদচে। ৫ই অগ্রহায়ণ ১৩০৭

তোমার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২ ডিসেম্বর [১৯০০]

ওঁ

বন্ধু,

পীড়িত ছিলাম বলিয়া কিছুদিন পত্র বন্ধ ছিল। সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়া ঘুরপাক খাইয়া বেড়াইতেছি। বিসর্জ্জন নাটকের অভিনয় হইবে; আমি রঘুপতি সাজিব, সেইজন্য সঙ্গীতসমাজের অনুরোধে পড়িয়া শিলাইদহের বিরহ স্বীকার করিয়া এই পাষাণপুরীর বন্ধনে ধরা দিয়াছি। যত পার তোমার খবর আমাকে পাঠাইবে— তন্ন তন্ন বিবরণের জন্য আমি ক্ষুধাতুর— কোন কথা সামান্য জ্ঞান করিয়া বাদ দিয়ো না। তোমার কীর্ত্তিকাহিনীর মহাভোজের কণাটুকু হইতেও আমি বঞ্চিত হইতে চাই না। ত্রিবেদী তোমার নবপ্রকাশিত পুস্তিকা হইতে একটা প্রবন্ধ লিখিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন— এ সম্বন্ধে আলোচনার জন্য তাঁহার সহিত একবার দেখা করিব।

আমার গল্পের দ্বিতীয় খণ্ড আর দিন দশেকের মধ্যেই বাহির হইয়া যাইবে। দুইখণ্ড তোমার হস্তগত হইলে নির্ব্বাচন করিবার সুবিধা হইবে। আমার রচনা-লক্ষ্মীকে তুমি জগৎ-সমক্ষে বাহির করিতে উদ্যত হইয়াছ— কিন্তু তাহার বাঙ্গলা-ভাষা-বস্ত্রখানি টানিয়া লইলে দ্রৌপদীর মত সভাসমক্ষে তাহার অপমান হইবে না? সাহিত্যের ঐ বড় মুস্কিল—

ভাষার অন্তঃপুরে আত্মীয়-পরিজনের কাছে সে যে ভাবে প্রকাশমান, বাহিরে টানিয়া আনিতে গেলেই তাহার ভাবান্তর উপস্থিত হয়। ঐখানে তোমাদের জিৎ— জ্ঞান ভাষার অপেক্ষা তেমন করিয়া রাখে না, ভাব ভাষার কাছে আপাদমস্তক বিকাইয়া আছে।

গবর্ম্মেণ্ট যদি তোমাকে ছুটি দিতে সম্মত না হয়, তুমি কি বিনা বেতনে ছুটি লইতে অধিকারী নও? যদি সে-সম্ভাবনা থাকে তবে তোমার সেই ক্ষতিপূরণের জন্য আমরা বিশেষ চেষ্টা করিতে পারি। যেমন করিয়া হোক তোমার কার্য্য অসম্পন্ন রাখিয়া ফিরিয়া আসিও না। তুমি তোমার কর্ম্মের ক্ষতি করিও না, যাহাতে তোমার অর্থের ক্ষতি না হয় সে ভার আমি লইব।

আমার গল্পের অনুবাদ ছাপাইয়া কিছু যে লাভ হইবে, ইহা আমি আশা করি না— যদি লাভ হয় আমি তাহাতে কোন দাবী রাখিতে চাহি না— তুমি যাহাকে খুসি দিয়ো।

বিসর্জ্জন নাটকের রিহার্সাল আমাকে তাগিদ করিতেছে— অতএব বিদায়। ইতি ১২ই ডিঃ [ডিসেম্বর ১৯০০]

তোমার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ

৮

[ডিসেম্বরের শেষ ১৯০০
বা জানুয়ারির প্রথম ১৯০১]

ওঁ

বন্ধু,

আমাকে তুমি কি এক দিগ্‌গজ পুরাতত্ত্বজ্ঞ বলিয়া ভ্রম করিয়াছ? প্রাচীন ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের কি পর্য্যন্ত আলোচনা হইয়াছে তাহার বিন্দু-বিসর্গও জানি না। ত্রিবেদী সেকালের জ্যোতির্বিজ্ঞান (astronomy) সম্বন্ধে দুইটি প্রবন্ধ তাঁহার "প্রকৃতি" নামক গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন— সেই গ্রন্থ তোমাকে পাঠাইয়া দিব। অন্য বিজ্ঞান সম্বন্ধে কোথাও কিছু দেখিয়াছি বলিয়া মনেই পড়ে না।

কিছু দিন রোগভোগে কাটাইয়া দিয়াছি। তাহার পর শান্তিনিকেতনের উৎসবের জন্য এক বক্তৃতা লিখিতে হইল— তাহার পরে ভারতীর জন্য "চিরকুমার সভা" লিখিতে হইল— তাহার পরে সঙ্গীত-সমাজে বিসর্জ্জন নাটকের অভিনয়ের রিহার্সাল দেওয়া গেল— আমাকে রঘুপতি সাজিতে হইয়াছিল —এই সমস্ত ঝঞ্ঝাটে বিব্রত ছিলাম।

বিসর্জ্জনের অভিনয় যখন হইতেছিল তুমি তখন সাত সমুদ্র পারে কি করিতেছিলে? উপস্থিত থাকিলে তুমি খুসী হইতে— আমিও হইতাম, বলা বাহুল্য।

বড় দাদা তাঁহার পাণ্ডুলিপি তোমাকে পাঠাইবার জন্য আমার হস্তে দিয়াছেন। কোন গণিতওয়ালাকে দিয়া একবার যাচাই করিয়া লইতে চান— নিরুৎসাহজনক কথা হইলে বলিতে কুণ্ঠিত হইও না। তাঁহার মতে ইহা কিছু জটিল ও বাহুল্যময় হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু ধৈর্য্য ধরিয়া দেখিলে ইহার মধ্যে নূতন পদার্থ মেলা অসম্ভব নহে। যদি কেহ ইহাকে [সহজ] করিবার জন্য কোন [ইচ্ছা জ্ঞাপন] করেন তাহা তিনি শিরোধার্য্য করিয়া লইবেন। অথবা কেহ যদি ইহার মর্ম্মটা রাখিয়া কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া ছাপাইতে ইচ্ছুক হন, তিনি তাহাতে সম্মত।

এবার শিলাইদহে ফিরিয়া পদ্মার চরে বোটে আশ্রয় লইব বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছি। এখন শীতের দিনে পদ্মা তাহার তীরে আমার অভ্যর্থনার জন্য শুভ্র ফরাস বিছাইয়া অপেক্ষা করিতেছে— ফস্ করিয়া তুমি একবার বেড়াইয়া যাইতে পারিলে বেশ হইত।

তোমার রবি

পুঃ— বড়দাদার এই খাতার কোন নকল নাই।

৯
জানুয়ারি ১৯০১ ?

ওঁ

বন্ধু,

অসময়ে ভারতবর্ষে ফিরিলে পাছে তোমার কর্ম্ম-সমাধা সম্বন্ধে ব্যাঘাত ঘটে এ আশঙ্কা আমি দূর করিতে পারিতেছি না। সকল প্রকারেই ত্যাগ স্বীকার করিয়া তোমাকে তোমার কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে হইবে। যে বৈজ্ঞানিক রশ্মি তোমার মাথার মধ্যে স্পন্দিত হইতেছে তাহাকে বিশ্বসংসারের গোচর করিতে হইবে। তোমার কাজে আমাদের স্বার্থ— সুতরাং সেই কার্য্য সমাধার ব্যয় আমাদেরই বহনীয়। তুমি অসময়ে তোমার কর্ম্ম অসম্পন্ন রাখিয়া ফিরিয়ো না— আমার ত এই পরামর্শ।

এখনো বোধ হয় ডাক্তারের হাতে রহিয়াছ— আমার এই চিঠি যখন পৌঁছিবে, আশা করি, ততদিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়া উঠিয়াছ। আমার একান্ত মনের প্রার্থনা এই যে, তোমার প্রদত্ত নূতন জ্ঞানালোকের দ্বারা নব শতাব্দীর আরম্ভ ভাগ অপূর্ব্ব উজ্জ্বলতা লাভ করুক।

তোমার রবি

১০
মে ১৯০১

ওঁ

বন্ধু,

অনেক দিন তোমার পত্র পাই নাই, আমিও লিখি নাই। তুমি লেখ নাই তাহার ভাল জবাবদিহি আছে— আমি যে লিখি নাই তাহার কারণ অতি ক্ষুদ্র অথচ বিপুল। নানা সাংসারিক সঙ্কটে বিজড়িত হইয়া আমি অত্যন্ত পীড়িত চিত্তে আছি— কোন রকমে মনের অবসাদ ঝাড়িয়া ফেলিয়া লেখা-পড়ায় মন দিতে চাই— কিন্তু কম্‌লি নেই ছোড়্‌তা।

শরীরটা কিছু ক্লিষ্ট হওয়ায় সম্প্রতি মহারাজের সঙ্গে দার্জ্জিলিঙে আসিয়াছি। তাঁহার আতিথ্যে ও প্রকৃতির শুশ্রূষায় শরীর ও মনের স্বাস্থ্য লাভ করিব প্রত্যাশা করিতেছি। কিন্তু অধিক দিন থাকিবার সম্ভাবনা নাই। কেন নাই, সে খবরটা তোমাকে দেওয়া যাক।

বেলার বিবাহ এই মাসেই স্থির হইয়াছে। আর তিন সপ্তাহ মাত্র অবশিষ্ট আছে। আমি এমনি হতভাগ্য, আমার কোন বন্ধুই বিবাহে উপস্থিত থাকিবেন না। তুমি বিলাতে, লোকেন তথৈবচ, মহারাজ সে-সময় বোধ করি আগরতলায়, নাটোর নীলগিরিতে। আমার গৃহে এই প্রথম বড় কাজ— কিন্তু তোমাদের অভাবে আমার উৎসব নিরানন্দ হইবে।

কিন্তু তুমি এমন কোনও তারহীন বিদ্যুদ্-যান এখনো কি প্রস্তুত কর নাই যাহা অবলম্বন করিয়া বন্ধুর আনন্দ-উৎসবে প্রসন্ন মঙ্গলহাস্য বিকীর্ণ করিতে পার? নব দম্পতিকে আশীর্ব্বাদ করিয়ো।

তোমাকে একটি কাজের ভার দিতে চাই। যুবরাজের জন্য বিলাত হইতে একটি ভাল শিক্ষক নির্ব্বাচন করিয়া পাঠাইতে হইবে। যুবরাজ ত্রিপুরা হইতে দূরে থাকিয়া সম্পূর্ণ তাঁহার শাসনাধীনে শিক্ষালাভ করিবেন। শিক্ষকটি বিজ্ঞানবিৎ হইলেই ভাল হয়। এরূপ গুরুতর দায়িত্ব স্কন্ধে লইতে তুমি সঙ্কোচ বোধ করিবে, আমি জানি; কিন্তু তবু তোমাকে লইতে হইবে। অবশ্য, তুমি যাহাকে ভাল মনে করিয়া বাছিয়া দিবে ভারতবর্ষের জলহাওয়ার গুণে দুই দিনেই সে মন্দ হইয়া দাঁড়াইতে পারে— মহারাজা সেজন্য তোমাকে দোষী করিবেন না। বর্ত্তমানে তুমি যাঁহাকে যোগ্য এবং ভাল মনে করিবে, যিনি যুবরাজকে যথোচিত সংযমে রাখিতে পারিবেন, অথচ অনাবশ্যক উদ্ধত হইবেন না এমন একটি লোক দেখিয়া, তাহার বেতন প্রভৃতি কিরূপ হইতে পারে জানিয়া লিখিবে।

বঙ্গদর্শন কাগজখানি পুনর্জ্জীবিত হইতেছে। আমাকে তাহার সম্পাদক করিয়াছে। মহারাজও এই পত্রটিকে আশ্রয় দান করিয়াছেন। কন্যাকে বিদায় দিয়া এই পত্রের প্রতি মন দিতে হইবে।

তোমাকে বেলার হাতে কপি-করা একখানি কবিতার খাতা পাঠাইয়াছি, নিশ্চয় পাইয়াছ।

বন্ধুজায়াকে আমার নববর্ষের সাদর অভিবাদন জানাইবে। শুনিলাম, তিনি অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিতে প্রবাসী বাঙ্গালীকে মাছের ঝোল ভাত খাওয়াইয়া পুণ্য লাভ করিতেছেন— তাঁহার মাছের ঝোল এখনও ভুলি নাই।

তোমার রবি

পুনশ্চ— মহারাজ আবার তোমাকে বলিবার জন্য আমাকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেন— তিনি এ বিষয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন— তোমাকে পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিতে চাহেন। শিক্ষকটির বাসস্থান ও আহারাদির খরচ নিজে হইতে লাগিবে না। কুচবিহার বলেন, বেতন পাঁচ শত হইতে আরম্ভ করিয়া আট শত পর্য্যন্ত হওয়াই নিয়ম। যদি তার চেয়ে অধিক দিতে হয় ও নির্দ্দিষ্ট সময় বাঁধিয়া দিতে হয় তাহাও চলিতে পারিবে।

১১
২১ মে ১৯০১

ওঁ

শিলাইদহ
২১শে মে
১৯০১

বন্ধু

অনেকদিন থেকে তোমার চিঠির জন্যে প্রত্যাশিত হয়ে ছিলুম। আজ পেয়ে খুব খুসি হলুম। পাছে তোমার কাজের লেশমাত্র ক্ষতি হয় সেই জন্যে আমি তোমাকে কখন তাগিদ করি নে।

পৃথিবীকে সর্ব্বত্র চিম্‌টি কাটবার যে উপায় তুমি বের করেছ সেইটে পড়ে গর্ব্ব অনুভব করা গেল। এতদিন জড় পদার্থ আমাদের বিধিমতে পীড়ন করে আস্‌ছিলেন এবারে তোমার কল্যাণে তাদের উপর প্রতিশোধ নিতে পারব। তাদের দেদার চিম্‌টি কাট আর বিষ খাওয়াও— ওগুলোকে কোনমতে ছেড়োনা। এখন থেকে আদালতে যদি অপরাধী জড় পদার্থের বিচার হয় তাহলে বিচারক তাদের চিমটি দণ্ড বিধান কর্ত্তে পারবে।

যদি পাঁচ ছ বৎসর তোমাকে বিলাতে থাক্‌তে হয় তুমি তারই জন্যে প্রস্তুত হোয়ো, অনর্থক ভারতবর্ষের ঝঞ্ঝাটের মধ্যে এসে কাজ নষ্ট কোরো না। তুমি আমাকে একটু বিস্তারিত করে লিখো এই ৫।৬ বৎসর সেখানে থাকতে গেলে ঠিক কি পরিমাণ সাহায্য তোমার দরকার হবে। আমার

ওঁ

শিলাইদহ
২১শে মে
১৯০১

বন্ধু

অনেকদিন থেকে তোমার চিঠির জন্যে প্রত্যাশিত হয়ে ছিলুম। আজ পেয়ে খুব খুসি হলুম। যাতেই তোমার কাজের লেশমাত্র ক্ষতি হয় সেই জন্যে আমি তোমাকে কখন তাগিদ করিনে।

পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিজ্ঞানসভায় যে উৎসাহ তুমি বের করেচ সেইটে যতই গর্ব্ব অনুভব করা গেল। একদিন যত যথার্থ আমাদের বিরুদ্ধমতে পীড়ন ক'রে আসচিলেন এবারে তোমার কল্যাণে তাঁদের উচিত প্রতিশোধই নিতে পারব। তাঁদের দেওয়া বিজ্ঞানকথা আর কিছু ধারওধার — ওগুলোকে কোনমতে ফেরানো।

এসব থেকে আদালতে যদি অপরাধী
গুড ফাদারদের বিচার হয় তাহলে
বিচারক তাদের ফাঁসি দণ্ড বিধান করে
পারবে।

যদি পাঁচ ছ বছর তোমাকে বিলাতে
থাকতে হয় তুমি তবে যেন প্রস্তুত হোয়ো,
সর্বদা ভারতবর্ষের সম্মানের মর্য্যাদা রেখে
তাকে নষ্ট কোরো না। তুমি আমাকে একটু
বিস্তারিত করে লিখো এই ৫/৬ বছর
সেখানে থাকতে গেলে ঠিক কি পরিমাণ
সাহায্য তোমার দরকার হবে। আমার
কাছে লেশমাত্র সংকোচ কোরো না।
বছরে তোমাকে কত পরিমাণে দিলে
তুমি বিনা বেতনে দীর্ঘ ছুটি নিতে পার
আমাকে লিখো। যাতে তুমি স্বচ্ছন্দে
ও নিশ্চিন্ত চিত্তে সেখানে থেকে তোমার
কাজ করতে পার আমি যা হয় তার
ব্যবস্থা করে দিতে পারব। তুমি আমাকে
খোলসা করে লিখো।

লোককে যাত্রা করে বেরিয়ে যাচ্ছি,
একদিকে সে তোমার সঙ্গে বিশ্বাস
দেখা করছে। তার প্রতি আমার
ঈর্ষা হচ্ছে। আমার ভারি ইচ্ছা করে
তোমরা সব দুইতিনে মিলে তোমার
ওখানকে মানুষের বেরাল মেরে আসুক
কাছে ঘরের কোণে একটা দুইতিনে
মধ্যে বসিয়ে দিস। আর একবার
আমি লোকেদের সঙ্গে লণ্ডনে গিয়ে
ছিলুম – তখন তোমরা কেউ সেখানে
ছিলে না – আমি দুদিন থেকেই নিতান্ত
বিরক্ত হয়ে সেখান থেকে দৌড় দিয়ে
ছিলুম। কিন্তু তোমার যদি বিলাতে
পাঁচ বছর থাকতে হয় তাহলে কি
একবার সেখানেই তোমার সঙ্গে দেখা
হবে না? আশা করি দেখা হবে।
হয়ত কোন দিন তোমার দরকার ঠিকঠাক

মাঝে যা পড়বে।

[illegible] প্রথম সংখ্যা বেরিয়েছে। নানা হাঙ্গামে আমি মন দিতে পারিনি — অনেক ভুলচুক থেকে গেছে। আমার একটার কবিতা এমন বিকৃত হয়ে গেছে যে, মানেই বোঝা যায় না। তোমাকে পাঠিয়ে দিতে বলে দেব।

তোমার [illegible]

কাছে লেশমাত্র সঙ্কোচ কোরো না। বৎসরে তোমাকে কত পরিমাণে দিলে তুমি বিনা বেতনে দীর্ঘ ছুটি নিতে পার আমাকে লিখো। যাতে তুমি স্বচ্ছন্দে ও নিশ্চিন্ত চিত্তে সেখানে থেকে তোমার কাজ করতে পার আমি বোধ হয় তার ব্যবস্থা করে দিতে পারব। তুমি আমাকে খোলসা করে লিখো।

লোকেন যাত্রা করে বেরিয়ে পড়েছে। এতদিনে সে তোমার সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা করেছে। তার প্রতি আমার ঈর্ষ্যা হচ্চে। আমার ভারি ইচ্ছা করচে আমরা জন দুই তিনে মিলে তোমার ওখানে মাছের ঝোল খেয়ে আগুনের কাছে ঘরের কোণে ঘণ্টা দুই তিনের জন্যে জমিয়ে বসি। আর একবার আমি লোকেনের সঙ্গে লণ্ডনে গিয়েছিলুম— তখন তোমরা কেউ সেখানে ছিলেনা— আমি দুদিন থেকেই নিতান্ত ধিক্কার সহকারে সেখান থেকে দৌড় দিয়েছিলুম। কিন্তু তোমার যদি বিলাতে পাঁচ ছয় বৎসর থাকা হয় তাহলে কি একবার সেখানেই তোমার সঙ্গে দেখা হবে না? আশা করচি দেখা হবে। হয় ত কোন দিন তোমার দরজায় ঠক্‌ঠক্ শব্দে ঘা পড়বে।

বঙ্গদর্শন প্রথম সংখ্যা বেরিয়েছে। নানা হাঙ্গামে আমি মন দিতে পারি নি— অনেক ভুলচুক থেকে গেছে। আমার একটা কবিতা এমন বিকৃত হয়ে গেছে তার মানেই বোঝা যায় না। তোমাকে পাঠিয়ে দিতে বলে দেব।

তোমার রবি

১২
৪ জুন [১৯০১]

ওঁ

বন্ধু,

ধন্যোহং কৃতকৃত্যোহং! তোমাদের চিঠি পাইয়া আমি প্রাতঃকাল হইতে নূতন লোকে বিচরণ করিতেছি। যে ঈশ্বর তোমার দ্বারা ভারতের লজ্জা নিবারণ করিয়াছেন আমি তাঁহার চরণে আমার হৃদয়কে অবনত করিয়া রাখিয়াছি। কোন্ দিক্ দিয়া তিনি আমাদের দেশকে গৌরবান্বিত করিবেন অদ্য আমি তাহার অরুণাভামণ্ডিত পথ দেখিতেছি। তোমার নিকট পূজা প্রেরণ করিবার জন্য আমার অন্তঃকরণ উন্মুখ হইয়া আছে— বন্ধু, আমার পূজা গ্রহণ কর! তোমার জয় হউক্। তোমাতে আমাদের দেশ জয়ী হউক্! নব্য ভারতের প্রথম ঋষিরূপে জ্ঞানের আলোকশিখায় নূতন হোমাগ্নি প্রজ্বলিত কর।

তোমাকে বারম্বার মিনতি করিতেছি— অসময়ে ভারতবর্ষে আসিবার চেষ্টা করিও না। তুমি তোমার তপস্যা শেষ কর— দৈত্যের সহিত লড়াই করিয়া অশোকবন হইতে সীতা-উদ্ধার তুমিই করিবে, আমি যদি কিঞ্চিৎ টাকা আহরণ করিয়া সেতু বাঁধিয়া দিতে পারি তবে আমিও ফাঁকি দিয়া স্বদেশের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিব।

বেলার বিবাহের আর ১০।১১ দিন বাকি আছে। তোমার জয়সংবাদে আমার সেই উৎসব দ্বিগুণতর উৎসবময় হইয়া উঠিয়াছে। আমার সংসার মধ্যে তুমি তোমার অদৃশ্য কিরণের আলোক জ্বালিয়া দিয়াছ। অনেক ঝঞ্ঝাটের মধ্যে পড়িয়াছিলাম —আমি সমস্তই ভুলিয়া গিয়াছি। আমার একান্ত দুঃখ রহিল তোমার জয়ক্ষেত্রে আমি উপস্থিত থাকিতে এবং তোমার জয়লাভের পরে তোমার হস্তস্পর্শ করিতে পারিলাম না।

তোমার ক্ষুদ্র বন্ধু মীরাকে তোমার জয়সংবাদ দিলাম, সে কিছুই বুঝিল না। যখন বুঝিবার বয়স হইবে তখন স্মরণ করিয়া খুসী হইবে।

এইবার বিবাহের আয়োজনে মন দেইগে। ইতি—
২১শে জ্যৈষ্ঠ। [১৩০৮]

তোমার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ

১৩
৩ জুলাই ১৯০১

ওঁ

৩রা জুলাই
১৯০১

বন্ধু

আমার কন্যার প্রতি তোমার আশীর্ব্বাদসহ সুন্দর উপহারখানি পাইয়া আনন্দলাভ করিলাম। তোমার হস্তাক্ষর-সহ এই গ্রন্থখানি বেলা উপযুক্ত আদর করিয়া পড়িবে ও রাখিবে সন্দেহ নাই। আমার জামাতাটি মনের মত হইয়াছে। সাধারণ বাঙালির ছেলের মত নয়। ঋজুস্বভাব, বিনয়ী অথচ দৃঢ়চরিত্র, পড়াশুনা ও বুদ্ধিচর্চ্চায় অসামান্যতা আছে— আর একটি মহদ্‌গুণ এই দেখিলাম, বেলাকে তাহার ভাল লাগিয়াছে। এইবার শিলাইদহ হইতে ফিরিয়া গিয়া বেলাকে মজঃফরপুরে তাহার স্বামীগৃহে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিতে হইবে।

লোকেন বিলাতে গিয়া এমনি মাতিয়া আছে যে, আমাকে কিম্বা বেলাকে একটা ছত্র চিঠিও লিখিল না। তোমার সঙ্গে কি তাহার দেখা সাক্ষাৎ হইয়া থাকে?

আমি সাহসে ভর করিয়া ইলেকৃট্রিশ্যান্ প্রভৃতি হইতে সংগ্রহ করিয়া শ্রাবণের বঙ্গদর্শনের জন্য তোমার নব আবিষ্কার সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছি। প্রথমে জগদানন্দকে লিখিতে

দিয়াছিলাম— পছন্দ না হওয়াতে নিজেই লিখিলাম। ভুলচুক থাকার সম্ভাবনা আছে— দেখিয়া তুমি মনে মনে হাসিবে।

আষাঢ়ের বঙ্গদর্শনে যেটুকু আভাস দিয়াছিলাম তাহা বোধ হয় বৈজ্ঞানিক হিসাবে যথাযথ হয় নাই— তখন ইলেক্‌ট্রিশ্যান্ দেখিতে পাই নাই।

তুমি আরো কিছুকাল বিলাতে থাকিয়া যাইবার কিরূপ ব্যবস্থা করিয়াছ খবর দিলে না কেন? আমি সেকথা জানিতে উৎসুক হইয়া আছি। অন্যান্য সভায় তোমার মত প্রচার কি ভাবে অগ্রসর হইতেছে তাহাও জানিবার জন্য আমাদের মন উৎকণ্ঠিত। জর্ম্মানি ও অ্যামেরিকায় যাইবার কোনপ্রকার সুযোগ করিতে পারিবে না কি? তুমি যদি দীর্ঘ-কাল য়ুরোপে থাক তবে যেমন করিয়া হোক্ একবার সেখানে গিয়া তোমার সঙ্গে দেখা করিয়া আসিব।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। খুব বর্ষা পড়িয়াছে।

তোমার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ

১৪
২৫ জুলাই [১৯০১]

ওঁ　　　২৫শে জুলাই [১৯০১]

বন্ধু,

তোমার কর্ম্ম কেন সম্পূর্ণ সফল না হইবে? বাধা যতই গুরুতর হউক তুমি যে-ভার গ্রহণ করিয়াছ তাহা সমাধা না করিয়া তোমার নিষ্কৃতি নাই; সেজন্য যে কোন প্রকার ত্যাগ-স্বীকার প্রয়োজন তাহা তোমাকে করিতে হইবে। একথা তোমাকে ছাড়া আর কাহাকেও অসঙ্কোচে বলিতে পারিতাম না। বলিতে পারিতাম না যে, দারিদ্র্য, অর্থসঙ্কট, সাংসারিক অবনতি গ্রহণ কর। আমি নিজে হইলে হয়ত পারিতাম না— কিন্তু তোমাকে আমি নিজের চেয়ে বড় দেখি বলিয়াই তোমার কাছে দাবীর সীমা নাই। তুমি যাহা আবিষ্কার করিতেছ ও করিবে তাহাতে জগতের যে-শিক্ষা লাভ হইবে, কর্ত্তব্যের অনুরোধে যে-দুঃখভার গ্রহণ করিবে তাহাতে তাহার চেয়ে কম শিক্ষা দিবে না। আমাদের মত বিষয়পরায়ণ সাবধানী, নিষ্ঠাবিহীন, ক্ষুদ্র লোকদের পক্ষে এই দৃষ্টান্ত, এই শিক্ষা একান্তই আবশ্যক হইয়াছে। ... ... তুমি যদি ফার্লো না পাও তবে একবার এখানে আসিয়ো। যথাসাধ্য ভাল বন্দোবস্ত করিয়া একেবারে যাত্রা করিয়া রণক্ষেত্রে বাহির হইবে। ইহা ছাড়া আর কি পরামর্শ দিতে পারি? একবার দেখা পাইলে বড় আনন্দিত হইব— না

যদি পাই, তবু, তুমি তোমার কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারিতেছ এই খবর পাইলে আর কিছুই চাই না। তোমার উপরে আমার একান্ত নির্ভর আছে—বর্ত্তমান য়ুরোপ তোমাকে গ্রহণ করিল কি না তাহা লইয়া আমি অতিমাত্র উৎকণ্ঠিত হইতেছি না— তুমি যাহা দেখিতে পাইয়াছ তাহা বৈজ্ঞানিক মায়া-মরীচিকা নহে তাহাতে আমার সন্দেহমাত্র, দ্বিধামাত্র নাই। তোমার উদ্ভাবিত সত্য একদিন বৈজ্ঞানিক সিংহাসনে অভিষিক্ত হইবে— সেদিনের জন্য ধৈর্য্য ধরিয়া অপেক্ষা করিতে পারিব।

ইতিমধ্যে তুমি একবার জার্ম্মানি বা আমেরিকায় যাইতে পারিলে বেশ হইত। এবারে না হয় আর একবার চেষ্টা দেখিতে হইবে।

কন্যাকে ইতিমধ্যে স্বামীগৃহে রাখিয়া আসিলাম। পথের মধ্যে কিছুদিন শান্তিনিকেতনে বাস করিয়া আরাম লাভ করিয়াছি। সেখানে একটা নির্জ্জন অধ্যাপনের ব্যবস্থা করিবার চেষ্টায় আছি। দুই একজন ত্যাগ-স্বীকারী ব্রহ্মচারী অধ্যাপকের সন্ধানে ফিরিতেছি।

তোমার রবি

১৫

[অগস্ট ১৯০১]

ওঁ

বন্ধু,

আজ রমেশবাবুর চিঠি পাইয়া বিশেষ উৎসাহিত হইয়াছি। তোমার প্রতি, সুতরাং স্বদেশের প্রতি, তাঁহার সহৃদয় অনুরাগে আমার হৃদয় স্পর্শ করিল। আমার সেই এক কথা। বিলাতে থাকিয়া তোমাকে স্বাধীন ভাবে কর্ম্ম সমাধা করিতে হইবে। একবার কেবল দুই তিন মাসের জন্য দেশে ফিরিয়া এসো— তোমার সঙ্গে একবার সকল কথা পরিষ্কার-রূপে আলোচনা করিয়া লইতে চাই।

তোমার স্পন্দন-রেখার খাতাখানি পাইয়া অনেকটা পরিষ্কার ধারণা হইল। বঙ্গদর্শনে এইগুলি খোদাইয়া ছাপাইবার ইচ্ছা আছে।

তোমার সঙ্গে শীঘ্র দেখা হইবার সম্ভাবনার কল্পনা করিয়া আগ্রহান্বিত হইয়া আছি।

তোমার রবি

উপবিষ্ট : জগদীশচন্দ্র, লোকেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ
দণ্ডায়মান : রথীন্দ্রনাথ, মহিমচন্দ্র ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৬ সংখ্যক পত্রে উল্লিখিত 'শিলাইদহের গ্রুপ'

বিলাতে জগদীশচন্দ্র। ১৯০১

১৬ সংখ্যক পত্রে উল্লিখিত

১৬

[অগস্ট ১৯০১]

বন্ধু,

তোমার ছবি আজ পাইয়া বড় খুসী হইলাম। ভারি সুন্দর ছবি হইয়াছে— এ ছবি আমার লিখিবার ঘর বিভূষিত করিয়া থাকিবে। কিছু দিন পূর্ব্বে সাহিত্যে তোমার ছবি ছাপিবার জন্য সমাজপতি তোমার ফোটো চাহিয়া পাঠাইয়াছিল। আমাদের শিলাইদহের গ্রুপ ছাড়া তোমার ছবি আমার কাছে ছিল না। সেটা তেমন ভাল না, কিন্তু অগত্যা সেইটেই সমাজপতিকে দিতে হইয়াছে। তোমার এ ছবিখানি চাহিলেও আমি দিতাম না— কারণ, চুরি করিতে অনেক ভদ্রলোক সঙ্কোচ বোধ করেন বটে, কিন্তু জিনিষ ধার লইয়া ফিরাইয়া না দেওয়াকে তাঁহারা অপহরণের নামান্তর বলিয়া জানেন না। তোমার প্রেরিত আশা ছবিখানিও ভাবে পূর্ণ। ভারতবর্ষীয় আশার সপ্ততন্ত্রী বীণার মধ্যে কোন্ তারটা অবশিষ্ট আছে? ধর্ম্ম, না, কর্ম্ম; ধ্যান, না, জ্ঞান; বিদ্যা, না, উদ্যম?

শান্তিনিকেতনে আমি একটি বিদ্যালয় খুলিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছি। সেখানে ঠিক প্রাচীন কালের গুরুগৃহ-বাসের মত সমস্ত নিয়ম। বিলাসিতার নাম-গন্ধ থাকিবে না— ধনী দরিদ্র সকলকেই কঠিন ব্রহ্মচর্য্যে দীক্ষিত

৬।।৪

হইতে হইবে। উপযুক্ত শিক্ষক কোন মতেই খুঁজিয়া পাইতেছি না। এখনকার কালের বিদ্যা ও তখনকার কালের প্রকৃতি একত্রে পাওয়া যায় না। স্বার্থ-চেষ্টা এবং আড়ম্বর হইতে কোন মহৎ কার্য্যকে বিচ্যুত করিতে গেলে কাহারো মুখরোচক হয় না। এতদিনকার ইংরেজি বিদ্যায় আমাদের কাহাকেও যথার্থ কর্ম্মযোগী করিতে পারিল না কেন? মহারাষ্ট্র দেশে ত তিলক ও পরঞ্জ্পে আছে, আমাদের এখানে সে-রকম ত্যাগী অথচ কর্ম্মী নাই কেন? ছেলেবেলা হইতে ব্রহ্মচর্য্য না শিখিলে আমরা প্রকৃত হিন্দু হইতে পারিব না। অসংযত প্রবৃত্তি এবং বিলাসিতায় আমাদিগকে ভ্রষ্ট করিতেছে— দারিদ্র্যকে সহজে গ্রহণ করিতে পারিতেছি না বলিয়াই সকল প্রকার দৈন্যে আমাদিগকে পরাভূত করিতেছে। তুমি যদি ইতিমধ্যে একবার এখানে এস তবে তোমাকে লইয়া আমার এই কাজটি পত্তন করিতে হইবে।

বিংশ শতাব্দীতে নৈবেদ্যের যে-সমালোচনা বাহির হইয়াছে তোমাকে পাঠাই। নৈবেদ্যকে আমি আমার অন্যান্য বইয়ের মত দেখি না। লোকে যদি বলে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না বা ভাল হয় নাই তবে তাহাতে আমার হৃদয় স্পর্শ করে না। নৈবেদ্য যাঁহাকে দিয়াছি তিনি যদি উহাকে সার্থক করেন তবে করিবেন— আমি উহা হইতে লোকস্তুতি বা লোকনিন্দার কোন দাবীই রাখি না।

সেদিন সরস্বতী নামক এক হিন্দি কাগজে দেখিলাম,

আমার "মুক্তির উপায়" নামক ছোট গল্পটি তর্জ্জমা করিয়াছে। হিন্দিতে পড়িতে বেশ লাগিল— রস কিছুই নষ্ট হয় নাই।

একটা খবর তোমাদের দেওয়া হয় নাই। হঠাৎ আমার মধ্যম কন্যা রেণুকার বিবাহ হইয়া গেছে! একটি ডাক্তার বলিল, বিবাহ করিব— আমি বলিলাম, কর। যেদিন কথা তার তিন দিন পরেই বিবাহ সমাধা হইয়া গেল। এখন ছেলেটি তাহার অ্যালোপ্যাথি ডিগ্রির উপর হোমিওপ্যাথিক চূড়া চড়াইবার জন্য অ্যামেরিকা রওনা হইতেছে। বেশী দিন সেখানে থাকিতে হইবে না। ছেলেটি ভাল, বিনয়ী, কৃতী।

ভয় নাই— তোমার বন্ধুটিকে তোমার প্রতীক্ষায় রাখিব। ফস্ করিয়া তাহাকে হস্তান্তর করিব না।

তোমার রবি

১৭
[সেপ্টেম্বর ১৯০১]

ওঁ

বন্ধু

আজ মিস্ নোব্‌লের চিঠিতে তোমার কথা পড়িয়া অত্যন্ত আনন্দ পাইয়াছি। আমরা এখন বোলপুরে শান্তিনিকেতনে বাস করিতেছি। তুমি এখানে কখনো আস নাই। জায়গাটি বড় রমণীয়। আলোকে আকাশে বাতাসে আনন্দে শান্তিতে যেন পরিপূর্ণ। এখানকার আকাশে চলিবার ফিরিবার সময় নিয়ত যেন একটি মঙ্গলের স্পর্শ অনুভব করি। এখানে জীবন বহন করা নিতান্তই সহজ ও সরল। কলিকাতার আবর্ত্তের মধ্যে আমার আর কিছুতেই ফিরিতে ইচ্ছা করে না। এখানে নিভৃতে নির্জ্জনে ধ্যানে ও প্রেমে নিজের জীবনকে ধীরে ধীরে বিকশিত করিয়া তুলিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ জন্মিয়াছে। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি এখানে একটি বোর্ডিং বিদ্যালয় স্থাপনের আয়োজন করিয়াছি। পৌষ মাস হইতে খোলা হইবে। গুটি দশেক ছেলেকে আমাদের ভারতবর্ষের নির্ম্মল শুচি আদর্শে মানুষ করিবার চেষ্টায় আছি।

ত্রিপুরার মহারাজ কাল আমার কাছে একটি কর্ম্মচারী পাঠাইয়াছেন। তোমার সম্বন্ধে আমার সঙ্গে বিস্তারিত আলাপ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। আমি আর দিন দশ বারো পরে ত্রিপুরায় গিয়া মহারাজের সঙ্গে দেখা

করিব। তোমার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাগুণে মহারাজ আমার হৃদয় দ্বিগুণ আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার শ্রেণীর লোকের পক্ষে এরূপ বিনীত গুণগ্রাহিতা অত্যন্ত বিরল।

এখন ত তুমি প্রবাসেই থাকিয়া গেলে। দীর্ঘকাল তোমার বিচ্ছেদ বহন করিতে হইবে। বিলাতে যাইবার লোভ এখন আমার মনে নাই— কিন্তু একবার তোমার সঙ্গে দেখা করিয়া কথাবার্ত্তা কহিয়া আসিবার জন্য মন প্রায়ই ব্যগ্র হয়। তোমার সার্ক্যুলর রোডের সেই ক্ষুদ্র কক্ষটি এবং নীচের তলায় মাছের ঝোলের আস্বাদন সর্ব্বদাই মনে পড়ে। এখন যদি ভারতবর্ষে থাকিতে তবে কিছু দিনের জন্যে তোমাকে শান্তিনিকেতনে রাখিয়া নিবিড় আনন্দ লাভ করিতাম। যদি কোন সুযোগ পাই একবার তুমি থাকিতে থাকিতে ইংলণ্ডে যাইবার বিশেষ চেষ্টা করিব। তোমার বন্ধুত্ব যে আমাকে এমন প্রবল ও গভীর ভাবে আকৃষ্ট করিবে তাহা এক বৎসর পূর্ব্বে জানিতাম না।

তোমার রবি

১৮
[অক্টোবর বা নভেম্বর] ১৯০১

ওঁ

আগরতলা
কার্ত্তিক ১৩০৮

বন্ধু

আমি তোমার কাজেই ত্রিপুরায় আসিয়াছি। এইখানে মহারাজের অতিথি হইয়া কয়েক দিন আছি। তোমার প্রতি তাঁহার কিরূপ শ্রদ্ধা তাহা ত জানই— সুতরাং তাঁহার কাছে আমার প্রার্থনা জানাইতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ অনুভব করিতে হয় নাই। তিনি শীঘ্রই বোধ হয় দুই এক মেলের মধ্যেই তোমাকে দশ হাজার টাকা পাঠাইয়া দিবেন। সে টাকা আমার নামেই তোমাকে পাঠাইব। এই বৎসরের মধ্যেই তিনি আরো দশ হাজার পাঠাইতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ইহাতে বোধ করি তুমি বর্ত্তমান সঙ্কট হইতে আপাতত উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। প্রাসাদ নির্ম্মাণ প্রভৃতি বহুব্যয়সাধ্য কার্য্যে সম্প্রতি মহারাজ জড়িত আছেন নতুবা তিনি স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া তোমাকে পঞ্চাশ হাজার পর্য্যন্ত সাহায্য করিতে পারিতেন। তাঁহার এই উৎসাহে তিনি আমার হৃদয় আরো দৃঢ়তররূপে আকর্ষণ করিয়াছেন— স্বাভাবিক ঔদার্য্যের এমন উজ্জ্বল আদর্শ আমি আর দেখি নাই। তুমি অবসাদ হইতে নিজেকে রক্ষা কর। ফললাভ করিতে তোমার যতই বিলম্ব হউক আমাদের শ্রদ্ধা এবং আন্তরিক প্রীতি সর্ব্বদাই ধৈর্য্য-

সহকারে তোমার পার্শ্বচর হইয়া থাকিবে। তোমাকে আমরা লেশমাত্র তাড়া দিতেছি না; যাহাতে কর্ম্ম সম্পূর্ণ করিবার জন্য তুমি যথোচিত বিলম্ব করিতে পার আমরা তাহারই সহায়তা করিতে প্রস্তুত হইয়াছি— আমাদের প্রতি সেই আস্থা তুমি দৃঢ় রাখিয়ো। তোমার কাছে আমরা আরো কত দাবী করিব? তুমি যাহা করিয়াছ তাহার জন্যই যদি আমরা কৃতজ্ঞ না হইতে পারি তবে আমাদিগকে ধিক্। তুমি যাহা করিয়াছ আমরা তাহার উপযুক্ত প্রতিদান কিছুই দিতে পারি না। আমি যে চেষ্টা করিতেছি তাহা কতটুকু এবং তাহার মূল্যই বা কি? এইটুকু দিয়া তোমার উপরে দাবী চালাইতে পারি না। তোমাকে হৃদয়ের গভীর প্রীতি ছাড়া আর কিছুই দিই নাই জানিবে, সে প্রীতি ধৈর্য্য ধরিতে জানে এবং প্রীতি ছাড়া আর কিছুই ফিরিয়া চাহে না। মহারাজের সম্বন্ধে এটুকু নিশ্চয় জানিয়ো তিনি তোমাকে ঋণী করিবার জন্য অর্থসাহায্য করেন নাই তিনি তোমার ঋণ পরিশোধ করিতেছেন। যিনি তোমাকে প্রতিভা দান করিয়াছেন তিনিই তোমাকে উদ্যম ও আশা প্রেরণ করিয়া সেই প্রতিভাকে সার্থক করুন!

তোমার

রবি

১৯
[এপ্রিল ১৯০২]

ওঁ

বন্ধু

তোমাকে চিঠি লিখিতে পারি নাই কিন্তু কত দিন যে তোমাকে লইয়া কাটাইয়াছি, হৃদয়ের অন্তরঙ্গ প্রদেশে তোমাকে অনুভব করিয়াছি তাহা বলিতে পারি না। আজ তোমার জয়সংবাদ পাইয়া নবমেঘগর্জ্জনপুলকিত ময়ূরের মত আমার হৃদয় নৃত্য করিতেছে। মাতাল মদের বোতলের শেষ বিন্দুটি পর্য্যন্ত যেমন পান করে তোমার চিঠির ভিতর হইতে আমি সমস্ত মত্ততাটুকু একেবারে উপুড় করিয়া ধরিয়া চাখিবার চেষ্টা করিতেছি। বহু বিলম্বে তোমার জয় হইলেও আমি হতাশ্বাস হইতাম না— তবু নগদ পাওনার প্রবল আনন্দ।

গত কাল প্যারিসে তোমার বলিবার কথা ছিল— নিশ্চয় সেখানে তোমার জয় হইয়াছে— তোমার সেই বক্তৃতাসভায় আমাদের হৃদয় উপস্থিত ছিল।

য়ুরোপের মাঝখানে ভারতবর্ষের জয়ধ্বজা পুঁতিয়া তবে তুমি ফিরিয়ো— তাহার আগে তুমি কিছুতেই ফিরিয়ো না। গারিবাল্ডি যেমন জয়ী হইয়া রণক্ষেত্র হইতে কৃষিক্ষেত্রে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন তেমনি তোমাকেও অভ্রভেদী জয়-তোরণের ভিতর দিয়া ভারতবর্ষের গভীর নির্জ্জনতার মধ্যে

দারিদ্র্যের মধ্যে আসিয়া আশ্রয় লইতে হইবে— তখন তোমাকে সকলে খুঁজিয়া লইবে তুমি কাহাকেও খুঁজিবে না— তখন তোমার কাছে আসিতে ভারতবর্ষের কাছে সকলে মাথা নত করিবে— বিদেশী ছাত্রকে ডাকিবার জন্য বিদেশের প্ল্যানে প্রাসাদ রচনা করিলে চলিবে না— মাঠের মধ্যে কুটীরের মধ্যে মৃগচর্ম্মে যে বসিবে সেই তোমাকে পাইবে। ভারতবর্ষের দারিদ্র্যকে এমন প্রবল তেজে জয়ী করিবার ক্ষমতা বিধাতা আমাদের আর কাহারো হাতে দেন নাই— তোমাকেই সেই মহাশক্তি দিয়াছেন। যেদিন স্নিগ্ধ পবিত্র প্রভাতে প্রাতঃস্নান করিয়া কাষায় বসন পরিয়া তোমার যন্ত্রতন্ত্র লইয়া বিপুলচ্ছায়া বটবৃক্ষের তলে তুমি আসিয়া বসিবে— সেদিন ভারতবর্ষের প্রাচীন ঋষিগণ তোমার জয়শব্দ উচ্চারণ করিবার জন্য সেদিনকার পুণ্য সমীরণে এবং নির্ম্মল সূর্য্যালোকের মধ্যে আবির্ভূত হইবেন। ভারতবর্ষের সমস্ত শূন্য প্রান্তর এবং উদার আকাশ তৃষিত বক্ষের ন্যায় ব্যাকুল প্রসারিত বাহুর ন্যায় সেই দিনের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি অনুসারে আমরাও সেই দিনের জন্য তপস্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছি। আমাদের রাজা যে কেহ হউক, আমাদের আকাশ, আমাদের দিগন্তবিস্তীর্ণ মাঠ কে কাড়িয়া লইবে? আমাদের জ্ঞানের অবকাশ, আমাদের ধ্যানের অবকাশ, আমাদের দারিদ্র্যের অবকাশ হইতে আমাদিগকে কে বঞ্চিত করিতে পারিবে? আমাদের দেশে

যে পরমা মুক্তির অচলপ্রতিষ্ঠা হইয়াছে— তাহা স্তব্ধ, তাহা নির্ব্বাক্, তাহা দীন, তাহা দিগম্বর, তাহা শাশ্বত— তাহাকে বলীর বাহু ও ক্ষমতাশালীর স্পর্দ্ধা স্পর্শ করিতে পারে না— ইহাই চিত্তের মধ্যে স্থিরনিশ্চয়রূপে জানিয়া শান্তমনে সন্তোষের সহিত প্রসন্নমুখে ইহারই বিরলভূষণ বিশালতার মধ্যে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। বিদেশীর কটাক্ষে আর ভ্রূক্ষেপ করিব না— তাহার ধিক্কারে আর কর্ণপাত করিব না— তাহার কাছ হইতে যে বর্ব্বর রংচং বসনভূষণ সংগ্রহ করিয়া লইয়াছিলাম তাহা তপোবনের দ্বারে আবর্জ্জনার মত ফেলিয়া দিয়া প্রবেশ করিব।

পত্রের মধ্যে আমাদের আশ্রমবৃক্ষ হইতে কালিদাসের শিরীষ পুষ্প তোমাকে পাঠাইলাম।

তোমার রবি

২০

[মে ১৯০২]

ওঁ

বন্ধু,

ঈশ্বর তোমার ললাটে বিজয়-তিলক অঙ্কিত করিয়া তোমাকে পৃথিবীতে পাঠাইয়া দিয়াছেন— তুমি কি আমাদের মত লোকের কাছ হইতে বলের বা উৎসাহের অপেক্ষা রাখ? যেখানে থাক এবং যেমন করিয়াই হউক, উল্লাসে হউক, বাধায় হউক, নৈরাশ্যে হউক, তুমি নিজেকেও ব্যর্থ করিতে পার না। যিনি ভিতরে থাকিয়া তোমার অজ্ঞাতসারে তোমার সমস্ত জীবনকে সফলতার দিকে লইয়া গেছেন তাঁহার কর্ম্মকে হঠাৎ মাঝখানে নিরর্থক করিবে কে? সীজারের নৌকা কখন ডুবে না। নিরাসক্ত ভারতবর্ষের অবিচলিত স্থৈর্য্য তোমাকে তোমার কর্ম্মের মধ্যে অনায়াসে রক্ষা করুক্। কোন ক্ষুদ্র আকর্ষণ, কোন ইচ্ছার চাঞ্চল্য তোমাকে তোমার মহৎ ব্রত হইতে ভ্রষ্ট না করুক। ভারতবর্ষের অশ্বমেধের ঘোড়া তোমার হাতে আছে, তুমি ফিরিয়া আসিলে আমাদের যজ্ঞ সমাধা হইবে। তুমি এখানে আসিয়া তপস্বী হইয়া নিভৃতে তোমার শিষ্যদিগকে জ্ঞানের দুর্গম দুর্গের গোপন পথ সন্ধান করিতে শিখাইয়া দিবে, এই আমি আশা করিয়া আছি। পড়া মুখস্থ করানো, পাশ করানো তোমার কাজ নহে— যে-অগ্নি তুমি পাইয়াছ তাহা তুমি সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিবে না— তাহা ভারতবর্ষের

হৃদয়াগারে স্থায়ী করিয়া যাইতে হইবে; বিদেশী আমাদিগকে জ্ঞানের অগ্নি যেটুকু দেয় তাহা অপেক্ষা ঢের বেশী ধোঁয়া দিয়া থাকে— তাহাতে যে কেবল আমাদের অন্ধকার বাড়ে তাহা নহে, আমাদের অন্ধতাও বাড়িয়া যায়— আমাদের দৃষ্টি পীড়িত হয়। তোমার কাছে জ্ঞানের পন্থা ভিক্ষা করিতেছি— আর কোন পথ ভারতবর্ষের পথ নহে— তপস্যার পথ, সাধনার পথ আমাদের। আমরা জগৎকে অনেক জিনিষ দান করিয়াছি, কিন্তু সে-কথা কাহারো মনে নাই— আর একবার আমাদিগকে গুরুর বেদীতে আরোহণ করিতে হইবে— নহিলে মাথা তুলিবার আর কোনো উপায় নাই। ভারতবর্ষের প্রান্তরের বটচ্ছায়ায় সেই বেদী-অধিরোহণে তোমাকে সহায়তা করিতে হইবে। সৈন্য সামন্ত, ঐশ্বর্য্য, সম্পদ, বাণিজ্য, ব্যবসায়, কিছুই আমাকে বিচলিত করে না। আমি মাঠের মাঝখানে বসিয়া সেই প্রাচীন পবিত্র বেদীর স্বপ্ন দেখিতেছি। তাহা শূন্য রহিয়াছে, আমরা শিশুর মত তাহার মাটি ভাঙিয়া পুতুল গড়িয়া খেলা করিতেছি।

তোমার রবি

২১
২০ জুন ১৯০২

ওঁ

৬ই আষাঢ় ১৩০৯
শান্তিনিকেতন
বোলপুর

বন্ধু

আষাঢ় আসিয়াছে— কিন্তু আষাঢ়ের সেই চিরন্তন নব ঘনঘটা এবার এখনো দেখা দিল না। আমরা সেইজন্য হাঁ করিয়া চাহিয়া আছি। এখানে চারিদিকে অবারিত প্রান্তর— কোথাও দৃষ্টির কোন বাধা নাই—মেঘের লীলাস্থল এমন আর নাই—এইখানেই জয়দেব বিপুলচ্ছন্দে তমালবনে বর্ষারাত্রির বর্ণনা লিখিয়াছিলেন। এখান হইতে জয়দেবের জন্মভূমি ছয় ক্রোশ —চণ্ডীদাসের জন্মভূমিও অধিক দূর নহে। এই জায়গায় ঘন বর্ষার সময় একবার তোমাকে গ্রেফ্‌তার করিতে পারিলে চমৎকার হয়। এক এক সময় বিদ্যুতের মত আমার মনে হয় যে সব কাজকে আমরা অত্যন্ত বেশি মনে করি— বক্তৃতা করি, লিখি, হাঁসফাঁস করিয়া বেড়াই, দেশ উদ্ধার করিবার ফিকির করি— এ সমস্তই বাজে কাজ। জীবনটা ইহাতে কেবল খণ্ডিত বিচ্ছিন্ন অসম্পূর্ণ হইয়া যায়। প্রেমই নিত্য, শান্তিই চিরন্তন। দুঃখ এই যে, মানুষকে ক্ষণিক ক্ষোভ সাময়িক অশান্তি কাটাইয়া এই নিত্য পরিণামের দিকে অগ্রসর হইতে হয়। এমনি করিতে করিতেই জীবনটা কাটিয়া যায়—

তখন কোথায় তুমি কোথায় আমি! সম্পূর্ণতা কেবল মরীচিকার মত আগে আগে চলে তাহার পথের আর শেষ নাই। এমন করিয়া কে আমাদিগকে কেবলি টানিয়া চলিয়াছে? একএকবার ইচ্ছা করে বিদ্রোহ করি— সব কাজকর্ম্ম ফেলিয়া মুখামুখি করিয়া বসি— হৃদয়টাকে পূর্ণ করিয়া তুলি। কিন্তু পথের আহ্বান যখন আসে তখন লক্ষ্মীছাড়া আর বসিয়া থাকিতে পারে না— আবার দৌড় আবার দৌড়! একটা পাকের মধ্যে পড়িয়া গেছি। সমস্ত বিশ্বজগৎটা একটা পাক— কেবলি ঘুরিতেছে— ঘোরাই যেন তাহার পরিণাম— মানবলোকও একটা পাক—কেবলি ঘুরিয়া চলিতেছে তাহার পরিণাম কোথায়? এই জন্যই ভগবান বুদ্ধ ব্যাকুল হইয়া এই পাক হইতে কোনমতে বাহির হইবার জন্য এত চেষ্টা করিয়াছিলেন। সমস্ত মানুষ বাহির না হইলে একজনের বাহির হইবার জো নাই। জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়া এই মানুষঘূর্ণীতে ঘুরিয়া মরিতে হয়। তোমাদের বিজ্ঞানের মতে আকাশের এক জায়গায় পাক খাইয়া জগৎ অগণ্য গ্রহতারায় ঝলকিয়া উঠিয়াছে— কোন কোন পণ্ডিত এইরূপ বলে না? এই পাকের মধ্যে অগণ্য চক্র— নক্ষত্রচক্র, সৌরচক্র, গ্রহচক্র, জীবচক্র— এই পাকের বাহিরেই স্থির শান্তি। প্রাণটা সেই-খানকার জন্য দুই হাত বাড়ায়, কিন্তু ভীষণ জগতের টান তাহাকে আপনার অনন্ত ঘূর্ণায় বার বার টানিয়া লয়। প্রেমে যেন এই পাকের মধ্যেও একটুখানি স্থিতি ও পরিপূর্ণতার

আভাস পাওয়া যায়। দুইটি হৃদয় মুখামুখি করিয়া বসিলে জগৎচক্রের ঘর্ঘরশব্দ কিছুক্ষণের জন্য যেন শোনা যায় না— তখন লাভক্ষতি সুখদুঃখ পাপপুণ্য জয়পরাজয়ের তোলাপাড়া কিছুক্ষণের জন্য ভুলিয়া থাকা যায়। কিন্তু তোমার বিজ্ঞান-দিগ্বিজয়যাত্রার সময় এই সকল কবির ক্রন্দন ঠিক নহে, এখন জয়ভেরীর বাদ্যই বাদ্য, এখন হৃদয়ের কথা হৃদয়ের মধ্যেই থাক্।

তুমি জর্ম্মনি আমেরিকায় তোমার জয়পতাকা নিখাত করিয়া আসিয়ো। তাড়াতাড়ি করিয়ো না। আমি বোধ হয় দুই এক মাসের মধ্যেই তোমাকে কিছু সাহায্য করিতে পারিব — তাহার ব্যবস্থা করিয়াছি। এখন আমরা তোমাকে কাছে ডাকিব না। আগে তোমার কাজ সারিয়া আইস— তাহার পরে দীর্ঘ সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালিয়া কেদারা টানিয়া বসা যাইবে।

আমার শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে একটি জাপানী ছাত্র সংস্কৃত শিখিবার জন্য আসিয়াছে। ছেলেটি বড় ভাল। সে বেশ আমাদের আপনার লোক হইয়া আসিয়াছে। তোমার বন্ধু মীরা প্রত্যহ তাহাকে এক পেয়ালা ফুল দিয়া বশ করিয়া লইয়াছে। তাহার কাছ হইতে দুটো একটা করিয়া জাপানী কথাও শিখিয়া লইতেছে। ইহা যদি তোমার আশঙ্কার বিষয় বলিয়া মনে হয় তবে ইহার যথাবিহিত প্রতিকার করিয়ো।

তোমার রবি

২২
৩০ জুন ১৯০৩

ওঁ   Thomson House

১৫ই আষাঢ়

১৩১০

বন্ধু

রেণুকার সংশয়াপন্ন অবস্থার টেলিগ্রাফ পাইয়া আমাকে ছুটিয়া আসিতে হইয়াছে। তাহাকে জীবিত দেখিব এরূপ আশামাত্র ছিল না। ডাক্তাররা তাহাকে কেবলই Strychnine ব্রাণ্ডি প্রভৃতি খাওয়াইয়া কোন মতে কৃত্রিম জীবনে সজীব রাখিবার চেষ্টায় ছিল। আমি যেদিন আসিয়া পৌঁছিলাম সেদিন তাহারা রোগীর জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়াছিল। আমি আসিয়াই সমস্ত Stimulants বন্ধ করিয়া দিয়া হোমিয়োপ্যাথি চিকিৎসা করিতেছি। রক্ত ওঠা বন্ধ হইয়া গেছে— কাশি কম, জ্বর কম, পেটের অসুখ কম— বিকারের প্রলাপ বন্ধ হইয়া গেছে— বুকের ব্যথা নাই— বেশ সহজ ভাবে কথাবার্ত্তা কহিতেছে, অনেকটা সবল হইয়াছে— আশা করিতেছি এই ধাক্কাটা কাটিয়া গেল।

কিন্তু বিদ্যালয়ের জন্য আমার উদ্বেগের সীমা নাই। এখান হইতে তাহার সৎকার সদ্গতি করিব এমন উপায়মাত্র নাই— সমস্তই অব্যবস্থার মুখে ফেলিয়া চলিয়া আসিতে হইয়াছে— কবে যাইতে পারিব তাহার কোন ঠিকানা নাই। কি আর

বলিব তুমি মোহিতবাবু ও রমণীকে লইয়া বিদ্যালয়কে দাঁড় করাইয়া দাও— ইহাকে তোমাদের জিনিষ বলিয়াই মনে করিয়ো। আমি নিতান্ত একলা হওয়াতেই এত বিঘ্ন হইতেছে — তোমরা আমার সঙ্গে যোগ না দিলে আমার পক্ষে অসাধ্য হইয়াছে। নূতন যে সকল অধ্যাপক নিযুক্ত করিতে হইবে তাহাদিগকে নিযুক্ত করিয়া তাহাদের কর্ত্তব্য স্থির করিয়া দাও— ছেলেদের খাওয়া দাওয়া এবং চরিত্র পরিদর্শনের যথোচিত ব্যবস্থা করিয়া দাও— অধ্যয়ন অধ্যাপনের নিয়ম বাঁধিয়া দাও— নহিলে এই সময়ে মাঝপথে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিলে আর শৃঙ্খলাস্থাপনা কঠিন হইবে— বিদ্যালয়ের বদনাম হইবে এবং বর্ত্তমান অরাজকতার অবস্থায় এমন সকল কুনীতি কুশিক্ষা কুদৃষ্টান্ত বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে যে ভবিষ্যতে কেবল মাত্র অনুতাপ করিয়া তাহার সংশোধন হইতে পারিবে না। কুঞ্জবাবু সপরিবারে আছেন দিনরাত্রি ছেলেদের উপর দৃষ্টি রাখা তাঁহার দ্বারা সম্ভবপর নহে— অনেক নূতন ছেলে আসিয়াছে তাহাদের চরিত্র ও আচরণ কিরূপ ঠিক জানি না— তাহারা বিদ্যালয়ে যদি কোন কলুষ আনয়ন করে তবে আক্ষেপের সীমা থাকিবে না। তুমি আর লেশমাত্র বিলম্ব করিয়ো না। মোহিতবাবু বিদ্যালয়ের সমস্ত অবস্থা দেখিয়া জানিয়া আসিয়াছেন তাঁহাকে সত্বর ডাকাইয়া আমার এই চিঠি দেখাইয়া একটা ব্যবস্থা করিয়া লইয়ো। রেণুকাকে দিনরাত্রি সাবধানে সেবাশুশ্রূষা করিতে হইতেছে—

চিঠি লিখিবার সময় অত্যন্ত অল্প— এইজন্য মোহিতবাবুকে চিঠি লিখিতে পারিলাম না। তুমি তাঁহাকে আমার আন্তরিক উদ্বেগ জানাইলে তিনি কখনই উদাসীন থাকিবেন না— তাঁহাকে অনেক খাটাইয়াছি আরো অনেক খাটাইব। এ বিত্থালয়কে সম্পূর্ণ তোমাদের নিজের করিতে হইবে। যত-ক্ষণ লিখিতেছি ততক্ষণ আমার ঘুমানো উচিত ছিল কিন্তু বিত্থালয়ের বর্ত্তমান অব্যবস্থায় আমাকে বিশ্রাম করিতে দিতেছে না। ছুটি কবে পাইব?

তোমার রবি

২৩
[অক্টোবর বা নভেম্বর ১৯০৫ ?]

ওঁ

বন্ধু,

আমি পলাতক। একদিন তুমি ছিলে কোণের মধ্যে, আমি ছিলাম জনতায়— আমি আজ কোণ খুঁজিতেছি, তুমি ভিড়ের মধ্যে বাহির হইয়া পড়িয়াছ। যে-কাজ তোমার মুলতবি ছিল সে তোমাকে সাধিয়া লইতে হইবে। আমার কাজ সারা হইয়াছে; তাই চোখ বুজিবার পূর্ব্বে বাতি নিবাইবার আয়োজন করিতেছি। এখন তুমি আমাকে ডাক দিলে চলিবে কেন? দেশের লোকের কাছ হইতে আমার মজুরি চুকাইয়া লইয়াছি— পূরা বেতন পাইলাম কি না সে-হিসাব করিবারও ইচ্ছা নাই— এখন ছুটি লইয়া একটু বিশ্রাম করিব, এইজন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছে। এই বিশ্রামের দাবী আমার অন্যায় নয়— এবং সেটা মঞ্জুর করিতে দেশের লোকের সিকি পয়সা খরচ নাই— সম্মান-সম্বর্দ্ধনার জন্য অনেক কাঠ-খড় দরকার হয়, এমন-কি অপমানও নেহাৎ বিনি খরচায় হয় না। কাল আবার বোলপুরে ফিরিতেছি। সেখানকার আকাশে এবং আলোয় কিছুমাত্র কৃপণতা নাই— ছেলে-বেলা হইতে একান্ত মনে ঐ আকাশকে আলোকে ভাল-বাসিয়াছি— আমার স্বদেশের কাছ হইতে আর কিছু না

পাই ঐ জিনিষটি প্রাণ ভরিয়া পাইয়াছি— ক্ষুধা এখনো মেটে নাই।

বৌঠা'নকে নমস্কার দিবে।

তোমার রবি

২৪
৮ জানুয়ারি ১৯০৮

ওঁ

শিলাইদহ

বন্ধু

তোমার চিঠি পাইয়া বিশেষ সান্ত্বনা অনুভব করিয়াছি। আমাদের চারিদিকেই এত দুঃখ এত অভাব এত অপমান পড়িয়া আছে যে নিজের শোক লইয়া অভিভূত হইয়া এবং নিজেকেই বিশেষরূপ দুর্ভাগ্য কল্পনা করিয়া পড়িয়া থাকিতে আমার লজ্জা বোধ হয়। আমি যখনই আমাদের দেশের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া দেখি তখনি আমাকে আমার নিজের দুঃখতাপ হইতে টানিয়া বাহির করিয়া আনে। আমাদের অসহ্য দুর্দ্দশার মূর্ত্তি ঘরে ও বাহিরে আজকাল এমনি সুপরিস্ফুট হইয়া দেখা দিয়াছে যে নিজের ব্যক্তিগত ক্ষতি লইয়া পড়িয়া থাকিবার সময় আমাদের আর নাই।

এবারকার কন্‌গ্রেসের যজ্ঞভঙ্গের কথা ত শুনিয়াছই—তাহার পর হইতে দুই পক্ষ পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করিতে দিনরাত্রি নিযুক্ত রহিয়াছে। অর্থাৎ বিচ্ছেদের কাটা ঘায়ের উপর দুই দলে মিলিয়াই নুনের ছিটা লাগাইতে ব্যস্ত হইয়াছে। কেহ ভুলিবে না, কেহ ক্ষমা করিবে না—আত্মীয়কে পর করিয়া তুলিবার যতগুলি উপায় আছে তাহা অবলম্বন করিবে। কিছু দিন হইতে গবর্মেণ্টের হাড়ে বাতাস লাগিয়াছে

—এখন আর সিডিশনের সময় নাই— যেটুকু উত্তাপ এত দিন আমাদের মধ্যে জমিয়াছিল তাহা নিজেদের ঘরে আগুন দিতেই নিযুক্ত হইয়াছে। বহুদিন ধরিয়া "বন্দেমাতরম্" কাগজে স্বাধীনতার অভয়মন্ত্রপূর্ণ কোনো উদার কথা আর পড়িতে পাই না, এখন কেবলি অন্য পক্ষের সঙ্গে তাহার কলহ চলিতেছে। এখন দেশে দুই পক্ষ হইতে তিন পক্ষ দাঁড়াইয়াছে— চরমপন্থী, মধ্যমপন্থী এবং মুসলমান— চতুর্থ পক্ষটি গবর্মেণ্টের প্রাসাদ-বাতায়নে দাঁড়াইয়া মুচ্‌কি হাসিতেছে। ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানেই বয়। আমাদিগকে নষ্ট করিবার জন্য আর কারো প্রয়োজন হইবে না— মর্লিরও নয় কিচেনারেরও নয়— আমরা নিজেরাই পারিব। আমরা "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি করিতে করিতে পরস্পরকে ভূমিসাৎ করিতে পারিব।

শরৎ বহু দিনের পর তোমাদের ওখানে দিশি রান্না খাইয়া এবং বৌঠাকুরাণীর শাড়িপরা স্নিগ্ধমূর্ত্তি দেখিয়া ভারি খুশি হইয়া বেলাকে চিঠি লিখিয়াছে।

কারখানা ঘরের কাজ চালাইবার উপযুক্ত Engine lathe প্রভৃতির কথা তোমার চিঠিতে পড়িয়া বিশেষ লোভ জন্মিতেছে। আমি যেমন করিয়া পারি বোলপুরে টেক্‌নিকাল বিভাগ খুলিব। ধর্ম্মপাল আমাকে গোটাকতক কল দিতে স্বীকার করিয়াছে। তাহার কতকগুলি কৃষি-ব্যাপারের যন্ত্র আছে, একটা কাপড় কাচিবার আমেরিকান কল আছে।

সে বলে আমি যদি টেকনিকাল বিভাগ খুলি তাহা হইলে আমাকে সাহায্য জোগাড় করিয়া দিবে। কিন্তু তাহার condition এই যে এই টেকনিকাল বিভাগের নাম রাখিতে হইবে Indo-American Industrial School। আমি তাহাকে লিখিয়াছি সাহায্যের পরিমাণ যদি যথেষ্ট এবং যদি যথার্থ কাজের হয় তাহা হইলে আমেরিকার ঋণ স্বীকার করিতে আপত্তি করিব না। আচ্ছা, তোমাকে যদি হাজার খানেক টাকা সংগ্রহ করিয়া পাঠাই তবে সুরেশকে দিয়া আমার Workshopএর মালমসলা কিনাইয়া পাঠাইয়া দিতে পারিবে কি? এ-সম্বন্ধে তোমার উত্তর পাইলে টাকা জোগাড়ের চেষ্টা দেখিব।

রথীর চিঠি প্রায়ই পাই। তাহারা সেখানে আনন্দ ও উৎসাহের সঙ্গে পড়াশোনা করিতেছে। বলা বাহুল্য তুমি আমেরিকায় গেলে তাহাদের অত্যন্ত আনন্দ হইবে— নিশ্চয়ই তাহারা তোমাকে তাহাদের কলেজে টানিয়া লইয়া যাইবে। তোমার সঙ্গে আমিও জুটিতে পারিলে কত খুশি হইতাম। বৌঠাকরুণকে আমার কথাটা স্মরণ করাইয়া দিয়ো— সমুদ্রের এপারের কালো বন্ধুদের ভাগে হৃদয়ের একটা অংশ রাখিয়া দেন যেন। ইতি ২৩শে পৌষ ১৩১৪।

তোমার রবি

[নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯১২
বা জানুয়ারি ১৯১৩]

508 W. High Street
Urbana. Illinois U. S. A.

ওঁ

বন্ধু

আমি অনেক দিন হইতে তোমার চিঠির জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম। আমি কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছিলাম না বন্ধুত্বের কোন্ সূত্র কোথায় কেমন করিয়া কি পরিমাণে ছিন্ন হইয়াছে। এই দীর্ঘকাল এ সম্বন্ধে আমি নিরবচ্ছিন্ন বেদনা অনুভব করিয়াছি। অবশেষে আমি এই কথাই ঠিক করিয়াছিলাম যে আমাদের মাঝখানে এই একটা মায়া, এই একটা ভুল বোঝার কুয়াশা দেখা দিয়াছে ইহার সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র লইয়া লড়াই করিয়া কোনো ফল নাই কিছু দিন চুপ করিয়া থাকিলে পর ইহা আপনিই স্বপ্নের মত কাটিয়া যাইবে। তাই আমার মনে ছিল দীর্ঘকাল প্রবাসবাসের পর যখন ফিরিব তখন দেখিব মায়াবরণ মিলাইয়া গিয়াছে।

পশ্চিমে আমি সমাদর লাভ করিব একথা মনে করিয়া আসি নাই— যখন অসুস্থ অবস্থায় শিলাইদহে বসন্ত যাপন করিতেছিলাম তখন গীতাঞ্জলি হইতে আমার ছোট ছোট গান ইংরেজি গদ্যে তর্জ্জমা করিয়াছিলাম, মুহূর্ত্তের জন্য মনে করি নাই সেগুলি কোনো কাজে লাগিবে— বিশেষত ইংরেজি

ভাষায় আমার অধিকার সম্বন্ধে আমার মনে লেশমাত্র অহঙ্কার নাই। দৈবক্রমে সেগুলি কাজে লাগিয়াছে— তাহাতে আমার বিশেষভাবে এই আনন্দ যে যাহারা আমাকে ভালবাসে তাহারা গৌরব অনুভব করিবে। বাংলা সাহিত্যের প্রতি সহসা এখানকার লোকের মনে একটা বিশেষ ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে— অনেকে বাংলা শিখিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে হয়ত তাহার একটা শুভফল আছে। এদেশে আসিয়া আমি দুঃসাহসে ভর দিয়া ভারতবর্ষের আদর্শ সম্বন্ধে দুই একটা বক্তৃতা করিয়াছি, শিকাগো য়ুনিভার্সিটিতে আমাকে আমন্ত্রণ করিয়াছিল সেই উপলক্ষ্যে সম্প্রতি আমি এখানে আসিয়াছি। আমার বক্তৃতা এখানকার লোকের ভাল লাগিয়াছে, আরো আমন্ত্রণ পাইয়াছি। কিন্তু বক্তৃতা করিয়া ঘুরিয়া বেড়ানো আমার পক্ষে এতই ক্লান্তিকর যে কি করিব ভাবিয়া পাইতেছি না। আগামী এপ্রেল মাসে ইংলণ্ডে ফিরিবার কথা আছে। সেখানে ম্যাক্‌মিলানরা আমার রচনা প্রকাশ করিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছে। আমার অনেকগুলি কবিতা এবং কিছু কিছু নাটক তর্জ্জমা করিয়াছি— সেগুলি এখানকার রসজ্ঞ ব্যক্তিদের ভাল লাগিয়াছে— এবং সেগুলি ছাপা হইলে সমাদৃত হইবে এমন আশা আছে। এমনি করিয়া এখানকার গোলমালের মধ্যে দিন কাটিতেছে— যতই আদর অভ্যর্থনা পাই না কেন— মনের ভিতরটাতে একটা ক্লান্তির ভার অনুভব করিতেছি— দেশে ফিরিয়া গিয়া

সেখানকার অবারিত আকাশ অপর্য্যাপ্ত আলোক এবং অনবচ্ছিন্ন অবকাশের মধ্যে নিমগ্ন হইবার জন্য হৃদয়ের মধ্যে প্রায়ই একটা উদ্বেগ অনুভব করিতেছি। কিন্তু এখানে আমার কিছু কাজ আছে— সে কাজে ভঙ্গ দিয়া গেলে সেটা অন্যায় হইবে তাই এই আবর্ত্তের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। আশা করিতেছি দেশে ফিরিয়া গিয়া আরো উৎসাহ ও শক্তির সঙ্গে আমার কাজে লাগিতে পারিব।

তোমার
রবি

২৬
১৫ মে ১৯১৩

C/o Messrs. Thomas Cook & Son.
Ludgate Circus, London.
15 May, 1913.

বন্ধু

তোমার বন্ধু Mrs. Booleএর সঙ্গে দেখা হইয়াছে। তিনি তোমার সম্বন্ধে বিশেষভাবে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলেন। তাঁহার বয়স আশি পার হইয়া গিয়াছে কিন্তু কি আশ্চর্য্য তাঁহার বুদ্ধিশক্তির সজীবতা! তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। Miss MacLeod আমাকে তাঁহার ওখানে লইয়া গিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে তোমার কি এখানে আসিবার সম্ভাবনা আছে? যদি এখানে একসঙ্গে মিলিতে পারিতাম ত সুখের হইত। এদিকে আমার বোধ করি ফিরিবার সময় কাছে আসিতেছে; এখানকার সামাজিকতার ঘূর্ণির টানে পাক খাইয়া আমার শরীর মন পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। বিদ্যালয়ের চিন্তাও আমাকে পাইয়া বসিয়াছে— আর অধিক দিন দূরে থাকা হয়ত ক্ষতিকর হইতে পারে।

ইহার মধ্যে একদিন এখানকার সভায় "চিত্রা"র ইংরেজি অনুবাদ পড়িয়া শুনাইয়াছিলাম। এখানকার শ্রোতাদের ভাল লাগিয়াছে। আইরিশ থিয়েটারে আমার "ডাকঘর" নাটকের অভিনয়ের ব্যবস্থা হইতেছে।

তবু এই খ্যাতিপ্রতিপত্তির ঝোড়ো হাওয়ার মধ্যে মন

টিঁকিতেছে না। একটুখানি নিভৃতের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুলতা বোধ করিতেছি। হাতের কাজগুলা কোনোমতে শেষ করিতে পারিলেই দৌড় দিব।

গত বারে দেবেনের সঙ্গে আমার দেখা হইয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া আমি বড় আনন্দিত হইয়াছিলাম।

শুনিয়াছি তোমার কাজ অগ্রসর হইতেছে এবং বাহিরের দিক হইতে তোমার বাধাবিঘ্ন অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে। ফিরিয়া গিয়া তাহার অনেকটা পরিচয় পাইব এই প্রত্যাশা করিয়া রহিলাম।

তোমার রবি

১৯ই নভেম্বর ১৯১৩

বন্ধু

পৃথিবীতে তোমাকে এতদিন
জয়মাল্য ভূষিত না দেখিয়া যে কি
অনুভব করিয়াছি। আজ সেই
দুঃখ দূর হইল। দেবতা এই
কাজের জন্য কি করিয়া তোমায়
উত্তরে লাগাইবেন? চিরকাল
শক্তিশালী হও, চিরকাল
অপ্রমত্ত হও। ঈশ্বর তোমার
চির সহায় হউন।

তোমার
জগদীশ

রবীন্দ্রনাথের নোবেল-পুরস্কার-প্রাপ্তি-উপলক্ষে

২৭
[১৪ এপ্রিল ১৯১৪]

ওঁ

শান্তিনিকেতন
[১ বৈশাখ ১৩২১]

বন্ধু,

তুমি ত তোমার জয়যাত্রায় বেরিয়েছ—"শিবাস্তে পন্থানঃ সন্তু।" আমি স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি, তুমি জয়মাল্য বহন ক'রে নিয়ে এসে তোমার দেশকে অলঙ্কৃত কর্‌বে, তুমি বিধাতার আশীর্ব্বাদ নিয়ে গেছ। আজ পয়লা বৈশাখ, আজকের নব বর্ষারম্ভের উৎসবে আমি এই প্রার্থনাই কর্‌চি— এতদিন ধ'রে যে সোনার ফসল তুমি ফলিয়ে তুল্‌লে মহাকালের তরণী বোঝাই ক'রে দেশে দেশান্তরে সেই ফসল প্রাণ বিস্তার ক'রে দিক।

যদি সম্ভব হয় এবার একবার আমার বন্ধু রোটেন্‌-স্টাইনের সঙ্গে আলাপ ক'রে এসো। তিনি ত খুসি হবেন-ই, তুমিও হবে। আমি তাঁকে, তোমার কথা আগেই লিখে দিয়েছি। তুমিও তোমার পৌঁছা সংবাদ তাঁকে দিয়ো।

বৌঠাকুরাণীকে আমার নববর্ষের সাদর সম্ভাষণ জানিয়ো।

তোমার রবি

২৮

[সেপ্টেম্বর বা অক্টোবর ১৯১৬]

ওঁ

বন্ধু,

তোমার চিঠি এখানে এসে পেলুম। জাপানে পেলে সুবিধা হ'ত, কেননা সেখানে হাতে কতকটা সময় ছিল। কিন্তু এখানে এসে পৌঁছেই এমন প্রচণ্ড ঘুরপাকের মধ্যে প'ড়ে গেছি যে, কিছুই ভাব্‌বার অবকাশ নেই— কেবলই আমাকে টানাটানি ছেঁড়াছেড়ি ক'রে ঠেলে নিয়ে চলেচে। এখানকার ঝোড়ো বাতাসে এক মুহূর্ত্ত স্থির হ'য়ে দাঁড়াবার জো নেই— বাড়িতে চিঠিপত্র লেখা পর্য্যন্ত বন্ধ ক'রে দিতে হয়েচে। অন্তত মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত আমাকে এই ঘূর্ণির টানে সহর থেকে সহরে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াবে। যাই হোক, আমি কোনো জায়গায় একটুখানি স্থির হ'য়ে বস্‌বার সময় পেলেই তোমার গান লেখবার সময় কর্‌ব। তোমার বিজ্ঞান-মন্দিরে প্রথম সভা উদ্বোধনের দিনে আমি যদি থাক্‌তে পার্‌তুম তা হ'লে আমার খুব আনন্দ হ'ত। বিধাতা যদি দেশে ফিরিয়ে আনেন তা হ'লে তোমার এই বিজ্ঞান-যজ্ঞশালায় একদিন তোমার সঙ্গে মিলনের উৎসব হবে এই কথা মনে রইল। এতদিন যা তোমার সঙ্কল্পের মধ্যে ছিল আজকে তার সৃষ্টির দিন এসেচে। কিন্তু এ ত তোমার একলার সঙ্কল্প নয়, এ আমাদের সমস্ত দেশের সঙ্কল্প, তোমার জীবনের মধ্যে দিয়ে
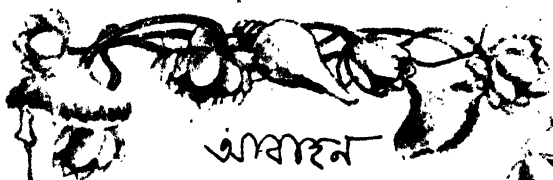
আবাহন

মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গন
কর মহোজ্জ্বল আজ হে!
শুভ শঙ্খ বাজহ বাজ হে!
ঘন তিমির রাত্রির চির প্রতীক্ষা
পূর্ণ কর, লহ জ্যোতির্দীক্ষা,
যাত্রিদল সব সাজ হে!
শুভ শঙ্খ বাজহ বাজ হে!
বল "জয় নরোত্তম, পুরুষসত্তম,
জয় তপস্বিরাজ হে!
জয় হে, জয় হে, জয় হে!"

এস বঙ্গ মহোৎসবে, মাতৃ আশীর্বাদমঙ্গল,
সকল সাধক এস হে, ধন্য কর এ দেশ হে!
সকল যোগী, সকল ত্যাগী,
এস দুঃসহ-দুঃখভাগী,
এস দুর্জয়শক্তিসম্পদ
মুক্তবন্ধ সমাজ হে!
এস জ্ঞানী, এস কর্ম্মী,
নাশ ভারতলাজ হে!
এস মঙ্গল, এস গৌরব,
এস অক্ষয় পুণ্য সৌরভ,
এস তেজঃসূর্য্য উজ্জ্বল
কীর্ত্তি অম্বর মাঝে হে!
বীরধর্ম্মে পুণ্যকর্ম্মে
বিশ্বহৃদয় রাজ হে!
শুভ শঙ্খ বাজহ বাজ হে!
জয় জয় নরোত্তম, পুরুষসত্তম,
জয় তপস্বিরাজ হে!
জয় হে, জয় হে, জয় হে!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৪ অগ্রহায়ণ
১৩২৪

বসু-বিজ্ঞানমন্দির-প্রতিষ্ঠা-উৎসবে আবাহনসংগীত

এর বিকাশ হ'তে চল্‌ল। জীবনের ভিতর দিয়েই জীবনের উদ্বোধন হয়— তোমার প্রাণের সামগ্রীকে তুমি আমাদের দেশের প্রাণের সামগ্রী ক'রে দিয়ে যাবে— তার পর থেকে সেই চিরন্তন প্রাণের প্রবাহে আপনিই সে এগিয়ে চল্‌তে থাক্‌বে। কতবার আমরা নানা মিথ্যার সঙ্গে জড়িয়ে কত মিথ্যা জিনিষের সৃষ্টি করেচি— তার উপরে অজস্র টাকা বৃষ্টি ক'রেও তাদের বাঁচিয়ে তুল্‌তে পারিনি। কেবল মাত্র অভিমান দিয়ে ত' কোনো সত্য বস্তু আমরা সৃজন কর্‌তে পারিনে। কিন্তু এ যে তোমার চিরদিনের সত্য সাধনা— এর মধ্যে তুমি যে আপনাকে দিয়েচ, আপনাকে পেয়েচ— তুমি যে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির মত তোমার মন্ত্রকে তোমার অন্তরে প্রত্যক্ষ দেখতে পেয়েচ, এইজন্যে বাইরে তাকে প্রকাশ কর্‌বার পূর্ণ অধিকার ঈশ্বর তোমাকে দিয়েচেন। সেই অধিকারের জোরে আজ তুমি একলা দাঁড়িয়ে তোমার মানস-পদ্মের বিজ্ঞান-সরস্বতীকে দেশের হৃদয়-পদ্মের উপরে প্রতিষ্ঠিতা কর্‌চ। তোমার মন্ত্রের গুণে, তোমার তপস্যার বলে— দেবী সেই আসনে অচলা হবেন, এবং প্রসন্ন দক্ষিণ হস্তে তাঁর ভক্তদের নব নব বর দান কর্‌তে থাক্‌বেন।

দেশে ফের্‌বার জন্যে মন ব্যাকুল হ'য়ে রয়েচে। এখানকার কাজ শেষ হ'তে কতদিন লাগবে জানিনে। কিন্তু এইরকম ঊর্দ্ধশ্বাসে লাটিমের মত ঘুরে' বেড়াতে আর পারিনে।

তোমার রবি

২৯

[অক্টোবর ?, ১৯১৭]

ওঁ

কলিকাতা

বন্ধু,

এতদিন শরীরটা অত্যন্ত টলমলে অবস্থায় ছিল— এখন ভাঙন ধরা সুরু হয়েছে। কানের উপরে এক পর্দ্দা প'ড়ে গেছে— ভাল ক'রে শুন্‌তে পাচ্চিনে। তার উপরে শরীর এমন ক্লান্ত যে, প্রতিদিনের সামান্য কাজটুকু করাবার জন্যে তাকে ঠেলাঠেলি কর্‌তে হয়। ডাক্তার বল্‌চে, একেবারে চুপচাপ ক'রে থাক্‌তে। তাই এতদিন পরে চিঠি পড়বার ও চিঠি লেখবার জন্যে একজন সেক্রেটারী রাখতে হয়েছে— সর্ব্বদা নিজের কাছে কাছে এরকম একজন লোককে লাগিয়ে রাখতে আমার অত্যন্ত খারাপ লাগে, কিন্তু আর উপায় নেই। এদিকে কন্‌গ্রেসের সময় একটা কিছু বল্‌বার জন্যে আমার উপরে অন্তরে বাহিরে তাগিদ এসেছে, কিন্তু কিছুকাল বিশ্রামের পর যদি ভাল থাকি ত চেষ্টা কর্‌ব— এখনকার মত সুগভীর নিষ্কর্ম্মণ্যতার মধ্যে ডুব মার্‌ব। কোনো নূতন যায়গায় গেলে মনের বিক্ষিপ্ততা ঘটে, তাই শান্তিনিকেতনে যাওয়া ঠিক কর্‌চি— সেখানে বিদ্যালয়ের ছুটি— কেউ লোক-জন নেই। বেলাকে ছেড়ে বেশী দূরে যাতায়াত চল্‌বে না। কানটা আশা করি বিশ্রামের পরে আবার সতেজ হ'বে— না যদি হয় তা হ'লে রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে নেপথ্যে স'রে পড়ব—

মাঝি তোর বৈঠা নে রে
আমি আর বাইতে পার্‌লেম না।

নিবেদিতার বইয়ের সেই ভূমিকা লেখবার মত মনের সচেষ্টতা নেই। তোমাদের লেক্‌চারের জন্যে কবে তৈরী হ'ব তা বল্‌তে পারিনে— বোধহয় এখন থেকে কর্ত্তব্যকে সঙ্কীর্ণ ক'রে এনে জীবনের একটা সীমা নির্দ্ধারণ ক'রে নিতে হবে— এই সহজ কথাটা মনে রাখতে চেষ্টা কর্‌ব— যা আমি পারি তার চেয়ে আমি বেশী পারিনে।

তোমার রবি

৩০

১ জানুয়ারি ১৯১৯

ওঁ

বন্ধু,

বৌমার খুব কঠিন রকম ন্যুমোনিয়া হয়েছিল। অনেক দিন লড়াই ক'রে কাল থেকে ভাল বোধ হচ্চে। সম্পূর্ণ সুস্থ হতে বোধ হয় অনেক দিন লাগবে। হেমলতা এবং সুকেশী এখনো ভুগচেন। তার মধ্যে হেমলতা প্রায় সেরে উঠেচেন— কিন্তু সুকেশীর জন্যে ভাবনার কারণ আছে।

কিন্তু ছেলেদের মধ্যে একটিরও ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়নি। আমার বিশ্বাস, তার কারণ, আমি ওদের বরাবর পঞ্চতিক্ত পাঁচন খাইয়ে আস্‌চি। ছেলেদের অনেকেই ছুটীর মধ্যে বাড়ীতে নিজেরা ভুগেছে এবং সংক্রামকের আড্ডা থেকে এবং কেউ কেউ মৃত্যুশয্যা থেকে এসেচে। ভয় ছিল, তারা এখানে এসে রোগ ছড়াবে— কিন্তু একটুও সে লক্ষণ ঘটেনি, এবং সাধারণ জ্বরও এ বছর অনেক কম। আমার এখানে প্রায় দুশো লোক, অথচ হাঁসপাতাল প্রায়ই শূন্য প'ড়ে আছে— এমন কখনও হয় না—তাই মনে ভাবচি এটা নিশ্চয়ই পাঁচনের গুণে হয়েচে।

অজিতের অকাল-মৃত্যুতে সাহিত্যের ক্ষতি হবে। তার গুণ ছিল— সে সম্পূর্ণ নির্ভীক ভাবে প্রবল পক্ষের বিরুদ্ধে এবং প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে নিজের মত প্রকাশ কর্‌তে পার্‌ত।

ঠিক বর্ত্তমানে সে-রকম আর কোন বাংলা লেখক আমার ত মনে পড়চে না।

আমি নিজে কোন স্পষ্ট ব্যামোয় পড়িনি— কেবল মাঝে মাঝে খুব একটা ক্লান্তি আমাকে চেপে ধরে— সেই পুনঃ পুনঃ ক্লান্তিটাই আমার ছুটির দর্‌বার। আমার দ্বারা যতটা হতে পারে নানা রকমে তা করেচি, এখন অন্যদের জন্যে জায়গা ছেড়ে দেবার সময় এসেচে। নূতন লোক এসে নূতন ভাষায় নূতন কালের জন্যে কথা ক'বে এইটেই হচ্চে আবশ্যক— নিজের পালাটাকে তার সময় অতিক্রম করিয়ে জোর ক'রে টেনে রাখাটাই ভুল। ইতি ১৭ পৌষ ১৩২৫

তোমার রবি

৩১
২৪ নভেম্বর ১৯২১

ওঁ

বন্ধু

তোমার "অব্যক্ত"র অনেক লেখাই আমার পূর্ব্ব-পরিচিত— এবং এগুলি পড়িয়া অনেক বারই ভাবিয়াছি যে যদিও বিজ্ঞানবাণীকেই তুমি তোমার সুয়োরাণী করিয়াছ তবু সাহিত্যসরস্বতী সে পদের দাবী করিতে পারিত— কেবল তোমার অনবধানেই সে অনাদৃত হইয়া আছে। ইতি ৮ই অগ্রহায়ণ ১৩২৮

তোমার রবি

৩২
[১২ মে ১৯২২ ?]

ওঁ শান্তিনিকেতন

বন্ধু

"বিশ্বভারতী"কে এইবার সাধারণের হাতে সমর্পণ করে দিচ্চি। তোমাকে এর ভাইস্-প্রেসিডেন্টের আসনে বসাতে চাই। সম্মতি লিখে পাঠিয়ো। বেশি কিছু দায়িত্ব নেই, কেবল তোমার সঙ্গে নামের যোগ না থাক্‌লে চল্‌বে না— সময় যদি পাও এই সূত্রে কাজের যোগও ঘট্‌বে।

এখানে কিছুদিন বিপরীত গরম গিয়েছিল। এখনো মাঝে মাঝে একএকদিন আকাশে বাতাসে অগ্নিবাণ ছুট্‌তে থাকে। ক্ষণে ক্ষণে আমার মন বিচলিত হয়েছিল; ভেবেছিলুম দার্জ্জিলিঙে তোমাদের পাড়ায় ঘুরে আস্‌ব, অমনি তোমাকে বিশ্বভারতীর Constitution দেখিয়ে সভ্য করে আসব। কিন্তু এই মাঠের মধ্যেই আমার সমস্ত সময় এবং সম্বল খরচ করতে হচ্চে— আমার না আছে অবসর না আছে পাথেয়। সমুদ্র পার থেকে দুইএকজন আমার কাজে যোগ দিতে এসেচেন, তাঁদের ফেলে রেখে চলে যেতে পারচিনে।

Constitutionখানা ছাপা হয়েচে, রেজেস্ট্রি হয়ে গেলেই তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব। ইতি ২৯ বৈশাখ ১৩২৫ [১৩২৯ ? 12 May 1922 ?]

তোমার রবি

৩৩
২৮ ডিসেম্বর ১৯২৬

শান্তিনিকেতন

বন্ধু

অবশেষে দেশে এসে পৌঁছলুম। কিন্তু চারিদিকে ক্ষুদ্রতা ও বীভৎসতার ঘূর্ণিপাকের মধ্যে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠ্‌ল। হঠাৎ একটা perspective থেকে আর একটার ভিতরে এসে নিজে সুদ্ধ যেন খাটো হয়ে পড়ি। বহুদিন পরে দেশে ফিরে আসার আনন্দ যখন ম্লান হয়ে এসেছিল এমন সময়ে আমার নামে উৎসর্গ করা তোমার যে বই আমার অনুপস্থিতিকালে এখানে এসেছিল সেইটি হাতে আসাতে তখনি বুঝতে পারলুম এইখানেই আমাদের সত্য, এই আলো, এই প্রাণ— এই ভারতের নিত্য পরিচয়। এই বইখানির মধ্যে তোমার বন্ধুত্বের বাণী পেয়ে ভারি আনন্দ হল— মনে যে অবসাদের ছায়া এসেছিল সেটা যেন কেটে গেল। মাঝে মাঝে সত্যের স্পর্শে যখন মায়ার কুয়াশা দূর হয়ে যায় তখন বুঝতে পারি যে আমাদের মনের তন্তুতে তন্তুতে অনেক আদিম অভ্যাস জড়িয়ে আছে— কথায় কথায় জুজু আমাদের পেয়ে বসে— সে যে বস্তুত কিছু না এটা বুঝেও বোঝা শক্ত হয়ে ওঠে।

একেবারে ৭ই পৌষের মুখে এসে পৌঁচেছিলুম। কলকাতায় যে কয়ঘণ্টা ছিলুম অবকাশমাত্র ছিল না। তাড়াতাড়ি চলে

আসতে হোল— তাই তোমার সঙ্গে সেদিন দেখা করতে পারলুম না। কবে আবার সহরে ফিরব নিশ্চয় জানিনে— কিন্তু গেলেই দেখা হবে।

তোমার আশ্চর্য্য কীর্ত্তির বিবরণ মাঝে মাঝে পেয়েছি— সে কীর্ত্তি আজ সমস্ত বাধা লঙ্ঘন করে পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হয়েছে। এতে মনে কত আনন্দ ও গৌরব অনুভব করি ব'লে শেষ করতে পারিনে। ইতি ২৮ ডিসেম্বর ১৯২৬

তোমার রবি

বৌঠাকুরাণীকে আমার সাদর নমস্কার।

৩৪
৮ অক্টোবর ১৯২৮

ওঁ   শান্তিনিকেতন

বন্ধু

এখানে এসে কিছু ভালো আছি। কিন্তু চলতে ফিরতে কষ্ট ও ক্লান্তি বোধ হয়। ডাক্তাররা অন্তরে বাইরে উল্টে পাল্টে আমাকে তন্ন তন্ন করে দেখেচে। বলচে কোনও কল একটুও বিগড়োয় নি— নাড়ীতে রক্তস্রোতের ব্যবহার খুবই ভালো। নানা দুশ্চিন্তা ও কাজের তাড়ায় আমাকে জখম করেচে। এখানে সকালে বিকালে খুব অল্প অল্প করে একটু বেড়ানো অভ্যেস করচি— বেশি পারিনে। লিখ্‌তে পড়তে একটুও শ্রান্তি বোধ করিনে। নানা লোক এসে নানা বাজে কাজে আমার উপর উৎপাত করে সেইটেতে বড় পীড়ন করে।

রথীদের কাছে তোমার ভিয়েনার সমস্ত খবর শুনে খুব আনন্দ বোধ করেচি। যখন দেখা হবে সব কথা শুনব। আজ আমার একজন চীনদেশী বন্ধু আসচেন তাঁর জন্যে ব্যস্ত আছি। যখন তাঁদের দেশে গিয়েছিলুম ইনি আমাদের অজস্র আতিথ্য করেচেন। ইতি ৮ অক্টোবর ১৯২৮

তোমার রবি

বৌঠাকরুণকে সাদর অভিবাদন।

শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু

প্রিয়করকমলে

বন্ধু

যেদিন ধরণী ছিল ব্যথাহীন বাণীহীন মরু,
প্রাণের আনন্দ নিয়ে, শঙ্কা নিয়ে, দুঃখ নিয়ে, তরু
দেখা দিল দারুণ নির্জ্জনে। কত যুগ যুগান্তরে
কান পেতে ছিল স্তব্ধ মানুষের পদশব্দ তরে
নিবিড় গহন তলে। যবে এল মানব অতিথি,
দিল তারে ফুল ফল, বিস্তারিয়া দিল ছায়াবীথি।
প্রাণের আদিম ভাষা গূঢ় ছিল তাহার অন্তরে,
সম্পূর্ণ হয় নি ব্যক্ত আন্দোলনে, ইঙ্গিতে, মর্ম্মরে।
তার দিনরজনীর জীবযাত্রা বিশ্বধরাতলে
চলেছিল নানা পথে শব্দহীন নিত্য কোলাহলে
সীমাহীন ভবিষ্যতে; আলোকের আঘাতে তনুতে
প্রতিদিন উঠিয়াছে চঞ্চলিত অণুতে অণুতে

স্পন্দবেগে নিঃশব্দ সঙ্গীতগীতি; নীরব সুরের
সূর্যের ছন্দনাচনে নাচিয়াছে প্রভাত পবনে।
প্রাণের প্রথম বাণী এই মতো জাগে চারি ভিতে
তৃণে তৃণে বনে বনে, তবু তাহা রয়েছে নিভৃতে, —
কাছে থেকে শুনি নাই; — হে তপস্বী, তুমি একমনা
নিঃশব্দেরে বাক্য দিলে; অরণ্যের অন্তরবেদনা
শুনেছ একান্তে বসি; মূক জীবনের যে ক্রন্দন
ধরণীর মাতৃবক্ষে নিরন্তর জাগালো স্পন্দন
অঙ্কুরে অঙ্কুরে উঠি, প্রসারিয়া শত ব্যগ্র শাখা,
পত্রে পত্রে চঞ্চলিয়া, শিকড়ে শিকড়ে আঁকাবাঁকা
জন্মমরণের দ্বন্দ্বে, তাহার রহস্য তব কাছে
বিচিত্র অক্ষররূপে সহসা প্রকাশ লভিয়াছে।
প্রাণের আগ্রহবার্তা নির্বাকের অন্তঃপুর হতে
অন্ধকার পার করি' আনি দিলে দৃষ্টির আলোতে।
তোমার প্রতিভাদীপ্ত চিত্তমাঝে কহে আজি কথা
তরুর মর্মের সাথে মানব মর্মের আত্মীয়তা;
প্রাচীন আদিমতম সম্বন্ধের দেয় পরিচয়।
হে সাধক শ্রেষ্ঠ, তব দুঃসাধ্য সাধন লভে জয়; —
সতর্ক দেবতা যেথা গুপ্তবাণী রেখেছেন ঢাকি'
সেথা তুমি দীপহস্তে অন্ধকারে পশিলে একাকী,

জাগ্রত করিলে তারে। দেবতা আপন পরাভবে
যেদিন প্রসন্ন হন, সেদিন উদার জয়রবে
ধ্বনিত অমরাবতী আনন্দে রচিয়া দেয় বেদী
বীর বিজয়ীর তরে, যশের পতাকা অভ্রভেদী
মর্ত্যের চূড়ায় উড়ে।

মনে আছে একদা যেদিন
আসন প্রচ্ছন্ন তব, অশ্রদ্ধার অন্ধকারে লীন,
ঈর্ষাকণ্টকিত পথে চলেছিলে ব্যথিত চরণে,
ক্ষুদ্র শত্রুতার সাথে প্রতিক্ষণে অকারণ রণে
হয়েছ পীড়িত শ্রান্ত। সে দুঃখই তোমার পাথেয়,
সে অগ্নি জ্বেলেছে যাত্রাদীপ, অবজ্ঞা দিয়েছে শ্রেয়,
পেয়েছ সম্বল তব আপনার গভীর অন্তরে।
তোমার খ্যাতির শঙ্খ আজি বাজে দিকে দিগন্তরে
সমুদ্রের এ কূলে ও কূলে; আপন দীপ্তিতে আজি
বন্ধু, তুমি দীপ্যমান; উচ্ছ্বসি উঠিছে বাজি
বিপুল কীর্তির মন্দ্র তোমার আপন কর্ম মাঝে।
জ্যোতিষ্ক সভার তলে যেথা তব আসন বিরাজে
সেথায় সহস্র দীপ জ্বলে আজি দীপালি উৎসবে।
আমারো একটি দীপ তারি সাথে মিলাইনু যবে

চেয়ে দেখো তার পানে, এ দীপ বন্ধুর হাতে জ্বালা;
তোমার তপস্যাক্ষেত্র ছিল যবে নিভৃত নিরালা
বাধায় বেষ্টিত রুদ্ধ, সেদিন সংশয় সন্ধ্যাকালে
কবি-হাতে বরমাল্য সে বন্ধু পরায়েছিল ভালে;
অপেক্ষা করে নি সে তো জনতার সমর্থন তরে,
দুর্দিনে জ্বেলেছে দীপ রিক্ত তব অর্ঘ্যথালি পরে।
আজি সহস্রের সাথে ঘোষিল সে, ধন্য ধন্য তুমি,
ধন্য তব বন্ধুজন, ধন্য তব পুণ্য জন্মভূমি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন
১৪ অগ্রহায়ণ
১৩৩৫
[30 Nov. 1928]

আচার্য জগদীশচন্দ্রের সপ্ততিপূর্তি-উৎসব-উপলক্ষে

৩৫
২৪ অক্টোবর ১৯২৮

ওঁ

বন্ধু

তোমার এই বিষম উদ্বেগের দিনে কিছুই করবার উপায় নেই এই আমার দুঃখ। চলাফেরা আমার পক্ষে কঠিন হয়েচে —চুপ করে বসেই আমাকে কাজ চালাতে হয়। যতটুকু আমার নিজের যথার্থ কাজ তার বেশি কোনো ভার নেওয়া আমার উচিত নয়— কিন্তু বাইরে থেকে বোঝা এসে পড়ে তাকে ঠেলে ফেলা যায় না। শীতকালে আগন্তুক অতিথির সমাগম বাড়তে থাকবে সেইটেতে আমাকে বড় ক্লান্ত করে।

রথীর চিঠিতে শুনেছিলুম সুইজারল্যাণ্ডে তোমার স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি হয়েছিল। আশা করি সেটা এখন দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়ে থাকবে।

আগামী গ্রীষ্মে য়ুরোপে গিয়ে আর কিছু না করে একবার শরীরটাকে সারিয়ে নিয়ে আসবার চেষ্টা করব।

তোমার ৭০ বছরের অভিনন্দনসভায় নিশ্চয়ই আমি যোগ দিতে যাব। তখন শীতের সময় শরীরে এখনকার চেয়ে বল পাব বলে বিশ্বাস করি।

বর্ত্তমান দুর্য্যোগ উত্তীর্ণ হয়ে তোমার শরীর মন সুস্থ সবল থাক এই আমি একান্ত মনে কামনা করি। ইতি বিজয়াদশমী ১৩৩৫ [৭ কার্ত্তিক]

তোমার রবি

ওঁ

বন্ধু

তোমার ছুটি যদি এখানে কাটিয়ে যাও তা হলে বোধ হয় তোমার উপকার হয়। আমি ত জ্বর প্রভৃতি নিয়ে এসে এখন বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছি— ওজনে প্রায় ৩ সের বেড়েছি। তুমি বৌঠাকরুণকে সঙ্গে করে নিয়ে এস— তোমাদের কোনো অসুবিধা হবে না। জিনিষপত্র কিছু আনবার চেষ্টা কোরো না। বিছানা যথেষ্ট আছে— কেবল গায়ে দেবার কম্বল এনো। তোমার জন্যে চা চুরুট তামাক প্রভৃতি সমস্ত নেশার জোগাড় করে রেখেছি। পড়বার বই এবং লেখবার অবকাশ এখানে যথেষ্ট পাবে— বেড়াবার মাঠ এবং সঙ্গীরও অভাব হবে না। আমি আজকাল সকালে তিন ঘণ্টা বেড়াই, এ-কথা চিঠি পড়ে তোমার বিশ্বাস হবে না— এখানে এলেই প্রমাণ হবে।

তুমি যদি সকালের ট্রেনে ছাড় তা হলে সন্ধ্যেবেলায় ঠাণ্ডা লাগ্‌বার আশঙ্কাটা থাকে না। সে গাড়িটা সাতটার সময় ষ্টেশন ছাড়ে। এখানে এসে প্রায় বারোটার সময় পৌঁছয়— বর্দ্ধমানে দশ মিনিট থামে— আগে থাকৃতে ব্রেকফাষ্ট টেলিগ্রাফ করে দিয়ে ওখান থেকে খাদ্যদ্রব্য গাড়িতে তুলে নিতে পার।

কবে ও কখন ছাড়বে সে-খবরটা আমার চিঠি পেয়েই আমাকে টেলিগ্রাফ করে দিয়ো— তা হলে তোমাদের যান বাহন ঘর প্রভৃতি সমস্ত ঠিক করে রেখে দেব। ইতি বুধবার।

তোমার রবি

অবলা বসু মহোদয়াকে লিখিত

১
৪ জুন ১৯০১

ওঁ কলিকাতা

৪ জুন ১৯০১

মাননীয়াসু

আপনি ধন্য। আমরাও দূরে থাকিয়া তাঁহার বন্ধুত্বে ধন্য হইয়াছি। আমার গর্ব্ব আমি গোপন করিতে পারিতেছি না— আমি সকলকে জয়সংবাদ জানাইয়া বেড়াইতেছি। ত্রিপুরার মহারাজকে কাল টেলিগ্রাফ করিয়া দিয়াছি।

বন্ধুকে তাঁহার কর্ম্মসমাধার পূর্ব্বে দেশে আসিতে দিবেন না। এদেশে তাঁহার জীবন নিরর্থক হইবে। আমরা তাঁহাকে য়ুরোপে রাখিবার আয়োজন করিতে পারিব— তিনি যেন তাঁহার এই সামান্য কাজটুকু করিবার অবসর আমাদিগকে দেন।

আপনারা প্রবাসে থাকিয়াও আমাদের অপেক্ষাও ভারতের অন্তরে রহিয়াছেন— সেইখানে, স্বদেশের হৃদয়-মণ্ডপে, চিরদিন আপনাদের প্রতিষ্ঠা অক্ষয় হউক্!

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২
১৬ এপ্রিল ১৯০২

ওঁ

শান্তিনিকেতন
বোলপুর

মাননীয়াসু

ঠিক নববর্ষের প্রথম দিনের প্রভাতে আপনার চিঠি আনন্দসংবাদ বহন করিয়া সমুদ্র পার হইয়া এই প্রান্তরের মধ্যে আমার হাতে আসিয়া উপস্থিত হইল। কলিকাতা হইতে সেদিন অনেক কলেজের ছাত্র এবং মোহিতবাবু প্রভৃতি অধ্যাপকদল এখানে উপস্থিত ছিলেন। প্রাতঃকালের উপাসনা শেষ করিয়া আমরা আমাদের বিদ্যালয়গৃহে বসিয়া ছিলাম এমন সময় আপনার পত্রখানি আসিয়া আমাদের উৎসব সম্পূর্ণ করিয়া দিল। আমাদের এই বাংলা দেশের নববর্ষের আনন্দ অভিবাদন আপনারা গ্রহণ করুন। অধ্যাপকমহাশয় জয়যুক্ত হইবেন তাহাতে সন্দেহ মাত্র করি না— নিঃশব্দ ভারতবর্ষ তাঁহাকে শেষ পর্যন্ত সাহায্য করিবে। ক্ষণে ক্ষণে আমার কেবলি ইচ্ছা হয় আপনাদের দেখিয়া আসি। নানা কারণে আমি তাহাতে অক্ষম। যদি আপনারা ভারতবর্ষে ফিরিবার সময় জাপান দিয়া ঘুরিয়া আসেন তবে সেই সময়ে জাপানে গিয়া আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য একান্ত চেষ্টা করিব। নিবেদিতার কল্যাণে একটি জাপানীর সহিত আমার বন্ধুতা হইয়াছে—

অধ্যাপকমহাশয়কে তাঁহারা জাপানে বন্দী করিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক আছেন।

আমার এখানকার খবর আপনি নিশ্চয় জানেন। আমি এখন গুটিকয়েক বালক লইয়া এখানে নিভৃতে পড়াইতেছি। আশা করিতেছি এই অঙ্কুরটি ক্রমে বড় গাছ হইয়া ফলবান্ হইয়া উঠিবে। ইতি ৩রা বৈশাখ ১৩০৯

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩

[অক্টোবর ?, ১৯০৩]

ওঁ সোমবার

মাননীয়াসু

বিদ্যালয় আজ খুলিয়াছে। আমার কাজ আরম্ভ হইল। এ কয়দিন ছুটির সময় কয়েকটি ছেলে ছিল— তাহাদিগকে অল্পস্বল্প পড়াইতেছিলাম— আজ এখানকার শূন্যতা অনেকটা পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে। এখন হইতে এই কাজের মধ্যেই আমার বিশ্রাম— এই কাজের মধ্যেই আমার শরীর মনের চিকিৎসা। কাজ হইতে দূরে গিয়া কি আমার মন শান্ত হইবে? আমার অবর্ত্তমানে বিদ্যালয়ের যে যে অংশ বিকল হইয়া গিয়াছিল—সেই সমস্ত অংশ আমাকে সংস্কার করিতে হইবে। অধ্যাপক ও ছাত্রদের অন্তরের মধ্যে ভস্ম হইতে আগুনকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে— সমস্ত উজ্জ্বল ও সজীব করিতে হইবে। এই সকল কাজের কথা স্মরণ করিলে আমার দুর্ব্বলতা চলিয়া যায়। আমার কাজ অসম্পন্ন থাকিবে না— আমি রণে ভঙ্গ দিব না।

ইংরাজি শিক্ষার সুবিধার জন্য আমি সুবোধকে আবার দিল্লি হইতে টানিয়া আনিয়াছি। সুবোধ ইংরাজি ভাল পড়াইত। দিল্লিতে সে হেড্‌মাষ্টার হইয়া আমাকে বড় বিপদে ফেলিয়াছিল। আমি তাহাকে জবরদস্তি করিয়া এখানে

ফিরাইয়াছি। অরবিন্দ সম্বন্ধে এখন হইতে আপনি আর কিছুই ভাবিবেন না।

আপনি কেন আমাকে লোভ দেখাইতেছেন! দার্জ্জিলিঙে আপনার ওখানে যাইতে পারিলে আমি আর কিছু চাহিতাম না। কিন্তু বালককালে ইস্কুল পালাইয়াছি এ বয়সে আর চলে না। আমার অনেক লেখাপড়ার কাজ মুলতবি আছে— আপনার আশ্রয়ে যদি যাইতে পারিতাম তবে অধ্যাপক একদিকে আর এই সম্পাদক আর একদিকে নিঃশব্দে আপন আপন কাজে লাগিয়া থাকিতাম— ক্ষুধার সময় আপনার কাছে গিয়া পড়িতাম— কিন্তু নিরামিষ, তাহা বলিতেছি— আর কই মাছ নয়— দ্বিপদ চতুষ্পদের ত কথাই নাই। কলিকাতার চেয়ে শরীরটা অল্প একটু সারিয়াছে। যদি ছুটি লওয়া সঙ্গত ও আবশ্যক বোধ করি তবে অগ্রহায়ণের পূর্ব্বে নড়িব না। আমার বোটে কি আপনাদের টানিতে পারিব না? আমাকে নিঃসহায় পদ্মায় বিসর্জ্জন দিবেন? আমাকে যদি এমন করিয়া অবহেলা করেন তবে একলা এই শরীরটাকে লইয়া কত করিব?

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪
১৯ জুলাই ১৯০৬

ওঁ বোলপুর

মাননীয়াসু

অরবিন্দের জন্য কিছুমাত্র ভাববেন না। এবারে আসবামাত্র তাকে পিসিমার জিম্মা করে দেব— তিনি ওকে মাছ ভাত মাংস, সজ্‌নের ডাঁটা, কুম্‌ড়োর ফুল, লাউডগা-সিদ্ধ প্রভৃতি খাইয়ে তাজা করে তুলবেন।

আপনাকে আর একটি কাজ করতে হবে— আমাকে সম্মান এবং শ্রদ্ধা প্রভৃতি করা একেবারে ছেড়ে দেবেন। তার প্রধান কারণটা আপনাকে বলি। সম্প্রতি আমার বয়স যে যথেষ্ট হয়েছে সে ঢাকবার কোনো উপায় নেই— আমার দেহযন্ত্র এ সম্বন্ধে অধ্যাপক মশায়ের চেয়ে ঢের বেশি সরল। আমার নিজের মাথার পাকা চুল আমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে এমন অবস্থায় আপনারাও যদি আমাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করেন তাহলে আমার কি উপায় হবে। যদি স্নেহ করেন ত বাঁচি— তাহলে অল্প বয়সের স্মৃতিটাও মাঝে মাঝে মনে পড়ে। আমার এক বৌঠাকরুণ ছিলেন আমি ছেলেবেলায় তাঁর স্নেহের ভিখারী ছিলেম— তাঁকে হারানর পর আমার দ্রুতপদবিক্ষেপে বয়স বেড়ে উঠেছে এবং আমি সম্মান ও শ্রদ্ধা লাভ করে হয়রান্‌ হয়েছি। কিন্তু আপনার কাছে এ রকম নৃশংসতা প্রত্যাশা করি নি। আপনার বয়স আমার চেয়ে কম

কিন্তু ঈশ্বর আপনাদের স্নেহ করবার স্বাভাবিক শক্তি দিয়েছেন —সেজন্যে আপনাদের বয়সের অপেক্ষা করতে হয় না— সকলের দাবী মিটিয়ে সকলের ভাগ চুকিয়ে আমার মত জরাজীর্ণের জন্যও কিঞ্চিৎ বরাদ্দ করে দিলে স্নেহের নিতান্ত অপব্যয় হবে না। আমাকে যদি "আপনি" বলা ছেড়ে দিয়ে "তুমি" বলবার চেষ্টা করে কৃতকার্য্য হতে পারেন ত উত্তম— যদি অসাধ্য বোধ করেন তবে পত্রে শ্রদ্ধাস্পদেষু প্রভৃতি বিভীষিকা প্রচার করবেন না। তার চেয়ে আমাকে আপনি "কবিবরেষু" বলে লিখবেন। আপনাদের কাছ থেকে এ রকম উৎসাহজনক সম্ভাষণ পেলে হয়ত আমার কলমের বেগ আরো বাড়তে পারে— সেটাকে যদি দুর্ঘটনা জ্ঞান না করেন তবে দ্বিধা করবেন না।

দ্বিতীয় নিবেদন, বোলপুরে আসবার জন্যে প্রস্তুত হোন। বিলম্ব করবেন না। ইতি ৩রা শ্রাবণ ১৩১৩।

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫
[অক্টোবর ১৯০৫ বা ১৯০৬]

ওঁ

বোলপুর

বৌঠাকুরাণী

আজ আপনার সস্নেহ পত্র পাইলাম। ইচ্ছা ছিল লিখি যে আমার শরীর অত্যন্ত খারাপ— কিন্তু দুই কারণে লিখিলাম না— এক, লিখিলেও আপনার দয়া উদ্রেক করিত না, দুই, সম্প্রতি আমার শরীর খারাপ নয়। শেষ কারণটা তেমন গুরুতর বলিয়া গণ্য করি না কিন্তু প্রথমটা মারাত্মক— অতএব খুব উচ্চ কণ্ঠে সতেজে বলিতেছি বেশ আছি, ভাল আছি, রোগের কোনো চিহ্নও নাই।

নিবেদিতা যে আপনার ওখানে পীড়িত অবস্থায় তাহা আমি জানিতাম না— আমি একখানা বই চাহিয়া তাঁহাকে কলিকাতার ঠিকানায় কয়েক দিন হইল পত্র লিখিয়াছি। আপনি দয়া করিয়া এমন ব্যবস্থা করিবেন যে, সে পত্রের যেন তিনি কোনো নোটিস্ না লন্। তাঁহাকে আমার সাদর নমস্কার জানাইবেন এবং বলিবেন যে উৎসুক চিত্তে তাঁহার আরোগ্যপ্রত্যাশায় রহিলাম।

আমি বোলপুর বিদ্যালয় খোলার অন্তত দুই সপ্তাহ পরে শিলাইদহ অভিমুখে রওনা হইব অতএব আপনাদের সঙ্গে তৎপূর্ব্বে নিশ্চয় দেখা হইবে। আপনি যদি বোলপুরে পদার্পণ করেন তবে আরো সত্বর দেখা হইতে পারে বিশেষ আপনি

যখন অনেকবার— , থাক্, এ নিষ্ফল আলোচনায় প্রয়োজন নাই।

বেলা ও তাহার স্বামী আসিয়াছিল দিন তিনেক হইল চলিয়া গেছে— মীরাও তাহাদের সঙ্গে মজঃফরপুর গেছে— তাই আমার এখানকার আশ্রম সম্প্রতি আমার পক্ষে অত্যন্ত শূন্য হইয়া গেছে।

অরবিন্দর সহপাঠীরা সকলেই কার্ত্তিক মাসের জন্য বাড়ি গেছে— কেবল যোগেন আছে। সেও দুই এক দিনের মধ্যে চলিয়া যাইবে। কেবল ছুটির জন ছয় সাতেক ছাত্র থাকিবে। অজিতও আজ বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য দিল্লি অভিমুখে রওনা হইল। অরবিন্দ ফিরিয়া আসিলে, যদি ইচ্ছা করেন, ত এখানে পাঠাইতে পারেন। তাহার অঙ্ক ও সংস্কৃতের অধ্যাপক এখানে আছেন। ইতি। ৩১শে আশ্বিন ১৩ [১২ বা ১৩]

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬

[এপ্রিল ১৯০৮]

ওঁ কলিকাতা

মাননীয়াসু

আপনার চিঠি পেয়ে খুব খুশি হলুম। আপনারা চলে যাওয়ার পরে অল্প দিনের মধ্যে খুব একটা বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে এসেছি। এই বিপ্লবটাকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে দেখতে গেলে এটা যত বড় উৎকট আকার ধারণ করে, জীবনের সমগ্রের সঙ্গে মিলে মিশে এটা তত প্রচণ্ড নয়। যে-ব্যাপারটা কল্পনায় নিতান্তই দারুণ এবং অসঙ্গত বোধ হয় সেটাও ঘটনায় এমন ভাবে আপনার স্থান গ্রহণ করে যেন তার মধ্যে অপ্রত্যাশিত কিছুই নেই। সেই জন্যে সমস্ত আঘাত কাটিয়ে, জীবনযাত্রা যেমন চল্‌ছিল তেমনিই চল্‌ছে ;— হয়ত একটা কিছু পরিবর্ত্তন ঘটেছে— কিন্তু সে পরিবর্ত্তন উপর থেকে দেখা যায় না— সে পরিবর্ত্তন নিজের চোখেও হয়ত সম্পূর্ণভাবে লক্ষ্যগোচর হতে পারে না।

ভেবেছিলুম ছুটি নেব কিন্তু আমার কাজের ভার আরো বেড়ে গেছে। আমি সম্প্রতি পল্লীসমাজ নিয়ে পড়েছি। আমাদের জমিদারীর মধ্যে পল্লীগঠনকার্য্যের দৃষ্টান্ত দেখাব বলে স্থির করেছি। কাজ আরম্ভ করে দিয়েছি। কয়েক জন পূর্ব্ববঙ্গের ছেলে আমার কাছে ধরা দিয়েছে। তারা

পল্লীর মধ্যে থেকে সেখানকার লোকদের সঙ্গে বাস করে তাদের শিক্ষা স্বাস্থ্য বিচার প্রভৃতি সকল কাজের ব্যবস্থা তাদের নিজেদের দিয়ে করাবার চেষ্টা করচে। তাদের দিয়ে রাস্তাঘাট বাঁধানো, পুকুর খোঁড়ানো, ড্রেন কাটানো, জঙ্গল সাফ করানো, প্রভৃতি সমস্ত কাজের উদ্যোগ হচ্চে। আমাদের পল্লীর ভিতরে সমস্ত দেশ ব্যাপ্ত করে এমন সুগভীর নিরুদ্যম, যে, সে দেখলে স্বরাজ স্বাতন্ত্র্য প্রভৃতি কথাকে পরিহাস বলে মনে হয়— ও সকল কথা মুখে উচ্চারণ করতে লজ্জা বোধ হয়। কিন্তু যাঁরা সবচেয়ে উচ্চৈঃস্বরে একেবারেই সপ্তমে গলা চড়িয়ে এই সকল শব্দ ঘোষণা করেন তাঁরাই এই বিষয়টাতে সকলের চেয়ে নিশ্চেষ্ট। সুরেন্দ্রবাবুরা পল্লীসমাজ গঠনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়েছেন— তাঁরা কলকাতায় ৯ নম্বর ওয়ার্ডে কাজ আরম্ভ করে দিয়েছেন— পল্লীগ্রামেও লাগবেন বলে আশা দিয়েছেন। কিন্তু চরমপন্থীরা কেবল চরমের কথাই ভাবচেন, উপস্থিত কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তাঁরা একেবারেই নিশ্চেষ্ট। এ পর্য্যন্ত এঁদের দ্বারা একটি অতি ক্ষুদ্র কাজও হয় নি। অথচ এঁরাই মডারেট দলকে কর্ম্মহীন বাক্যবিশারদ বলে গাল দিয়ে এসেছেন। এঁরা কেবলই কথা নিয়ে কলহ করচেন কাজেই আমার মত জরাজীর্ণকেও কাজের ক্ষেত্রে নাবতে হয়েছে। আমি সভা-স্থলের আহ্বানে আর সাড়া দিচ্চি নে— কিন্তু সেই জন্যেই দেশের যেটা সকলের চেয়ে প্রয়োজন সেটা সাধনের জন্যে আমার যেটুকু সাধ্য তা প্রয়োগ করতেই হবে। আপনারা

যখন ফিরে আস্‌বেন— আশা করচি তত দিনে আমাদের শিলাইদহের গ্রামগুলি অনেকটা গঠিত হয়ে উঠতে পারবে।

আপনি লণ্ডনে যেভাবে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা করতে চান সেইটেই আপাতত অবলম্বনীয়। এমনি করে পর্য্যায়ক্রমে এক এক জনের বাড়িতে উপাসনাকার্য্য হতে হতে এর পরে স্বতন্ত্র গৃহনির্ম্মাণ করা সম্ভবপর হবে। ওখানে যে উপাসনা-প্রণালী গ্রহণ করেচেন তার মধ্যে অন্তত গুটি দুই তিন উপনিষদের মন্ত্র রাখবেন— ভারতবর্ষের সঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্মের সম্বন্ধটা সে দেশে এই রকম করে বিশেষ ভাবেই স্বীকার করা চাই। এতে ভারতবাসী প্রবাসীরও উপকার হবে, আর সে দেশের লোকের কাছেও ব্যাপারটা শ্রদ্ধেয় ও মনোহর হবে। আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব।

আমরা সবাই কলকাতায় ফিরে এসেছি। এদিকে নিদারুণ গ্রীষ্মে বিদ্যালয়ও বন্ধ করতে হ'ল— আবার কোথায় পালাব তাই ভাবছি— কলকাতায় বাস করা অসম্ভব।

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ

৭

২৪ নভেম্বর ১৯৩৭

ওঁ শান্তিনিকেতন

প্রিয়বরাসু

মৃত্যুর দ্বার থেকে সেদিন ফিরে এসেছি— তার সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেছে, মনে কোনো আশঙ্কা নেই। শেষযাত্রারও দেরি নেই তা জানি। দুঃখ তাদেরই যারা পিছনে পড়ে থাকে। বাইরের কোনো সান্ত্বনাবাক্যেই তাদের বিচ্ছেদের অভাব লেশমাত্র পূরণ করতে পারে না। যে অসামান্য নিষ্ঠা ও সতর্কতার সঙ্গে আপনি তাঁর সেবা করেছেন তারই মহত্ত্ব আপনার অবশিষ্ট জীবনকে মূল্যবান করবে, আপনার জীবনের অসামান্য অভিজ্ঞতা আপনার শোককে মহোচ্চতা দেবে এ ছাড়া আজ আর কিছু বলবার নেই। ইতি ২৪।১১। [১৯]৩৭

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সংযোজন

জগদীশচন্দ্র বসুকে লিখিত

১ ওঁ "UTTARAYAN"

SANTINIKETAN

BENGAL

বন্ধু

তোমার সম্মাননা সভায় উপস্থিত থাকতে পারব আশা করেছিলুম কিন্তু এখনো চলতে ফিরতে কষ্ট হয়— প্রায় সমস্ত দিন কেদারা অবলম্বন করে থাকি। সকালে খুব অল্প একটুখানি হাঁটি, তাতেই হাঁপিয়ে পড়ি। রেলে যাতায়াত করতে ভয় পাই।

আমার মনের কথা একটি কবিতায় লিখে পাঠিয়েচি, আশা করি তোমার হাতে পৌঁচেছে— তোমার সেদিনকার অভিনন্দন সভায় এই আমার অর্ঘ্য। আমার অন্তরের কথা তুমি জানো— কিন্তু সকলকে জানিয়ে রেখে যেতে চাই। আমার সৌভাগ্য, তোমাকে বন্ধুরূপে পেয়েছি, সেই গৌরবের কথাটিকে স্থায়ী রূপ দিয়ে আমার ছন্দে প্রতিষ্ঠিত করেছি— ভাবীকালের চিত্তে তোমার স্মৃতির সঙ্গে আমার স্মৃতি জড়িত হয়ে থাকবে এই আমার আনন্দ। তোমার কর্ম্মে তোমার সহযোগিতা করি এমন শক্তি আমার নেই, কিন্তু বন্ধুর প্রীতি সংসারপথের পাথেয়, অন্তর থেকে তাই তোমাকে নিবেদন করতে পেরেছি এই কথা মনে রেখো। ইতি ১০ই অগ্রহায়ণ ১৩৩৫

তোমার রবি

২

ওঁ

সুহৃৎ,

আসিয়াছিলাম— চলিলাম।

সোমবারে শিলাইদহ যাইব। ইহার মধ্যে সে অঞ্চলে যাইবার ইচ্ছা আছে কি, সার্কুলার রোডের বাড়িতেও গিয়াছিলাম, সেখানে দ্বার জানালা রুদ্ধ— এখানে দ্বার জানালা উন্মুক্ত, কিন্তু ফলে তফাৎ হইল না। কিন্তু চলুন পদ্মাতীরে— সেখানে চমৎকার ঝড়বৃষ্টি বজ্র বিদ্যুৎ চলিতেছে— এইরূপ দুর্য্যোগে ম্যাকবেথের তিন উইচ্ মাঠের মাঝখানে সম্মিলিত হইয়াছিল— অধিক আর কি বলিব। ইতি ১৬ই বৈশাখ ১৩০৭

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অবলা বসুকে লিখিত

আজ আপনার চিঠি এইমাত্র পেলুম।

অরবিন্দ সম্বন্ধে আপনি আমাকে কিছু বল্‌বেন একথা আমি অনেকদিন থেকে প্রত্যাশা করে আছি। কারণ অরবিন্দকে যখন আমার হাতে মানুষ হবার জন্যে আপনি দিয়েছিলেন তখন তার সঙ্গে আমার চিরন্তন মঙ্গলের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছে। এখন থেকে অরবিন্দকে নিয়ে যখন যাই করুন না কেন আমাদের এই সম্বন্ধটিকে হিসাবের মধ্যে আন্‌তেই হবে।

অনেক জিনিষ আছে যা ভাড়াটে গাড়ির মত— যতক্ষণ তার প্রয়োজন, ততক্ষণই তার ব্যবহার, ততক্ষণই তার সঙ্গে সম্বন্ধ। কিন্তু যেখান থেকে আমরা এমন কিছু পাই যা আমাদের মনুষ্যত্বের সম্বল, তার সঙ্গে স্বভাবতই আমাদের চিরকালের গভীর যোগ জন্মে যায়। পৃথিবীতে যে কোনো মানুষের বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমাদের সেইরকম বড়, গভীর এবং নিত্য সম্বন্ধ জন্মে যায় তারা লক্ষ্যে এবং অলক্ষ্যে আমাদের ক্ষুদ্রতা থেকে রক্ষা করে এবং সার্থকতার দিকে নিয়ে যায়। দুর্ভাগ্যক্রমে অল্প মানুষেরই এমন সুযোগ ঘটে। পৃথিবীতে চিত্তকে সুদূর গভীরতার মধ্যে প্রেরণ করে' চিরদিন প্রাণরস মঙ্গলরস সঞ্চয় করবার মত জায়গা আমরা বেশি পাইনে— এবং আমাদের অনেকেরই এমন শক্তি নেই যে আমরা কোথাও চিরন্তন সত্যসম্বন্ধ স্থাপন করতে পারি। যদি এ কথা সত্য হয় যে বোলপুর বিদ্যালয়ের সঙ্গে অরবিন্দের একটি সত্যকার যোগ স্থাপনা হয়েছে তবে সে জন্যে কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন হবেন না, বরঞ্চ অরবিন্দের জন্যে আনন্দিত হবেন। আমি যে এ কথা বলচি তার কারণ এ নয় যে বোলপুর বিদ্যালয়ের মধ্যে বিশেষ একটা শক্তি আছে— এ বিদ্যালয় কাউকে বিশেষ কিছু দিতে পারে না— কিন্তু যে ব্যক্তি তপস্যা করে নিতে পারে সে আপনার শক্তিতেই সমস্ত উপলক্ষ্য হতেই সার সংগ্রহ করতে পারে। সেই তপস্যাকে জাগ্রত করাই হচ্চে কথা। বারো আনা লোক অত্যন্ত লঘুভাবে পৃথিবীর উপর দিয়ে ভেসে চলে যায়, বিপদ সেইখানেই। জীবনের সম্বন্ধে পৃথিবীর সম্বন্ধে সত্যতা যদি জন্মে যায় তাহলেই

মানুষ সার্থক হয়। বোলপুরের বিদ্যালয়ে অরবিন্দ আর কিছু পাক্ বা না পাক্, সে জীবনকে সত্য বলে অন্তরের মধ্যে দৃঢ়রূপে উপলব্ধি করেছে। এই উপলব্ধিটি এমন একটি বড় জিনিষ যে, যেখান থেকে এটি আমরা পাই সেইখানেই আমাদের জীবনের গভীরতম শ্রদ্ধা জড়িত হয়ে পড়ে— না হয়ে উপায় নেই। যদি দেখ্‌তেন অরবিন্দের মনে সেই পরিমাণ শ্রদ্ধা জাগ্রত হয়নি তাহলে নিশ্চয়ই জান্‌তেন তার চিত্তেও সে সেই পরিমাণ বড় জিনিষ পায় নি। এই জন্যে আমি আপনাকে বলচি অরবিন্দের জন্যে আপনি উদ্বিগ্ন হবেন না।

এ কথা নিশ্চয়, অনেক সময় নানা কারণে আমাদের মনে মোহ উৎপন্ন হয়— সেই মোহের বন্ধনও প্রচণ্ড প্রবল। আমাদের ছেলেরা অনেক সময় ইংলণ্ডে গিয়ে সেখানে আপনার মনপ্রাণ বিকিয়ে আসে সেটা তাদের পক্ষে কিছুতেই ভাল নয় এ কথা স্বীকার করতেই হবে।

কিন্তু এখানে মোহের কোনো উপকরণই নেই। যাতে মনকে বাইরের দিক থেকে ভোলাতে পারে এমন কিছুই এখানে দেখতে পাবেন না— বরঞ্চ ঠিক তার উল্টো। সুদীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অরবিন্দের মন এখানে বসে নি। ও যেন একেবারে উদাসীন ছিল। কোনো শিক্ষা বা কোনো কথায় ও মন প্রয়োগ করতেই পারত না। ওর সম্বন্ধে আমি প্রায় হতাশ হয়ে পড়েছিলুম। পড়াশুনোর দিকেও ওকে আমি অগ্রসর করতে পারছিলুম না, ভিতরের দিক থেকেও মহত্ত্বের প্রতি ওর চিত্তকে জাগ্রত করতে পারছিলুম না, ক্রমে এই

বিদ্যালয় যখন ওর অন্তঃকরণকে স্পর্শ করলে সে ত কোনো কৃত্রিম উপকরণ বা বাহ্য প্রলোভন দিয়ে নয়। সে নিঃসন্দেহ ক্রমশই আমাদের অগোচরে চিত্তের সামগ্রী কিছু পাচ্ছিল— যখন থেকে তাই পেতে আরম্ভ করলে তখন থেকে আপনিই আপনার মধ্যে ওর উদ্বোধন হতে লাগল। এই উদ্বোধনের মত এমন গভীর এবং বড় জিনিষ জগতে আর কিছুই নেই— যে লোক তা উপলব্ধি করেছে সে তার আনন্দকে কোনোদিন ভুল্‌তে পারবেনা।

কিন্তু সত্য এমন একটি জিনিষ যাকে নিয়ে যেমন খুসি চলা যায় না। তাকে তার নিজের পথ খানিকটা ছেড়ে দিতেই হয়। যদি কোনো মানুষকে কোনো একটি বিশেষ গণ্ডীর মধ্যে কোনো একটি বিশেষ ইচ্ছার দ্বারা বেষ্টিত করে রাখতে ইচ্ছা করেন তাহলে তাকে এই সত্য উপলব্ধির প্রবল বিকাশ থেকে দূরে রাখ্‌তেই হবে। শূদ্রের উপর ব্রাহ্মণ যখন কর্ত্তৃত্ব করতে চেয়েছিল, যখন তাকে বিশেষ প্রয়োজনে লাগাতে চেয়েছিল তখন তাকে কেবল সামাজিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে নি, তাকে সত্যলাভের সুযোগ থেকে সর্ব্বপ্রকারে বঞ্চিত করেছিল।

কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই এমন কথা বল্‌বেন না, যে মানুষের অন্তরাত্মার বিকাশ তার আর সমস্ত প্রয়োজনের চেয়ে বড় নয়। এই অন্তরাত্মার বিকাশ আপাতত সমাজে সংসারে যতই অসুবিধাকর হোক্‌ না, এর চেয়ে মানুষের শ্রেষ্ঠ জিনিষ আর কিছুই নেই। অরবিন্দের অন্তরের মানুষের জাগরণ হয়েছে— তার ক্ষুধা, তার কান্না, তার চাঞ্চল্যকে আপনি যদি আপদ মনে করেন তাহলে ভুল

করবেন। উপবাসের দ্বারা, শাসনের দ্বারা, বাধার দ্বারা একে নিঃশব্দ ও নির্জ্জীব করতে হয় ত কিছুতেই পারবেন না— যদি তা পারেন তবে তার চেয়ে এমন পরম দুঃখের জিনিষ আর কিছুই হতে পারে না।

কিন্তু আমি হয় ত গোড়াতেই ভুল করছি। সম্ভবত অরবিন্দ জীবনের যে আদর্শ গ্রহণ করেছে সেটাকে আপনারা ভাল বলেই মনে করেন না। ও যে রকম হলে আপনারা খুসি হতেন ও তেমনটি হয় নি— এবং সেই জন্যে নিশ্চয়ই এই বিদ্যালয়ের শিক্ষা, প্রভাব ও বিধিব্যবস্থাকে মনে মনে দায়ী করচেন— এবং ভাবচেন, যা হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে এখন থেকে নূতন পথে ওর জীবনকে প্রবাহিত করে দেবেন।

এ সম্বন্ধে আমার বল্‌বার কথা কিছুই থাক্‌তে পারে না। যা ওর পক্ষে মঙ্গল বলে আপনারা বিবেচনা করবেন নিশ্চয়ই সেদিকে ওকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করবেন। কিন্তু ক্ষুব্ধ হয়ে বিরক্ত হয়ে যদি এ কাজে প্রবৃত্ত হন তবে ওকে প্রতি মুহূর্ত্তে কেবল পীড়িত করবেন, কোনো ফলই পাবেন না। মঙ্গলের পথ যন্ত্রের পথ নয়— সেখানে জোর খাটে না। ওকে আপনারা যদি না বোঝেন, তা হলে স্বভাবতই ও ক্রমেই আপনাদের কাছ থেকে দূরে গিয়ে পড়বে, ক্রমেই আপনাদের বোঝার অতীত হয়ে উঠ্‌বে। ওর এখন এমন একটি বয়স এমন একটি অবস্থা যখন খুব বিবেচনার সহিত ওকে সকল দিক্ থেকে বুঝে ওর প্রতি একান্ত সহিষ্ণু হয়ে, ওর গভীরতম প্রয়োজনের কথা চিন্তা করে’ ওর বেদনায় বেদনা দিয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধুর

মত ওকে হাতে ধরে নিয়ে চল্‌তে হবে— রাগ করে ওকে আঘাত করলে সেই আঘাতের দ্বারা ওর ক্ষতি করবেন এবং ওকে হারাতে থাক্‌বেন।

আমার পক্ষ থেকে আমি একটি মাত্র কথা আপনাকে বল্‌তে ইচ্ছা করি। অরবিন্দকে যে আদর্শে তৈরি করলে আপনাদের মনের মত হত তা আমি হয় ত করি নি, কারণ করা হয় ত আমার পক্ষে অসাধ্য, কিন্তু এ কথা মনে রাখ্‌বেন যে যদি বড়র দিকে সত্যের দিকে ওর জীবনের গতি অভিমুখ হয়ে থাকে সেও কম কথা নয়। ও নিজের জীবনকে বড় রকম করে সার্থক করতে চায় এইটেই সকলের চেয়ে বড় কথা— কোন্ বিশেষ পথ দিয়ে করতে চায় তা নিয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে ফল নেই। আমার হাতে যা ছিল, আমি যেটুকু পারি তা আমি ওর সম্বন্ধে করেছি— সে জন্যে যেটুকু অপরাধ সে সম্পূর্ণই আমার— ও বেচারার উপায় ছিল না— কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে দণ্ড ওকেই ভোগ করতে হবে। অরবিন্দ যদি ইস্কুলে পড়া কলেজে পাস করা সাধারণ বালকের মত হত— অর্থাৎ চিত্ত বলে কোনো পদার্থ না থাকৃত, এবং যখন যে যা বল্‌ত তাই আবৃত্তি করত, চারদিকে যা শুন্‌ত তাই নির্ব্বিচারে শুনে যেত, তাহলে আপনারা কি খুসি হতেন? সত্যকে পাবার চেষ্টা ওর মনে যে প্রবল হয়ে উঠেছে সে যদি ভুল করেও হয় এবং ভুল পথেও যায় তাতে কি আপনাদের আনন্দের কথা কিছু নেই? পথের সংশোধন হওয়া শক্ত নয় কিন্তু এই চেষ্টাটাই জগতে দুর্লভ।

এবারে আপনাকে বোলপুরে আসবার কথা বলি নি— তার

কারণ, কিছুদিন থেকে আমি অনুভব করছিলুম এই বিদ্যালয়ের প্রতি আপনার হৃদয় অনুকূল নেই। অথচ এই বিদ্যালয়টি আমার জীবনের সাধনার ক্ষেত্র— আমার দেবতা এইখানে, আমার মুক্তি এইখানে— এ সামান্য ইস্কুলমাত্র নয়— এখানে আপনি মনে লেশমাত্র বিমুখতা নিয়ে আস্‌বেন, এখানে এসে কেবলমাত্র কৌতূহল চরিতার্থ করে যাবেন এ আমার পক্ষে অসহ্য। অনেক লোক তেমনভাবে এখানে আসে যায়— আমি পৃথিবীর সকল লোকের কাছেই সহানুভূতির কাঙালবৃত্তি করতে ত চাইনে— কিন্তু আপনাদের তেমন উদাসীনভাবে দেখ্‌তে পারিনে। যে জায়গায় আমি সকলের চেয়ে সার্থকতা লাভ করেছি সে জায়গায় আপনাদের যদি কোনো বিরোধ থাকে তবে সেখানে খেলাচ্ছলেও আমাদের মিলন হতে পারে না— আর সব জায়গাই রইল— কলকাতা আছে, আমাদের পদ্মার চর আছে, আর যেখানেই বলেন সেখানেই কোনো বাধা নেই।

আজ বর্ষশেষের দিন! আমরা যিনি যে পথেই চলি না কেন, ক্ষমা রাখ্‌বেন— ফাঁকি দিতে চাচ্চিনে, প্রাণপণে চলচি এবং আরামের পথ বেছে নিই নি এইটুকু মাত্র দাবীর জোর রাখি, তার পরে সত্য মিথ্যা ভালমন্দর বিচারক যিনি, তিনিই যথাসময়ে বিচার করবেন। ইতি ৩০শে চৈত্র ১৩১৭

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পরিশিষ্ট

১ জগদীশচন্দ্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কবিতা

২ রবীন্দ্রনাথের নিবন্ধ

৩ রবীন্দ্রনাথের পত্র

৪ রবীন্দ্র-জগদীশ-প্রশ্নোত্তর

৫ জগদীশচন্দ্র সম্বন্ধে অন্যান্য পত্র

সত্যের মন্দিরে তুমি যে দীপ জ্বালিলে অনির্ব্বাণ
তোমার দেবতা সাথে তোমারে করিল দীপ্যমান

'কথা'র উৎসর্গ

সত্যরত্ন তুমি দিলে,— পরিবর্তে তার
কথা ও কল্পনামাত্র দিনু উপহার।

শিলাইদহ
অগ্রহায়ণ ১৩০৬

জগদীশচন্দ্র বসু

ভারতের কোন্ বৃদ্ধ ঋষির তরুণ মূর্ত্তি তুমি
হে আর্য্য আচার্য্য জগদীশ? কি অদৃশ্য তপোভূমি
বিরচিলে এ পাষাণ নগরীর শুষ্ক ধূলিতলে?
কোথা পেলে সেই শান্তি এ উন্মত্ত জনকোলাহলে
যার তলে মগ্ন হয়ে মুহূর্ত্তে বিশ্বের কেন্দ্রমাঝে
দাঁড়াইলে একা তুমি— এক যেথা একাকী বিরাজে
সূর্য্যচন্দ্র-পুষ্পপত্র-পশুপক্ষি-ধূলায় প্রস্তরে,—
এক তন্দ্রাহীন প্রাণ নিত্য যেথা নিজ অঙ্ক'পরে
দুলাইছে চরাচর নিঃশব্দ সঙ্গীতে! মোরা যবে
মত্ত ছিনু অতীতের অতিদূর নিষ্ফল গৌরবে,
পরবস্ত্রে, পরবাক্যে, পরভঙ্গিমার ব্যঙ্গরূপে
কল্লোল করিতেছিনু স্ফীতকণ্ঠে ক্ষুদ্র অন্ধকূপে—
তুমি ছিলে কোন্ দূরে? আপনার স্তব্ধ ধ্যানাসন
কোথায় পাতিয়াছিলে? সংযত গম্ভীর করি' মন
ছিলে রত তপস্যায় অরূপরশ্মির অন্বেষণে
লোক-লোকান্তের অন্তরালে,— যেথা পূর্ব্ব ঋষিগণে
বহুত্বের সিংহদ্বার উদ্ঘাটিয়া একের সাক্ষাতে
দাঁড়াতেন বাক্যহীন স্তম্ভিত বিস্মিত জোড়হাতে!
হে তপস্বী, ডাক তুমি সামমন্ত্রে জলদগর্জ্জনে
"উত্তিষ্ঠত! নিবোধত!" ডাক শাস্ত্র-অভিমানী জনে
পাণ্ডিত্যের পণ্ডতর্ক হতে! সুবৃহৎ বিশ্বতলে
ডাক মূঢ় দাম্ভিকেরে! ডাক দাও তব শিষ্যদলে—

একত্রে দাঁড়াক্ তারা তব হোম-হুতাগ্নি ঘিরিয়া!
আরবার এ ভারত আপনাতে আসুক ফিরিয়া
নিষ্ঠায়, শ্রদ্ধায়, ধ্যানে,— বসুক্ সে অপ্রমত্ত চিতে
লোভহীন দ্বন্দ্বহীন শুদ্ধ শান্ত গুরুর বেদীতে!

[১৩০৮]

গাং হোক তব জয়

স্বদেশের গলে দাও তুমি তুলি

যশোমাল্য অক্ষয়।

বহুকাল হতে ভারতের বাণী

আছিল নীরব অপমানমানী

তুমি তারে আজি জাগায়ে তুলিয়া

রটালে বিশ্বময়।

জ্ঞানমন্দিরে জ্বালায়েছ তুমি

যে নব আলোকশিখা

তোমার সকল ভ্রাতার ললাটে

দিল উজ্জ্বল টিকা।

অবারিতগতি তব জয়রথ

ফিরে যেন আজি সকল জগৎ

দুঃখদীনতা যা আছে মোদের

তোমারে না বাঁধি রয়।

সম্বর্ধনা-সঙ্গীত

ঔঁ

জয় তব হোক জয়!
স্বদেশের গলে দাও তুমি তুলে
যশোমালা অক্ষয়!
বহুদিন হতে ভারতের বাণী
আছিল নীরবে অপমান মানি'
তুমি তারে আজি জাগায়ে তুলিয়া
রটালে বিশ্বময়।

জ্ঞানমন্দিরে জ্বালায়েছ তুমি
যে নব আলোকশিখা,
তোমার সকল ভ্রাতার ললাটে
দিল উজ্জ্বল টীকা।
অবারিতগতি তব জয়রথ
ফিরে যেন আজি সকল জগৎ।
দুঃখ দীনতা যা' আছে মোদের
তোমারে বাঁধি না রয়।

মাঘ
১৩০৯]

অনুষ্ঠানপত্রের পাঠ। পাণ্ডুলিপি-চিত্র দ্রষ্টব্য

বন্ধু,   এ যে আমার লজ্জাবতী লতা।
কি পেয়েছে আকাশ হতে,
কি এসেছে বায়ুর স্রোতে,
পাতার ভাঁজে লুকিয়ে আছে
সে যে প্রাণের কথা।
যত্নভরে খুঁজে খুঁজে
তোমায় নিতে হবে বুঝে,
ভেঙে দিতে হবে যে তার
নীরব ব্যাকুলতা।
আমার   লজ্জাবতী লতা।

বন্ধু,   সন্ধ্যা এল, স্বপনভরা
পবন এরে চুমে।
ডালগুলি সব পাতা নিয়ে
জড়িয়ে এল ঘুমে।
ফুলগুলি সব নীল নয়ানে
চুপি চুপি আকাশপানে
তারার দিকে চেয়ে চেয়ে
কোন্ ধেয়ানে রতা!
আমার   লজ্জাবতী লতা।

বন্ধু, আনো তোমার তড়িৎ পরশ,
হরষ দিয়ে দাও,—
করুণ চক্ষু মেলে ইহার
মর্ম্মপানে চাও।
সারাদিনের গন্ধগীতি,
সারাদিনের আলোর স্মৃতি
নিয়ে এযে হৃদয়ভারে
ধরায় অবনতা।
আমার লজ্জাবতী লতা।

বন্ধু, তুমি জান ক্ষুদ্র যাহা
ক্ষুদ্র তাহা নয় ;—
সত্য যেথা কিছু আছে
বিশ্ব সেথা রয়।
এই যে মুদে আছে লাজে
পড়বে তুমি এরি মাঝে
জীবন মৃত্যু রৌদ্রছায়া
ঝটিকার বারতা।
আমার লজ্জাবতী লতা।

কলিকাতা
১৮ আষাঢ় ১৩১৩

আধুনিক ভারতবর্ষে যাঁহারা মাঝে মাঝে এই আশার আলোক জ্বালিয়া তুলিতেছেন তাঁহারা যদিবা আমাদের সূর্য্যচন্দ্র নাও হন তথাপি আমাদের স্বদেশের অন্ধ রজনীতে তাঁহারা এক মহিমান্বিত ভবিষ্যতের দিকে আমাদিগকে পথ দেখাইয়া জাগিতেছেন। সম্ভবতঃ সেই ভবিষ্যতের আলোকে তাঁহাদের ক্ষুদ্র রশ্মিটুকু একদিন ম্লান হইয়া যাইতে পারে কিন্তু তথাপি তাঁহারা ধন্য।

ভারতবর্ষ আজ পৃথিবীর সমাজচ্যুত। তাহাকে আবার সমাজে উঠিতে হইবে। কোন একসূত্রে পৃথিবীর সহিত তাহার আদানপ্রদান আবার সমানভাবে চলিবে, এ আশা আমরা কিছুতেই ছাড়িতে পারি না। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আমরা কবে ফিরিয়া পাইব এবং কখনও ফিরিয়া পাইব কিনা সে কথা আলোচনা করা বৃথা। কিন্তু নিজের ক্ষমতায় জগতের প্রতিভারাজ্যে আমরা স্বাধীন আসন লাভ করিব এ আশা কখনই পরিত্যাগ করিবার নহে।

রাজ্যবিস্তারমদোদ্ধত ইংলণ্ড আজকাল উষ্ণমণ্ডলবাসী জাতিমাত্রকে আপনাদের গোষ্ঠের গরুর মত দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সমস্ত এসিয়া এবং আফ্রিকা তাঁহাদের ভারবহন এবং তাঁহাদের দুগ্ধ যোগাইবার জন্য আছে, কিড্ প্রভৃতি আধুনিক লেখকগণ ইহা স্বতঃসিদ্ধসত্যরূপে ধরিয়া লইয়াছেন।

অদ্য আমাদের হীনতার অবধি নাই একথা সত্য কিন্তু উষ্ণমণ্ডলভুক্ত ভারতবর্ষ চিরকাল পৃথিবীর মজুরী করিয়া আসে নাই। ইজিপ্ট, ব্যাবিলন্, কাল্ডিয়া, ভারতবর্ষ, গ্রীস এবং রোম ইহারাই জগতে সভ্যতার

শিখা স্বহস্তে জ্বালাইয়াছিলেন, ইঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই ট্রপিক্‌সের অন্তর্গত, উষ্ণ সূর্য্যের করাধীন। সেই পুরাতন কালচক্র পৃথিবীর পূর্ব্বপ্রান্তে পুনর্ব্বার কেমন করিয়া ফিরিয়া আসিবে তাহা ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌স্ এবং তর্কদ্বারা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য, কারণ বড় বড় জাতির উন্নতি ও অধোগতি বিধির বিচিত্র বিধানে ঘটিয়া থাকে, তার্কিকের তর্কশৃঙ্খল তাহার সমস্ত মাপিয়া উঠিতে পারে না; তাহার কম্পাসের অর্দ্ধাংশ মাত্রের ভুল বিশাল কালপ্রান্তরে ক্রমশই বাড়িতে বাড়িতে সত্য হইতে বহু দূরে গিয়া বিক্ষিপ্ত হয়।

প্রসঙ্গক্রমে এই অবান্তর কথা মনের আক্ষেপে আপনি উঠিয়া পড়ে। কারণ, যখন দেখিতে পাই ক্ষুধিত য়ুরোপ ঘরে বসিয়া সমস্ত উষ্ণভূভাগকে অংশ করিয়া লইবার জন্য খড়ি দিয়া চিহ্নিত করিতেছেন তখন নিজেদিগকে সম্পূর্ণ মৃতপদার্থ বলিয়া শঙ্কা হয়, তখন নিজেদের প্রতি নৈরাশ্য এবং অবজ্ঞা অন্তঃকরণকে অভিভূত করিতে উদ্যত হয়।

ঠিক এইরূপ সময়ে জগদীশ বসুর মত দৃষ্টান্ত আমাদিগকে পুনর্ব্বার আশার পথ দেখাইয়া দেয়। জগদীশ বসু জগতের রহস্যান্ধকার-মধ্যে বিজ্ঞানরশ্মিকে কতটুকু অগ্রসর করিয়াছেন তাহা আমাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই ঠিকমত জানি না এবং জানিবার শক্তি রাখি না, কিন্তু সেই সূত্রে আশা এবং গৌরবের উৎসাহে আমাদের ক্ষমতা অনেকখানি বাড়াইয়া দিয়াছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

[১৩০৫]

আচার্য্য জগদীশের জয়বার্ত্তা

নিজের প্রতি শ্রদ্ধা মনের মাংসপেশী। তাহা মনকে উর্দ্ধে খাড়া করিয়া রাখে এবং কর্ম্মের প্রতি চালনা করে। যে জাতি নিজের প্রতি শ্রদ্ধা হারাইতে বসে, সে চলৎশক্তিরহিত হইয়া পড়ে।

রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার অভাব ভারতবাসীর পক্ষে গুরুতর অভাব নহে; কারণ, ভারতবর্ষে রাষ্ট্রতন্ত্র তেমন ব্যাপক ও প্রাণবৎ ছিল না। মুসলমানের আমলে আমরা রাজ্য-ব্যাপারে স্বাধীন ছিলাম না, কিন্তু নিজেদের ধর্ম্মকর্ম্ম, বিদ্যাবুদ্ধি ও সর্ব্বপ্রকার ক্ষমতার প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মিবার কোন কারণ ঘটে নাই।

ইংরাজের আমলে আমাদের সেই আত্মশ্রদ্ধার উপরে ঘা লাগিয়াছে। আমরা সুখে আছি, স্বচ্ছন্দে আছি, নিরাপদে আছি; কিন্তু আমরা সকল বিষয়েই অযোগ্য, এই ধারণা বাহির হইতে ও ভিতর হইতে আমাদিগকে আক্রমণ করিতেছে। এমন আত্মঘাতিধারণা আমাদের পক্ষে আর কিছুই হইতে পারে না।

নিজের প্রতি এই শ্রদ্ধা রক্ষার জন্য আমাদের শিক্ষিত সমাজের মধ্যে একটা লড়াই চলিতেছে। ইহা আত্মরক্ষার লড়াই। আমাদের সমস্তই ভাল, ইহাই আমরা প্রাণপণে ঘোষণা করিবার চেষ্টা করিতেছি। এই চেষ্টার মধ্যে যেটুকু সত্য আশ্রয় করিয়াছে, তাহা আমাদের মঙ্গলকর, যেটুকু অন্ধভাবে অহঙ্কারকে প্রশ্রয় দিতেছে, তাহাতে আমাদের ভাল হইবে না। জীর্ণবস্ত্রকে ছিদ্রহীন বলিয়া বিশ্বাস করিবার জন্য যতক্ষণ চক্ষু বুজিয়া থাকিব, ততক্ষণ শেলাই করিতে বসিলে কাজে লাগে।

আমরা ভাল, এ কথা রটনা করিবার লোক যথেষ্ট জুটিয়াছে। এখন এমন লোক চাই, যিনি প্রমাণ করিবেন, আমরা বড়। আচার্য্য জগদীশ

বস্তুর দ্বারা ঈশ্বর আমাদের সেই অভাব পূরণ করিয়াছেন। আজ আমাদের যথার্থ গৌরব করিবার দিন আসিয়াছে,— লজ্জিত ভারতকে যিনি সেই সুদিন দিয়াছেন, তাঁহাকে সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত প্রণাম করি।

আমাদের আচার্য্যের জয়বার্ত্তা এখনো ভারতবর্ষে আসিয়া পৌঁছে নাই, য়ুরোপেও তাঁহার জয়ধ্বনি সম্পূর্ণ প্রচার হইতে এখনো কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে। যে সকল বৃহৎ আবিষ্কারে বিজ্ঞানকে নূতন করিয়া আপন ভিত্তি স্থাপন করিতে বাধ্য করে, তাহা একদিনেই গ্রাহ্য হয় না। প্রথমে চারিদিক্ হইতে যে বিরোধ জাগিয়া উঠে, তাহাকে নিরস্ত করিতে সময় লাগে; সত্যকেও সুদীর্ঘকাল লড়াই করিয়া আপনার সত্যতা প্রমাণ করিতে হয়।

আমাদের দেশে দর্শন যে পথে গিয়াছিল, য়ুরোপে বিজ্ঞান সেই পথে চলিতেছে। তাহা ঐক্যের পথ। বিজ্ঞান এ পর্য্যন্ত এই ঐক্যের পথে গুরুতর যে কয়েকটি বাধা পাইয়াছে, তাহার মধ্যে জড় ও জীবের প্রভেদ একটি। অনেক অনুসন্ধান ও পরীক্ষায় হক্‌স্‌লি প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই প্রভেদ লঙ্ঘন করিতে পারেন নাই। জীবতত্ত্ব এই প্রভেদের দোহাই দিয়া পদার্থতত্ত্ব হইতে বহুদূরে আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেছে।

আচার্য্য জগদীশ জড় ও জীবের ঐক্যসেতু বিদ্যুতের আলোকে আবিষ্কার করিয়াছেন। আচার্য্যকে কোন কোন জীবতত্ত্ববিদ্ বলিয়াছিলেন, আপনি ত ধাতব-পদার্থের কণা লইয়া এতদিন পরীক্ষা করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু যদি আস্ত একখণ্ড ধাতুপদার্থকে চিম্‌টি কাটিয়া তাহার মধ্য হইতে এমন কোন লক্ষণ বাহির করিতে পারেন, জীব-শরীরে চিম্‌টির সহিত যাহার কোন সাদৃশ্য পাওয়া যায়, তবে আমরা বুঝি!

জগদীশবাবু ইহার উত্তর দিবার জন্য এক নূতন কল বাহির করিয়াছেন। জড়বস্তুকে চিম্‌টি কাটিলে যে স্পন্দন উৎপন্ন হয়, এই কলের সাহায্যে তাহার পরিমাণ স্বত লিখিত হইয়া থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমাদের শরীরে চিম্‌টির ফলে যে স্পন্দনরেখা পাওয়া যায়, তাহার সহিত এই লেখার কোন প্রভেদ নাই।

জীবনের স্পন্দন যেরূপ নাড়ীদ্বারা বোঝা যায়, সেইরূপ জড়েরও জীবনী শক্তির নাড়ীস্পন্দন এই কলে লিখিত হয়। জড়ের উপর বিষ-প্রয়োগ করিলে তাহার স্পন্দন কিরূপে বিলুপ্ত হইয়া আসে, এই কলের দ্বারা তাহা চিত্রিত হইয়াছে।

বিগত ১০ই মে তারিখে আচার্য্য জগদীশ রয়াল ইন্‌ষ্টিট্যুশনে বক্তৃতা করিতে আহূত হইয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল— যান্ত্রিক ও ও বৈদ্যুতিক তাড়নায় জড়পদার্থের সাড়া (The response of in-organic matter to mechanical and electrical stimulus)। এই সভায় ঘটনাক্রমে লর্ড রেলি উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই, কিন্তু প্রিন্স ক্রপট্‌কিন্ এবং বৈজ্ঞানিক সমাজের প্রতিষ্ঠাবান্ লোকেরা অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

এই সভায় উপস্থিত কোন বিদূষী ইংরাজ মহিলা, সভার যে বিবরণ আমাদের নিকট পাঠাইয়াছেন, নিম্নে তাহা হইতে স্থানে স্থানে অনুবাদ করিয়া দিলাম।

সন্ধ্যা নয়টা বাজিলে দ্বার উন্মুক্ত হইল এবং বসু-জায়াকে লইয়া সভাপতি সভায় প্রবেশ করিলেন। সমস্ত শ্রোতৃমণ্ডলী অধ্যাপকপত্নীকে সাদরে অভ্যর্থনা করিল। তিনি অবগুণ্ঠনাবৃতা এবং শাড়ী ও ভারতবর্ষীয় অলঙ্কারে সুশোভনা। তাঁহাদের পশ্চাতে যশস্বী লোকের দল, এবং সর্ব-পশ্চাতে আচার্য্য বসু নিজে। তিনি শান্ত নেত্রে একবার সমস্ত সভার

প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং অতি স্বচ্ছন্দ সমাহিত ভাবে বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

তাঁহার পশ্চাতে রেখাঙ্কন-চিত্রিত বড় বড় পট টাঙান রহিয়াছে। তাহাতে বিষপ্রয়োগে, শ্রান্তির অবস্থায়, ধনুষ্টঙ্কার প্রভৃতি আক্ষেপে, উত্তাপের ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় স্নায়ু ও পেশীর এবং তাহার সহিত তুলনীয় ধাতুপদার্থের স্পন্দনরেখা অঙ্কিত রহিয়াছে। তাঁহার সম্মুখের টেবিলে যন্ত্রোপকরণ সজ্জিত।

তুমি জান, আচার্য্য বসু বাগ্মী নহেন। বাক্যরচনা তাঁহার পক্ষে সহজসাধ্য নহে; এবং তাঁহার বলিবার ধরণও আবেগে ও সাধ্বসে পূর্ণ। কিন্তু সে রাত্রে তাঁহার বাক্যের বাধা কোথায় অন্তর্ধান করিল। এত সহজে তাঁহাকে বলিতে আমি শুনি নাই। মাঝে মাঝে তাঁহার পদবিন্যাস গাম্ভীর্য্যে ও সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল,— এবং মাঝে মাঝে তিনি সহাস্যে সুনিপুণ পরিহাস-সহকারে অত্যন্ত উজ্জ্বল সরলভাবে বৈজ্ঞানিকব্যূহের মধ্যে অস্ত্রের পর অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তিনি রসায়ন, পদার্থতত্ত্ব ও বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাপ্রশাখার ভেদ অত্যন্ত সহজ উপহাসেই যেন মিটাইয়া দিলেন।

তাহার পরে, বিজ্ঞানশাস্ত্রে জীব ও অজীবের মধ্যে যে সকল ভেদ-নিরূপক-সংজ্ঞা ছিল, তাহা তিনি মাকড়সার জালের মত ঝাড়িয়া ফেলিলেন। যাহার মৃত্যু সম্ভব, তাহাকেই ত জীবিত বলে;— অধ্যাপক বসু একখণ্ড টিনের মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে দাঁড় করাইয়া আমাদিগকে তাহার মরণাক্ষেপ দেখাইতে প্রস্তুত আছেন, এবং বিষপ্রয়োগে যখন তাহার অন্তিম দশা উপস্থিত, তখন ঔষধপ্রয়োগে পুনশ্চ তাহাকে সুস্থ করিয়া তুলিতে পারেন।

অবশেষে অধ্যাপক যখন তাঁহার স্বনির্মিত কৃত্রিম চক্ষু সভার সম্মুখে

উপস্থিত করিলেন এবং দেখাইলেন, আমাদের চক্ষু অপেক্ষা তাহার শক্তি অধিক, তখন সকলের বিস্ময়ের অন্ত রহিল না।

ভারতবর্ষ যুগে যুগে যে মহৎ ঐক্য অকুণ্ঠিত চিত্তে ঘোষণা করিয়া আসিয়াছে, আজ যখন সেই ঐক্যসংবাদ আধুনিক কালের ভাষায় উচ্চারিত হইল, তখন আমাদের কিরূপ পুলকসঞ্চার হইল, তাহা আমি বর্ণনা করিতে পারি না। মনে হইল, যেন বক্তা নিজের নিজত্ব-আবরণ পরিত্যাগ করিলেন, যেন তিনি অন্ধকারের মধ্যে অন্তর্হিত হইলেন,—কেবল তাঁহার দেশ এবং তাঁহার জাতি আমাদের সম্মুখে উত্থিত হইল,—এবং বক্তার নিম্নলিখিত উপসংহারভাগ যেন সেই তাহারই উক্তি!

I have shown you this evening the autographic records of the history of stress and strain in both the living and non-living. How similar are the two sets of writings, so similar indeed that you cannot tell them one from the other! They show you the waxing and waning pulsations of life—the climax due tostimulants, the gradual decline of fatigue, the rapid setting in of death-rigor from the toxic effect of poison.

It was when I came on this mute witness of life and saw an all-pervading unity that binds together all things—the mote that thrills on ripples of light, the teeming life on earth and the radiant suns that shine on it—it was then that for the first time I understood the message proclaimed by my ancestors on the banks of the Ganges thirty centuries ago—

"They who behold the One, in all the changing manifoldness of the universe, unto them belongs eternal truth, unto none else, unto none else."

বৈজ্ঞানিকদের মনে উৎসাহ ও সমাজের অগ্রণীদের মধ্যে শ্রদ্ধা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সভাস্থ দুই একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনীষী ধীরে ধীরে আচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার উচ্চারিত বচনের জন্য ভক্তি ও বিস্ময় স্বীকার করিলেন।

আমরা অনুভব করিলাম যে, এতদিন পরে ভারতবর্ষ— শিষ্য-ভাবেও নহে, সমকক্ষভাবেও নহে, গুরুভাবে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকসভায় উত্থিত হইয়া আপনার জ্ঞানশ্রেষ্ঠতা সপ্রমাণ করিল,— পদার্থতত্ত্ব-সন্ধানী ও ব্রহ্মজ্ঞানীর মধ্যে যে প্রভেদ, তাহা পরিস্ফুট করিয়া দিল।

লেখিকার পত্র হইতে সভার বিবরণ যাহা উদ্ধৃত করিলাম, তাহা পাঠ করিয়া আমরা অহঙ্কার বোধ করি নাই। আমরা উপনিষদের দেবতাকে নমস্কার করিলাম ; ভারতবর্ষের যে পুরাতন ঋষিগণ বলিয়াছেন "যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি" এই যাহা কিছু সমস্ত জগৎ প্রাণেই কম্পিত হইতেছে, সেই ঋষিমণ্ডলীকে অন্তরে উপলব্ধি করিয়া বলিলাম, হে জগদ্‌গুরুগণ, তোমাদের বাণী এখনও নিঃশেষিত হয় নাই, তোমাদের ভস্মাচ্ছন্ন হোমহুতাশন এখনো অনির্ব্বাণ রহিয়াছে, এখনো তোমরা ভারতবর্ষের অন্তঃকরণের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া বাস করিতেছ ! তোমরা আমাদিগকে ধ্বংস হইতে দিবে না, আমাদিগকে কৃতার্থতার পথে লইয়া যাইবে। তোমাদের মহত্ত্ব আমরা যেন যথার্থভাবে বুঝিতে পারি। সে মহত্ত্ব অতিক্ষুদ্র আচারবিচারের তুচ্ছ সীমার মধ্যে বদ্ধ নহে,— আমরা অদ্য যাহাকে "হিঁদুয়ানি" বলি, তোমরা তাহা লইয়া তপোবনে বসিয়া কলহ করিতে না, সে সমস্তই পতিত ভারতবর্ষের আবর্জনামাত্র ; —তোমরা যে অনন্তবিস্তৃত লোকে আত্মাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলে, সেই লোকে যদি আমরা চিত্তকে জাগ্রত করিয়া তুলিতে পারি, তবে আমাদের জ্ঞানের দৃষ্টি গৃহপ্রাঙ্গণের মধ্যে প্রতিহত না হইয়া বিশ্বরহস্যের

অন্তরনিকেতনের মধ্যে প্রবেশ করিবে। তোমাদিগকে স্মরণ করিয়া যতক্ষণ আমাদের বিনয় না জন্মিয়া গর্ব্বের উদয় হয়, কর্ম্মের চেষ্টা জাগ্রত না হইয়া সন্তোষের জড়ত্ব পুঞ্জীভূত হইতে থাকে, এবং ভবিষ্যতের প্রতি আমাদের উদ্যম ধাবিত না হইয়া অতীতের মধ্যে সমস্ত চিত্ত আচ্ছন্ন হইয়া লোপ পায়, ততক্ষণ আমাদের মুক্তি নাই।

আচার্য্য জগদীশ আমাদিগকে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। তিনি বিজ্ঞান-রাজ্যে যে পথের সন্ধান পাইয়াছেন, সে পথ প্রাচীন ঋষিদিগের পথ—তাহা একের পথ। কি জ্ঞানে বিজ্ঞানে, কি ধর্ম্মে কর্ম্মে, সেই পথ ব্যতীত "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"

কিন্তু আচার্য্য জগদীশ যে কর্ম্মে হাত দিয়াছেন, তাহা শেষ করিতে তাঁহার বিলম্ব আছে। বাধাও বিস্তর। প্রথমত, আচার্য্যের নূতন সিদ্ধান্ত ও পরীক্ষার দ্বারা অনেকগুলি পেটেণ্ট্ অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইবে এবং একদল বণিক্‌সম্প্রদায় তাঁহার প্রতিকূল হইবে। দ্বিতীয়ত, জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ জীবনকে একটা স্বতন্ত্র শ্রেষ্ঠ ব্যাপার বলিয়া জানেন, তাঁহাদের বিজ্ঞান যে কেবলমাত্র পদার্থতত্ত্ব, এ কথা তাঁহারা কোনমতেই স্বীকার করিতে চাহেন না। তৃতীয়ত, কোন কোন মূঢ় লোকে মনে করেন যে, বিজ্ঞান-দ্বারা জীবনতত্ত্ব বাহির হইলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিশ্বাস করিবার প্রয়োজন থাকে না, তাঁহারা পুলকিত হইয়াছেন। তাঁহাদের ভাবগতিক দেখিয়া খৃষ্টান্ বৈজ্ঞানিকেরা তটস্থ, এজন্য অধ্যাপক কোন কোন বৈজ্ঞানিকের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইবেন। সুতরাং একাকী তাঁহাকে অনেক বিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে।

তবে, যাঁহারা নিরপেক্ষ বিচারের অধিকারী, তাঁহারা উল্লসিত হইয়াছেন। তাঁহারা বলেন, এমন ঘটনা হইয়াছে যে, যে সিদ্ধান্তকে রয়াল সোসাইটি প্রথমে অবৈজ্ঞানিক বলিয়া পরিহার করিয়াছিলেন,

বিশ বৎসর পরে পুনরায় তাঁহারা আদরের সহিত তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। আচার্য্য জগদীশ যে মহৎ তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক-সমাজে উপস্থিত করিয়াছেন, তাহার পরিণাম বহুদূরগামী। এক্ষণে আচার্য্যকে এই তত্ত্ব লইয়া সাহস ও নির্বন্ধের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে, ইহাকে সাধারণের নিকট প্রতিষ্ঠিত করিয়া তবে তিনি বিশ্রাম করিতে পাইবেন। এ কাজ যিনি আরম্ভ করিয়াছেন, শেষ করা তাঁহারই সাধ্যায়ত্ত। ইহার ভার আর কেহ গ্রহণ করিতে পারিবে না। আচার্য্য জগদীশ বর্ত্তমান অবস্থায় যদি ইহাকে অসম্পূর্ণ রাখিয়া যান, তবে ইহা নষ্ট হইবে।

কিন্তু তাঁহার ছুটি ফুরাইয়া আসিল। শীঘ্রই তাঁহাকে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপনাকার্য্যে যোগ দিতে আসিতে হইবে এবং তিনি তাঁহার অন্য কাজ বন্ধ করিতে বাধ্য হইবেন।

কেবল অবসরের অভাবকে তেমন ভয় করি না। এখানে সর্বপ্রকার আনুকূল্যের অভাব। আচার্য্য জগদীশ কি করিতেছেন, আমরা তাহা ঠিক বুঝিতেও পারি না। এবং দুর্গতিপ্রাপ্ত জাতির স্বাভাবিক ক্ষুদ্রতা-বশত আমরা বড়কে বড় বলিয়া শ্রদ্ধা করিতে পারি না, শ্রদ্ধা করিতে চাহি-ও না। আমাদের শিক্ষা, সামর্থ্য, অধিকার যেমনই থাক, আমাদের স্পর্দ্ধার অন্ত নাই। ঈশ্বর যে সকল মহাত্মাকে এ দেশে কাজ করিতে পাঠান, তাহারা যেন বাংলা গবর্মেণ্টের নোয়াখালি-জেলায় কার্য্যভার প্রাপ্ত হয়। সাহায্য নাই, শ্রদ্ধা নাই, প্রীতি নাই,— চিত্তের সঙ্গ নাই, স্বাস্থ্য নাই, জনশূন্য মরুভূমিও ইহা অপেক্ষা কাজের পক্ষে অনুকূল স্থান;— এই ত স্বদেশের লোক— এদেশীয় ইংরাজের কথা কিছু বলিতে চাহি না। এ ছাড়া যন্ত্র-গ্রন্থ, সর্ব্বদা বিজ্ঞানের আলোচনা ও পরীক্ষা ভারতবর্ষে সুলভ নহে।

আমরা অধ্যাপক বসুকে অনুনয় করিতেছি, তিনি যেন তাঁহার কর্ম্ম

সমাধা করিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন! আমাদের অপেক্ষা গুরুতর অনুনয় তাঁহার অন্তঃকরণের মধ্যে নিয়ত ধ্বনিত হইতেছে, তাহা আমরা জানি। সে অনুনয় সমস্ত ক্ষতি ও আত্মীয়বিচ্ছেদদুঃখ হইতেও বড়। তিনি সম্প্রতি নিঃস্বার্থ জ্ঞানপ্রচারের জন্য তাঁহার দ্বারে আগত প্রচুর ঐশ্বর্য্য-প্রলোভনকে অবজ্ঞাসহকারে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, সে সংবাদ আমরা অবগত হইয়াছি, কিন্তু সে সংবাদ প্রকাশ করিবার অধিকার, আমাদের আছে না আছে, দ্বিধা করিয়া আমরা মৌন রহিলাম। অতএব এই প্রলোভনহীন পণ্ডিত জ্ঞানস্পৃহাকেই সর্ব্বোচ্চে রাখিয়া জ্ঞানে, সাধনায়, কর্ম্মে, এই হতচারিত্র হতভাগ্য দেশের গুরু ও আদর্শস্থানীয় হইবেন, ইহাই আমরা একান্তমনে কামনা করি।

[১৩০৮]

জড় কি সজীব ?

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু গতবারে বিলাতে গিয়া বিজ্ঞানের যে নূতন তথ্য প্রচার করিয়া আসিয়াছিলেন, এতদিনে অল্পে অল্পে তাহার সংবাদ আমাদের নিকট পরিচিত হইয়া আসিতেছে। সেই আবিষ্কার ঈথর-তত্ত্বকে অগ্রসর করিয়া দিয়া তারহীন টেলিগ্রাফযন্ত্রের কার্য্যোপযোগিতা বাড়াইয়া দিয়াছে এবং বিজ্ঞানবিদ্‌গণের নিকট প্রচুর সম্মান লাভ করিয়াছে, এ খবর আমাদের কাছে আসিয়া পৌছিয়াছে।

পুনর্ব্বার আচার্য্যবর য়ুরোপের পণ্ডিতসভায় নবতর তত্ত্ব উপহার লইয়া প্রবেশ করিয়াছেন। ইহা শুনিয়াছি ব্যাপারটি অদ্ভুত। শুনিয়াছি জড় ও জীবের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য বৈষম্য তিনি ভেদ করিয়া বিজ্ঞানিগণকে সচকিত করিয়া তুলিয়াছেন। আঘাত, উত্তেজনা প্রভৃতি দ্বারা ধাতুপদার্থ ও সজীবপদার্থে একই রূপ ফল উৎপন্ন হয়, ইহা পরীক্ষা দ্বারা প্রত্যক্ষ দেখাইয়া তিনি জড়জীবের সাধর্ম্ম্য প্রমাণ করিয়াছেন।

সকল কথা আমরা এখনো স্পষ্ট করিয়া বিস্তারিতরূপে জানিতে পারি নাই। সভায় যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাহাদের মনে কিরূপ ধারণা হইয়াছে, তাহা হইতেই বিষয়টার মোট কথা আমরা কতকটা অনুমান করিতেছি।

অবৈজ্ঞানিক শ্রোতারা কি বুঝিয়াছেন, তাহা ইংরাজি 'গ্লোব'পত্রের নিম্নলিখিত পরিহাসবাক্যে জানা যায়। গ্লোব বলেন, ধাতুপদার্থের উপর নানাবিধ অত্যাচার করিবার সময় অধ্যাপকের দুই চক্ষু অশ্রুজলে পূর্ণ হইয়াছিল। এ জন্য তাঁহাকে ধন্য বলি। কিন্তু আগুন উস্কাইবার লৌহদণ্ড যখন চুলার লৌহবেষ্টনের উপর পড়িয়া যাইবে, তখন তাহার আঘাত লাগিয়াছে বলিয়া তাড়াতাড়ি তাহাকে তুলিয়া লইয়া আদর

করিতে বসিবে, বৃটিশ গৃহস্থর সে অবস্থা আসিতে বিলম্ব আছে।

বৃটিশ গৃহস্থর চিত্ত জড় কি সজীব, কি পরিমাণ তাহার বেদনাবোধ, কতটা আঘাতে তাহার সাড়া পাওয়া যায়, সে দুরূহ পরীক্ষায় অধ্যাপক নিযুক্ত ছিলেন না, তিনি লোহা-পিতলকে আঘাত করিয়া সাড়া পাইয়াছেন। গ্লোবের উক্তিতে ইহা বুঝা যায় যে, অধ্যাপকের মতে জড়ের জীবনধর্ম্ম আছে, অবৈজ্ঞানিক শ্রোতাদের মনে এইরূপ সংস্কার জন্মিয়াছে।

জীবমাত্রই যে সচেতন, এ কথা মনে আনিবার প্রয়োজন নাই। অন্তত এখনো তাহার প্রমাণ হয় নাই। উদ্ভিদের চেতনা আছে কিনা, কেহ বলিতে পারে না, কিন্তু তাহার জীবন আছে, এ কথা সকলেই জানে।

লৌহদণ্ড পড়িয়া গেলে তাহার বেদনা বোধ হয়, এ কথা কেহ বলে না; কিন্তু সে যে আঘাত পায়, এ কথাও কেহ বলিত না। অর্থাৎ সজীব পদার্থ আছাড় খাইলে তাহাতে আঘাতের যেরূপ লক্ষণ প্রকাশ পায়, ধাতুপদার্থেও সেইরূপ লক্ষণ দেখা দেয়, ইহা জানা ছিল না। আচার্য্য জগদীশ পরীক্ষা দ্বারা তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন।

সাধারণ শ্রোতার কথা উপরে লিখিলাম। এক্ষণে বিজ্ঞানবিদ্ বিশেষজ্ঞ কি বলেন, তাহা আলোচনা করিলে বিষয়টার আভাস পাওয়া যাইবে। তড়িৎ-তত্ত্ব-সম্বন্ধে বিখ্যাত ইংরাজী পত্র ইলেকৃট্রিশ্যানে অধ্যাপক বসুর বক্তৃতার যে মর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা তাহারই সার সংগ্রহ করিয়া দিতেছি।

সজীব মাংসপেশীকে যদি চিম্‌টি কাটা যায় বা তাহাতে মোচড় বা চাপ দেওয়া যায়, তবে তাহা লম্বায় ছোট হইয়া চওড়ার দিকে ফুলিয়া উঠে। চাপ উঠাইয়া লইলে মাংসপেশী আবার প্রকৃতিস্থ হয়। বিশেষ

যন্ত্রের দ্বারা মাংসপেশীর এই বিকৃতি ও প্রকৃতির উত্থান-পতন-রেখা আঁকিয়া লওয়া যায়। যদি মাংসপেশীতে থাকিয়া থাকিয়া চাপ পড়ে, তবে তাহার তরঙ্গরেখা (curve) করাতের মত দন্তুর হইয়া অঙ্কিত হয়। যদি এই চাপ অত্যন্ত ঘন ঘন হইতে থাকে, তবে অবশেষে এমন একটি অবস্থা আসে, যখন মাংসপেশী নিরন্তর সঙ্কুচিত হইয়া ধনুষ্টঙ্কারের আক্ষেপ উৎপন্ন করে।

অতিরিক্ত ঠাণ্ডা বা গরমে মাংসপেশী আড়ষ্ট হইয়া যায়, তখন আঘাতে তাহার সাড়া পাওয়া যায় না এবং প্রকৃতিস্থ হইতেও বিলম্ব ঘটে। আবার বিশেষ মাত্রার উত্তাপে মাংসপেশীর সাড় সর্ব্বাপেক্ষা বাড়িয়া উঠে। এই উত্তাপের মাত্রা ভিন্ন মাংসপেশীর পক্ষে ভিন্ন রূপ।

দ্রব্যগুণে মাংসপেশীর সাড় বাড়ে কমে। উত্তেজক পদার্থে সাড় প্রবল হইয়া উঠে এবং প্রকৃতিস্থতাও শীঘ্র ফিরিয়া আনে। অবসাদক পদার্থে বিপরীত ফল হয় এবং বিষে এই সাড়-শক্তি একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলে। ইহাও দেখা গিয়াছে, কোন কোন দ্রব্য মাত্রাবিশেষে উত্তেজনা ও অন্য-মাত্রায় অবসাদ আনয়ন করে।

সজীব মাংসপেশীকে ছাড়িয়া যদি সজীব স্নায়ুকে লইয়া পরীক্ষা করা যায়, তবে তাহাতেও এইরূপ পরে পরে সাড় ও প্রকৃতি-লাভ দেখা যায়। কিন্তু স্নায়ুতে এই সাড়ার প্রকাশ অন্যপ্রকার। ঘা লাগিলে স্নায়ুর আহত বা উত্তেজিত অংশ হইতে সুস্থ অংশ পর্যন্ত একটি বিদ্যুৎ-প্রবাহের সৃষ্টি হয়। পুনঃপুন আঘাত, শীতাতপের মাত্রাধিক্য, এবং উত্তেজক বা অবসাদক দ্রব্যদ্বারা স্নায়ুতে যে ক্রিয়া ও ক্রিয়াশান্তি উপস্থিত হয়, যন্ত্রবিশেষের দ্বারা তাহার রেখাচিত্র লওয়া হইয়াছে। মাংসপেশীর চিত্রের সহিত তাহার সাদৃশ্য দেখা যায়। অধ্যাপক এইরূপ বিবিধ চিত্র সংগ্রহ করিয়াছেন। দেহবিদ্‌গণ বলেন, দেহপদার্থের মধ্যে এই সাড়ই

জীবনের সুস্পষ্ট লক্ষণ, মৃত পদার্থে ইহার সম্পূর্ণ অভাব দৃষ্ট হয়।

এখন জড়পদার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাক্। অধ্যাপক বসু দেখাইয়াছেন, একটি তারের এক প্রান্তে যদি মোচড় বা ঘা দেওয়া যায়, তবে সেই আহত বা উত্তেজিত প্রান্ত হইতে প্রকৃতিস্থ প্রান্ত পর্যন্ত একটি বিদ্যুৎপ্রবাহ উৎপন্ন হয়। তড়িৎমাপক-সূচির বিচলন দ্বারা এই সাড়ের পরিমাণ ধরা পড়ে। যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া অধ্যাপক বসু দেখাইয়াছেন, জড়পদার্থের এই আঘাতজনিত সাড় ও প্রকৃতিলাভের তরঙ্গরেখার সহিত স্নায়ুমাংসপেশীর তরঙ্গরেখার অত্যন্ত সাদৃশ্য আছে।

ধাতুপদার্থে ঘন ঘন তাড়না করিলে যে তরঙ্গরেখা পাওয়া যায়, তাহা দস্তুর— সেই তাড়না আরো দ্রুত করিলে তরঙ্গরেখা নিরন্তর স্ফীত হইয়া ধনুষ্টঙ্কারের অবস্থা প্রকাশ করে। শীতাতপের মাত্রা অধিক হইলে ধাতুপদার্থে আড়ষ্টতা জন্মে এবং বিশেষ উত্তাপে তাহার সাড়শক্তি সর্ব্বাপেক্ষা বিকাশ পায় ;— ধাতুতারের মধ্যে বিশেষ দ্রব্য প্রয়োগ করিলে তাহার সাড়ের প্রবলতা মদমত্ততার মত আশ্চর্য বাড়িয়া উঠে, আবার দ্রব্যবিশেষে অবসাদের লক্ষণ আনয়ন করে, আবার কোন কোন দ্রব্যে বিষের মত কাজ করে। কোন কোন দ্রব্য ধাতুপদার্থের পক্ষে বিশেষ মাত্রায় উত্তেজক এবং মাত্রান্তরে অবসাদক ; আবার ইহাও দেখা গিয়াছে, সময়মত ঔষধ দিতে পারিলে বিষপ্রয়োগের প্রতিকার করা যায়।

এইরূপ নানা আঘাত-অপঘাতে ধাতুদ্রব্যে যে ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, তাহার তরঙ্গচিত্র জৈবতরঙ্গের এতই সদৃশ যে, দেহবিদ্‌গণ উভয় চিত্রকে পৃথক্ করিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারেন না।

এই গেল আঘাতজনিত সাড়। আলোকজনিত সাড় সম্বন্ধেও অধ্যাপক মহাশয় পরীক্ষা করিয়া সমফল পাইয়াছেন। তিনি একটি

কৃত্রিম চক্ষু নির্ম্মাণ করিয়াছেন ; যে সকল রশ্মি সম্বন্ধে আমাদের চক্ষু অসাড়, তাঁহার কৃত্রিম চক্ষুতে সে সকল রশ্মিও সাড়া জাগাইয়া থাকে। আলো লাগিলে সজীব চক্ষু যেমন করিয়া মস্তিষ্কে বেগ প্রেরণ করে, এই কৃত্রিম চক্ষুর ক্রিয়া ঠিক সেইরূপ। সুতরাং এই আবিষ্কারের ফলে দর্শনক্রিয়া ব্যাপারটি দেহবিদ্যার কোঠা হইতে পদার্থ-বিদ্যার কোঠায় আসিয়া পড়িতে পারে। এই কৃত্রিম চক্ষুর আবিষ্কারে বর্ত্তমান তারহীন টেলিগ্রাফী ও ঐথরিক বার্ত্তাবহন-প্রণালী উলট্‌পালট্‌ করিয়া দিবে।

[১৩০৮]

এ কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, এতকাল অনেক বিদেশী অধ্যাপক আমাদের কালেজের পরীক্ষাশালায় যন্ত্রতন্ত্র লইয়া অনেক নাড়াচাড়া করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই স্বাধীন-বুদ্ধি দেখাইয়া যশস্বী হইতে পারেন নাই। বাঙালীর মধ্যেই জগদীশ ও প্রফুল্লচন্দ্র সুযোগলাভ করিয়া সেই সুযোগের ফল দেখাইয়াছেন।...

...এস্থলে আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য, নিজেরা সচেষ্ট হওয়া; আমাদের দেশে ডাক্তার জগদীশ বসু প্রভৃতির মতো যে সকল প্রতিভাসম্পন্ন মনস্বী প্রতিকূলতার মধ্যে থাকিয়াও মাথা তুলিয়াছেন, তাঁহাদিগকে মুক্তি দিয়া তাঁহাদের হস্তে দেশের ছেলেদের মানুষ করিয়া তুলিবার স্বাধীন অবকাশ দেওয়া ;— অবজ্ঞা-অশ্রদ্ধা-অনাদরের হাত হইতে বিদ্যাকে উদ্ধার করিয়া দেবী সরস্বতীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা ; জ্ঞানশিক্ষাকে স্বদেশের জিনিস করিয়া দাঁড় করানো ; আমাদের শক্তির সহিত, সাধনার সহিত, প্রকৃতির সহিত তাহাকে অন্তরঙ্গরূপে সংযুক্ত করিয়া তাহাকে স্বভাবের নিয়মে পালন করিয়া তোলা।

[১৩১১]

আমাদের যাহা নাই, তাহার জন্য আমরা রাজদ্বারে ধন্না দিয়া পড়ি এবং চাঁদার খাতা লইয়া গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া বেড়াই— কিন্তু যাহা আছে, তাহাকে কেমন করিয়া কাজে লাগাইতে হইবে, সে দিকে কি আমরা দৃষ্টিপাত করিব না?···

আমাদের দেশে অধ্যাপক জগদীশ, অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র দেশবিদেশে যশোলাভ করিয়াছেন, বিজ্ঞানসভা কি তাঁহাদিগকে কাজে লাগাইবার জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা করিতেছেন?···

যদি জগদীশ ও প্রফুল্লচন্দ্রের শিক্ষাধীনে দেশের কয়েকটি অধ্যবসায়ী ছাত্রকে মানুষ করিয়া তুলিবার ভার বিজ্ঞানসভা গ্রহণ করেন, তবে সভা এবং দেশ উভয়েই ধন্য হইবেন।

স্বদেশে বিজ্ঞানপ্রচার করিবার দ্বিতীয় সদুপায়, স্বদেশের ভাষায় বিজ্ঞান প্রচার করা। যতদিন পর্য্যন্ত না বাংলাভাষায় বিজ্ঞানের বই বাহির হইতে থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত বাংলাদেশের মাটির মধ্যে বিজ্ঞানের শিকড় প্রবেশ করিতে পারিবে না।

[১৩১২]

তখন অল্প বয়স ছিল। সামনের জীবন ভোর বেলাকার মেঘের মত; অস্পষ্ট কিন্তু নানা রঙে রঙীন। তখন মন রচনার আনন্দে পূর্ণ; আত্ম-প্রকাশের স্রোত নানা বাঁকে বাঁকে আপনাতে আপনি বিস্মিত হয়ে চলেছিল; তীরের বাঁধ কোথাও ভাঙচে কোথাও গড়চে; ধারা কোথায় গিয়ে মিশ্‌বে সেই সমাপ্তির চেহারা দূর থেকেও চোখে পড়েনি। নিজের ভাগ্যের সীমারেখা তখনো অনেকটা অনির্দ্দিষ্ট আকারে ছিল বলেই নিত্য নূতন উদ্দীপনায় মন নিজের শক্তির নব নব পরীক্ষায় সর্ব্বদা উৎসাহিত থাক্‌ত। তখনো নিজের পথ পাকা করে বাঁধা হয়নি; সেইজন্যে চলা আর পথ বাঁধা এই দুই উদ্যোগের সব্যসাচিতায় জীবন ছিল সদাই চঞ্চল।

এমন সময়ে জগদীশের সঙ্গে আমার প্রথম মিলন। তিনিও তখন চূড়ার উপর ওঠেন নি। পূর্ব্ব উদয়াচলের ছায়ার দিক্‌টা থেকেই ঢালু চড়াই পথে যাত্রা করে চলেছেন, কীর্ত্তি-সূর্য্য আপন সহস্র কিরণ দিয়ে তাঁর সফলতাকে দীপ্যমান করে তোলে নি। তখনো অনেক বাধা, অনেক সংশয়। কিন্তু নিজের শক্তিস্ফুরণের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের যে আনন্দ সে যেন যৌবনের প্রথম প্রেমের আনন্দের মতই আগুনে ভরা, বিঘ্নের পীড়নে দুঃখের তাপে সেই আনন্দকে আরো নিবিড় করে তোলে। প্রবল সুখদুঃখের দেবাসুরে মিলে অমৃতের জন্য যখন জগদীশের তরুণ শক্তিকে মন্থন করছিল সেই সময় আমি তাঁর খুব কাছে এসেছি।

বন্ধুত্বের পক্ষে এমন শুভ সময় আর হয় না। তার পরে যখন মধ্যাহ্নকাল আসে তখন বিপুল সংসার মানুষকে দাবী করে বসে। তখন কা'র কাছে কি আশা করা যেতে পারে তা'র মূল্যতালিকা পাকা অক্ষরে

ছাপা হয়ে বেরোয়, সেই অনুসারে নিলেম বসে, ভীড় জমে। তখন মানুষের ভাগ্য অনুসারে মাল্যচন্দন, পূজা-অর্চ্চনা সবই জুট্‌তে পারে; কিন্তু এখন পথযাত্রীর রিক্তপ্রায় হাতের উপর বন্ধুর যে করস্পর্শ নির্জ্জন প্রভাতে দৈবক্রমে এসে পড়ে, তার মত মূল্যবান আর কিছুই পাওয়া যায় না।

তখন জগদীশ যে চিঠিগুলি আমাকে লিখেছিলেন তার মধ্যে আমাদের প্রথম বন্ধুত্বের স্বত চিহ্নিত পরিচয় অঙ্কিত হয়ে আছে। সাধারণের কাছে ব্যক্তিগতভাবে তার যথোচিত মূল্য না থাকৃতে পারে, কিন্তু মানবমনের যে ইতিহাসে কোনো কৃত্রিমতা নেই, যা সহজ প্রবর্ত্তনায় দিনে দিনে আপনাকে উদ্ঘাটন করেছে, মানুষের মনের কাছে তার আদর আছেই। তা ছাড়া, যাঁর চিঠি তিনি ব্যক্তিগত জীবনের কৃষ্ণপক্ষ পেরিয়ে গেছেন, গোপনতার অন্ধ রাত্রি তাঁকে প্রচ্ছন্ন করে নেই, তিনি আজ পৃথিবীর সাম্‌নে প্রকাশিত। সেই কারণে তাঁর চিঠির মধ্যে যা তুচ্ছ তাও তাঁর সমগ্র জীবন-ইতিবৃত্তের অঙ্গরূপে গৌরব লাভ করবার যোগ্য।

এর মধ্যে আমারও উৎসাহের কথা আছে। প্রথম বন্ধুত্বের স্মৃতি যদিচ মনে থাকে, কিন্তু তার ছবি সর্ব্বাংশে সুস্পষ্ট হয়ে থাকে না। এই চিঠিগুলির মধ্যে সেই মন্ত্র ছড়ানো আছে যাতে করে সেই ছবি আবার আজ মনে জেগে উঠ্‌চে। সেই তাঁর ধর্ম্মতলার বাসা থেকে আরম্ভ করে আমাদের নির্জ্জন পদ্মাতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত বন্ধুলীলার ছবি। ছেলেবেলা থেকে আমি নিঃসঙ্গ, সমাজের বাইরে পারিবারিক অবরোধের কোণে কোণে আমার দিন কেটেছে। আমার জীবনে প্রথম বন্ধুত্ব জগদীশের সঙ্গে। আমার চিরাভ্যস্ত কোণ থেকে তিনি আমাকে টেনে বের ক'রেছিলেন যেমন ক'রে শরতের শিশিরস্নিগ্ধ সূর্য্যোদয়ের মহিমা

চিরদিন আমাকে শোবার ঘর থেকে ছুটিয়ে বাইরে এনেছে। তাঁর মধ্যে সহজেই একটি ঐশ্বর্য্য দেখেছিলুম। অধিকাংশ মানুষেরই যতটুকু গোচর তার বেশি আর ব্যঞ্জনা নেই, অর্থাৎ মাটির প্রদীপ দেখা যায়, আলো দেখা যায় না। আমার বন্ধুর মধ্যে আলো দেখেছিলুম। আমি গর্ব্ব করি এই যে, প্রমাণের পূর্ব্বেই আমার অনুমান সত্য হয়েছিল। প্রত্যক্ষ হিসাব গণনা ক'রে যে শ্রদ্ধা, তাঁর সম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধা সে জাতের ছিল না। আমার অনুভূতি ছিল তার চেয়ে প্রত্যক্ষতর; বর্ত্তমানের সাক্ষ্যটুকুর মধ্যেই আবদ্ধ ক'রে ভবিষ্যৎকে সে খর্ব্ব ক'রে দেখে নি। এই চিঠিগুলির মধ্যে তারই ইতিহাস পাওয়া যাবে, আর যদি কোনো দিন এরই উত্তরে প্রত্যুত্তরে আমার চিঠিগুলিও পাওয়া যায়, তাহ'লে এই ইতিহাস সম্পূর্ণ হতে পারবে।

২২ চৈত্র ১৩৩২

তরুণ বয়সে জগদীশচন্দ্র যখন কীর্তির দুর্গম পথে সংসারে অপরিচিতরূপে প্রথম যাত্রা আরম্ভ করেছিলেন, যখন পদে পদে নানা বাধা তাঁর গতিকে ব্যাহত করছিল, সেই সময়ে আমি তাঁর ভাবী সাফল্যের প্রতি নিঃসংশয় শ্রদ্ধাদৃষ্টি রেখে বারে বারে গদ্যে পদ্যে তাঁকে যেমন করে অভিনন্দন জানিয়েছি, জয়লাভের পূর্বেই তাঁর জয়ধ্বনি ঘোষণা করেছি, আজ চিরবিচ্ছেদের দিনে তেমন প্রবল কণ্ঠে তাঁকে সম্মান নিবেদন করতে পারি সে শক্তি আমার নেই। আর কিছু দিন আগেই অজানা লোকে আমার ডাক পড়েছিল। ফিরে এসেছি। কিন্তু সেখানকার কুহেলিকা এখনও আমার শরীর মনকে ঘিরে রয়েছে। মনে হচ্ছে, আমাকে তিনি তাঁর অন্তিমপথের আসন্ন অনুবর্তন নির্দেশ করে গেছেন। সেই পথযাত্রী আমার পক্ষে আমার বয়সে শোকের অবকাশ দীর্ঘ হতে পারে না। শোক দেশের হয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞানের সাধনায় যিনি তাঁর কৃতিত্ব অসমাপ্ত রেখে যান নি, বিদায় নেওয়ার দ্বারা তিনি দেশকে বঞ্চিত করতে পারেন না। যা অজর যা অমর তা রইল। শারীরিক বিচ্ছেদের আঘাতে সেই সম্পদের উপলব্ধি আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, যেখানে তিনি সত্য সেখানে তাঁকে বেশি করে পাওয়ার সুযোগ ঘটবে। বন্ধুরূপে আমার যা কাজ সে আমার যখন শক্তি ছিল তখন করতে ত্রুটি করি নি। কবিরূপে আমার যা কর্তব্য সেও আমার পূর্ণ সামর্থ্যের সময় প্রায় নিঃশেষ করে দিয়েছি— তাঁর স্মৃতি আমার রচনায় কীর্তিত হয়েই রয়েছে।

বিজ্ঞান ও রসসাহিত্যের প্রকোষ্ঠ সংস্কৃতির ভিন্ন ভিন্ন মহলে, কিন্তু তাদের মধ্যে যাওয়া-আসার দেনা-পাওনার পথ আছে। জগদীশ ছিলেন সেই পথের পথিক। সেই জন্যে বিজ্ঞানী ও কবির মিলনের উপকরণ

দুই মহল থেকেই জুটত। আমার অনুশীলনের মধ্যে বিজ্ঞানের অংশ বেশি ছিল না, কিন্তু ছিল তা আমার প্রবৃত্তির মধ্যে। সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর ছিল অনুরূপ অবস্থা। সেই জন্যে আমাদের বন্ধুত্বের কক্ষে হাওয়া চলত দুই দিকের দুই খোলা জানলা দিয়ে। তাঁর কাছে আর একটা ছিল আমার মিলনের অবকাশ যেখানে ছিল তাঁর অতি নিবিড় দেশপ্রীতি।

প্রাণ পদার্থ থাকে জড়ের গুপ্ত কুঠুরিতে গা ঢাকা দিয়ে। এই বার্তাকে জগদীশ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে পাকা করে গেঁথে দেবেন, এই প্রত্যাশা তখন আমার মনের মধ্যে উন্মাদনা জাগিয়ে দিয়েছিল— কেননা ছেলেবেলা থেকেই আমি এই ঋষিবাক্যের সঙ্গে পরিচিত— "যদিদং কিঞ্চ জগৎ প্রাণ এজতি নিঃসৃতং", "এই যা কিছু জগৎ, যা কিছু চলছে, তা প্রাণ থেকে নিঃসৃত হয়ে প্রাণেই কম্পমান।" সেই কম্পনের কথা আজও বিজ্ঞানে বলছে। কিন্তু সেই স্পন্দন যে প্রাণস্পন্দনের সঙ্গে এক, এ কথা বিজ্ঞানের প্রমাণভাণ্ডারের মধ্যে জমা হয় নি। সেদিন মনে হয়েছিল আর বুঝি দেরি নেই।

তার পরে জগদীশ সরিয়ে আনলেন তাঁর পরীক্ষাগার জড়রাজ্য থেকে উদ্ভিদরাজ্যে, যেখানে প্রাণের লীলায় সংশয় নেই। অধ্যাপকের যন্ত্র-উদ্ভাবনী শক্তি ছিল অসাধারণ। উদ্ভিদের অন্দরমহলে ঢুকে গুপ্তচরের কাজে সেই সব যন্ত্র আশ্চর্য নৈপুণ্য দেখাতে লাগল। তাদের কাছ থেকে নতুন নতুন খবরের প্রত্যাশায় অধ্যাপক সর্বদা উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকতেন। এ পথে তাঁর সহযোগিতার উপযুক্ত বিদ্যা আমার না থাকলেও তবুও আমার অশিক্ষিত কল্পনার অত্যুৎসাহে তিনি বোধ হয় সকৌতুক আনন্দ বোধ করতেন। কাছাকাছি সমজদারের আনাগোনা ছিল না; তাই আনাড়ি দরদীর অত্যুক্তিমুখর ঔৎসুক্যেও সেদিন তাঁর প্রয়োজন ছিল। সুহৃদের প্রত্যাশাপূর্ণ শ্রদ্ধার মূল্য যাই থাক, গম্যস্থানের উজান পথে

এগিয়ে দেবার কিছু না কিছু পালের হাওয়া সে জুগিয়ে থাকে। সকল বাধার উপরে তিনি যে জয়লাভ করবেনই, এই বিশ্বাস আমার মধ্যে ছিল অক্ষুণ্ণ। নিজের শক্তির পরে তাঁর নিজের যে শ্রদ্ধা ছিল, আমার শ্রদ্ধার আবেগ তাতে অনুরণন জাগাত সন্দেহ নেই।

এই গেল আদিকাণ্ড। তার পরে আচার্য তাঁর পরীক্ষালব্ধ তত্ত্ব ও সহধর্মিণীকে নিয়ে সমুদ্রপারের উদ্যোগে প্রবৃত্ত হলেন। স্বদেশের প্রতিভা বিদেশের প্রতিভাশালীদের কাছ থেকে গৌরব লাভ করবে, এই আগ্রহে দিন রাত্রি আমার হৃদয় ছিল উৎফুল্ল। এই সময় যখন জানতে পারলুম যাত্রার পাথেয় সম্পূর্ণ হয় নি, তখন আমাকে উদ্বিগ্ন করে তুললে। সাধনার আয়োজনে অর্থাভাবের শোচনীয়তা যে কত কঠোর, সে কথা দুঃসহভাবেই তখন আমার জানা ছিল। জগদীশের জয়যাত্রায় এই অভাব লেশমাত্রও পাছে বিঘ্ন ঘটায়, এই উদ্বেগ আমাকে আক্রমণ করলে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমার নিজের সামর্থ্যে তখন লেগেছে পূরো ভাঁটা। লম্বা লম্বা ঋণের গুণ টেনে আভূমি নত হয়ে চালাতে হচ্ছিল আমার আপন কর্মতরী। অগত্যা সেই দুঃসময়ে আমার এক জন বন্ধুর শরণ নিতে হোলো। সেই মহদাশয় ব্যক্তির ঔদার্য্য স্মরণীয় বলে জানি। সেই জন্যেই এই প্রসঙ্গে তাঁর নাম সম্মানের সঙ্গে উল্লেখ করা আমি কর্তব্য মনে করি। তিনি ত্রিপুরার পরলোকগত মহারাজা রাধাকিশোর দেবমাণিক্য। আমার প্রতি তাঁর প্রভূত শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা চিরদিন আমার কাছে বিস্ময়ের বিষয় হয়ে আছে। ঠিক সেই সময়টাতে তাঁর পুত্রের বিবাহের উদ্যোগ চলছিল। আমি তাঁকে জানালুম শুভ অনুষ্ঠানের উপলক্ষ্যে আমি দানের প্রার্থী, সে দানের প্রয়োগ হবে পুণ্যকর্ম্মে। বিষয়টা কী শুনে তিনি ঈষৎ হেসে বললেন, "জগদীশচন্দ্র এবং তাঁর কৃতিত্ব সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছুই জানি নে, আমি যা দেব, সে আপনাকেই দেব, আপনি তা নিয়ে কী

করবেন আমার জানবার দরকার নেই।" আমার হাতে দিলেন পনেরো হাজার টাকার চেক। সেই টাকা আমি আচার্যের পাথেয়ের অন্তর্গত করে দিয়েছি। সেদিন আমার অসামর্থ্যের সময় যে বন্ধুকৃত্য করতে পেরেছিলুম, সে আর এক বন্ধুর প্রসাদে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগ পাশ্চাত্য মহাদেশকে আশ্রয় করেই দীপ্তিমান হয়ে উঠেছে, সেখানকার দীপালিতে ভারতবাসী এই প্রথম ভারতের দীপশিখা উৎসর্গ করতে পেরেছেন, এবং সেখানে তা স্বীকৃত হয়েছে। এই গৌরবের পথ সুগম করবার সামান্য একটু দাবিও মহারাজ নিজে না রেখে আমাকেই দিয়েছিলেন, সেই কথা স্মরণ করে সেই উদারচেতা বন্ধুর উদ্দেশে আমার সুগভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

তার পর থেকে জগদীশচন্দ্রের যশ ও সিদ্ধির পথ প্রশস্ত হয়ে দূরে প্রসারিত হোতে লাগল, একথা সকলেরই জানা আছে। ইতিমধ্যে কোনো উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী তাঁর কীর্তিতে আকৃষ্ট হলেন, সহজেই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তাঁর পরীক্ষা-কাননের প্রতিষ্ঠা হোলো, এবং অবশেষে ঐশ্বর্যশালী বসু-বিজ্ঞানমন্দির স্থাপনা সম্ভবপর হোতে পারল। তাঁর চরিত্রে সংকল্পের যে একটি সুদৃঢ় শক্তি ছিল, তার দ্বারা তিনি অসাধ্য সাধন করেছিলেন। কোনো একক ব্যক্তি আপন কাজে রাজকোষ বা দেশীয় ধনীদের কাছ থেকে এত অজস্র অর্থ-সাহায্য বোধ করি ভারতবর্ষে আর কখনো পায় নি। তাঁর কর্মারম্ভের ক্ষণস্থায়ী টানাটানি পার হবামাত্রই লক্ষ্মী এগিয়ে এসে তাঁকে বরদান করেছেন এবং শেষপর্যন্তই আপন লোকবিখ্যাত চাপল্য প্রকাশ করেন নি। লক্ষ্মীর পদ্মকে লোকে সোনার পদ্ম বলে থাকে। কিন্তু কাঠিন্য বিচার করলে তাকে লোহার পদ্ম বলাই সংগত। সেই লোহার আসনকে জগদীশ আপনার দিকে যে এত অনায়াসে টেনে আনতে পেরেছিলেন, সে তাঁর বৈয়ক্তিক চৌম্বকশক্তি,

অর্থাৎ ইংরেজিতে যাকে বলে পার্সোনাল ম্যাগনেটিজ্‌ম্‌, তারই গুণে।

এই সময়ে তাঁর কাজে ও রচনায় উৎসাহদাত্রীরূপে মূল্যবান সহায় তিনি পেয়েছিলেন ভগিনী নিবেদিতাকে। জগদীশচন্দ্রের জীবনের ইতিহাসে এই মহনীয়া নারীর নাম সম্মানের সঙ্গে রক্ষার যোগ্য। তখন থেকে তাঁর কর্মজীবন সমস্ত বাহ্য বাধা অতিক্রম করে পরিব্যাপ্ত হোলো বিশ্বভূমিকায়। এখানকার সার্থকতার ইতিহাস আমার আয়ত্তের অতীত। এদিকে আমার পক্ষে সময় এল যখন থেকে আমার নির্মম কর্মক্ষেত্রের ক্ষুদ্র সীমায় রোদে বাদলে মাটিভাঙা আলবাঁধার কাজে আমি একলা ঠেকে গেলুম। তার সাধনকৃচ্ছ্রতায় আত্মীয়বন্ধুদের থেকে আমার চেষ্টাকে ও সময়কে নিল দূরে টেনে।

[১৩৪৪]

Years ago, when Jagadis Chandra, in his militant exuberance of youthfulness, was contemptuously defying all obstacles to the progress of his endeavour, I came into intimate contact with him, and became infected with his vigorous hopefulness. There was every chance of his frightening me away into a respectful distance, making me aware of the airy nothingness of my own imaginings. But to my relief, I found in him a dreamer, and it seemed to me, what surely was a half-truth, that it was more his magical instinct than the probing of his reason which startled out secrets of nature before sudden flashes of his imagination. In this I felt our mutual affinity but at the same time our difference, for to my mind he appeared to be the poet of the world of facts that waited to be proved by the scientist for their final triumph, whereas my own world of visions had their value, not in their absolute proba bility, but in their significance of delightfulness. All the same, I believe that a part of my nature is logical which not only enjoys making playthings of facts, but seeks pleasure in an analytical view of objective reality. I remember often having been assured by my friend that I only lacked the opportunity of training to be a scientist but not the temperament Thus in the prime of my youth I was strangely attracted by the personality of this remarkable man and found his mind sensitively alert in the poetical atmosphere of enjoyment which belonged to me.

At this time he was busy detecting in the behaviour

of the non-living some hidden impulses of life. This aroused a keen enthusiasm in me who had ever been familiar with the utterance of the Upanishad which proclaims that whatever there is in this moving world vibrates with life. Afterwards he shifted his enquiries from the field of physics to the biological realm of plants. With the marvellously sensitive instruments which he invented he magnified the inaudible whisperings of vegetable life, which seemed to him somewhat similar in language to the message of our own nerves. My mind was overcome with joy at the idea of the unity of the heart-beats of the universe, and I felt sure that the pulsating light which palpitates in the stars has its electric kinship in the life that throbs in my own veins. I knew that this was not science, but my mind trembled with the hope that the opening message had already been declared and final evidences were in preparation.

At last when Jagadis Chandra sailed across the sea to place the results of his researches before the questioning scrutiny of the West, my heart expanded with an undoubting expectation of our country's claim to a world-recognition being accepted and at the prospect of a wide establishment of a wonderful truth which is native to our oriental attitude of mind. With what little lay in my power I helped him in his adventure but, fortunately, since then no more help was needed either in companionship or in other ways from a man like me who was too heavily burdened with his own responsibilities. His fame spread rapidly and material

contributions from all sides showered upon his schemes, which centralized at last in the Bose Institute. I fervently hope that the Spirit of Science will find its lasting shrine in this place and the aspiration of the great master will remain a living force in its heart, making it a perpetual memorial worthy of him.

This tribute of mine to the memory of Jagadis will appear inadequately feeble, especially in contrast to the repeated magnification of his name in my writings both in prose and verse at the time when his fame was not luminously apparent above the horizon and when, I am sure, my fellowship and unfaltering faith in his genius did hearten and help him. But my struggling health, which has lately been wrenched back from the grip of death, is incompetent for most of my important tasks and also the singing hope that began its first soaring in immensity has completed its journey in its terminus.

JAGADISH CHANDRA BOSE

Memorial Address

When by some fortunate chance I came into an intimate contact with Sir Jagadish, he was in the prime of his youth and I was very nearly of his age. At that moment his mind seemed entranced with a vision of the living creatures' fundamental kinship with the world of the unconscious. He was busy in employing his marvellous inventiveness in coaxing mute Nature to yield her hidden language. The response which he received through skilful questionings revealed to him glimpses of the mystery of an existence that concealed its meaning underneath a contradiction of its appearance. I had the rare privilege of sharing the daily delight of his constant surprises. I believe, poets inherit the primeval age in their temperament when things in their infant simplicity revealed a common feature. Somehow these lovers of *Maya* feel the joy of their being spread all over the creation, which makes them indulge in seeking the analogy of the living in things that appear lifeless. Such an attitude of mind may not in all cases be based upon any definite belief, animistic or pantheistic; it may be merely a make-believe, as we notice in children's play, which owes its origin to the lurking tendency in our sub-conscious mind to ascribe life-energy to all activities in the natural world. I was made familiar from my boyhood with the Upanishad which, in its primitive intuition, proclaims that whatever there is in this world vibrates with life, the life that is one in the infinite.

This might have been the reason of the eager enthusiasm with which I expected that the idea of the boundless community of life in the world was on the verge of a final sanction from the logic of scientific verification. Being allowed to follow the Master's footsteps in the privacy of his pursuit, even though as a mere picker of his casual hints, I had my daily feast of wonders. At this early stage of his adventure when obstacles were powerfully numerous and jealousy largely predominated over appreciation, friendly companionship and sympathy must have had some needful value for him even from one who to maintain intellectual communion with him lacked special competency. Yet I can proudly claim to have helped him in some of his immediate needs and occasional hours of despondency in those days of an inadequate recognition and feeble support that he received from the public.

In the background of that distant memory of mine, I find not the slightest gleam of a vision of the enormous success that could before long combine scientific renown with a vast material means adequate enough to build this Institute, one of the very few richly endowed mediums in India for bestowing the benediction of science upon his countrymen. In fact, it makes me laugh at myself to-day to read, in some of my old letters, my effort to encourage him with the likelihood of filling the gaps in his funds when my own resources were precariously limited to persuading friends who were foolish enough to have faith in me.

Still it is comically sweet to think of the proud magnificence in my assurance fitfully accompanied by contribution absurdly poor compared to the ceaseless flow of tribute that, later on, he could attract by his own magnetic personality and also by the general confidence he widely aroused in his genius. But I repeat again, it was sweet to have dreamed impracticable dreams and to have done however little it was possible, as it proves a courage of joy in the faith in greatness which itself is a bounteous gift to one's own mind.

However ill-equipped as I was by the deficiency in my training and by the poet's idiosyncrasy to be a fit companion to a man of science at a luminous period of his self-revelation, I was still accepted as his close friend and, possibly because of the contrariety in our natural vocations, I was able to offer some stimulation to his urge of fulfilment. Not having the necessary amount of vanity in my constitution, it had been the subject of constant wonder in my mind.

Since then time passed quickly, maturing the fruits of our expectation. During this period of his fast-growing triumph, I was modest enough to feel less and less the urgency of my comradeship in his journey towards the goal, which was no longer arduous or beset with uncertainty. And yet I can rightfully claim the credit for strengthening in some measure his trust in his own destiny, by adding to it my own unwavering faith, at that painfully hesitant moment of fortune during the dubious dawn of his career, when even

persons of meagre resources might have some important use.

Victory is the inalienable claim of all genuine power having the might of attraction that naturally exploits all kindred elements on its path and moulds them into an image of glory. And such an image is this Institute, which represents the Master's lifelong endeavour taking a permanent shape in the form of a centre for the inspiration of similar endeavours.

However, the early association of mine with the Master's first great challenge of genius to his fate, whose path at that time did not run smooth, belongs for me to a remote period of a history in which I feel myself hazily indistinct. And this made me seriously waver to accept the invitation for taking an honoured seat at a ceremonial meeting in this institution. The presumptuousness of youth made me absurdly proud to imagine that my companionship was growing into an organic part in the history that was being evolved before my eyes, and, in that belief I did try to hearten the hero, which was a part of my vanity. But foolish youth does not last for ever, and I have had time to come to realise my limitation. Anyhow it is quite obvious, that I am a mere poet carrying on my *sadhana* in the temple of language, the most capricious deity who is apt to ignore her responsibility to logic, often losing herself in the nebulous region of fantasy. Our oriental custom is to bring proper gifts to sacred shrines, but my gift of words for this occasion cannot but be out of place among the records of memorable

proceedings of a learned society.

Fortunately there are some few men among us who can claim fellowship with the aristocracy in the realm of science, and can be expected to make splendid this ceremony with the wealth of their thoughts. I can only bless this institution from that obscure distance where the multitude of the uncared-for generations of this country have helplessly drifted to the pitiless toil of primitive land-tilling. I offer my salutation to the illustrious founder of this Institute, humbly sitting by those who are deprived of a sufficiency of that knowledge which only can save them from the desolating menace of scientific devilry and from the continual drainage of the resources of life, and I appeal to this Institute to bring our call to science herself to rescue the world from the clutches of the marauders who betray her noble mission into an unmitigated savagery.

১ মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য-বাহাদুরকে লিখিত

...জগদীশবাবুর সেই টাকা আমার নিকট পাঠাইলে আমি আনন্দ-সহকারে যথাস্থানে যথাসময়ে পাঠাইয়া দিব। ইতিমধ্যে দিন দুয়েকের জন্য কলিকাতায় গিয়াছিলাম— সেখানে জগদীশবাবুর সহিত অনেক আলাপ-আলোচনা হইল। তিনি সম্প্রতি বিলাতের পণ্ডিতদের নিকট হইতে মহোৎসাহপূর্ণ যে সমস্ত পত্র পাইয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া পুলকিত হইয়াছি। তাঁহারা লিখিয়াছেন— 'আপনার নূতন আবিষ্কার-গুলি পরমাশ্চর্যজনক।'... ২১ বৈশাখ ১৩০৭

২ ঠাকুর মহিমচন্দ্র দেববর্মাকে লিখিত

...আমি ভাবিলাম তোমরা রাজপারিষদ। লোকের সাধু উদ্দেশ্যে তোমাদের বিশ্বাস নাই— সকলকেই তোমরা সন্দেহচক্ষে দেখ— মহারাজের স্বাভাবিক ঔদার্য্যকে তোমরা আচ্ছন্ন করিয়া আছ। বস্তুতঃ মহারাজের মত লোকের সহিত সংশ্রব রাখিলেই সাধারণ লোকে সন্দেহের চক্ষেই দেখে। সাধারণের কাছে আমার প্রতিপত্তি আছে— আমি স্বার্থপর ভাবে ভিক্ষুভাবে মহারাজের দ্বারে গমনাগমন করি এ অপবাদ গ্রহণ করিতে সঙ্কোচ বোধ করি। মহারাজ আমাকে মান্যবন্ধু-ভাবে দেখিয়া তদনুরূপ ব্যবহার করিতে নিজে স্বভাবতঃই ইচ্ছুক কিন্তু শুনিতে পাই তোমরা তাহাতে বাধা দিয়া তাঁহাকে সুদূরে রাখিতে চেষ্টা

কর— সুতরাং মহারাজের সহিত আমার প্রিয় সম্বন্ধ লোকচক্ষে হীন করিয়া তুলিতেছে। সেই সকল কারণে মহারাজের প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অনুরাগ সত্ত্বেও আমি ক্রমশঃ দূরে নির্লিপ্ত থাকিবার চেষ্টায় ছিলাম। কেবল জগদীশবাবুর কার্য্যে আমি মান অপমান অভিমান কিছুই মনে স্থান দিতে পারি না— লোকে আমাকে যাহাই বলুক এবং যতই বাধা পাই না কেন তাঁহাকে বন্ধনমুক্ত ভারমুক্ত করিতে পারিলে আমি কৃতার্থ হইব— ইহা কেবল বন্ধুত্বের কার্য্য নহে, স্বদেশের কার্য্য। সুতরাং ভিক্ষুভাবেই আমি এবার অসঙ্কোচে মহারাজের দ্বারে দাঁড়াইব। আমি ধনীর পুত্র কিন্তু ধনী নহি— অন্তরে ঈশ্বর যে সকল শুভ সঙ্কল্প প্রেরণ করেন তাহা সাধনের ক্ষমতা আমার হাতে দেন নাই— সুতরাং শুভকর্ম্মের অন্তরায়স্বরূপ সমস্ত অভিমানকে সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন দেওয়াই আমার কর্ত্তব্য। জগদীশবাবুর জন্য তাহাই দিব। তাহার পরে যদি পারি তবে সংসারের সমস্ত স্তুতিনিন্দা হইতে নিজেকে দূরে লইয়া গিয়া শান্তচিত্তে স্বচেষ্টায় নিজের কর্ত্তব্য পালন করিব।··· [১৩০৮]

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩ প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত

···আজ জগদীশ বসুর এক চিঠি পেয়ে ভারি আনন্দে আছি। এবারে তিনি সেখানে খুব বড় রকমের জয়লাভ করে আসবেন তার সূত্রপাত হয়েছে। এবারে তিনি যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কার করেচেন তাতে বিজ্ঞানের অনেকগুলি প্রাচীন মত উল্টে গিয়ে একটা বৈজ্ঞানিক বিপ্লব উপস্থিত হবে— একবারে মূলতত্ত্বে ঘা দেবে— কেবল Physics নয়,

কেমিষ্ট্রি, ফিজিয়লজি এমন কি Psychology পর্য্যন্তে আঘাত করবে। যুদ্ধ ত আরম্ভ হয়েছে। ইলেক্‌ট্রিসিটি সম্বন্ধে Prof. Lodge য়ুরোপের মধ্যে একজন মহারথী— জগদীশ বসুর মত বিশেষ রূপে তাঁরই মত খণ্ডন করেছে। সে জন্যে প্রথমে, প্রোফেসার যুদ্ধসাজে সদলবলে এসেছিলেন— কিন্তু জগদীশ বসুর প্রবন্ধ শুনে Prof. Lodge উঠে প্রশংসাবাদ করে বসুজায়ার নিকট গিয়ে বল্লেন— Let me heartily congratulate you on your husband's splendid work. তার পরে তাঁরা ওঁকে ধরে পড়েছেন যে, তুমি ইংলণ্ডে থেকে কাজ কর, ভারতবর্ষে তোমার বিস্তর ব্যাঘাত। ওঁকে সেখানকার একটা বড় য়ুনিভার্সিটির অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত করবার জন্যে তাঁরা অনুরোধ করচেন— তিনি জন্মভূমির প্রতি মমত্ববশতঃ ইতস্ততঃ করচেন। আমি তাঁকে মিনতি করে লিখেছি যে, জন্মভূমির মোহ যেন তাঁর চিত্তকে তাঁর কাজের সফলতা থেকে বিক্ষিপ্ত করে না দেয়। সেখানে অবসর এবং বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীর সহায়তা ও সহানুভূতির মধ্যে না থাকলে তাঁর হাতের সুবৃহৎ কাজ সমাধা করতে পারবেন না। তাঁর কৃতকার্য্যতাতেই তাঁর মাতৃভূমির গৌরব। আমি ঈশ্বরের কাছে প্রাণমনে প্রার্থনা করি তাঁর জয় হোক্!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪ মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য-বাহাদুরকে লিখিত

বিপুলসম্মানপুরঃসর নিবেদন—

অনেকদিন পরে মহারাজের পত্র পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি।

মহারাজের সহিত আমি এমন কোন সম্বন্ধ রাখিতে ইচ্ছা করি না যাহাতে লোকে স্বার্থসিদ্ধির অপবাদ দিতে পারে। আমার সাধ্য যৎসামান্য হইলেও, এবং উদ্দেশ্য লোকহিতকর হইলেও, যে কাজ নিজের হাতে লইয়াছি সে সম্বন্ধে মহারাজের নিকট হইতে আর্থিক সহায়তা লইব না ইহা আমি স্থির করিয়াছি। কষ্ট এবং ত্যাগ স্বীকার ব্যতীত কোন মহৎ কর্ম্মের মূল্য থাকে না— আমার যতদূর সাধ্য আছে বঙ্গদর্শন পরিচালনায় তাহার সীমা অতিক্রম করিলেই গৌরব লাভ করিব। এবারে জগদীশবাবুর পত্র পড়িয়া এই বিষয়ে আমি মনে মনে বল লাভ করিয়াছি— জগদীশবাবুর প্রতিভায় পাণ্ডিত্য এবং সহৃদয়তার আশ্চর্য্য মিলন হইয়াছে বলিয়া এ সকল ব্যাপারে তাঁহার মত আমার কাছে সর্ব্বাগ্রগণ্য। তিনি লিখিয়াছেন:—

'তুমি পুনরায় সম্পাদকের ভার লইয়া তোমার সময় নষ্ট করিবে মনে করিয়া প্রথম প্রথম দুঃখিত হইয়াছিলাম। তারপর দুই সংখ্যা বঙ্গদর্শন পাইয়া অতিশয় সুখী হইয়াছি। আর, সমস্ত লেখাতে একটি নূতন ভাব দেখিয়া অতিশয় আশান্বিত হইয়াছি। এতদিন পরে যদি আমাদের চক্ষের আবরণ ঘুচিয়া যায় এবং আমরা আমাদের প্রকৃত মনুষ্যত্ব বুঝিতে পারি, তাহা অপেক্ষা আর কিছুই অভিপ্রেত হইতে পারে না। তোমার আকাঙ্ক্ষা যেন ভারতবর্ষময় ব্যাপ্ত হয়। আর, তুমি যে সব দুরূহ প্রতিজ্ঞা করিয়াছ তাহা যেন রক্ষা করিতে সমর্থ হও! আমার সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষোভ এই যে, আমাদের প্রকৃত গৌরব ভুলিয়া মিথ্যা আড়ম্বর লইয়া ভুলিয়া আছি। এখন এ সব দেশ ভাল

করিয়া দেখিয়াছি, এখন অনেক বুঝিতে পারি। অন্য কোন দেশে সভ্যতা এতদূর নিম্নস্তর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছে? অন্য কোন জাতি অনার্য্যকে আর্য্য করিতে পারিয়াছে? অন্য কোথায় নিম্নস্তর পর্য্যন্ত পুণ্য এরূপ প্রসারিত হইয়াছে? তবে আজকাল জ্ঞান লইয়া সভ্যাসভ্যের বিচার হয়। তোমরা মূর্খ তোমরা কেবল নকল করিতে পার ইত্যাদি কথা বিদেশী কেন, স্বদেশীয় অনেকের নিকট শুনিয়াছি। এই এক কথা শুনিয়া সমস্ত দেশের লোক মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া আছে। তুমি স্নেহগুণে আমার অনেক অযথা প্রশংসা করিয়াছ। যদি কিছু প্রশংসার থাকে তবে এই যে আমি এই মন্ত্রপাশ হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে পারিয়াছি। আমি সত্য বলিতেছি যে, অন্যে যাহা করিয়াছে তাহা যতই উচ্চ হউক না কেন তাহা আমাদের জাতির পক্ষে অসম্ভব নহে। তোমরা আশীর্ব্বাদ কর আমি যেন সেই Eternal lie, যাহা দ্বারা আমাদের সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত উৎসাহ, নির্ম্মূল হইয়াছে—সেই ঘোর মিথ্যাপাশকে চিরকালের জন্য ছিন্ন করিতে পারি।"

জগদীশবাবুর এই পত্র আমার পক্ষে পারিতোষিক। আমি যাহা বলিতে চেষ্টা করিয়াছি তিনি তাহা বুঝিয়াছেন। হিন্দুর যথার্থ গৌরব কি, এবং হিন্দুর উন্নতিসাধনের প্রকৃত পথ কোন্ দিকে বঙ্গদর্শনে তাহাই সম্যক্ আলোচিত হইলে আমি চরিতার্থ হইব। হিন্দুত্ব কি তাহাই আমি ক্রমশঃ দেখাইতেছি এবং সেই সঙ্গে একথাও জানাইতেছি যে, য়ুরোপীয় সভ্যতায় যাহাকে ন্যাশনাল মহত্ত্ব বলে তাহাই মহত্ত্বের একমাত্র আদর্শ নহে। আমাদের বিপুল সামাজিক আদর্শ তাহা অপেক্ষা অনেক বৃহৎ ও উচ্চ ছিল। এই আদর্শকে যদি জড়ত্ববশত আমরা নষ্ট হইতে দিই তবে য়ুরোপীয় মতে নেশন্‌ও হইব না অথচ আত্মপ্রকৃতি হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অকর্ম্মণ্য দুর্ব্বল হইব।

জগদীশবাবুর জন্য কিছু করিবার সময় অগ্রসর হইতেছে। তাঁহার

বিজ্ঞানালোচনার সঙ্কটকাল উপস্থিত হইয়াছে। তিনি যে উচ্চের দিকে উঠিতেছিলেন পরাধীনতা ও বাহিরের বাধায় তাঁহাকে হঠাৎ নিরস্ত করিলে আমাদের পক্ষে ক্ষোভ ও লজ্জার সীমা থাকিবে না। মহারাজ আপনাকে স্পষ্ট কথা বলি— আমি যদি দুর্ভাগ্যক্রমে পরের অবিবেচনা-দোষে ঋণজালে আপাদমস্তক জড়িত হইয়া না থাকিতাম তবে জগদীশ-বাবুর জন্য আমি কাহারও দ্বারে দণ্ডায়মান হইতাম না, আমি একাকী তাঁহার সমস্ত ভার গ্রহণ করিতাম। দুরবস্থায় পড়িয়া আমার সর্ব্বপ্রধান আক্ষেপ এই যে দেশের হিতকার্য্যের জন্য পরকে উত্তেজনা করা ছাড়া আমার দ্বারা আর কিছুই হইতে পারে না। মহারাজের উদার হৃদয়, লোকহিতৈষা মহারাজের পক্ষে স্বাভাবিক, সেই গুণে আমি মহারাজের নিকট একান্ত আকৃষ্ট হইয়া আছি। জগদীশবাবুর জন্য আমি প্রত্যক্ষভাবে মহারাজের নিকট দরবার করিতে ইচ্ছুক— এজন্য আমি আগরতলায় যাইতে প্রস্তুত।··· আমি মহারাজের নির্জ্জন খাস্ দরবারের মধ্যে প্রবেশ করিবার প্রত্যাশী— আমি মহারাজের প্রতি নিতান্তই উপদ্রব করিব, মন্ত্রীবর্গদ্বারা আমি প্রতিহত হইব না। মহারাজের পরিচরবর্গ নানা কথাই বলিবে, নানা অভিসন্ধি আশঙ্কা করিয়া আমাকে সঙ্কুচিত করিবে, কিন্তু আমি তাহা শিরোধার্য্য করিব। মহারাজের নিকট পূর্ব্ব হইতেই আমার এই নিবেদন রহিল। মহারাজের প্রতি আমার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা আছে বলিয়াই আমি অকুণ্ঠিতভাবে সকল কথা বলিলাম। যদি ধৃষ্টতা হইয়া থাকে তবে মার্জ্জনা করিবেন। এবং আমাকে ব্যক্তিগত হিসাবে মার্জ্জনা করিয়া আমার একান্ত আন্তরিক মঙ্গল উদ্দেশ্যের প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টি রক্ষা করিবেন।··· ইতি ২৪শে শ্রাবণ ১৩০৮

চিরানুরক্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

…জগদীশকে মহারাজ যে পাঁচ হাজার টাকা সাহায্য প্রেরণ করিয়াছেন তাহার জন্য আমার হৃদয় কৃতজ্ঞতায় অভিষিক্ত হইয়াছে। মহারাজের উদার মহত্ত্ব বারম্বার অনুভব করিয়াছি, তাহা চিরকাল মনে রহিবে, মুখে প্রকাশ করিব কি করিয়া?… মহারাজের ঔদার্য্য কালক্রমে সর্ব্ব-প্রকার বাধামুক্ত হইয়া আমাদের স্বদেশকে সফলতার পথে প্রতিষ্ঠিত করিবে।… ইতি ২৪শে শ্রাবণ ১৩০৯

অনুরক্ত ভক্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ জোড়াসাঁকো

বিপুলসম্মানপুরঃসর নিবেদন,—

মহারাজের নিকট অধ্যাপক বসুর একটি প্রার্থনা জানাইবার নিমিত্ত এই পত্র লিখিতেছি।

অধ্যাপক মহাশয় উদ্ভিদের বর্দ্ধন পরিমাপের জন্য একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি এই বর্দ্ধনতত্ত্ব আলোচনায় প্রবৃত্ত আছেন।

ত্রিপুরায় যে মুলী বাঁশ জন্মে— শিশু অবস্থায় তাহার বৃদ্ধি অতিশয় দ্রুত। এই গাছের চারা তাঁহার পরীক্ষার জন্য অত্যাবশ্যক হইয়াছে। সদ্য অঙ্কুরিত মুলী বাঁশের চারা মহারাজ যদি সত্বর তাঁহার ঠিকানায় পাঠাইয়া দিতে আদেশ করিয়া দেন তবে তাঁহার বিশেষ উপকার হইবে।

পথের মধ্যে অঙ্কুরাগ্র দলিত হইয়া গাছগুলি মরিয়া না যায় সে জন্য প্যাকবাক্সে শিকড় সমেত গাছগুলি মাটিতে বসাইয়া তাহার উপরে খাঁচার আবরণ দেওয়া আবশ্যক হইবে। আপাতত প্রায় ২০।২৫টি গাছ তাঁহার প্রয়োজন হইবে। পরীক্ষার উপদ্রবে এগাছগুলি মারা গেলে অন্য তাজা গাছের পুনশ্চ প্রয়োজন হইবে— তখন মহারাজ পুনর্ব্বার আদেশ করিয়া দিবেন। কলিকাতার নিকটে এই গাছের সন্ধান করিয়া না পাওয়াতে তাঁহার পরীক্ষা অসমাপ্ত হইয়া আছে। ··· ইতি ২রা আষাঢ় ১৩১২

চিরানুরক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭ শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত

…বিধাতা দেশ থেকে আমাদের তাড়া করেছিলেন এই জন্যে যে, মহাবিশ্বের পথকেই আমরা দেশ বলে গ্রহণ করব। এই জন্যে যে, আমরা আরামে থাকব না আমরা আলোকে বাস করব—আমাদের জন্যে সম্পদ নয়, মুক্তি। যাই হোক্ আমি বেশ দেখতে পাচ্চি বাংলাদেশের বৈরাগীরা বিশ্বের পথে পথে ছড়িয়ে পড়বে— কোণের মধ্যে আমাদের জায়গা হবে না। ঐ দেখনা, এত কোণ এত বন্ধনের মধ্যেও জগদীশ বোস্‌কে কেউ ধরে রাখতে পারলে না। তাঁর বিজ্ঞানের মন্ত্র কুণো বিজ্ঞানের মন্ত্র নয়— তিনি জড় ও চেতন, বস্তুবিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান সমস্তকে একত্র মিলিয়ে বন্ধনমুক্ত জ্ঞানের মহাসঙ্কীর্ত্তন পূর্ব্ব পশ্চিমে ধ্বনিত করে তুলেচেন। এই যে তিনি দ্বার খুলে বেরিয়েচেন এ দ্বার সহজে আর বন্ধ হবে না, তাঁর দলের লোক আরো আসচে, পথে আর জায়গা হবে না। ইতিমধ্যে এক পয়সা দু পয়সার সাময়িক ও অসাময়িক পত্রগুলো কুণো-রাজ্যের দলাদলি নিয়ে কোঁদল করুক চীৎকার করুক, সে কারো কানে পৌঁছবে না— কেননা বাংলাদেশের অন্তরতম সাধন-লোকে সিদ্ধিদাতার আহ্বান এসে পৌঁচেছে।… ১০ই কার্ত্তিক ১৩২৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮ শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে লিখিত

…কোনো একটা জাতের সঙ্গে বৈষয়িক সম্বন্ধ থাকলেই তার বিকারে এইরকম অসত্য বুদ্ধি উগ্র হয়ে ওঠে। আমার উদ্দেশ্য ছিল অবৈষয়িক ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য জাতির সঙ্গে মিলনের পথ উদ্‌ঘাটন করা। আমি য়ুরোপকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করি। আমি জানি ঐখানেই মানুষের মন সর্ব্বতোভাবে জেগেছে— এইজন্যে ঐখান থেকেই মানুষের সমস্ত কলুষ দূর হবে। যারা আধজাগা, আধমরা তারা নিজের অসাড়তার বোঝায় ধরণীকে ভারাক্রান্ত করে, এবং সজীব পদার্থকে ব্যাধিগ্রস্ত করে। অথচ আমাদের সুপ্তির তলায় একটা চিত্ত আছে, আমরা বর্ব্বর নই। জাগ্রত জগতের সঙ্গে অন্তরের যোগ হলেই আমাদের শক্তির উদ্বোধন হবে। তখন আমরা কেবল গ্রহণ করব না, দান করব। জগদীশ আজ বিশ্বকে যা দিচ্চেন তার মধ্যে ভারতের চিত্ত আছে, কিন্তু তার উদ্বোধন য়ুরোপের। তিনি যদি কূপমণ্ডূক হয়ে কেবল সাংখ্যদর্শন মুখস্থ করে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির চর্চ্চা করতেন তাহলে কি হত সবাই জানি। সাংখ্য-দর্শন যখন সজীব ছিল তখন ওর মধ্যে থেকে আমাদের চিত্ত প্রাণ-শক্তি লাভ করতে পারত। কিন্তু এখন ওর প্রাণক্রিয়া বন্ধ হয়ে গিয়ে ও একটা শাস্ত্রমাত্র হয়ে রয়েচে। অতএব সাংখ্যদর্শনকে সজীবভাবে জানতে ও গ্রহণ করতে হলে য়ুরোপীয় বিদ্যার সঙ্গে তার সহযোগিতা ঘটাতেই হবে।… ২৮ ভাদ্র ১৩৩৫

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন : ভাণ্ডার-সম্পাদক

আমাদের দেশের শিক্ষার আদর্শ এখনকার অপেক্ষা দুরূহতর ও পরীক্ষা কঠিনতর করা ভাল কি মন্দ ?

উত্তর : শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু

শিক্ষার আদর্শ দুরূহতর ও পরীক্ষা কঠিনতর করা সম্বন্ধে "ভাণ্ডারে" যে প্রশ্ন তোলা হইয়াছে, আমি কেবল বিজ্ঞানের পক্ষ হইতে সংক্ষেপে তাহার উত্তর দিব।

এ কথা সকলেই জানেন যে, আমাদের দেশে শিক্ষিতদের মধ্যেও বিজ্ঞান-চর্চা তেমন করিয়া ছড়াইয়া পড়ে নাই। দেশী ভাষায় সাহিত্যের যেমন উন্নতি হইয়াছে, বিজ্ঞানের তেমন হয় নাই, ইহা তাহার একটি প্রমাণ।

এমন স্থলে এ দেশের য়ুনিভার্সিটিকে এ দেশের অবস্থা ও অভাব বিশেষভাবে বিচার করিয়া কাজ করিতে হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই :— অন্য দেশের অনুকরণ করিতে গেলে, সে দেশের লোক যে ফল পাইতেছে তাহাও পাইব না, আমরা যে ফল আশা করিতে পারিতাম তাহা হইতেও বঞ্চিত হইব। যে ব্যক্তি চলিতে শিখিলেই আপাতত খুসি হওয়া যায়, তাহাকে একদমে লাফ দিতে শিখাইতে হইবে এমন পণ করিয়া বসিলে, লাফ দেওয়া ত হইবে না, মাঝে হইতে চলাই দুর্ঘট হইবে।

দেশে যাহারা একটা নূতন ব্যবসা চালাইতে চায়, তাহারা কি উপায় গ্রহণ করে? ভারতবাসীদের মধ্যে চায়ের ব্যবসা জাঁকাইয়া তুলিবার

জন্য কি করা হইয়াছে? দেশের যথাসম্ভব লোক যাহাতে চায়ের স্বাদ পায়, চা-পান করিতে অভ্যস্ত হয়, তাহার জন্য দেশ জুড়িয়া সস্তায় চা-বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। অত্যন্ত সেরা জাতের দামী চা চড়াদরে বাজারে বাহির করা, দেশে চা-প্রচলনের পক্ষে ভাল উপায় বলিয়া গণ্য হয় নাই।

দেশে নূতন বিদ্যা চালাইবারও এই একই উপায়। প্রথমপরিচয়ের স্বাদ বিস্তার করিবার জন্য শিক্ষার প্রণালীকে সরল করা চাই;— যখন অনেক লোকের মধ্যে শিক্ষার গোড়াপত্তন হইয়া যাইবে, দেশের লোক যখন এই বিদ্যার রস পাইতে থাকিবে, তখন যোগ্যতার বাছাই করিবার জন্য এখনকার চেয়ে কড়াক্কড়ি চলিতে পারিবে।

বিদেশী য়ুনিভার্সিটির চেয়ে আমাদের আদর্শ খাটো হইয়া পড়িবে, এই মিথ্যালজ্জার কোনো মূল্য নাই। সেখানকার আদর্শও চিরদিন একইভাবে ছিল না— জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আদর্শ উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে।

যাই হোক্ না কেন, রাজবাড়ীতে সকলে ক্ষীর খাইতেছে বলিয়া, দরিদ্র বেচারাকে সেই আদর্শে লজ্জার বশে দুধ খাওয়া ছাড়িতে কেহ পরামর্শ দিবে না— আপাতত যাহা আমাদের পুষ্টির পক্ষে প্রয়োজন সেই দিকে মন দিতে হইবে, গৌরবের কথা পরে ভাবা যাইবে।

তা ছাড়া, আর একটি কথা বলিবার আছে। বিজ্ঞানের কূটতত্ত্ব ও কঠিনসমস্যা লইয়া নাড়াচাড়া করিলেই যে উদ্ভাবনী শক্তি বাড়ে তাহা নহে। প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয়, ভাল করিয়া দেখিতে শেখাই, বিজ্ঞান-সাধকের মুখ্য সম্বল। বিজ্ঞানপাণ্ডিত্যে যাঁহারা যশস্বী হইয়াছেন, তাঁহারা যে বিদ্যালয়ে অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষা দিয়া বড় হইয়াছেন তাহা নহে।

আমাদের দেশে আমরা যদি যথার্থ বিজ্ঞানবীরদের অভ্যুদয় দেখিতে চাই, তবে শিক্ষার আদর্শ দুরূহ ও পরীক্ষা কঠিন করিলেই সে ফল পাইব না। তাহার জন্য দেশে বিজ্ঞানের সাধারণ ধারণা ব্যাপ্ত হওয়া চাই, এবং ছাত্রা যাহাতে পুঁথিগতবিদ্যার শুষ্ককাঠিন্যের মধ্যে বদ্ধ না থাকিয়া, প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য বিজ্ঞানদৃষ্টিচালনার চর্চা করিতে পারে, তাহার উপায় করিতে হইবে।

এরূপ শিক্ষা ভাগ্যদোষে দুর্লভ হইতে পারে, কিন্তু দুরূহ নহে।

[১৩১২]

54 Parliament Street
London, S. W.
16 July 1901

My dear Robi,

I was glad to learn that some of our countrymen have been thinking of making arrangements to make Dr. Bose independent of the Government appointment which he holds, so that he may pursue his researches all his life to the credit and honour of our country. The idea is an excellent one, because the chance we have now will probably never return within a generation, if we lose it now. Dr. Bose has read startling papers and disclosed startling discoveries at the Royal Institution & the Royal Society, he has awakened the interest of the civilised and scientific world, and he is on the eve of revealing farther truths which will give our countrymen a position and a name. But to pursue his work to a successful termination against all opposition is a work of years,—and during these years we *must* support him and keep him in his work. The Indian Govt. *can't* do this and *won't* do this. They have refused his prayer for extention, and you know as well as I, they will not be sorry to see him withdrawn from his brilliant labours into the drudgery and obscurity of Calcutta. If ever there was an occasion for us to fight for our fame and honour,—this is the occasion!

I am sure you will be able to guess, as well as I,

what his expenses here are likely to be. He has to keep an assistant on about £ 200 a year, his instruments and appliances will cost about as much, and living with his wife in this country & travelling from place to place,—to Germany or America sometimes,—will cost at least £ 600 a year.

Thus a thousand pounds a year,—(or 15,000 Rupees) is what is absolutely necessary for him ;— I believe Sir M. Bhownagree gets about three times as much for his political work ! Will our country fail to give our only scientist this support when so much is at stake, when a chance now lost may never come back to us ?

From past bitter experience, I would not depend on annual collections and contributions. As a friend, I would not advise Dr. Bose to give up his appointment,—miserable as it is,—depending on annual remittances. We must make him independent once for all, so that there may be no doubt as to his future, so that he may devote his whole time and energies to his work without any uncertainty in his prospects. I do not know how much money an Insurance Office would require in order to grant Dr. Bose an annuity of Rs 15,000 a year for the rest of his life. I imagine they would want two lakhs or so ;— and unless we can find this sum and pay it into an Insurance Office to assure an annuity to Dr. Bose during the rest of his life I see no other way of making him independent of that drudgery, humiliation and eternal worry which are certain to ruin his chances and our country's

prospects for ever.

The suggestions I have made in this letter are all my own. I feel strongly in the matter, and have thought it out, and made my own calculations. And I feel also that if we do not help ourselves in this matter, if we have not patriotism enough to make our one scientist independent for life and devoted to the cause of science and of our country,— we shall lose our chance for ever and deserve to lose it. I know, Robi, you feel as strongly as I do ; you have immense influence in the country ; and I appeal therefore to you to try privately to raise this money & invest it in the manner proposed for the honour & the glory of our country.

Yours Ever Sincerely
Romesh Dutt

Bose Para Lane
Baghbazar.
Calcutta. Friday
June 16, 1899.

My dear Mr. Tagore,

You have heard long ago, I fancy, that I must go to England this summer & that therefore I shall not be able to accept that fascinating invitation to your river-house, towards wh. I had been steadily pressing for so long ! I was within a day or two of

writing to you that, if you wd. allow me, I wd. come to Mrs. Tagore & yourself as soon as the Swami had started. Little did I think that before I shd. have written, my own fate wd. have been reversed !

I am really not at all happy to be going away from India— even for a little while— and long talks with yourself on all sorts of delightful things are amongst the many disappointments of the change of plan. Besides, I really wanted to add a new friend to those with which India has already blessed me, and you are so dear to my friend Dr. Bose, that I cd. not help hoping you sd. be my friend too !

But I hope that the greatest ends may be better served by my going than by my staying— & if that is so I know that you will feel with me that personal considerations simply do not count.

My Au Revoir includes a great many wishes for your good health & happiness until we meet again. Please give my kind regards and respects to Mrs. Tagore & my love to your charming children.

And believe me dear Mr. Tagore

Sincerely Yours,
Nivedita

9, Elysium Row,
Calcutta.
April 18th, 1903.

Dear Mr. Tagore,

You asked me to write you an account of the actual discoveries which Prof. Bose had made, & of the difficulties under which he had laboured in making them. But I imagine that you only want the kind of account that I can give you in a letter. I imagine, too, that in writing you a letter I am making a more or less confidential communication, so that I need not fear to use names occasionally knowing that I shall not be quoted in any public way.

When I came to Calcutta I first knew Prof. & Mrs. Bose, in the end of the year 1898. I was horrified to find the way in which a great worker could be subjected to continuous annoyances & petty difficulties—with the evident earnest desire of those who were about him to end his distinction which was personally galling to them. The college-routine was made as arduous as possible for him, so that he could not have the time he needed for investigation. And every little thing that happened was made an excuse for irritating correspondence & flagrant misrepresentation.

These things may seem small in your eyes, but if you have the least idea (as you must have) of how impossible it is to do work requiring great insight or great & sustained emotion, unless there is freedom & peace, you will know how wonderful it is that

our friend should have continued to work on & achieve, in spite of his surroundings at that time. If one could also realise, in a country situated as India is, the sacrifices that a free people, like the Americans or English, the French or the Germans wd. be willing to make in order to obtain such a worker as Dr. Bose —of their own blood— one wd. stand amazed, as I did, at the spectacle of a great scientific man working alone as he was. I had come, of course, from Europe, where Prof. Bose's name was well known as the discoverer of the Etheric Waves that penetrate minerals. His work was belated in reaching Europe. It was announced along with the Rontgen rays, & obviously went deeper— since that form of light was deterred by bone & metal, while *his* penetrated these substances. Already, early in the year 1895, I believe, he had demonstrated the existence of these invisible rays at the Town Hall, Calcutta— and it was not till two years after he had thus made the essential discovery— as some of the Italian scientific papers were the first to point out,— that Marconi began to work out & apply it on the large scale.

Of course you understand that men of the inventor & discoverer type— men like Marconi, Tesla, Mascine*, & so on,— rank in the world of science far below the investigator, the man of Sannyasin mind like Dr. Bose, who pursues knowledge for its own sake. Even Prof. ... jeopardises his great reputation, & certainly minimises his historic importance by taking patents & becoming involved

* **Mascart ?**

in commercial schemes. But Dr. Bose not only demonstrated the existence of these particular etheric waves. He proved himself as great in constructive ability as in research itself, & his instrument, popularly known as the Artificial Eye, was considered a marvel of compactness & simplicity. Prince Kropotkin was talking of how Prof. Thomson the week before at the Royal Institn. had exhibited an apparatus some yards long, to act as a polariser of light— and Prof. Bose, the following week, to do the same thing, simply took up a book (it happened to be a Bradshaw) & showed how the rays wd. pass one way & not the other. "I said to myself", said Prince K, "that this was the simplicity of the highest genius." But of course Prof. Bose was only able to perform this great simplification of methods because *his* theory was so much more sound than those of his English & German competitors in this field.

He began to publish Papers through the Royal Society in, I think, the year 1894. From that date, working under all his difficulties as he was, he published 2 or 3 every year till he left for Paris in 1900. (One Paper in 2 years is considered a good record for a life that is surrounded by advantages.) And Prof. Bose's work was in each case completely original & in a special sense accurate & exhaustive. He was like a man haunted by the fear that if he failed at any point his people wd. be held to have no right to education. "Everyone knows that we have brilliant imagination" he told me, when he was fighting against death in

London in 1900, & still struggling to make a record of his latest discoveries, "but I have to prove that we have accuracy & dogged persistence besides." He did prove it. Lord Rayleigh & Sir Wm. Crookes both told him that while the perfection of his methods was unquestioned, no one had yet been able, in 1901, to repeat his experiments of 1895-6 ! His manipulation was beyond rivalry.

The work of '94 to 1900 had consisted of some dozen or more separate investigations on invisible light-polarisation. The existence of a dark cross— &c. &c.— these were valuable pieces of work, full of suggestions to some of the advanced workers in Europe, who were not slow to take hints from his instruments & theories. It was apparently in the year 1900, however, that all these separated tasks began to combine in a series of great generalisations which have not yet been given to the world in their completeness, and which are to prove of wider & wider philosophic interest as time goes on.

I allude to the great Theory of Stress & Strain— which, if only he can command time & strength to work it out in publication, will be held as epoch-making as Newton's Law of Gravitation— a tribute worthy of India's contributing to world-knowledge.

It is the minor applications of this generalisation that have hitherto attracted so much attention— one of the first discoveries to which it led was that of the Binocular Alternation of Vision.

Another was of a more practical (i.e. commercial)

nature— leading to the improvement of the coherer in Wireless Signalling, & Lodge's collaborator, Dr. Muirhead, freely confessed that in the development of the system lately adopted for India, they had owed most important suggestions to Dr. Bose's Papers & conversation. The largest applications of the theory are however purely scientific. It gives an immediate clue to whole classes of apparent anomalies in photography, in chemistry, & in Molecular Physics generally. Amongst other things it led to the immediate discovery & formulation of the phenomenon known as Vegetable Response. In realms like these it has disproved the contentions of many would-be theorists of a smaller scale, & there is therefore a strong opposition to Prof. Bose's work amongst those physiologists who have tried to prove the unique character of life. This opposition is of course perfectly normal. It is usually in fighting against it, that a scientific man proves his greatness, & conquers those who disagree with him. But in this case, there is a strong race-feeling of jealousy to combine with the natural & necessary scientific opposition, & I have no doubt that it was through the efforts of these men at the India Office that the opportunity was taken to refuse Dr. Bose any extension of deputation, at the moment when his opinions began to be known, & before his book had yet come out.

It was the very man of whom I have this suspicion who in November, believing Prof. Bose to be in India, (to have been forced back to India indeed) stole some

of his results & published them as his own. Fortunately Prof. Bose's position in the world of Science was too well assured for him to touch it, & though he has been able to organise a small party, we may regard it as easily discredited if the work can only be continued in an adequate way.

The book on Response in Living & Non-Living is now triumphant. I want a far greater work, such as only this Indian man of science is capable of writing, on Molecular Physics,— a book in which that same great Indian mind that surveyed all human knowledge in the era of the Upanishads & pronounced it one, shall again survey the vast accumulations of physical phenomena which the 19th Century has observed & collected, & demonstrated to the empirical, machine-worshipping, gold-seeking mind of the West that these also are One— appearing as Many.

But I recognise that under present conditions one cannot even ask for the beginning of such a work. The petty daily persecution where perfect sympathy & every facility are absolutely necessary : the distracting routine of a paid servant who is never allowed to feel independent of daily bread, the constant difficulties thrown in the way by minor officials who have power enough to impede, but not enough to be raised above jealousy,— are these things not enough ? And then we ask him to undertake great work— but what are *we* willing to do for *him* ? Can we supply him with companions in learning who will stimulate & encourage the arduous work ? Does it trouble us that he

is the one man in India doing work of the first rank, & that to this day he is paid less than *any* Englishman, even the commonest, wd. receive in his place ?

Dr. Garnett of London told me of the splendour of the great College of Sciences at Vienna, and how, when he exclaimed as to its cost, the government representative replied proudly that if *one* scientific man shd. be produced in a century there, it wd. be more than worth their while. Which of us feels like this ?

Ah India ! India! Can you not give enough freedom to one of the greatest of your sons to enable him,— not to sit at ease, but— to go out & fight your battles where the fire is hottest & the labour most intense, and the contest raging thickest ? And if you cannot do this— if you cannot even bless your own child & send him out equipped, then,— is it worthwhile that the doom should be averted, & the hand of ruin stayed, from this unhappy & so-beloved land ?

This is all very inadequate, dear Mr. Tagore. But I have used many sheets of note-paper I see— & I must draw my letter to a close.

Ever yours faithfully
Nivedita
of Ramakrishna-V.

জগদীশচন্দ্র ১৯০০ সালে লণ্ডন-প্রবাসকালে রবীন্দ্রনাথকে লিখিতেছেন (২ নভেম্বর ১৯০০)—

'তিন বৎসর পূর্ব্বে আমি তোমার নিকট একপ্রকার অপরিচিত ছিলাম। তুমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ডাকিলে। তার পর একটি একটি করিয়া তোমাদের অনেকের স্নেহবন্ধনে আবদ্ধ হইলাম। তোমাদের উৎসাহধ্বনিতে মাতৃস্বর শুনিলাম।'[১]

রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১) ও জগদীশচন্দ্রের (১৮৫৮-১৯৩৭) সৌহার্দ্যের বিষয় আলোচনাপ্রসঙ্গে জগদীশচন্দ্রের জীবনীকার প্যাট্রিক গেডিস লিখিয়াছেন[২]—

Turning now to Bose's friendships among men, foremost and greatest... has been that with the poet Rabindranath Tagore. On the occasion of Bose's return [April, 1897[৩]] from his successful visit to Europe in 1896, Tagore called to congratulate him and, not finding him at home, left on his work-table a great blossom of magnolia, as a fitting and characteristic message of regard. Since that time the two have been increasingly together, each complementing and thereby widening and deepening the other's characteristic outlook on nature and life...

রবীন্দ্র-জগদীশ-সৌহৃদ্যের এই সূচনাকালের কোনো চিহ্ন পত্রাকারে

১ প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৩৩, পৃ ৪১২

২ Patrick Geddes, *The Life and Work of Sir Jagadis C. Bose* (1920), p. 222

৩ '১৮৯৭ সালের এপ্রিল মাসে বসু মহাশয় ভারতে প্রত্যাগত হন।' —জগদানন্দ রায়, 'বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার' [১৩১৯], পৃ ৫

রক্ষিত হয় নাই; একমাত্র নিদর্শন 'কল্পনা' গ্রন্থে মুদ্রিত রবীন্দ্রনাথের 'জগদীশচন্দ্র বসু' ('বিজ্ঞানলক্ষ্মীর প্রিয় পশ্চিমমন্দিরে') কবিতা। বর্তমান গ্রন্থের সূচনায় পুনর্মুদ্রিত এই কবিতাটি মাঘ ১৩০৪ সংখ্যা প্রদীপ পত্রে 'অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসুর প্রতি' এই শিরোনামে প্রকাশিত হয়; রচনাশেষে তারিখ আছে ৪ঠা শ্রাবণ ১৩০৪ (১৯ জুলাই ১৮৯৭)।

১৮৯৯ সাল হইতে উভয়েরই অনেকগুলি পত্র রক্ষা পাইয়াছে; তন্মধ্যে রবীন্দ্রনাথের পত্রগুলি এই গ্রন্থে মুদ্রিত হইল। জগদীশচন্দ্রের অধিকাংশ চিঠি প্রবাসী পত্রে[১] প্রকাশিত হইয়াছিল; অপ্রকাশিত কয়েকখানি পত্র রবীন্দ্রসদনে আছে। উভয় পত্রগুচ্ছের সংখ্যার তুলনা করিয়া সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি চিঠি রক্ষা পায় নাই বা আবিষ্কৃত হয় নাই।

প্রবাসীতে জগদীশচন্দ্রের পত্রাবলীর প্রকাশ সমাপ্ত হইলে রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী প্রকাশিত হয়।[২]

জগদীশচন্দ্রের মৃত্যুর পর, তাঁহাকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের আরো কয়েকখানি চিঠি প্রবাসী পত্রে মুদ্রিত হইয়াছিল।[৩] এইসকল পত্র 'চিঠিপত্র' গ্রন্থের বর্তমান খণ্ডে সংকলিত হইয়াছে। জগদীশচন্দ্রের সহধর্মিণী অবলা বসু মহোদয়াকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের সাতখানি চিঠিও এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইল; উহার প্রথম ছয়খানি ইতিপূর্বে প্রবাসীতে প্রকাশিত।[৪] রবীন্দ্রনাথকে লিখিত অবলা বসু মহোদয়ার চিঠিপত্রও প্রবাসীতে মুদ্রিত হয়।[৫]

১ প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ-পৌষ, ১৩৩৩

২ প্রবাসী, মাঘ-চৈত্র, ১৩৩৩

৩ প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৪৪ - আষাঢ় ১৩৪৫

৪ প্রবাসী; চৈত্র ১৩৪৪, শ্রাবণ ১৩৪৫

৫ প্রবাসী, কার্তিক, অগ্রহায়ণ ১৩৩৩, বৈশাখ ১৩৩৪

পত্র ১। ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬। 'কতকগুলি পৌরাণিক গল্প আমার মস্তিষ্কের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে।'

এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য 'কথা' (প্রকাশ ১ মাঘ ১৩০৬— ইহার অনেকগুলি কবিতা ১৩০৬ সালের আশ্বিন হইতে অগ্রহায়ণের মধ্যে রচিত হয়) এবং 'কাহিনী' (প্রকাশ ২৪ ফাল্গুন ১৩০৬)। কথা কাব্য জগদীশচন্দ্রকে উৎসর্গীকৃত।

তুলনীয় জগদীশচন্দ্রের পত্র (২০ মে ১৮৯৯, ৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬)—

'আপনার পৌরাণিক কবিতাগুলি সর্ব্বাংশে সুন্দর হইয়াছে। এগুলি কবে সম্পূর্ণ করিবেন?·· মহাভারত হইতে আরও অনেকগুলি লিখিবেন।' [১]

জগদীশচন্দ্র কর্ণ-চরিত্রের একান্ত অনুরাগী ছিলেন। এই পত্রেই তিনি লিখিতেছেন—

'একবার কর্ণ সম্বন্ধে লিখিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। ভীষ্মের দেবচরিত্রে আমরা অভিভূত হই, কিন্তু কর্ণের দোষগুণমিশ্রিত অপরিপূর্ণ জীবনের সহিত আমাদের অনেকটা সহানুভূতি হয়। ঘটনাচক্রে যাহার জীবন পূর্ণ হইতে পারে নাই, যাহার জীবনে ক্ষুদ্রতা ও মহৎভাবের সংগ্রাম সর্ব্বদা প্রজ্বলিত ছিল, যে এক এক সময়ে মানুষ হইয়াও দেবতা

১ 'বাল্যকালে এবং পরবর্ত্তী জীবনে কোন্ কোন্ বই·· মনে ছাপ রাখিয়া গিয়াছে' এই প্রশ্নের উত্তরে জগদীশচন্দ্র ৭. ৯. ৩৩. তারিখে লিখিয়াছিলেন—

'বাল্যকালে মহাভারত পাঠ করিয়াই জীবনের আদর্শ উপলব্ধি করিয়াছিলাম। যে রীতিনীতি মহাভারতে প্রচারিত হইয়াছিল সেই নীতি যেন বর্ত্তমান কালেও জীবন্তভাবে প্রচারিত হয়। তদনুসারে যদি কেহ কোন বৃহৎ কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিতে উন্মুখ হন, তিনি যেন ফলাফল-নিরপেক্ষ হইতে পারেন। তাহা হইলে বিশ্বাস-নয়নে কোনদিন দেখিতে পাইবেন যে, বারবার পরাজিত হইয়া যে পরাঙ্মুখ হয় নাই, সেই একদিন বিজয়ী হইবে।'— বঙ্গশ্রী, আশ্বিন ১৩৪০

হইতে পারিত, এবং যাহার পরাজয় জয় অপেক্ষাও মহত্তর, তাহার দিকে মন সহজেই আকৃষ্ট হয়।'

এই বৎসরেই রবীন্দ্রনাথ "কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ" রচনা করেন (১৫ ফাল্গুন ১৩০৬)।

পত্র ২। 'সেই অর্দ্ধশ্রুত গল্পটি…আস্তে আস্তে লিখি'

এই গল্পটি 'চোখের বালি' হইলেও হইতে পারে। ২৬ শ্রাবণ ১৩০৭ তারিখে প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রে[১] 'চোখের বালি'র ('বিনোদিনী'র) যেরূপ উল্লেখ দেখা যায় তাহাতে মনে হয় ইহা দীর্ঘকাল ধরিয়া ক্রমশ লিখিত হইয়াছিল। অপর পক্ষে 'চিরকুমার সভা'ও ঐরূপে লিখিত ও ভারতী পত্রে ১৩০৭ বৈশাখ হইতে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়; তবে এই ক্ষেত্রে 'মাসিক পত্রের তাড়া' যথেষ্টই ছিল।

পত্র ৩। ১০ আষাঢ় ১৩০৬ (২৪ জুন ১৮৯৯)। 'আপনার পত্রখানি পড়িয়া আমি বিশেষ সান্ত্বনা ও আনন্দ লাভ করিয়াছি।'

দ্রষ্টব্য জগদীশচন্দ্রের পত্র, ২১ জুন ১৮৯৯ (৭ আষাঢ় ১৩০৬)—

'আপনার পত্র পাইলাম। আমাকে বন্ধুভাবে স্মরণ করিয়াছেন ইহাতে অতিশয় সুখী হইয়াছি। আপনার সুখ ও উৎফুল্লতার সময় সহভাগী করিয়া যেরূপ সুখী করেন, অন্য সময়ে স্মরণ করিলে বন্ধুতার নিদর্শন দেখি।

'আপনি যে গল্পের কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা দেখিয়া অবাক্ হইয়াছি। ইতিপূর্ব্বেই সম্পাদককে এতৎসম্বন্ধে আমার কিছু মন্তব্য লিখিব স্থির করিয়াছিলাম। তবে এরূপ বিষয়ে একান্ত উপেক্ষা করাই

১. প্রিয়নাথ সেন, প্রিয়পুষ্পাঞ্জলি, পৃ ২৮৩

সমুচিত কিনা মনে করিয়া ইতস্ততঃ করিতেছিলাম। আমি লিখিব কিন্তু অধিক importance দিতে চাহি না। আপনি অনেক উচ্চে আছেন; এসব কর্দ্দম আপনাকে স্পর্শ করিবে না।

'আমি সম্পূর্ণ বুঝিতে পারি, যাঁহারা কার্য্যে ব্রতী তাঁহারা অনেকের ভালবাসা দ্বারা উন্নীত না হইলে কার্য্য সমাধা করিতে পারেন না। ঈশ্বরানুগ্রহে আপনার ভক্তের অভাব নাই। যদি কেহ আপনার কবিতা হইতে বঞ্চিত হন, তাঁহাদিগকে করুণার পাত্র মনে করি। আর যাঁহারা আপনার লেখা হইতে জীবন নবীন ও পূর্ণতর করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের আশীর্ব্বচন কি আপনার নিকট পৌঁছে না? আমি ত কখন কখন আপনার ব্যক্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাই।... বৃহত্তর জীবন আপনার জীবনকে পরাস্ত ও অধিকার করিয়াছে।'[১]

এই প্রসঙ্গে তুলনীয়, প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র (৭ আষাঢ় ১৩০৬, ২১ জুন ১৮৯৯)—

'ক্রুদ্ধ আত্মীয়দের পত্রে সংবাদ পাইলাম যে সাহিত্যের কোন গল্পে আমাকে অত্যন্ত কুৎসিত আক্রমণ করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে যদি তোমার কোন বন্ধুকৃত্য করিবার থাকে ত করিবে।'[২]

প্রিয়নাথ সেন ও জগদীশচন্দ্রের উত্তর পাইয়া, রবীন্দ্রনাথ যেদিন জগদীশচন্দ্রকে আলোচ্য চিঠিখানি লিখিয়াছেন সেইদিন (১০ আষাঢ় ১৩০৬) প্রিয়নাথ সেনকেও লিখিতেছেন—

১ রবীন্দ্রনাথ যে পত্রে 'গল্পের কথা' উল্লেখ করিয়াছেন তাহা পাওয়া যায় নাই। ৪ আষাঢ় ১৩০৬ তারিখের পত্রেই এই গল্পের প্রসঙ্গ ছিল, প্রবাসীতে মুদ্রণকালে ঐ প্রসঙ্গ বর্জিত হইয়াছে, এরূপও হইতে পারে। মূল পত্রখানি এ ক্ষেত্রে পাওয়া যায় নাই।

২ প্রিয়নাথ সেন, প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি, পৃ ২৭৫

'আমি সাহিত্য পড়ি নাই। কিন্তু তুমি যে নিন্দুক লেখকের প্রতি এতটা ঘৃণা অনুভব করিয়াছ তাহাতে আমি সান্ত্বনা পাইলাম। তোমরা আমার হইয়া রাগ করিলে, মনে হয়, আমার আর রাগ করিবার বা দুঃখ পাইবার দরকার করে না— আমি শান্তিলাভ করি।— মন শান্ত না থাকিলে আমি কোন কাজ করিতে পারি না— সেইজন্য জীবনকে নিষ্ফলতা হইতে রক্ষা করিবার জন্য সকল প্রকার ক্ষোভের কারণ হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা করি— কিন্তু সংসারে কাঁটার উপরে পা না ফেলিলেও কাঁটা আপনি আসিয়া পায়ে ফোটে ; — দুঃখ বেদনার পূর্ণ অংশ হইতে বঞ্চিত হইবার উপায় নাই— আছে নিজের মনে— তাহার সাধনা মাঝে মাঝে অবলম্বন করি, কিন্তু তাহার সিদ্ধি বহুদূরে।'[১]

জগদীশচন্দ্রের চিঠি উল্লেখ করিয়া ঐ পত্রেই লিখিতেছেন—

'ডাক্তার জগদীশ বসু লেখকের কাপুরুষতার প্রতি ঘৃণা এবং আমার প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিয়া একখানি সুন্দর পত্র লিখিয়াছেন— তোমার এবং তাঁহার এই পত্রে আমি মনের মধ্যে বিশেষ বল লাভ করিয়াছি ;— বন্ধুহৃদয়ের সমবেদনা আমার পক্ষে বৃষ্টিধারার মত— তাহা আমার সফলতা লাভের এক প্রধান সহায়।'

পত্র ৩। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমারের সহিত রবীন্দ্রনাথের বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল ; ইহার ইতিহাসচর্চায় রবীন্দ্রনাথ যে প্রেরণা সঞ্চার করেন 'ইতিহাস' গ্রন্থে তাহার প্রভূত নিদর্শন সংকলিত আছে। অক্ষয়কুমার রেশমশিল্পে বিশেষজ্ঞ এবং দেশে ঐ শিল্পের প্রতিষ্ঠাকল্পে উদ্‌যোগী ছিলেন—

১ প্রিয়নাথ সেন, প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি, পৃ ২৭৫-৭৬

রবীন্দ্রনাথের সহিত এ বিষয়েও তাঁহার আলোচনা চলিত।[১] অক্ষয়কুমার রাজসাহী শিল্পবিদ্যালয়ের একজন প্রধান উদ্‌যোক্তা ছিলেন, এই বিদ্যালয় হইতে রেশমের কাপড় কিনিয়া রবীন্দ্রনাথ নিজে ব্যবহার করিতেন, বন্ধুদেরও উপহার দিতেন— 'বন্ধুদের নিকট আমার এই সকল বস্ত্র উপহার কেবল আমার উপহার নহে তাহা স্বদেশের উপহার।'[২]

রবীন্দ্রনাথও এই সময় পল্লীর উন্নতিকল্পে নানা কল্পনায় ও পরীক্ষায় উৎসুক, সেই সূত্রেই 'রেশমের গুটি'র অভ্যাগম।

পত্র ৩। লরেন্স্।

শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের পুত্রকন্যাদের গৃহশিক্ষক[৩], পরে শান্তিনিকেতনেও অধ্যাপক ছিলেন। 'এক পাগলা মেজাজের চালচুলোহীন ইংরেজ শিক্ষক হঠাৎ গেল জুটে। তার পড়াবার কায়দা খুবই ভালো, আরো ভালো এই যে কাজে ফাঁকি দেওয়া তার ধাতে ছিল না।'[৪]

রেশমের চাষ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আরও বলেন—

'লরেন্সকে পেয়ে বসল রেশমের চাষের নেশায়। শিলাইদহের

১ রবীন্দ্রনাথকে লিখিত অক্ষয়কুমারের পত্র, ৯ সেপ্টেম্বর ১৮৯৮, বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৩, পৃ ২৬৭

২ মহিমচন্দ্র ঠাকুরকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র, ৩০ চৈত্র ১৩০৫। রবীন্দ্রস্মৃতি পূর্ব্বাশা [১৩৪৮], পৃ ১০৭

৩ 'আমাদের শান্তিনিকেতনের বোর্ডিং বিদ্যালয়ে রথীকে পড়াইব, সেইজন্য লরেন্সকে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বিদায় দিতে হইতেছে। যদি তোমাদের আগরতলায় ঠাকুরদের স্কুলে তাহাকে ইংরাজি অধ্যাপক নিযুক্ত কর তবে তোমাদেরও উপকার তাহারও উপকার। এরূপ সুযোগ আর পাইবে না। লরেন্স পড়াইবার বিদ্যা যেমন জানে এমন অল্প লোককেই দেখিয়াছি। ও আমাকে এখনও ছাড়িতে চায় না কিন্তু উপায় দেখি না।... ১৮ই ভাদ্র ১৩০৮' —মহিমচন্দ্র ঠাকুরকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র, রবীন্দ্রস্মৃতি পূর্ব্বাশা', পৃ ১০৮

৪ রবীন্দ্রনাথ, আশ্রমের রূপ ও বিকাশ, ৭ পৌষ ১৩৫৮ সংস্করণ, পৃ ৪০

নিকটবর্তী কুমারখালি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে রেশম-ব্যবসায়ের একটা প্রধান আড্ডা ছিল। সেখানকার রেশমের বিশিষ্টতা খ্যাতিলাভ করেছিল বিদেশী হাটে। সেখানে ছিল রেশমের মস্ত বড়ো কুঠি। একদা রেশমের তাঁত বন্ধ হল সমস্ত বাংলা দেশে, পূর্বস্মৃতির স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে কুঠি রইল শূন্য পড়ে। যখন পিতৃঋণের প্রকাণ্ড বোঝা আমার পিতার সংসার চেপে ধরল বোধ করি তারই কোনো এক সময়ে তিনি রেলওয়ে কোম্পানিকে এই কুঠি বিক্রি করেন।...

'লরেন্সের কানে গেল রেশমের সেই ইতিবৃত্ত। ওর মনে লাগল, আর একবার সেই চেষ্টার প্রবর্তন করলে ফল পাওয়া যেতে পারে; ...চিঠি লিখে যথারীতি বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে সে খবর আনালে। কীটদের আহার জোগাবার জন্যে প্রয়োজন ভেরেণ্ডা গাছের। তাড়াতাড়ি জন্মানো গেল কিছু গাছ কিন্তু লরেন্সের সবুর সইল না। রাজশাহি থেকে গুটি আনিয়ে পালনে প্রবৃত্ত হল অচিরাৎ। প্রথমত বিশেষজ্ঞদের কথাকে বেদবাক্য বলে মানলে না, নিজের মতে নতুন পরীক্ষা করতে করতে চলল। কীটগুলোর ক্ষুদে ক্ষুদে মুখ, ক্ষুদে ক্ষুদে গ্রাস, কিন্তু ক্ষুধার অবসান নেই। তাদের বংশবৃদ্ধি হতে লাগল খাদ্যের পরিমিত আয়োজনকে লঙ্ঘন করে। গাড়ি করে দূর দূর থেকে অনবরত পাতার জোগান চলল। লরেন্সের বিছানাপত্র, তার চৌকি টেবিল, খাতা বই, তার টুপি পকেট কোর্তা— সর্বত্রই হল গুটির জনতা। তার ঘর দুর্গম হয়ে উঠল দুর্গন্ধের ঘন আবেষ্টনে। প্রচুর ব্যয় ও অক্লান্ত অধ্যবসায়ের পর মাল জমল বিস্তর, বিশেষজ্ঞেরা বললেন অতি উৎকৃষ্ট, এ জাতের রেশমের এমন সাদা রঙ হয় না। প্রত্যক্ষ দেখতে পাওয়া গেল সফলতার রূপ— কেবল একটুখানি ত্রুটি রয়ে গেল। লরেন্স বাজার যাচাই করে

জানলে তখনকার দিনে এ মালের কাটতি অল্প, তার দাম সামান্য। বন্ধ হল ভেরেণ্ডা পাতার অনবরত গাড়ি-চলাচল, অনেকদিন পড়ে রইল ছালাভরা গুটিগুলো; তার পরে তাদের কী ঘটল তার কোনো হিসেব আজ কোথাও নেই। সেদিন বাংলাদেশে এই গুটিগুলোর উৎপত্তি হল অসময়ে।'[১]

দেশীয় শিল্পের পুনঃপ্রবর্তনের এই চেষ্টায় "প্রচুর ব্যয় ও অক্লান্ত অধ্যবসায়" রবীন্দ্রনাথের পক্ষ হইতে কী পরিমাণ যুক্ত হইয়াছিল তাহার কথা এই বিবরণে উল্লিখিত হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথকে লিখিত জগদীশচন্দ্রের ২৫ এপ্রিল ১৮৯৯ তারিখের পত্রে দেখা যায়, তিনিও, সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথের উৎসাহেই, এই সময় রেশমের কীট -পালনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

পত্র ৩। 'চাষ-বাসের কাজ।'

এই পত্র লিখিবার কিছুকাল পূর্ব হইতে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে পৈতৃক জমিদারিতে বাস করিতেছিলেন। ইহারও পূর্বে, জমিদারি-পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়া, 'দুঃখপীড়িত অটলবিশ্বাসপরায়ণ অনুরক্ত প্রজাদের' 'যেন আমার একটি দেশজোড়া বৃহৎ পরিবারের লোক' বলিয়া তিনি অনুভব করিতেছিলেন, 'এই সমস্ত নিঃসহায় নিরুপায় নিতান্তনির্ভর-পর সরল চাষাভুষোদের' অক্ষম অবস্থা তাঁহার মনকে আন্দোলিত করিতেছিল।[১] —রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল ধরিয়া বারংবার বিফলকাম

১ পূর্বোক্ত— আশ্রমের রূপ ও বিকাশ, পৃ ৪১-৪৩।

১ ছিন্নপত্র গ্রন্থে ২১ আগস্ট ১৮৯৩ তারিখের পত্র। অপিচ ১০ মে ১৮৯৩ তারিখের পত্রে দ্রষ্টব্য—

'আমার এই দরিদ্র চাষী প্রজাগুলোকে দেখ্‌লে আমার ভারি মায়া করে, এরা যেন বিধাতার শিশুসন্তানের মত নিরুপায়। তিনি এদের মুখে নিজের হাতে কিছু তুলে না

হইয়াও পল্লীমঙ্গলের যে উদ্‌যোগ ও আয়োজন করিয়াছেন আলোচ্য সময়ে 'চাষ-বাসের কাজ' তাহার একরূপ সূচনা বলা যাইতে পারে—

'শিলাইদহে কুঠিবাড়ির চার দিকে যে জমি ছিল প্রজাদের মধ্যে নতুন ফসল প্রচারের উদ্দেশ্যে সেখানে নানা পরীক্ষায় লেগেছিলেম। এই পরীক্ষাব্যাপারে সরকারি কৃষিবিভাগের বিশেষজ্ঞদের সহায়তা অত্যধিক পরিমাণেই মিলেছিল। তাঁদের আদিষ্ট উপাদানের তালিকা দেখে চিচেস্‌টরে যারা এগ্রিকালচারাল্‌ কলেজে পাশ করে নি এমন-সব চাষিরা হেসেছিল; তাদেরই হাসিটা টিঁকেছিল শেষ পর্যন্ত। মরার লক্ষণ আসন্ন হলেও শ্রদ্ধাবান রোগীরা যেমন করে চিকিৎসকের সমস্ত উপদেশ অক্ষুণ্ণ রেখে পালন করে, পঞ্চাশ বিঘে জমিতে আলু চাষের পরীক্ষায় সরকারি কৃষিতত্ত্বপ্রবীণদের নির্দেশ সেইরকম একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গেই পালন করেছি। তাঁরাও ··· পরিদর্শনকার্যে সর্বদাই যাতায়াত করেছেন। তারই বহুব্যয়সাধ্য ব্যর্থতার প্রহসন নিয়ে বন্ধুবর জগদীশচন্দ্র আজও প্রায় মাঝে মাঝে হেসে থাকেন।'[১]

পত্র ৩। দ্বিজেন্দ্রলালবাবু— দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের সুহৃৎশ্রেণীর অন্তর্গত ছিলেন; ১৩০৪ সালে (১৮৯৭) তিনি তাঁহার 'বিরহ' নাটিকা 'কবিবর শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের করকমলে' এইভাবে উৎসর্গ করেন— 'বন্ধুবর! আপনি আমার রহস্যগীতির

দিলে এদের আর গতি নেই।··· সোশিয়ালিষ্টরা যে সমস্ত পৃথিবীময় ধনবিভাগ করে দেয় সেটা সম্ভব কি অসম্ভব ঠিক জানি নে—যদি একেবারেই অসম্ভব হয় তাহলে বিধির বিধান বড় নিষ্ঠুর, মানুষ ভারি হতভাগা। কেননা পৃথিবীতে যদি দুঃখ থাকে তো থাক্‌ কিন্তু তার মধ্যে এতটুকু একটু ছিদ্র একটু সম্ভাবনা রেখে দেওয়া উচিত যাতে সেই দুঃখমোচনের জন্যে মানুষের উন্নত অংশ অবিশ্রাম চেষ্টা করতে পারে, একটা আশা পোষণ করতে পারে।'

১ পূর্বোক্ত— আশ্রমের রূপ ও বিকাশ, পৃ ৩৯-৪০

পক্ষপাতী। তাই রহস্যগীতিপূর্ণ এই নাটিকাখানি আপনার করে অর্পিত হইল'। রবীন্দ্রনাথ এই কালে দ্বিজেন্দ্রলালের নিম্নোক্ত কাব্যগ্রন্থগুলির প্রশস্তি রচনা করেন— আর্যগাথা, দ্বিতীয় ভাগ (১৮৯৩), ১৩০১ অগ্রহায়ণ সাধনা পত্রে; আষাঢ়ে (১৮৯৯), ১৩০৫ অগ্রহায়ণ ভারতী পত্রে; এবং মন্দ্র (১৯০২), ১৩০৯ কার্তিক বঙ্গদর্শন পত্রে। এই রচনাগুলি রবীন্দ্রনাথের 'আধুনিক সাহিত্য' গ্রন্থে মুদ্রিত আছে। রবীন্দ্রনাথ সাধনা-সম্পাদকরূপে 'সাময়িক সাহিত্য' বিভাগেও, মাসিক পত্রে প্রকাশিত দ্বিজেন্দ্রলালের কোনো কোনো রচনার ভূয়সী প্রশংসা করেন। উভয়ের মধ্যে বিরোধের প্রকাশ্য সূচনা 'বঙ্গভাষার লেখক' (১৩১১) গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের আত্মপরিচয় প্রকাশের পর। এই সৌহৃদ্য ও বিচ্ছেদের বিবরণ দেবকুমার রায় চৌধুরী -প্রণীত দ্বিজেন্দ্রলাল গ্রন্থে ও শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় -লিখিত রবীন্দ্রজীবনী গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

'শস্যক্ষেত্র পর্য্যবেক্ষণ' প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, দ্বিজেন্দ্রলাল বিলাত হইতে কৃষিবিদ্যায় পারদর্শী হইয়া আসিয়াছিলেন।

পত্র ৪। এই পত্রে সাল লিখিত নাই, তারিখ ও মাস (১ আশ্বিন) উল্লিখিত আছে; ১৩০৭ সালে লিখিত বলিয়া অনুমিত। এই পত্রে লোকেন্দ্রনাথ পালিত -কৃত ওমর খৈয়ামের একটি রুবাই'এর অনুবাদ উদ্ধৃত হইয়াছে; উহা ১৩০৮ বৈশাখ সংখ্যা ভারতীতে মুদ্রিত হয়, রচনার তারিখ দেওয়া আছে ভাদ্র ১৩০৭।

১৯০০ সালে প্যারিস প্রদর্শনীতে অনুষ্ঠিত ইন্‌টারন্যাশন্যাল কংগ্রেস অব ফিজিসিস্ট্‌স্'এ আমন্ত্রিত হইয়া জগদীশচন্দ্র বাংলা ও ভারত সরকারের প্রতিনিধিরূপে তাহাতে যোগ দেন (আগস্ট্ মাসে) ও Response of Inorganic and Living Matter সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ

করেন।[১] তথা হইতে লণ্ডনে গিয়া জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে যে চিঠি লেখেন (৩১ আগস্ট ১৯০০) তাহাতে তাঁহার নবাবিষ্কৃত তত্ত্ব সম্বন্ধে প্যারিস ও লণ্ডনের বিজ্ঞানীদের মনোভাবের বিবরণ দিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথের চিঠিখানি সম্ভবতঃ জগদীশচন্দ্রের এই পত্রের উত্তরেই লিখিত—

'একদিন [প্যারিস] Congressএর President হঠাৎ আমাকে বলিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। আমি কিছু কিছু বলিয়াছিলাম। তাহাতে অনেকে অতিশয় আশ্চর্য্য হইলেন। তারপর Congressএর Secretary… আমার সহিত দেখা করিতে আইসেন, এবং আমার কাজ লইয়া discussion করেন। এক ঘণ্টা পর হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—But, monsieur, this is very beautiful (butএর অর্থ আমি প্রথমে বিশ্বাস করি নাই।) তারপর আরও তিন দিন এ-সম্বন্ধে আলোচনা হয়, প্রত্যহই more and more excited— শেষদিন আর নিজকে সম্বরণ করিতে পারিলেন না। Congressএর অন্যান্য Secretary এবং Presidentএর নিকট অনর্গল ফরাসী ভাষায় আমার কার্য্য-সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন।…

'এই গেল প্যারিসের পালা। তাহার পর লণ্ডনে আসিয়াছি। এখানে একজন physiologist আমার কার্য্যের জনরব শুনিয়াই বলিলেন, যে, কখনও হইতে পারে না, there is nothing common between the living and non-living। আর একজন বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে ৪ ঘণ্টা কথা হইয়াছিল। প্রথম ঘণ্টায় ভয়ানক বাদানুবাদ, তারপর কথা না বলিয়া কেবল শুনিতেছিলেন, এবং ক্রমাগত বলিতেছিলেন, this is magic! this is magic! তারপর বলিলেন, এখন তাঁহার

১ গেডিস, পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ ৮৮

নিকট সমস্তই নূতন, সমস্তই আলোক। আরও বলিলেন, এইসব সময়ে accepted হইবে; এখন অনেক বাধা আছে। আমার theory পূর্ব্ব সংস্কারের সম্পূর্ণ বিরোধী, সুতরাং কোন-কোন physicists, কোন-কোন chemists এবং অধিকাংশ physiologists আমার মতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবেন। কোন-কোন মহামান্য বৈজ্ঞানিকের theory আমার মত গ্রাহ্য হইলে মিথ্যা হইবে। সুতরাং তাঁহারা বিশেষ প্রতিবাদ করিবেন। এবার সপ্তরথীর হস্তে অভিমন্যু বধ হইবে; আপনারা আমোদ দেখিবেন…

'কিন্তু আপনাদের প্রতিনিধি রণে পৃষ্ঠভঙ্গ দিবে না। সে মনশ্চক্ষুতে দেখিবে, যে, তাহার উপর অনেক স্নেহদৃষ্টি আপাততঃ রহিয়াছে।'

পত্র ৪। 'লর্ড রবার্টসের মত… প্রিটোরিয়ায় ক্রিষ্ট্মাস করতে পারবেন।'

১৮৯৯ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় বোয়ারদের সঙ্গে ইংরেজের যুদ্ধ বাধে; ইংরেজ সেনাপতি লর্ড রবার্ট্‌স্‌ বিশাল বাহিনী লইয়া রাজধানী প্রিটোরিয়ার দিকে অগ্রসর হইলেন। ১৯০০ সালের ৫ জুন প্রিটোরিয়া অধিকৃত হয়।

পত্র ৪। 'আপনি 'ক' বিন্দুতে কম্পমান, আমি 'খ' বিন্দুতে দিব্য নিশ্চেষ্ট'

জগদীশচন্দ্রের যে পত্রের (৩১ আগস্ট ১৯০০) উত্তরে রবীন্দ্রনাথের এই চিঠি, তাহাতে জগদীশচন্দ্র তাঁহার আবিষ্কার -প্রসঙ্গে কোনো বিজ্ঞানীর মন্তব্য উদ্ধৃত করেন 'এত Surprise একেবারে লোকে মনে ধারণা করিতে পারিবে না— it is

human nature, A বিন্দু পর্য্যন্ত উঠিতে পারে, তারপর হঠাৎ মন ভাঙিয়া B বিন্দুতে নামিয়া যায়'— এই পতন-অভ্যুদয় জগদীশচন্দ্র চিঠিতে চিত্রিত করিয়াও দেখাইয়াছিলেন। তাহারই অনুবর্তনে রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন যে, জগদীশচন্দ্র বিদেশে উদ্যম-উদ্দীপনার উচ্চবিন্দুতে, রবীন্দ্রনাথ পল্লীগ্রামে 'নিশ্চেষ্ট'তার নিম্নবিন্দুতে।

পত্র ৪। 'Sketch Book নিয়ে ব'সে ব'সে ছবি আঁক্‌চি।'

রবীন্দ্রনাথ চিত্রচর্চায় মনোনিবেশ করেন প্রাচীন বয়সে (১৩৩৫); কিন্তু প্রথমজীবনেও চিত্রবিদ্যার অনুরাগী ছিলেন, একান্তে কখনো কখনো এ বিষয়ে চর্চাও করিয়াছেন। আলোচ্য পত্র লিখিবার সাত বৎসর পূর্বে শ্রীমতী ইন্দিরাদেবীকে লিখিতেছেন—

'আমি বাস্তবিক ভেবে পাইনে কোন্‌টা আমার আসল কাজ।... লজ্জার মাথা খেয়ে সত্যিকথা যদি বল্‌তে হয় তবে এটা স্বীকার করতে হয় যে, ঐ যে চিত্রবিদ্যা বলে একটা বিদ্যা আছে তার প্রতিও আমি সর্ব্বদা হতাশ প্রণয়ের লুব্ধ দৃষ্টিপাত করে থাকি— কিন্তু আর পাবার আশা নেই, সাধনা করবার বয়স চলে গেছে। অন্যান্য বিদ্যার মত তাঁকেও সহজে পাবার জো নেই— তাঁর একেবারে ধনুকভাঙা পণ— তুলি টেনে টেনে একেবারে হয়রান্ না হলে তাঁর প্রসন্নতা লাভ করা যায় না।' ছিন্নপত্র, ৩০ আষাঢ় ১৮৯৩ [১৩০০]

ইহারও পূর্বে চিত্রচর্চার উল্লেখ পাওয়া যায় জীবনস্মৃতি গ্রন্থে 'বর্ষা ও শরৎ' অধ্যায়ে—

'মনে পড়ে, দুপুরবেলায় জাজিম-বিছানো কোণের ঘরে একটা ছবি আঁকার খাতা লইয়া ছবি আঁকিতেছি। সে যে চিত্রকলার কঠোর সাধনা তাহা নহে— সে কেবল ছবি আঁকার ইচ্ছাটাকে লইয়া আপন-

মনে খেলা করা। যেটুকু মনের মধ্যে থাকিয়া গেল, কিছুমাত্র আঁকা গেল না, সেইটুকুই ছিল তাহার প্রধান অংশ।'

এই প্রসঙ্গে উল্লিখিত গানগুলির প্রকাশ-তারিখ হইতে মনে হয় যে, সম্ভব ইহা ১৮৮৫ (১২৯২) বা তাহার কাছাকাছি সময়ের কথা।

পত্র ৪। 'আপনি আমাকে একটি ভ্রমণ-সঙ্গ-দানে প্রতিশ্রুত'

এই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয় চার বৎসর পরে। ১৯০৪ সালের অক্টোবর মাসে রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্র সুহৃদ্‌বর্গসহ বুদ্ধগয়া যান। ভগিনী নিবেদিতাও এই সঙ্গে ছিলেন, তাঁহার স্মৃতি-আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় ("Sister Nivedita as I knew her", Hindusthan Standard, Puja Annual, 1952) এই ভ্রমণের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত দিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্‌ধৃত হইল—

Early in the month of October, 1904, Nivedita, Dr. Jagadish C. Bose, Rabindranath Tagore, Swami Sadanand (Gupta Maharaj), Brahmachari Amulya (now Swami Shankaranand) went to pass a week at Bodh Gaya. I was invited and joined them from Patna. We were lodged in the *mahant's* guest-house.

There were daily readings from Warren's *Buddhism in Translations* and occasionally Edwin Arnold's *Light of Asia* ; some songs and recitations by the Poet, too. In the daytime we strolled through the temple enclosure, or visited the neighbouring villages. In the evening twilight we went to the Bodhi tree and sat in the gloom in silent meditation. There we found a remarkable character. Fuji, a poor Japanese fisherman had

by hard austerity for many years, saved money to gratify his life's dream of making a pilgrimage to the spot where the Blessed One had attained to Enlightenment. He had at last come here and lived frugally in a room of the pilgrim house. Every evening he would come and sit under the Bodhi Tree praying and chanting the hymn—

Namo namo Buddha Divakaraya,
Namo namo Gotama-Chandimaya,
Namo namo Nanta-Gunannabaya,
Namo namo Sakya-Nandanaya.

In the silence and gloaming the Sanskrit (Prakrit) words uttered with a Japanese accent, rose like the tolling of a low bell, which made us feel as if overpowered by the spirit of the place. Words were not uttered ; it was beyond speech.

It interests me to think that Rabindranath remembered this hymn,[১] and when he wrote his play *Natir Puja* he took care to insert it as Shrimati's prayer. Fuji had given the hint.

পত্র ৪। 'লোকেন আমার যে কাব্য-চয়ন প্রকাশে প্রবৃত্ত ছিল… নিজেই এ কাজে হাত দিতে পারি।'

সম্ভবতঃ লোকেন্দ্রনাথের উদ্যোগ কার্যে পরিণত হয় নাই, এই কাব্য-

১ এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, এই জাপানী ভক্তের কথা রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল পরেও স্মরণ করিয়াছেন, ১৩৪২ বৈশাখী পূর্ণিমায় কলিকাতা শ্রীধর্মরাজিক চৈত্যবিহারে বুদ্ধদেবের জন্মোৎসবে সভাপতির অভিভাষণে। দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথ -প্রণীত বুদ্ধদেব (জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৩) পৃ ২-৩

চয়ন প্রকাশিত হয় নাই ; 'চয়নিকা' প্রকাশিত হয় অনেক পরে (১৯০৯), কবির তরুণ অনুরাগীগণ, অজিতকুমার চক্রবর্তী, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সম্ভবত এ বিষয়ে উদ্‌যোগী ছিলেন। সম্প্রতি একখানি 'কাব্য-গ্রন্থে' (১৮৯৬) কবির হাতের নানা সম্পাদনা লক্ষ্য করিয়াও মনে হয়, তিনি 'নিজেই এ কাজে হাত' দিয়াছিলেন, যদিও তাহা সমাধা হয় নাই। এই সম্পর্কে ৬-সংখ্যক পত্রও দ্রষ্টব্য।

পত্র ৪। 'আর্যা।' তুলনীয় রবীন্দ্রনাথকে লিখিত জগদীশচন্দ্রের ২৫ এপ্রিল ১৮৯৯ তারিখের চিঠি— 'Mrs কথাটা বাংলাতে অতি বীভৎসজনক। আপনি একটি নূতন কথা বাহির করিবেন।'

পত্র ৪। 'শ্যালকজায়া আর্যা সরলা' সতীশরঞ্জন দাসের পত্নী সরলতা।

পত্র ৪। 'শিক্ষা-প্রণালীটি আমার রচিত।··· আমার পদ্ধতি মতে যদি তিনি সংস্কৃত শেখেন তা'হলে এক বৎসরের মধ্যেই তাঁর সংস্কৃত ভাষায় অধিকার জন্মাবে।'—

'ভাষার সহিত কিছুমাত্র পরিচয় হইবার পূর্ব্বেই শিশুদিগকে তাহার ব্যাকরণ শিখাইতে আরম্ভ করা, ভাষা শিক্ষার সদুপায় বলিয়া আমি গণ্য করি না।

'এইজন্য আমার গৃহে বালকবালিকাদিগকে যখন সংস্কৃত শিখাইবার সময় উপস্থিত হইল, তখন আর কোনো সুবিধা না দেখিয়া নিজে একটা সংস্কৃত পাঠ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম।

'তাহাতে গোড়া হইতে প্রয়োগ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই ভাষা শিক্ষা ও ভাষার সহিত পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ ব্যাকরণ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।' — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সম্পাদকের নিবেদন', [শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় -প্রণীত] সংস্কৃত প্রবেশ, প্রথম ভাগ।

রবীন্দ্রনাথ-প্রণীত 'সংস্কৃত পাঠ', দুই খণ্ডে, ১৮৯৬ সালে 'সংস্কৃত শিক্ষা' নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথম খণ্ড পাওয়া যায় নাই, দ্বিতীয় খণ্ড রবীন্দ্র-রচনাবলীতে (অচলিতসংগ্রহ দ্বিতীয় খণ্ডে) পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

পত্র ৪। 'আপনার জন্যে পুরীর জমীটি'

পুরীতে রবীন্দ্রনাথের 'জমি ও গোটাকতক ঘর' ছিল। জগদীশচন্দ্রকে এই জমি রবীন্দ্রনাথ দিতে চাহিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে লিখিতেছেন (১৮ আগস্ট ১৯০৩)—

'তুমি যে পুরীর জায়গা আমাকে দিতে চাহিয়াছ! তুমি কি মনে কর আমার কোন স্থানের উপর কোনমাত্র টান আছে? কেবল একসময় মনে করিয়াছিলাম যে, দুজনে একটি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া মাঝে মাঝে যাইয়া থাকিব।··· তুমি যদি এরূপ নিরাসক্ত হও, আর তুমি যদি পুরীতে সঙ্গী না হও, আমার পক্ষে ওরূপ নির্জ্জনবাস অসহ্য হইবে।'

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের ঋণমোচনের জন্য অবশেষে তাহা বিক্রয় করিয়া দিতে হয়।[১] এই প্রসঙ্গে শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ তাঁহার 'রবীন্দ্রনাথ' (১৩৪৮) গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের একখানি চিঠি উদ্ধৃত করিয়াছেন—

'বিদ্যালয়ের fund হইতে এই বাড়িটা করিয়া দিলে কিরূপ হয়? তা যদি না হয় তবে সেখানকার ইংরাজ ম্যাজিস্ট্রেট বলিতেছিলেন ··· পুরীতে জমি কিনিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক। যদি হাজার তিন চার টাকা পাওয়া যায়, তবে তাঁহাকে বেচিয়া ঐ টাকা বিদ্যালয়ে জমা করা যাইতে পারে। তুমি কাহাকে দিয়া ··· নিকট যাচাই করিতে পার?'

১ 'সমুদ্রতীরবাসের লোভে পুরীতে একটা বাড়ি করেছিলুম। সে বাড়ি একদিনও ভোগ করবার পূর্বে আশ্রমের ক্ষুধার দাবিতে বিক্রি হয়ে গেল।' —আশ্রমের রূপ ও বিকাশ, পৃ ৬৭

পুরী এক সময় রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়া থাকিবে; জগদীশচন্দ্রকেও পুরীতে সঙ্গীরূপে পাইবার জন্য তাঁহাকে এখানে গৃহ-নির্মাণে তিনি উৎসাহিত করেন। জগদীশচন্দ্র এক চিঠিতে (২১ জুন ১৯০০) রবীন্দ্রনাথকে লিখিয়াছিলেন—

'পুরীর বর্ণনা শুনিয়া আমার মন সেখানে আছে। সমুদ্রগর্জ্জন ও বাতাস ও ঢেউ আমাকে ঘেরিয়া আছে। এই সংকীর্ণ নগর ত্যাগ করিয়া প্রকৃতির মধ্যে নিজকে হারাইতে চাহি।'[১]

পত্র ৫। 'সীজার যে নৌকায় চড়েন সে নৌকা কি কখনও ডুবিতে পারে?'

একাধিক পত্রে রবীন্দ্রনাথ বিদেশের বিজ্ঞানীসমাজে জগদীশচন্দ্রের প্রতিষ্ঠা-অর্জন প্রসঙ্গে সীজারের কীর্তির উল্লেখ করিয়াছেন, ২০-সংখ্যক পত্রেও লিখিয়াছেন 'সীজারের নৌকা কখন ডুবে না'। সীজারের বিজয়-যাত্রা সম্বন্ধে যেরূপ নানা অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত, 'উষ্ণমণ্ডলবাসী' জগদীশচন্দ্রের জয়বার্তাও সেকালে সেইরূপ অলোকসামান্য বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল— 'ঈশ্বর তোমার ললাটে বিজয়-তিলক অঙ্কিত করিয়া তোমাকে পৃথিবীতে পাঠাইয়া দিয়াছেন', 'ভারতবর্ষের অশ্বমেধের ঘোড়া তোমার হাতে আছে।' 'সীজারের নৌকা' প্রসঙ্গে বোধ করি নিম্নলিখিত কাহিনীটি রবীন্দ্রনাথের মনে জাগিতেছিল[১]—

At Apollonia, since the force which he had with him was not a match for the enemy and the delay of his troops on the other side caused him perplexity and distress, Caesar conceived the dangerous plan of embarking in a twelve-oared boat, without any

১ ইংরেজি উদ্‌ধৃতি শ্রীযুক্ত শ্রীচন্দ্র সেনের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

one's knowledge, and going over to Brundisium, though the sea was encompassed by such large armaments of the enemy. At night, accordingly, after disguising himself in the dress of a slave he went on board, threw himself down as one of no account, and kept quiet. While the river, Aous was carrying the boat down towards the sea, the early morning breeze, which at that time usually made the mouth of the river calm by driving back the waves, was quelled by a strong wind which blew from the sea during the night; and the river therefore chafed against the inflow of the sea and the opposition of the billows, and was rough, being beaten back with a great din and violent eddies, so that it was impossible for the master of the boat to force his way along. He therefore ordered the sailors to come about in order to retrace his course. But Caesar, perceiving this, disclosed himself, took the master of the boat by the hand, who was terrified at sight of him, and said: "Come, good man, *be bold and fear naught; thou carryest Caesar and Caesar's fortune in thy boat.*" The sailors forgot the storm and laying to their oars, tried with all alacrity to force their way down the river...

পত্র ৫। 'আমার সমস্ত ছোটগল্প একত্র ছাপিতে প্রবৃত্তি হইয়াছে।'

ইহাই প্রথমসংস্করণ গল্পগুচ্ছ, দুই খণ্ডে প্রকাশিত; প্রথম খণ্ড ১ আশ্বিন ১৩০৭ (বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকা-অনুযায়ী ১১ অক্টোবর ১৯০০) তারিখে এবং দ্বিতীয় খণ্ড ১৩০৭ [১৯০১] সালে প্রকাশিত।

পত্র ৫। 'আপনার প্রস্তাব উপলক্ষ্যে'

জগদীশচন্দ্র পাশ্চাত্ত্য দেশে রবীন্দ্রনাথের রচনার প্রচারে উদযোগী হইলেও সে চেষ্টা তখন সার্থক হয় নাই। ১৯০০ সালের ২ নভেম্বর তারিখে লণ্ডন হইতে জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে লিখিতেছেন—

'এখন তোমার বিষয়ে দু-একটি কথা লিখিব। তুমি যে cutting পাঠাইয়াছ, তাহাতে আমি একটুও সন্তুষ্ট হই নাই। তুমি পল্লীগ্রামে লুক্কায়িত থাকিবে, আমি তাহা হইতে দিব না। তুমি তোমার কবিতাগুলি কেন এরূপ ভাষায় লিখ যাহাতে অন্য কোন ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব? কিন্তু তোমার গল্পগুলি আমি এদেশে প্রকাশ করিব। লোকে তাহা হইলে কতক বুঝিতে পারিবে। আর ভাবিয়া দেখিও, তুমি সার্ব্বভৌমিক। এদেশের অনেকের সহিত তোমার লেখা লইয়া কথা হইয়াছিল। একজনের সহিত কথা আছে (শীঘ্রই তিনি চলিয়া যাইবেন) যদি তোমার গল্প ইতিমধ্যে আসে তবে তাহা প্রকাশ করিব। Mrs Knightকে অন্য একটি দিব। প্রথমোক্ত বন্ধুর দ্বারা লিখাইতে পারিলে অতি সুন্দর হইবে। তারপর লোকেনকে ধরিয়া translate করাইতে পার না? আমি তাহাকে অনেক অনুনয় করিয়া লিখিয়াছি।'

জগদীশচন্দ্র পুনরায় এ বিষয়ে ১৯০০ সালের ২৩ নভেম্বর তারিখে লিখিতেছেন—

'তোমার পুস্তকের জন্য আমি অনেক মতলব করিয়াছি। তোমাকে যশোমণ্ডিত দেখিতে চাই। তুমি পল্লীগ্রামে আর থাকিতে পারিবে না। তোমার লেখা তরজমা করিয়া এদেশীয় বন্ধুদিগকে শুনাইয়া থাকি, তাঁহারা অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন না। তবে কি করিয়া publish করিতে হইবে, এখনও জানি না। publisherরা ফাঁকি দিতে চায়।

সে যাহা হউক, তোমার ভাগে কেবল glory, লাভালাভের ভাগ্য আমার। যদি কিছু লাভ হয়, তাহার অর্দ্ধেক তরজমাকারীর, আর অর্দ্ধেক কোন সদনুষ্ঠানের। ইহাতে তোমার আপত্তি আছে কি ?[১] আমি অনেক castles in the air প্রস্তুত করিতেছি।

'এবার যদি তোমার নাম প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি, তাহা হইলেই যথেষ্ট মনে করিব। ৬টি গল্প বাহির করিতে চাই। শীঘ্র তোমার অন্যান্য গল্প পাঠাইবে। Mrs. Knightকে দেই নাই।'

১৯০১, ১৬ জানুয়ারি তারিখে জগদীশচন্দ্র লিখিতেছেন—

'তোমার গল্পের পুস্তক ২য় খণ্ড কবে পাইব ? প্রথম খণ্ড হইতে ৬টি গল্প তর্জমা হইয়াছে। ভাষার সৌন্দর্য্য ইংরাজীতে রক্ষা করা অসম্ভব। কি করিব বল ? তবে গল্পের সৌন্দর্য্য ত আছে। এখন নরওয়ে সুইডেন ইটালী দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প এদেশে আগ্রহের সহিত পঠিত হয়, সে-সবের সঙ্গে তুলনার জন্য তোমার লেখা বাহির করিতে চাই। এদেশে এমন লোক আজকাল অধিকমাত্রায় হইয়াছে, যাহাদের কিপ্লিংই গুরু, সুতরাং popular হইবে কি না জানি না। তবে তিন শ্রেণীর বন্ধুগণের মত জোগাইতেছি :—

'প্রথম। এক সম্ভ্রান্ত আমেরিকান্ মহিলা— সাহিত্যে বিশেষ অনুরাগ আছে। "ছুটী" শুনিয়া কাঁদিয়া আকুল।

'দ্বিতীয়— Typical John Bull। "ছুটী" শুনিয়া বলিলেন যে, local colour ত কিছু দেখিলাম না— ফটিক যে আমাদের দেশী ছেলে,

১ জগদীশচন্দ্রকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র [১২ ডিসেম্বর ১৯০০]—'আমার গল্পের অনুবাদ ছাপাইয়া কিছু যে লাভ হইবে, ইহা আমি আশা করি না— যদি লাভ হয় আমি তাহাতে কোন দাবী রাখিতে চাহি না— তুমি যাহাকে খুসি দিয়ো।'